মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
অনূদিত
মুহাম্মদ কুতুবের
বিংশ শতাব্দীর
জাহিলিয়াত

বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত
মূল ঃ মুহাম্মদ কুতুব
অনুবাদ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৬

চতুর্থ প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১২ ইং
শাওয়াল ঃ ১৪৩৩
ভাদ্র ঃ ১৪১৯

প্রকাশক
রোকসানা বেগম
খায়রুন প্রকাশনী

কম্পোজ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০-ই/ এ-১, মধুবাগ, মগবাজর, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
আবদুল্লাহ জুবাইর

মুদ্রণ
মাল্টিলিংক
৬৮, ইসলাম ভবন (২য় তলা) ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ISBN : 984-8455-35-7

বিনিময় মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

আমাদের কথা

সারা দুনিয়া জুড়ে চলছে এক মহাক্রান্তিকাল। যে জড়বাদী সভ্যতার চোখ-ঝলসানো চাকচিক্য একদিন বিশ্বের মানুষকে হকচকিয়ে দিয়েছিল, তার অন্তঃসারশূন্যতা ইতিমধ্যেই সবার কাছে ধরা পড়ে গেছে। জড়বাদী সভ্যতার পুঁজিবাদী সংস্করণের মরণ-ঘন্টা বহু আগেই বেজে উঠেছে। এর মার্কসবাদী সংস্করণ আজ মৃত। পশ্চিমা সমাজের দূরদর্শী চিন্তাবিদদের কাছে, জড়বাদী সভ্যতার মানবতা-বিরোধী রূপ চরমভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেলেও আমাদের দেশের এক শ্রেণীর হীনমন্যতাগ্রস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এখনও পাশ্চাত্য সমাজের বাহ্যিক চাকচিক্যের মায়া-মরীচিকাময় মোহগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না— এটা সত্যই এক দুর্ভাগ্যের কথা। তাদের মতে জড়বাদী সভ্যতারূপী আধুনিক জাহিলিয়াতের মধ্যেই নাকি বিশ্বমানবতার পরিত্রাণ নিহিত রয়েছে।

আরব বিশ্বের বিখ্যাত মনীষী মুহাম্মদ কুতুব এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নামধারীর এই মোহগ্রস্ততা কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে এই পুস্তকে জাহিলিয়াতের নব রূপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন নির্মম হস্তে। এই সময়োপযোগী মূল্যবান গ্রন্থের বাংলা তরজমা করেছেন বাংলাদেশের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকবৃন্দ শুধু বর্তমান শতাব্দীর জাহিলিয়াতের স্বরূপের সঙ্গেই পরিচিত হবেন না, এই সব মানবতা বিরোধী মতবাদ কিভাবে আধুনিক সমাজ-মানসকে বিশেষ করে মুসলিম সমাজকে কিভাবে বিভ্রান্ত করে তুলতে উদ্যত হয়েছে লেখক তারও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এ ধরনের পুস্তক শিক্ষিত মুসলমান সমাজের ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। এই বই পড়ে যদি আমাদের তরুণ সমাজ আধুনিক জাহিলিয়াতের সর্বনাশা স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে, তবেই সার্থক হবে আমাদের এ প্রয়াস।

বইটির নাম নিয়ে হয়ত জনগণের মনে বিভ্রান্তি থাকতে পারে। যেহেতু বর্তমান শতাব্দী একাবিংশ শতাব্দী। আমরা বিংশ শতাব্দীতে লেখা লেখকের নামটিই রাখার পক্ষপাতি, কারণ, "জাহিলিয়াত কোনো শতাব্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়— সময়ের বিবর্তনে শুধু রং পালটায়।" পাঠক বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন আশা করি।

— প্রকাশক

গ্রন্থ পরিচিতি

এই গ্রন্থখানি

'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এই বইখানির নাম ... ...

এ নাম বহু লোকের মনে কঠিন প্রশ্নের উদ্রেক করবে। ... ... বিংশ শতাব্দীর এই যুগকে 'জাহিলিয়াত' বলা যায় কি করে? জাহিলিয়াত বলতে কি সেই একটি বিশেষ সময়কে বুঝায় না, যা জাজীরাতুল আরবে ছিল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে? কিংবা মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনো এক অধ্যায়ে— যা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে? তা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সর্ভতা-সংস্কৃতির এই চরম উন্নতির যুগকে— বস্তুগত উন্নতি-অগ্রগতির এই বিস্ময়কর বিকাশের সময়কে 'জাহিলিয়াত' বলে আখ্যায়িত করা কি ধৃষ্টতা নয়? ... ...

গ্রন্থকার এই পর্যায়ে উল্লিখিত সকল প্রকারের প্রশ্নের অকাট্য জবাব দিয়েছেন। কিন্তু তিনি 'জাহিলিয়াত' শব্দের প্রচলিত অর্থের ওপর নির্ভর করেন নি। শব্দটিকে সেই অর্থে ব্যবহারও করেন নি। তিনি শব্দটিকে একটি বিশেষ পরিভাষারূপে দেখেছেন। আসলে গ্রন্থকার ইসলামী ভাবধারা ও কুরআনী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে নতুন নতুন পরিভাষা রচনা করে নিয়েছেন। 'জাহিলিয়াত'ও অনুরূপ একটি বিশেষ পরিভাষা।

এই সব প্রাথমিক আলোচনার পর গ্রন্থকার পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেন এবং তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনাম দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে ... ... আধুনিক জাহিলিয়াতের বৈশিষ্ট্য ... ... ধারণা বিশ্বাসে বিপর্যয় ... ... আচার-আচরণে ও জীবন-ধারায়ও বিপর্যয় ... ... কেননা ধারণা-বিশ্বাস বিপর্যয় সৃষ্টি করলে বাস্তব জীবন ধারায় ও আচার-আচরণে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ... ...।

বিংশ শতাব্দীর এই যুগে জাহিলিয়াত মানুষের জীবনকে সর্বাত্মকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। বর্তমান দুনিয়ার মানুষের জীবনে কোনো একটি দিকও এমন নেই, যা এই জাহিলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই অবস্থার অপরিহার্য ফলশ্রুতি স্বরূপ ইসলামের সম্মুখে আসা, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা, দেশে দেশে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়া ছাড়া বিশ্বমানবতার পক্ষে গত্যন্তর থাকতে পারে না। কেননা জাহিলিয়াতের ঘন তমিশ্রায় আচ্ছন্ন নিশিথের

অবসানে নবীন সূর্যের উদয় এক চিরন্তন ও স্বাভাবিক ব্যাপার। তার ব্যতিক্রম হতে পারে না, ইতিহাসে কখনোই হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

কিন্তু বর্তমানেও বহু লোক সেই ইসলামকে এড়িয়ে যেতে চায়, বহু লোক তাকে ঘৃণা করে। গ্রন্থকার অত্যন্ত নিপুণভাবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এড়িয়ে চলা বা ঘৃণা করার কারণ, জাহিলিয়াতে আচ্ছন্ন লোকেরা ইসলামী জীবনে নিজেদের স্বার্থান্ধতা, লালসার অন্ধ অনুসরণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার অপমৃত্যু ঘটতে দেখবার জন্যে প্রস্তুত নয়। কিন্তু সেদিন দূরে নয়, যখন তাদের এই মানসিকতাকে চূর্ণ করে দিয়ে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটবে।

ইসলামের দিকে বিশ্বমানবতার প্রত্যাবর্তন এক অপরিহার্য ও অবধারিত সত্য। বর্তমান সময়ের মানুষ যত কুফরীতেই নিমজ্জিত থাকুক, জনগণ এই কুফরী ব্যবস্থায় যত কষ্ট পাচ্ছে, তাগুতী শাসনের যত দর্প ও ক্রুরতাই দেখা যাচ্ছে, ইসলামের আগমনের সাথে সাথে সব কিছুই বিলীন হয়ে যাবে— রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ে যেমন করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায় রাতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার।

সেই নতুন দিনের নির্মল সূর্য কিরণের সন্ধান করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

—অনুবাদক

শুরু কথা

এই গ্রন্থের নাম 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত'। বহু লোক এই নামকরণ দেখে বিস্মিত হবেন, অন্য বহু লোক হয়ত তাকে সম্পূর্ণরূপে অপছন্দ করবেন....

বিংশ শতাব্দী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শতাব্দী। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার উদ্ভাবনীর শতাব্দী! সংগঠন ও বিন্যাস স্থাপনের সময় কাল। প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপনের যুগ। অণু ও পরমাণুশক্তি বিচূর্ণকরণ ও তার বিকাশ লাভের যুগ। তাহলে এই সবই কি জাহিলিয়াত?

এ যুগে মানুষ উন্নতি উৎকর্ষের চরম শিখরে আরোহণ করেছে। অতীতের সমগ্র ইতিহাসেও তার কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ এ যুগে যে শক্তি, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও প্রতাপ-দাপট অর্জন করেছে, মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও পৃথিবী গ্রহের মানুষ তার কল্পনাও করতে পারেনি। কয়েক শতক পূর্বে তা পারা তো সুদূর পরাহত ছিল। ... ... তাহলে এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতে জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, তা আমরা কি করে বলতে পারি ?

আজকের মানুষ যে মূল্যবোধের ছত্রছায়ায় বসবাস করছে, তা হচ্ছে মুক্তি ও স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্য, গণতন্ত্র ও সামাজিক সুবিচার, যুক্তি ও বিজ্ঞান। এরূপ অবস্থায় আমাদের এই যুগকে জাহিলিয়াত বলব কোন যুক্তিতে ?

o o o

বহু লোকই সাধারণভাবে মনে করে, জাহিলিয়াত বলতে বুঝি কালের কোনো একটি বিশেষ অধ্যায়কে বোঝায়, যা ইসলামের পূর্বে আরব উপদ্বীপে বিরাজমান ছিল।

.... এরা পবিত্র চরিত্রাশ্রয়ী! রাসূলে করীম (স)-কে প্রেরণের পূর্ববর্তী কালকে আল্লাহ্ তা'আলা 'জাহিলিয়াত' বলে অভিহিত করেছেন। মনে হচ্ছে, ওরা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতে প্রস্তুত নয়। তাই শুধু উক্ত সময়টিকেই তারা জাহিলিয়াত মনে করতে বদ্ধপরিকর। ওরা বাস্তবিকই বিশ্বাস করে, ইসলামের বিপরীতে এই যুগটি সত্যিই জাহিলিয়াত ছিল।

তবে খারাপ মনোবৃত্তির লোকদের প্রতিরোধ করে বহু সংখ্যক অনৈসলামী শক্তি। রাসূলে করীম (স) একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

لَيْسَ مِنَا مَنْ دَعَا اِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ - (مسلم - ابوداؤد - نسائى)

যে লোক হিংস্র গোষ্ঠীপ্রীতির আহ্বান জানাবে, সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। আর যে লোক এই হিংস্র বিদ্বেষী গোষ্ঠীবদ্ধতার ভাবধারা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, সেও আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।

উক্ত লোকেরা এই ব্যাপারে বহু বিতর্কের অবতারণা করেছে। তারা সকলে তদানীন্তন আরবের জাহিলিয়াতকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। তাদের মতে কুরআন যদিও তাকে 'জাহিলিয়াত' বলেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নাকি জাহিলিয়াত ছিল না। তদানীন্তন আরব পরিবেশে অনেক বিশেষত্ব ছিল। ছিল ব্যক্তিগত অনেক মূল্যবোধ। ছিল জ্ঞান তথ্য, ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আর তা সবই তখনকার দুনিয়ার প্রথম দুই সভ্যতা— রোমান ও পারসিক-এর সাথে আরবের গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগের ফলশ্রুতি। এসব তথ্য অবশ্য এ কালের প্রাচ্যবিদদের (orientalists) গভীর সূক্ষ্ম গবেষণার ফলে জানা গেছে। এ শ্রেণীর লোকেরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবি করছে, বিংশ শতাব্দীর এই জ্ঞানোজ্জ্বল যুগে 'জাহিলিয়াত' বলতে কিছু নেই, থাকতে পারে না।

তাদের নিজস্ব মানদণ্ডেই যদি সত্য-মিথ্যা বা ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয়, তাহলে তাদের একথা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, এই সব লোক 'জাহিলিয়াত' বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়, কি তার যথার্থ তাৎপর্য, তা আসলেই জানে না। জানে না কুরআন মজীদ 'জাহিলিয়াত' বলতে কি বুঝিয়েছে।

এই লোকদের ধারণা, সাদা-মাটা শির্ক এবং মরুজীবন উপযোগী মূর্তিপূজা-ই হচ্ছে 'জাহিলিয়াত'। সেই সাথে প্রতিরোধ গ্রহণ ও সেকালের আরব সমাজের যে নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, তা-ও জাহিলিয়াতের বাহ্যিক প্রকাশ। অন্য কথায় জাহিলিয়াতের বাহ্যিক প্রকাশ— প্রপঞ্চকেই তারা জাহিলিয়াত মনে করেন, যা তখনকার আরব সমাজে ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরা জাহিলিয়াতকে এই সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত এবং তা ইতিহাসের দূর অতীত এক অধ্যায়ে আরব উপদ্বীপের বিচ্ছিন্ন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর সেই কাল যেহেতু অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তাই তা আর কখনোই— কোনো সময়ই এবং কোনো জনসমাজে পুনঃ প্রবর্তিত হতে পারবে না।

এ ক্ষেত্রে খারাপ মনোভাব সম্পন্ন লোকেরা মনে করে, জাহিলিয়াত হচ্ছে তাই, যা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিপন্থী। যা সত্যতা ও সংস্কৃতির বিরোধী। যা প্রগতি বিরোধী, বস্তুগত অগ্রগতির পথে যা প্রতিবন্ধক। যা চিন্তা, সামষ্টিকতা, রাজনৈতিকতা কিংবা মানবিক মূল্যবোধের বিপরীত, তাই জাহিলিয়াত। এই কারণেই তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা একান্তভাবে নিয়োজিত হয়েছে সেইসব জিনিস প্রতিরোধ সংগ্রামে। কিন্তু তা রাসূলে করীম (স)-এর নীতি আদর্শ ও সংগ্রাম রীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। ফলে প্রকারান্তরে তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, তদানীন্তন আরব মূর্খ বা জাহিল ছিল না, তারা নানা তত্ত্ব ও তথ্যের ধারক বাহক ছিল। তারা ছিল না পশ্চাদপদ, প্রগতি বিরোধী। তারাও এক ধরনের সভ্যতা সংস্কৃতির ধ্বজাধারী ছিল। মূল্যবোধশূন্যও ছিল না তারা, তাদেরও নানা গুণ-বৈশিষ্ট্য ছিল— মহানুভবতা, বীরত্ব, বিপন্নের ফরিয়াদে সাড়া দান, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, মর্যাদাবোধ ও অনুরূপ অন্যান্য ভালো কাজের জন্যে জীবন দান এবং প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মহৎ গুণে তারা বিভূষিত ছিল। অতএব কুরআন যে এই যুগ বা সমাজকে 'জাহিলিয়াত' বলেছে তা যথার্থ নয়। আর এই কারণেই তারা বিংশ শতাব্দীতে জাহিলিয়াতের কোনো নাম-চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। বরং তাদের দৃষ্টিতে বর্তমান শতাব্দী তো উন্নতি-উৎকর্ষের আলোকোজ্জ্বল যুগ। এই যুগেই মানুষ পারে উচ্চতর স্বপ্ন দেখতে, মহান কিছু ভাবতে।

এ সত্ত্বেও আমরা বলব, এরা জাহিলিয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য জানে না। তারা বুঝতে পারেনি কুরআন কেন এই যুগকে জাহিলিয়াত বলেছে, তার গভীর সূক্ষ্মতত্ত্ব এই লোকদের অগোচরেই রয়ে গেছে।

বস্তুত 'জাহিলিয়াত' বলতে— এরা যেমন মনে করেছে কোনো সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ প্রতিকৃতি নয়। ওদের ধারণা, তা অতীত কালের একটি সময়ের বিশেষ ব্যাপার, তা পুনঃ প্রবর্তিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মূলত জাহিলিয়াত হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট ভাবধারা— সারনির্যাস। তা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে এবং তা হয়ে থাকে পরিবেশ-পরিস্থিতি সময়-কাল ও স্থানের অবস্থার প্রেক্ষিতে। তা সত্ত্বেও সেইসব রূপের অভিন্ন পরিচয়— তা জাহিলিয়াত। তার বাহ্য প্রকাশ (phenomenon) যতই বিভিন্ন ও বিচিত্র হোক-না-কেন, আর বাহ্যিকভাবে সেসবের মধ্যে যত পার্থক্যেরই ধারণা করা হোক-না-কেন, মূল ব্যাপারের দিক দিয়ে তাতে বিন্দুমাত্রও তারতম্য ঘটে না।

আর তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, অবহিতি, অভিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বস্তুগত প্রগতি-অগ্রগতি এবং চিন্তা সামষ্টিকতা রাজনৈতিকতা ও সাধারণ মানবিকতার বিপরীতও কিছু নয়। যেমন এক শ্রেণীর লোক চিন্তা করেছে। তা আরব জাহিলিয়াতের প্রেক্ষিতেই হোক, কি অধুনা বিংশ শতকের জাহিলিয়াতের প্রেক্ষিতে। সেই মূল ভাবধারা সর্বত্রই লক্ষণীয়।

মূলত কুরআন মজীদ-ই এই শব্দটির ব্যবহার করেছে এবং তার সংজ্ঞা ও পরিচিতিও উপস্থাপিত করেছে। কুরআনের দৃষ্টিতে 'জাহিলিয়াত' হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থা, যা আল্লাহ্র দেওয়া হেদায়েত মেনে নিতে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তা এমন এক পরিবেশ ও সামাজিক সংগঠন যা আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ও বিচার কার্য সম্পাদন করতে সম্পূর্ণ অরাজী হয়ে দাঁড়ায়। এই কথাই প্রকাশ করা হয়েছে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিতে —

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

ওরা কি জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব সন্ধান করে ? অথচ দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন লোকদের জন্যে আল্লাহ্র তুলনায় অধিক উত্তম ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে ?

এ আয়াত অনুযায়ী 'জাহিলিয়াত' হচ্ছে আল্লাহ্ পরিচিতি আল্লাহ্র দেওয়া হেদায়েত অনুযায়ী হেদায়েত গ্রহণ এবং আল্লাহ্র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসন-প্রশাসন চালানোর পরিপন্থী রীতি-নীতি ও আদর্শ। তা কথিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, বস্তুগত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বিপুল উৎপাদনের বিপরীত কিছু নয়।

০ ০ ০

কুরআন কখনোই বলেনি যে, আরবরা 'জাহিলিয়াতের' মধ্যে নিমজ্জিত ছিল এইজন্য যে, তারা জ্যোর্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যা জানত না। অথবা এজন্যে যে, তারা রাজনৈতিক সংস্থা-ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল না। কিংবা বস্তুগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা পশ্চাদপদ রয়ে গিয়েছিল। তারা বিশেষ বিশেষ কোনো গুণ-বৈশিষ্ট্যে ভূষিত ছিল না; কিংবা সাধারণভাবে মূল্যবোধ বঞ্চিত ছিল বলেও তাদের জীবনকে 'জাহিলিয়াত' বলে অভিহিত করা হয়নি। কুরআন যদি তাদের প্রসঙ্গে এরূপ কথা বলত তাহলে আল্লাহ্ তাদের জন্যে বিকল্প কিছুর ব্যবস্থা অবশ্যই করতেন। যেমন মূর্খতার বিকল্প বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য বা জ্যোতির্বিদ্যা,

প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসা বিদ্যাই তার বিকল্প হিসেবে মনে করা যেত। কিংবা রাজনৈতিক মূর্খতার পরিবর্তে বিস্তারিত অধীত রাষ্ট্রীয় মতবাদ মতাদর্শ-ও বিকল্প হতে পারত। বস্তুগত উৎপাদন অক্ষমতা বা ত্রুটির বিকল্প হিসেবে বিপুল উৎপাদনের উপায়-উপকরণেরও ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল না। এ কাজকে আরও উন্নত উৎকর্ষসম্পন্নও করা যেত। বিশেষ গুণ–বৈশিষ্ট্যের অভাব ও বিশেষ ধরনের মুল্যবোধের অনুপস্থিতিকেও নানাভাবে পূরণ করা যেত। তাতে কোনোরূপ অসম্ভাব্যতার অবকাশ ছিল না।

কিন্তু কুরআন তাদের সম্পর্কে এই পর্যায়ের কোনো কথাই বলেনি। আর এই কারণেই কথিত ধরনের কোনো বিকল্প ব্যবস্থাই তাদের জন্যে করা হয়নি।[১]

কুরআন তাদের সম্পর্কে বলেছে, ওরা 'জাহিল'। কেননা ওরা নিজেদের কামনা-বাসনা ধারণা-চিন্তাকে শাসক-নিয়ন্ত্রক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। আর আল্লাহ্‌র হুকুম ও বিধানকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বস্তুত এটাই হচ্ছে জাহিলিয়াত এবং আল্লাহ্ তাদের এই জাহিলিয়াতের বদলেই দ্বীন-ইসলাম দান করেছেন।

মানব জীবনকে বিচার করার জন্যে এটাই হচ্ছে কুরআন অবলম্বিত মানদণ্ড (Measure)। এই মানদণ্ড জাহিলিয়াতের প্রতিপক্ষ। তা তদানীন্তন আরব জাহিলিয়াত হোক; কিংবা হোক ইতিহাসের অন্য কোনো অধ্যায়ে অপর কোনো জাহিলিয়াত।

প্রাচীনতম কালের অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাহিনী কুরআন মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে। যে সব সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলাম পূর্ব আরবদের তুলনায় বিপুলভাবে উন্নত মানের ও অগ্রসর ছিল। তা সত্ত্বেও কুরআন-ইসলাম তাকে 'জাহিলিয়াত' নামে অভিহিত করছে। কেননা সে সব সভ্যতা-সংস্কৃতি আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়েত অবলম্বনকারী বা তার অনুসারী ছিল না। এই পর্যায়ে কুরআনের এ আয়াতটি স্মরণীয় ঃ

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْٓا اَشَدَّ
مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط

১. সন্দেহ নেই, উত্তরকালে ইসলামী অভ্যুদয়ের পরিণতিতে এই সব কিছুই তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যে মানুষকে জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন ঐগুলো তার বিকল্প ছিল না।

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُ

وَالسُّوْٓءٰٓى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ - (الروم -٩- ١٠)

ওরা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি কি হয়েছিল। তারা শক্তির দিক দিয়ে ওদের অপেক্ষা অধিক ছিল। তারা পৃথিবীকে উন্নত ও উৎকর্ষিত করেছে। তারা যতটা উন্নত-উৎকর্ষিত করেছে তার তুলনায় অনেক বেশি এবং তাদের কাছে তাদের রাসূলগণও এসেছিল অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ নিদর্শনাদি সহকারে। ফলে আল্লাহ্ তো তাদের ওপর জুলুম করেন নি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। পরে যারা চূড়ান্ত মাত্রায় খারাপ কাজ করেছে তাদের পরিণতিও খারাপ হয়েছে। আর সে খারাপ কাজ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করেছিল এবং তারা সে সবের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল।

এ আয়াতে কুরআন আরব 'জাহিলগণ'কে প্রাচীন ও পূর্ববর্তী জাহিলিয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে। সে দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তারা দেখতে পাবে তার পরিণতি কি ভয়াবহ হয়েছে। তাহলেই তারা জাহিলিয়াতকে ভয় করবে, তাকে এড়িয়ে যেতে পারবে। আর তাহলে তারা আল্লাহ্র আয়াতকে অসত্য মনে করবে না, তা মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতাকেও পারবে না অস্বীকার করতে। তখন তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে, কুরআনের হেদায়েতকে তারা অবলম্বন করবে। উপরোক্ত আয়াতে যদিও 'জাহিলিয়াত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু তার তাৎপর্য ও ভাবার্থ যথাযথভাবে উপস্থিত। এ আয়াতে আরব 'জাহিল'গণকে বলা হয়েছে, জাহিলিয়াতের ক্ষেত্রে ওরা সব তোমাদেরই মতো। যদিও তারা শক্তি-সামর্থ, দাপট-প্রতাপ ও পৃথিবী আবাদকরণে, সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টিতে তোমাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর ও উন্নত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহিলিয়াতের মানদণ্ডে তোমরা ও তারা ভিন্ন। আর জাহিলিয়াতের এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি তোমাদের সকলের পক্ষেই অত্যন্ত মারাত্মক। অতএব তোমরা এই জাহিলিয়াতের অক্টোপাস থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভ করে আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়েতের পটভূমিতে ফিরে এসো। তোমরা সত্যিকার অর্থে মুসলিম— একান্তভাবে আল্লাহনুগত হয়ে যাও।

এ প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জাহিলিয়াত মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যা আল্লাহ্র দেওয়া হেদায়েত গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। তা এমন এক সাংগঠনিক-সামষ্টিক রূপ, যা আল্লাহ্র নাযিলকরা বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসন-

প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণরূপে অবাধ্য ও অরাজী। আর এই রূপ অবস্থারই অনিবার্য ফসল হচ্ছে চরম মাত্রার বিকৃতি ও বিপর্যয়— deliquity perversion। এই বিকৃতি ও বিপর্যয়ের রূপ বিভিন্ন হতে পারে এবং বিভিন্ন রূপের বিকৃতি ও বির্যয়ের ফলাফলও হতে পারে বিভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব জীবনে বিকৃতি ও বিপর্যয় নিয়ে আসার ব্যাপারে অভিন্ন ভূমিকা পালন করে। জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। শান্তি সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা হয়ে দাঁড়ায় সুদূর পরাহত।

এই কারণে এ জাহিলিয়াত ইসলাম পূর্ব আরব জাহিলিয়াতের রূপ ও প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সীমিত নয় কাল ও যুগের কোনো একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে। আসলে তা এমন একটি অবস্থা, যা কালের যে-কোনো সময়ে, দুনিয়ার যে-কোনো দেশে এবং মানুষের যে-কোনো সমাজ-সংস্থায় পাওয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। অনুরূপভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির যে কোনো স্তরে— বস্তুগত উন্নতি-অগ্রগতি, মূল্যমান, চিন্তা, রাজনৈতিকতা, সামষ্টিকতা ও মানবিকতার যে কোনো ধাপে ও বাঁকেই তা বাস্তব হয়ে দেখা দিতে পারে। আর তা বাস্তব হয়ে দেখা দিতে পারে তখনই, যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের হেদায়েত অবলম্বিত অনুসৃত হবে না, হবে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষিত। আর তদস্থলে অনুসৃত হবে মানুষের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত মতাদর্শ, পরিপূরিত হবে মানুষের খাহেশ-কামনা-বাসনা, অস্বীকৃত হবে আল্লাহ্র দ্বীন, আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান।

এ কারণেই বলা যায়, জাহিলিয়াত ও মানুষের খাহেশ, কামনা-বাসনা ও নিজস্ব চিন্তা প্রসূত মতবাদ মতাদর্শ এক ও অভিন্ন।

অতএব যারাই নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়, অনুসরণ করে মানব-রচিত নিয়ম বিধান, কার্যত তারাই অস্বীকার করে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মেনে চলতে, অনুসরণ করতে। আর তখনই তারা নিমজ্জিত হয়ে পড়ে জাহিলিয়াতের অতল গহ্বরে। কেননা তারা আল্লাহ্র হেদায়েতকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছে। মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সভ্যতা-সংস্কৃতির, বস্তুগত অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক-সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্থা-সংগঠনের দিক দিয়ে উন্নতি ঊর্ধ্বগতির যত উচ্চতর স্তরেই পৌঁছে গিয়ে থাকুক-না কেন। আর এই জাহিলিয়াতের যা কিছু অনিবার্য পরিণতি, যা কিছু ফলাফল, তার সম্মুখীন তাদের হতেই হবে নিশ্চিতভাবে। অশান্তি-অস্থিরতা, দুর্ভাগ্য-হতাশা-বঞ্চনার অমোঘ পরিণতি থেকে তাদের নিষ্কৃতি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

কাজেই স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, তদানীন্তন আরবরাই জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল না ইসলামের পূর্বে। বরং অনুরূপ যে জন-গোষ্ঠীই আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা-মতবাদ অনুসরণ করে চলে, তারা অভিন্নভাবেই জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত।

যারা মনে করে, ইসলাম-পূর্বকালীন আরবের জাহিলিয়াতই একমাত্র জাহিলিয়াত, তাদের সম্মুখে জাহিলিয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির চরম উন্নতির আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে জীবন যাপনের সঠিক রূপ কি তা তারা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারবে জাহিলিয়াতের এই তাৎপর্যের আলোকেই। এ কালের যে সব লোক তদানীন্তন আরব জাহিলিয়াতের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেন, সে জাহিলিয়াত থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আছে বলে অন্তরে আত্মশ্লাঘা বোধ করে, তাদের জন্য আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, তারা এজন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন, তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। তারা কখনোই এই ধারণায় সফল হতে পারে না যে, বিংশ শতাব্দীর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি রাজনৈতিক-সামষ্টিক-চৈন্তিক মূল্যবোধের এই চরম উৎকর্ষের যুগে তদানীন্তন আরব জাহিলিয়াত— যাকে তারা অনেক পশ্চাতে ফেলে এসেছে— তাদের স্পর্শমাত্রও করতে পারবে না। তাদের মনে রাখা উচিত বিংশ শতাব্দীর এই যুগ চৌদ্দশ বছর পূর্বেকার আরব জাহিলিয়াতের তুলনায় অধিক বীভৎস ও জঘন্য জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। উপরন্তু অধিক সত্য কথা হচ্ছে, পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মানুষের ইতিহাসে বর্তমান বিংশ শতাব্দীই হচ্ছে সর্বাধিক জাহিলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ।

তদানীন্তন আরবে জাহিলিয়াত ছিল খুবই সাদা-সিধা, হালকা, অপুঞ্জীভূত এবং পাত্রের তলদেশে অবস্থিত আবর্জনার মতো। তখনকার লোকেরা দৃশ্যমান মূর্তির পূজা করত। তাও ছিল অপরিপক্ক, সরল প্রকৃতির কল্পনার সাহায্যে মূর্তিগুলোর গাত্রে নানা বিচিত্র রঙ লাগিয়ে দিয়ে শোভা মণ্ডিত করে দিত। এইগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের নানা প্রকারের অনুষ্ঠান হতো— যদিও সবই হলো পথভ্রান্ত, আদর্শ বিচ্যুত। কিন্তু সে বিচ্যুত ও বিভ্রান্তি ছিল অত্যন্ত সরল, অগভীর। আর এই সবই ছিল কোরায়েশ বংশের ষড়যন্ত্র ও শক্ত হস্তক্ষেপের ফল। সব কিছু তাদের নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত হতো। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণই ছিল সবকিছুর মূলে নিহিত লক্ষ্য। আর এই সব কারণেই তারা শাশ্বত সত্য ও সুবিচারের

পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সর্বপ্রকারের জাহিলিয়াতের পশ্চাতেই এই রূপ কালো হাতের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী; তা প্রাচীন কালের হোক, কি আধুনিক কালের। তবে তা কখনো অশক্ত সহজ রূপও ধারণ করে থাকে, যদিও তাতে তার বীভৎসতা পূর্ণ মাত্রায় নগ্ন হয়ে দেখা দেয়। তার কারণ, আসল প্রকৃতিতে এতটা বিকৃতি আসে না, যতটা তার বাহ্যিক প্রকাশে গোচরীভূত হয়। এরূপ অবস্থায় বাহ্যিক ছালের (বকল) সাথে মহাসত্যের ঘর্ষণে তা অবিলম্বেন বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তা শাশ্বত সত্যের ধারক হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, পুঞ্জিভূত অন্ধকার হয়ে যেতে পারে বিলীন।

কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াত অত্যন্ত জঠিল, অধিক বীভৎস, রূঢ় ও জঘন্য। কেননা এ জাহিলিয়াত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাহিলিয়াত। তত্ত্বলোচনা, তত্ত্বানুসন্ধান, গবেষণা, অধ্যয়ন ও মতাদর্শের জাহিলিয়াত। প্রকৃতির গভীরে নিহিত সুসংবদ্ধ জাহিলিয়াত। এ জাহিলিয়াত বস্তুগত অগ্রগতির, যা তার অর্জিত শক্তিমত্তে মত্ত। তার বিশ্ববিজয়ী ও দিগন্ত বিস্তারকারী প্রভাবে দিশেহারা।

এ জাহিলিয়াত সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের, সুগঠিত, সুপরিকল্পিত; বিশ্বমানবতাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে একান্তভাবে নিয়োজিত। তার যাবতীয় কার্যকলাপই বিজ্ঞানভিত্তিক; বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল সমৃদ্ধ। এমন এক জাহিলিয়াত; যার দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিংশ শতাব্দীর এই অভিনব জাহিলিয়াতের— তার প্রপঞ্চের বিস্তারিত অধ্যয়নই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এ গ্রন্থে আমরা অধ্যয়ন করব এর কার্যকারণের, তার চাকচিক্যময় বাহ্য প্রকাশের, মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণের ওপর তার প্রতিফলন, মানব জীবনে লব্ধতার ফলাফল; মানুষের ভবিষ্যত।

এই আলোচনায় আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হবে; তা সবই সেই বাস্তব অবস্থা ও ঘটনাবলী থেকে সংগৃহীত; যার মধ্যে আমরা জীবন ধারণ করছি। তা প্রাচ্য হোক, কি পাশ্চাত্যে।

গোটা পৃথিবী থেকে সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণ.......

এ আলোচনার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ধ্যান-ধারণা নির্ভুল করে তোলা।

আচার-আচরণকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা। প্রগতি ও অপ্রগতির বা বিকাশ-এর নামে যে বিভ্রান্তির কুহক জালে বর্তমান বিশ্বমানবতা জর্জরিত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির

প্রতারণায় সম্মোহিত, এ আলোচনার তীব্র কষাঘাতে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, এ আমাদের দুরাশা নয়। এর ফলে মানবতা আত্ম-সচেতনতা ফিরে পাবে। তারা যে গভীর খাঁদের দিকে তীব্রগতিতে দৌড়ে যাচ্ছে, মনে করছে, তারা নির্ভুল পথেই অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের এ আলোচনায় তাদের এ ভুল ভাঙবে।

আর এই সব প্রেক্ষিতেই বিশ্ব মানবতার সম্মুখে শুভ সংবাদ উপস্থাপিত করাও আমাদের কাম্য।

সে এমন এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ, যার প্রতি আমাদের রয়েছে প্রবল ঈমান। সে ভবিষ্যৎ অর্জন করা তখনই সম্ভব হবে, যখন মানবতা বর্তমান পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করে নির্মল আলোকের দিকে অগ্রসর হবে।

আমি অবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে খুবই সচেতন। আমি জানি, আমাদের লক্ষ্যভূত কাজ মাত্র দু'-এক খানি কেন, হাজার খানি গ্রন্থেরও সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে আমি দুটি ব্যাপারকে পরপর সাজিয়ে দিচ্ছিঃ

প্রথম, আমি বিশ্বাস করি, অন্তর-নিঃসৃত কথা কখনোই নিষ্ফল যায় না, যদিও তা সহসাই মানুষের কর্ণকুহরে ভেদ করে মর্মে গিয়ে পৌঁছায় না।

আর দ্বিতীয়, অন্ধকারের দুর্ভেদ্য জাল ছিন্ন করার কাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই।

পুঞ্জীভূত অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করে নতুন সূর্যের আলোকচ্ছটা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। — আমি তা নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আর সেই আলো— উজ্জ্বল। তার মধ্যে বসেই আমি এই গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ্ই আমাকে মনযিলে পৌঁছিয়ে দিবেন।

— মুহাম্মদ কুতুব

সূচীপত্র

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؟ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

তবে ওরা কি জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়? অথচ দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন লোকদের জন্যে আল্লাহ্‌র তুলনায় অধিক উত্তম হুকুম দানকারী (কর্তৃত্ব সম্পন্ন) সত্তা আর কে হতে পারে? (সূরা মায়েদা ঃ ৫০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আমরা যথার্থভাবেই জানতে পেরেছি যে, ইতিহাসের অধ্যায়সমূহের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ ও সীমাবদ্ধ অধ্যায়কেই 'জাহিলিয়াত' নামে চিহ্নিত করা যায় না।

আমরা এ-ও জেনে নিয়েছি যে, তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি-সভ্যতা ও বস্তুগত উৎকর্ষ-অগ্রগতি বললে যা বুঝায় তার বিপরীত কোনো জিনিসকে জাহিলিয়াত বলা যায় না।

মূলত জাহিলিয়াত হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেওয়া হেদায়েত অবলম্বন ও অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অস্বীকার করা।

এই প্রেক্ষিতে আমাদের মন-মানসিকতার মধ্যে এমন একটি প্রস্তুতি জেগে ও গড়ে উঠেছে, যার দরুন আমরা সহজেই বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত পর্যায়ে প্রকাশ্য ও উন্মুক্ত আলোচনার অবতারণা করতে পারি।

আমাদের এই প্রস্তুতি কারোর-কারোর জন্যে বিব্রতকরও হতে পারে বটে! কেননা আধুনিককালের জাহিলিয়াত অনেক মানুষকে বিমোহিত, অবনত ও অধীন বানিয়ে দিয়েছে। তারা বলে, জাহিলিয়াত বলতে তুমি যখন এই শতাব্দীকেই বোঝাতে চেয়েছ তখন তা-ই সই। আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। এই শতাব্দীর প্রতি আমাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি রয়েছে, তোমরা একে যতই জাহিলিয়াত বলে অভিহিত করো না কেন! শুধু তাই-ই নয়, আমরা এর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করছি, এর প্রতি লোলুপ হয়ে তাকিয়ে আছি। আমরা এই শতাব্দীর ভূষণ ও আয়োজন ত্যাগ করে 'আল্লাহ্‌র হেদায়েত' নামের কোনো জিনিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে রাজি নই। কেননা, তোমরা 'আল্লাহ্‌র হেদায়েত' বলে যে-জিনিস পেশ করছ, তা তো মূর্খতা, কুসংস্কারে ভর্তি, পশ্চাদপদতা, পতনশীলতা, পচনশীলতা, অসভ্যতা, বর্বরতা। আমরা ইচ্ছা করেই তার অক্টোপাস থেকে বের হয়ে এসেছি। আমরা নবতর সংস্কৃতি পেয়েছি, উত্তরিত হয়েছি নবতর এক উচ্চমানের সভ্যতায়। ফলে আমরা অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে আলোকমণ্ডিত পরিবেশে এসে গেছি। না, না, তোমাদের কথা শুনছি না! এই জাহিলিয়াতই আমাদের পছন্দ,

আমাদের কাছে অতিশয় প্রিয় সেই জিনিসের তুলনায়, যার দিকে তোমরা আমাদের ডাক দিচ্ছ।

এই মানসিকতার সাথে কুরআন মজীদের এই কথাটুকু পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى -

এই লোকেরা অন্ধত্বকে অধিক পছন্দ করে নিয়েছে হেদায়েতের তুলনায়। (হা-মীম সাজদাহ্ ঃ ১৭)

আল্লাহ্র এই কথাটিও যথার্থ ঃ

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ط تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ -

এমনিভাবেই যারা কিছুই জানে না, বুঝে না, তারা বলে ওদের মতোই কথা। আসলে ওদের সকলের অন্তরসমূহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ— অভিন্ন হয়ে গেছে ....। (সূরা বাকারা ঃ ১১৮)

সার কথা, জাহিলিয়াতের এই ধ্বজাধারী লোকেরা ইতিহাসের পটভূমিতে একই কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। সেকালের ও একালের এই মনোভাবের লোকদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই— সবই একাকার।

আধুনিক কালের জাহিলিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে আমাদের মন ও মগজ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি মোটেই বিস্ময়কর কিছু নয়, নয় অপরিচিত কিছু— যেমন প্রথম দিক দিয়ে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে একথাও সত্য যে, বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণমুখী আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

বরং সত্যি কথা এই যে, এ পর্যায়ে এত বিস্তাতির আলোচনার প্রয়োজন যে, এই ধরনের আরও বহু সংখ্যক বই এ পর্যায়ে রচিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

বস্তুত 'জাহিলিয়াত' মাত্রই— তা যে কালের ও যে-ধরনেরই হোক— আল্লাহ্র দেওয়া হেদায়েতকে অপছন্দ ও অগ্রাহ্য করে। হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করে অন্ধত্বকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আর মনে মনে ধারণা করে, তারা যে জিনিস অবলম্বন করেছে, তা সম্পূর্ণ কল্যাণময়। আর তাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র যে হেদায়েতের দিকে তাদের আহ্বান করা হচ্ছে তাতে ক্ষতি বা লোকসান ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু তাদের অবলম্বিত জাহিলিয়াত ও অন্ধত্বে যে পথভ্রষ্টতা, বিকৃতি, বিপথগামিতা, ভাগ্যহীনতা ও অস্থিরতা নিহিত রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রথম দিক দিয়ে সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় হেদায়েত পাওয়ার পর; তার পূর্বে নয়।

অন্ধকারের গহ্বর থেকে মুক্তিলাভের পর আলোকের মধ্যে আসতে পারলেই বুঝতে পারা যায় আলোর মর্যাদা ও গুরুত্ব। জাহিলিয়াতের ধ্বংসকারিতা মর্মে মর্মে অনুধাবনের জন্যে একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে মানব প্রকৃতিকে আল্লাহ্‌র হেদায়েতের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

আমাদের এই গ্রন্থের লক্ষ্যই হচ্ছে, বর্তমান মানবতা যে ভ্রষ্টতা, বিকৃতি, বিপথগামিতা, দুর্ভাগ্য ও মানসিক অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জিত, তা পূর্ণ মাত্রায় উদ্‌ঘাটন করা। এটা স্পষ্ট করে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, তাদের বর্তমান সর্বাত্মক দুর্দশা ও সর্বগ্রাসী পতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দাসত্বকে অস্বীকার করা, আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান থেকে দূরে– অনেক দূরে চলে যাওয়া।

সন্দেহ নেই, আমার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের মন-মগজের পক্ষে খুব সহজ হবে না, কেননা বর্তমানের এই জাহিলিয়াত তার অনুসারীদের মনের পটে বহুবিধ বর্ণের ছটা বিক্ষেপণ করেছে। তাদের ধারণা ও আচরণে বিভিন্ন প্রকারের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

কোনো কোনো সময় তাদের এই প্রবোধ দেওয়া হয় যে, তাদের ধারণা ও আচার-আচরণ যা কিছুই রয়েছে, তাতে তারা আল্লাহ্‌র বিরোধিতা কিছু করছে না। তারা যা কিছু ভাবছে, যা কিছু করছে, তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই স্থিরীকৃত হয়েছে। তাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ।

আবার কখনো বোঝানো হয়, তাদের ধারণা ও আচার-আচরণে যা কিছু বিকৃতি ও বিপর্যয় এসেছে, তাতে তাদের কোনো হাত নেই। এই সবকিছুই অবধারিত, ললাট লিখন। তারা তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারে না, পারে না তা পরিবর্তন করতেও। তা সর্বদিক দিয়েই তাদের বুঝ দিতে সচেষ্ট বটে; কিন্তু যে বুঝ দেওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র উল্লেখ অনিবার্য, তা সযত্নে পরিহার করে চলবে। আল্লাহ্‌রও যে বিধান রয়েছে মানবতার কল্যাণের মধ্যে, তা কখনোই তাদের বলা হবে না। ফলে দুনিয়ার প্রতিটি শক্তিই বিদ্রোহী, এমন প্রতিটি শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াই করা অবশ্যম্ভাবী। এখানকার প্রত্যেক সংস্থা ও ব্যবস্থা অবশ্যই সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু তার কোনোটিই আল্লাহ্ প্রদত্ত মানদণ্ডে ওজন বা যাচাই করা হবে না। কেননা তাকে তো কোনো হিসাবেই গণ্য করা হয় না বর্তমান যুগের জাহিলিয়াতের পটভূমিতে।

জনগণ যখন প্রকৃতই আত্মসচেতনতা লাভ করবে, তাদের আত্মা যখন জেগে উঠবে, স্বচ্ছ দৃষ্টি হবে উন্মুক্ত, তখনই তারা বুঝতে ও জানতে পারবে যে, মানুষের সাথে এরূপ আচরণ কেবল একালের এই জাহিলিয়াতেরই নয়; ইতিহাসের প্রতিটি

অধ্যায়ের জাহিলিয়াতেরই এই প্রকৃতি, এই ধর্ম। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত দ্বারা তাদের কথাই বলা হয়েছেঃ

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا -

এই লোকেরা যখন কোনো চরম নির্লজ্জতার কাজ করে তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের তো এইরূপ কাজে ব্যস্ত পেয়েছি— বরং আল্লাহ্-ই আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা 'আরাফ ঃ ২৮)

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا -

শির্ককারীরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ্ চাইলে তো আমরা শির্ক করতাম না, আমাদের পিতৃপুরুষরাও নয়। (সূরা আন'আম ঃ ১৪৮)

তাহলে দেখা গেল, জাহিলিয়াতের বাহ্যিক রূপ বিভিন্ন হয়ে থাকে। তা যেমন বস্তুগত হয়, তেমিন হয় পরিবেশগত। কিন্তু এ সম্পর্কিত মৌল ধারণা বিভিন্ন হয় না। ইতিহাসের ধারায় তার কার্যকারিতাও হয় না বিভিন্ন রূপ।

ব্যাপার যা-ই হোক, বর্তমান জাহিলিয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত লোকেরা কি কঠিন বিকৃতি ও বিপথগামিতার আবর্তে পড়ে গেছে তা অনুধাবন করা তাদের পক্ষে খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কেননা, এই বিকৃতি ও বিপথগামিতার মৌল কারণই হচ্ছে আল্লাহ্র হেদায়েত থেকে তাদের দূরে সরে যাওয়া, তার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়া। তাদের কাছে এই ব্যাপারটি যখন প্রকট হয়ে উঠবে এবং তারা এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হতে পারবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্র হেদায়েত তাদের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থা, অশান্তি, পীড়ন, জ্বালা-যন্ত্রণা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। অন্য কথায় আল্লাহ্র হেদায়েতের কার্যকারিতার জন্যে এই মানসিক চেতনা ও জাগরণ পূর্বশর্ত। তা হলেই তা তাদেরকে স্থিতি, নিশ্চিন্ততা, স্বস্তি, সৌভাগ্য ও সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু তা কি খুব সহজসাধ্য ব্যাপার?... মোটেই নয়। সেইজন্য সেই পরিমাণ চেষ্টা-সাধণা ও সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতীক্ষা প্রয়োজন, যতটা আধুনিক জাহিলিয়াত তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যয় ও বিনিয়োগ করেছে। যা করে তারা তাদের মনে আল্লাহ্র হেদায়েতের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এখানে তাদের সম্মুখে জীবনের নবতর ব্যাখ্যা পেশ করতে হবে, অন্য সব ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত করতে হবে এবং তদস্থলে সেই ব্যাখ্যা মন-মগজে বসিয়ে দিতে হবে যা নাযিল করেছেন স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা আলাহ্ তা'আলা।

কিন্তু ব্যাপারটির কঠিনতা-জটিলতা আমাদেরকে যেন নিষ্ক্রিয় করে দিতে না পারে সেজন্যে আমরা এই কথা বলা থেকেও বিরত থাকব না। এই বর্ণনা

নিশ্চয়ই প্রকৃত কোনো অন্তরায় হয়ে যেন না দাঁড়ায় আল্লাহ্‌র সত্য হেদায়েত লাভ এ জনগণের মধ্যে। জনগণকে অবশ্যই আধুনিক জাহিলিয়াতের সব লোভনীয়-আকর্ষণীয় কথাবার্তা ও জাঁকজমক থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। তা হলেই আশা করা যায় তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হবে মহাসত্য অনুধাবন ও গ্রহণের জন্যে। তখন বর্তমান জাহিলিয়াতের কুৎসিত চেহারা তাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে। এই পরম সত্যকে য়ারা ভালোবাসতে পারবে, তদনুযায়ী জীবন যাপন শুরু করতে ও তাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে পূর্ণ শক্তি দিয়ে জিহাদও করতে সক্ষম হবে।

o o o

শুরুতেই জনগণ হয়তো আমাদের সাথে একমত হবে না, আমাদের বক্তব্যকে সত্য বলে মেনে নেবে না।

একালের মানুষ যে চরম ব্যর্থতা, অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্যে জীবন যাপন করছে, তা যেন আল্লাহ্‌র দিক থেকে তাদের দূরত্বে পড়ে যাওয়ারই অনিবার্য ফল, একথা অনুধাবন করা হয়তো তাদের পক্ষে কঠিনই হবে।

আধুনিক জাহিলিয়াত তাদের বুঝিয়েছে মূলধন বা পুঁজিবাদই হচ্ছে তাদের এ দুর্ভাগ্যের মূলীভূত কারণ অথবা তা শ্রেণী পার্থক্য ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি। কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাই এই অশান্তির আসল স্রষ্টা বা পারস্পরিক নিশ্চিত বৈপরীত্য এর এক উদ্ভাবক। অথবা অর্থনৈতিক চাপ ও নির্যাতন মানুষকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। .... এইভাবে অনেক জিনিসেরই উল্লেখ করবে; কিন্তু কস্মিনকালেও এবং একবারের তরেও বলবে না যে, মানব জীবনের বাস্তবতার সাথে আল্লাহ্‌র— আল্লাহ্‌র শাশ্বত নিয়মের— এই দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রবর্তিত নিয়মের গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং সম্পর্কে ব্যত্যয় ঘটেছে বলেই আজকের বিশ্বব্যাপী এই অশান্তি।

আধুনিক জাহিলিয়াত যতই পরিহাস করুন, জীবনের উত্থান ও পতন এবং সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের যে-ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, তার প্রকৃত ও নির্ভুল ব্যাখ্যা তো সম্ভব আল্লাহ্‌র সুন্নাত অনুযায়ী, আল্লাহ্‌র দেখানো পন্থা ও পদ্ধতিতেই। মানুষের মন ও মগজ থেকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কশীল সব কিছুকে উৎখাত করতে তা যতই চেষ্টা করুক, তারা তো সমগ্র জীবনের বাস্তবতাকেই শামিল করবে— তা মতাদর্শের ক্ষেত্রেই হোক, কি বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে।

সর্বোপরি আল্লাহ্‌ ও তাঁর পদ্ধতি এবং মধ্যযুগ ও অন্ধকার যুগের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যেমন তা সংযোগ স্থাপন করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার পদ্ধতির মধ্যে, আল্লাহ্‌র পদ্ধতি থেকে দূরত্ব সৃষ্টির মধ্যে।

এই কারণে আধুনিক মন-মানসিকতার লোকেরা খুব সহজেই যে আমাদের এই আলোচনার যথার্থতা স্বীকার করবে না তা আগেভাগেই বলে রাখছি।

০ ০ ০

বক্ষ্যমান আলোচনায় আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করছি তা হচ্ছে প্রথমে আমরা দেখাব, আধুনিক জাহিলিয়াতের উৎপত্তি কি করে হলো। তা ইতিহাসেরই একটি পাতা। দ্বিতীয়ত, আমরা বলব জাহিলিয়াতের যে সব মন-ভোলানো চাকচিক্যের কথা যার মধ্যে এখনকার লোকেরা জীবন অতিবাহিত করছে।......

তা একালেরই ইতিহাস।

অতঃপর আমরা সন্ধান করব, একালে সমস্ত মানুষের জীবনে সে চাকচিক্য কি করে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। অনুপ্রবেশ লাভ করেছে তাদের ধারণায়, তাদের আচার-আচরণে, রাজনীতিতে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সমাজ সমষ্টিতে, মনোবিদ্যায়, চরিত্রে, শিল্পে, কলায়, জীবনের সকল পর্যায়ের তৎপরতায়। . . . . . তা-ও বাস্তব ঘটনা সমন্বিত।

সর্বশেষে আমরা বলব, এই সবকিছু কিভাবে সংঘটিত হলো ..... হতে পারত না যদি তারা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করত। ...আর এক্ষণে তারা যদি নিজেদের জীবন থেকে এই সব কলংক-কালিমা মুছে ফেলে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পথ ও পন্থা অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হয়, যদি চলতে প্রস্তুত হয় আল্লাহ্‌ প্রদর্শিত উচ্চ-উন্নত পথে তাহলে তাদের জন্যে করণীয় কি আছে? এটা উন্নত ভবিষ্যতের আশা-ভরসায় ভরা পৃষ্ঠা। অতঃপর পর্যায়ক্রমিক এই আলোচনাই শুরু করা হয়েছে ....।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে

পৃথিবীতে জাহিলিয়াতের একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস অতীব প্রাচীন। যেমন প্রাচীনতম ইতিহাস রয়েছে ঈমান ও ইসলামের।

এই দুটোরই সূচনা হয়েছে প্রথম মানুষ আদম থেকে...তাঁর বংশধরদের সময় থেকে। এ দুটোরই মূলে নিহিত রয়েছে মানবীয় প্রকৃতি, মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব। মূলতই মানুষ সমন্বিত সত্তা। তার মধ্যে রয়েছে যেমন হেদায়েত গ্রহণের প্রবণতা তেমনি রয়েছে গুমরাহীর প্রতি আকর্ষণ, জাহিলিয়াতের প্রতি যেমন ঝোঁক রয়েছে তেমনি উদ্যম ও উৎসাহ রয়েছে পরিচিতি লাভের জন্যে নির্ভুল ও প্রকৃত জ্ঞান। কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْخَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

কসম নফসের এবং যা তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছে। অতঃপর তাকে ইলহাম করা হয়েছে (জানিয়ে দেওয়া হয়েছে) তার পাপপ্রবণতা ও আল্লাহ্-ভীতিমূলক ভাবধারা। নিঃসন্দেহে সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করল সে, যে তাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন-পরিশুদ্ধ করেছে। আর যে তাকে ধূলিমলিন করে বসিয়ে দিল, সে হলো সম্পূর্ণ ব্যর্থ। (সূরা আল-শাম্স ঃ ৭-১০)

বলেছেন ঃ

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ -

এবং তাকে দুটি উজ্জ্বল স্পষ্ট পথ প্রদর্শন করেছি। (সূরা বালাদ ঃ ১০)

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا -

আমরা মানুষকে পথ দেখিয়েছি— হয় আল্লাহ্র আনুগত্য ও শোকর করো না হয় কুফরির পথ। (সূরা আদ-দাহর ঃ ৩)

অতএব দুনিয়ায় মানুষের দ্বারা যা কিছু সংঘটিত হবে, যা কিছু ঘটবে মানুষের জন্যে, তা সবই মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত আল্লাহ্র এই নীতি ও নিয়মের ভিত্তিতেই ঘটবে। কেননা তিনিই মানুষকে সমন্বিত প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তা যেমন হেদায়েতগ্রহণ করতে পারে, তেমনি পারে গুমরাহী গ্রহণ করতেও। মানবতার ইতিহাসে এ থেকে ব্যতিক্রম কিছু— না মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, না মানুষের জন্যে সংঘটিত হয়েছে। কি অতীতে, কি অদূর-সুদূর ভবিষ্যতে সেরূপ কিছু সংঘটিত হওয়ার সম্ভব ছিল, না কোনো দিন তা সম্ভব হবে।

মানুষের ইতিহাস হেদায়েত বা গুমরাহী এই দুই ধারায় প্রবহমান। এর কোনো একটি পথ থেকে মানুষের বাইরে চলে যাওয়া কখনোই সম্ভব হতে পারে নি, পারবে না কোনো দিন। এই দুটি পথের একটির নাম ইসলাম। আর অপরটিই হচ্ছে জাহিলিয়াত।[১]

এই পৃথিবীর বুকে মানুষের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে— বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে। তাদের বিবর্তন ঘটেছে প্রকৃত তাৎপর্যগতভাবে, সুদৃঢ় পথে ও ভঙ্গিতে। অর্থাৎ তারা ক্রমবৃদ্ধি লাভ করেছে, পরিপক্ক হয়েছে এবং হয়েছে পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণ পরিণত। অথবা তাদের বিবর্তন ঘটেছে বিকৃত, কৃত্রিম বিপর্যস্ত পথের বিপথগামিতায়। অর্থাৎ তারা সরল সোজা ভারসাম্যপূর্ণ পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলেছে।[২]

এবং প্রতিটি বিবর্তন— এটা বা ওটা— বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যে রূপটি পরিবেশ ও বস্তুগত-জ্ঞানগত এবং সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির আনুকূল্য লাভ করেছে, তা-ই ধারণ করেছে, পরিণত হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের সামগ্রিক বিবর্তনে এবং সে বিবর্তন যে রূপ পরিগ্রহ করেছে সেই রূপে বর্ণিত দুটি অবস্থার কোনো একটি থেকেও বাইরে চলে যায়নি। এখানে তৃতীয় কোনো অবস্থা সৃষ্টি হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। হয় হেদায়েতের অবস্থা হবে, নয় হবে গুমরাহীর অবস্থা। হয় ইসলাম হবে, না হয় হবে জাহিলিয়াত।

এই প্রেক্ষেতেই একথা বিদালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাহিলিয়াতের সাথে স্থান ও কালের কোনো সম্পর্ক নেই, জ্ঞান-মনীষার মান, বস্তুগত প্রগতি-অগ্রগতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সংগঠন সংবদ্ধতার সাথেও নেই তার এক বিন্দু বন্ধন বা সম্পর্ক।

মূলত হেদায়েত যেমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মৌল ভাবাধারা, তেমিন জাহিলিয়াতও এক স্বতন্ত্র মৌল। অবশ্য এর প্রতিটির বিবর্তিত রূপ ও আকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে।

'হেদায়েত' হচ্ছে আল্লাহ্‌র মারেফত— পরিচিতি লাভ, আল্লাহ্‌র হেদায়েত অনুসরণ আর 'জাহিলিয়াত' হচ্ছে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা— আল্লাহ্‌র হেদায়েত হতে দূরবর্তিতা, তাঁর সাথে নিঃসম্পর্কতা।

পরবর্তীতে 'হেদায়েত' ও 'জাহিলিয়াত' বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। তা অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে— সর্বক্ষেত্রে ঘটে। ঘটে মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার পরিবেশগত বস্তুপ্রকৃতির

---

১. دراسات فی المنفس الانسا نیه .
২. النطور والثبات فی حیات المبشرية

সাথে ঘর্ষণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে, সেই সাথে সংগঠন, বিন্যাস এবং জীবনের বিভিন্ন 'ফ্যাক্টরে'র মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতার মাত্রা অনুপাতে।

অর্থনীতি, সামাজিকতা, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির কোনো একটিও তার বিবর্তিত কোনো একটি অবস্থাতে ও কথিত দুটি অবস্থার মধ্য থেকে কোনো একটি অবস্থারও বাইরে যেতে পারে না। হয় হবে হেদায়েত, না হয় গুমরাহী— ভ্রষ্টতা; হয় ইসলাম, না হয় জাহিলিয়াত।

এ আলোচনার আলোকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, 'জাহিলিয়াত' মানুষের বা ইতিহাসের বিবর্তনের কোনো এক পর্যায়ে বা স্তরের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়— তা পর্যায়-স্তরের উর্ধ্বে।

০ ০ ০

এ আলোচনায় অবশ্য আমরা সমগ্র ইতিহাস— ইতিহাসের সবগুলো পৃষ্ঠাই টেনে আনতে পারি না। তা কোনো ক্রমেই সহজ কাজও নয়।

তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আমরা এমন সব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার উল্লেখ করব, যা সেই মহাসত্যকে উদ্ভাসিত করে তুলবে, আধুনিক জাহিলিয়াত যে মহাসত্যকে ইচ্ছামূলকভাবেই অবহেলা ও উপেক্ষা করে এসেছে। ইচ্ছামূলকভাবে উপেক্ষা করার মূলে উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহ্ থেকে যেসব জিনিস বাস্তব জীবনে আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর ও সুদৃঢ় করে সেই সব জিনিস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

বস্তুত আল্লাহ্র দ্বীন প্রথম দিন থেকেই পূর্ণাঙ্গ জীবনের সংগঠক। মানুষের সামাজিকতা-সামষ্টিকতা, তাদের অর্থনীতি ও রাজনীতি— সব কিছুই তার অন্তর্ভুক্ত। তার অন্তর্ভুক্ত মানুষের অনুভূতি, স্বজ্ঞা ও আকীদা-বিশ্বাস। কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াত এই মহা সত্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। তা এই ধারণা প্রচার করেছে যে, দ্বীন বা ধর্ম এই অনুভূতি ও আকীদা-বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট ব্যাপারই ছিল চিরকাল। মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে তা কখনোই কোনো ভূমিকা পালন করেনি। সেরূপ স্বীকৃতও হয়নি কখনো।

আর আকীদা-বিশ্বাস তো একটা স্থিতিশীল জিনিস। তা কখনোই পরিবর্তিত হয় না, পরিবর্তন স্বীকার করে না। আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা— তিনিই উপাস্য-আরাধ্য, মা'বুদ— যদিও আরাধনা-উপাসনা-ইবাদতের রূপ এক-এক ধর্মে এক-এক প্রকারের রয়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে। তাতে কখনোই কোনো পরিবর্তন আসেনি, আসবার নয়।

তবে শরীয়ত— বাস্তব জীবনের কর্মবিধান মানুষের প্রবৃদ্ধি পরিপক্কতার সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে। সরল সহজ থেকে জটিল-কঠিনে রূপান্তরিত হয়েছে।

সাধারণ মৌলনীতি থেকে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আর এভাবেই দ্বীন আকীদা ও বিধান উভয় দিক দিয়েই পূর্ণত্ব লাভ করেছে সেইদিন, যেদিন আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

আজকের দিনে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে এবং সম্পূর্ণ করে দিয়েছি তোমাদের প্রতি আমার এই নেয়ামত। আর তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই আমি পছন্দ ও মনোনীত করে দিলাম। (সূরা আল-মায়াদা ঃ ৩)

ইতিহাসের ধারায় হেদায়েত ও জাহিলিয়াত দুটি পাশাপাশি চলে এসেছে, এসেছে একটির পরই অন্যটি। যখনই রাসূল প্রেরিত হয়েছে, আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী নাযিল হয়েছে। মানুষ তখন তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে হেদায়েতের ওপর দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তখন কিছু লোক এই মূল পর্যায়ে বা অন্য কোনো পর্যায়ে ভিন্নতর পথ অবলম্বন করে জাহিলিয়াতের দিকে চলে গেছে সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে। ফলে জীবনের যে পর্যায়ে এই দুটি পাশাপাশি দেখা গেছে সেখানেই হেদায়েত ও জাহিলিয়াত প্রতিবারে পরস্পর সমান মানে ও মাত্রায় সুবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে ঃ

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْجَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَاتَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَلَاتَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ج وَاذْكُرُوْآ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ص وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ -

এবং মাদ্ইয়ানের দিকে পাঠিয়েছি সেখানকার লোকদেরই ভাই শুয়াইবকে। সে বলল ঃ হে জনগণ! তোমরা দাস হয়ে থাকো একমাত্র আল্লাহ্র। তিনি ছাড়া তোমাদের মা'বুদ কেউ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের আল্লাহ্র কাছ থেকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এসে গেছে। অতএব, তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করে দাও, লোকদের জিনিসপত্র কম দিয়ে জুলুম করো না। পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও সুস্থতা শুদ্ধতার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্যে

অতীব কল্যাণকর, যদি তেমরা ঈামনদার লোক হয়ে থাকো, তোমরা প্রতিটি পথে বসে থেকে ওয়াদা করতে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি যে ঈমান এনেছে তাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করো না— সে পথে যেতে বাধাগ্রস্ত করো না, সেই পথ বাঁকা করতে চেয়ে। তোমরা স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় খুব কম ছিলে। পরে আল্লাহ্‌ই তোমাদের বিপুল সংখ্যক করে দিয়েছেন। আর দেখো বিপর্যয়কারীদের পরিণতি কি হয়েছে! (সূরা-'আরাফ ঃ ৮৫-৮৬)

হযরত শুয়াইব (আ) তাঁর জনগণের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন আকীদা পেশ করেছিলেন, তেমনি দিয়েছিলেন শরীয়ত— জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতি।

সে আকীদা স্থায়ী, অপরিবর্তনীয়। তার মূল কথা ঃ اُعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ — 'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দাস হয়ে জীবর্ন যাপন করো। তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্‌ আর কেউ নয়— নেই।' আর যে শরীয়ত পেশ করেছিলেন, তা ছিল বিস্তারিত। অর্থনৈতিক নিয়মনীতি ও তার রূপরেখাও তার মধ্যে শামিল ছিল। এ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَاتَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ -

তোমরা পূর্ণ করো পরিমাপ এবং ওজন। আর লোকদেরকাছে বিক্রয় করা দ্রব্য সামগ্রীতে কম দিয়ে জুলুম করো না। (সূরা আরাফ ঃ ৮৫)

সেই সাথে ছিল সামাজিক রাজনৈতিক নিয়ম-বিধান ঃ

وَلَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا .... وَلَاتَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ -

এবং পৃথিবীতে তার সুস্থ, নির্ঝঞ্ঝাট-নির্বিঘ্ন থাকার পরে তোমরা বিপর্যয় অশান্তির চেষ্টা করো না।...আর প্রতিটি পথে লোকদেরকে নানা ওয়াদা করা থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধাগ্রস্ত করো না। (সূরা আরাফ ঃ ৫৬ ও ৮৬)

হযরত শুয়াইব প্রদত্ত এসব মৌল বিধান ছিল তখনকার লোকেরা যে সামাজিক -রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক স্তরে বসবাস করছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে, সেই অনুপাতে।

এই স্তরেও বহু লোক তাদের সামষ্টিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন সংস্থা গড়ে তুলেছিল আল্লাহ্‌র দেওয়া শরীয়তের বিধানের ভিত্তিতে। তারা ছিল প্রকৃত

মুমিন কিংবা বলা যায় তারা ছিল মুসলিম। ইসলামের সর্বাত্মক রূপই তাতে প্রতিফলিত। হযরত শুয়াইবের আপন জনগণের মধ্য থেকেই বহু লোক শরীয়তের হেদায়েতের ভিত্তিতে তাদের জীবন গড়ে তুলতে ও পরিচালিত করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে তারা জাহিলিয়াতের মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল। আর এই ইসলাম ও জাহিলিয়াত সেই মান ও স্তরেই অবস্থিত ছিল যার মধ্যে তখনকার মানুষ জীবন যাপন করত।

অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর আগমন হল। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হলো তওরাত গ্রন্থ। তাতে যেমন ছিল হেদায়েত, তেমিন আলো। তাতে এমন আকীদা বিধৃত ছিল যা কখনোই পরিবর্তিত হয় না এবং তা-ও ঃ

اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

তোমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র বান্দা হও, তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ আর কেউ নেই। (সূরা আরাফ ঃ ৬৫)

তাতে যে শরীয়ত বিবৃত হয়েছিল, তা মানবতার বিকাশ ও ক্রমোন্নতির মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত সমাজ-সমষ্টিতে একটি রাষ্ট্র ও সরকারে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যসম্পন্ন ছিল। তাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিধান বিধৃত ছিল। তাতে ক্রয়-বিক্রয়ের আইন ছিল, বিয়ে-তালাকের বিধান ছিল, অপরাধ ও তার দণ্ড উল্লেখিত ছিল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও নীতি-বিধানেরও উল্লেখ ছিল তাতে।

এই স্তরেও বহু মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনকে আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিধানের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করে নিয়েছিল। ফলে এরা ছিল প্রকৃত মুমিন ও মুসলিম। আর অপর কিছু লোক— হযরত মূসার অপনজনের মধ্য থেকেই— শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন গঠন ও পরিচালন করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে তারা জাহিলিয়াতের মধ্যেই থেকে গেল। এই ইসলাম ও জাহিলিয়াত উভয়ই সেই সময়কার জনগণের জীবন যাত্রার মান ও স্তরের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল।

অতঃপর প্রেরিত হলেন হযরত ঈসা (আ)। তিনি নিয়ে এলেন আল্লাহ্‌র কিতাব ইন্‌জীল। তা তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাত কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী, সত্যতা ঘোষণাকারী ছিল। তখনকার লোকদের প্রতি যেসব জিনিস হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, তাতেও তা হালাল ঘোষিত হলো। আকীদা ও শরীয়ত উভয় দিক দিয়েই তা ছিল তওরাতের পরিপূরক ও পশ্চাদানুসরণ (Follow up)। তখন কিছু লোক তা গ্রহণ ও অনুসরণ করে। এজন্যে তারাই ছিল তখনকার সময়ের মুমিন ও মুসলিম।

অন্যরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়ে জাহিলিয়াতের মধ্যে ডুবে থাকল। এ সময়কার জনগণের জীবন মান ও স্তর অনুপাতেই ইসলাম ও জাহিলিয়াত বিবর্তন-স্তর পরিগ্রহ করেছিল।

এরপর এলো দ্বীন-ইসলামের যুগ। দ্বীন হল পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণ পরিণত। বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহ্র এই মহানেয়ামত নাযিল হওয়ার কাজটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হলো।

ইসলাম উপস্থাপিত করল আকীদা ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান— শরীয়ত। আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা সব দ্বীনই এমনি পূর্ণাঙ্গ ছিল। তাতে যেমন অপরিবর্তনশীল আকীদা-বিশ্বাস ছিল ঃ 'দাস হয়ে থাকো একমাত্র আল্লাহ্র। তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই— নয়।' আর শরীয়ত বিবর্তিত হয়ে সর্বশেষ পূর্ণ পরিণত রূপ পরিগ্রহ করল। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলাই অনাগত বিশ্ব মাবনতার জন্যে এই শরীয়তকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, মানবতার সর্বোচ্চ পরিণত স্তরের মান অনুযায়ী এই শরীয়তকে আল্লাহ্ তা'আলা রচনা করেছেন। তাতে জীবনের গভীর সূক্ষ্ম দূরবর্তী খুঁটিনাটি বিষয়েও পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। তা মানবতার পরবর্তী বিবর্তনের সকল স্তর ও পর্যায়ের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ও চাহিদা পরিপূরণে সক্ষম। তা সেই দিন পর্যন্ত মানুষকে পরিচালনা করবে যেদিন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ই এই পরিত্যক্ত পৃথিবী ও তার ওপর অবস্থিত সবকিছুরই উত্তরাধিকারী হবেন। (মানব জীবনের স্থিতি ও বিবর্তন পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনাও গ্রন্থকার করেছেন তাঁর স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থে এবং ইসলাম কিভাবে উভয় দিকের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম তাও তিনি তাতে দেখিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন যে, জীবন তার বিবর্তনের কোনো স্তরেই ইসলামী ভাবধারা এই আইন-বিধানের আওতার বাইরে যেতে বাধ্য হয় না। এখানে তা উদ্ধৃত করা শোভন হবে না। তবে এ গ্রন্থেও আমরা যথাস্থানে এই পর্যায়ের আলোচনা তুলব।)[১]

এই পর্যায়েও বহু লোক ইসলামের প্রতি ঈমান গ্রহণ করে মুমিন ও মুসলিম হয়েছেন। আর অন্য লোকেরা তা অস্বীকার করে জাহিলিয়াতের মধ্যেই রয়ে গেছে— সেই সময় থেকেই।

বিগত চৌদ্দশ' বছরে মানুষের জীবন নানাভাবে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে ইসলাম আগমনের পর। আর প্রায় সব ভূখণ্ডেই মানুষ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তৃতীয় ভাগের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি। একভাগে মুসলিম, অপরভাগে জাহিলিয়াতের নিশানবরদার— জাহিল। প্রতিটি জীবনের বিবর্তিত পর্যায়ে অবস্থান করছে। সেই স্তরের মান ও দাবি-দাওয়া অনুপাতেই সব হচ্ছে। কিন্তু যেসব লোক

১. এই গ্রন্থটির নামঃ الاسلام وحياة البشرية س ঃ অধ্যায় ঃ المنطوروالثبات فى حياة البشري পাঠ করুন।

আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র হেদায়েত গ্রহণ করতে পেরেছেন ও সেইভাবেই চলেছেন। তাঁরাও জীবনের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত আল্লাহ্‌র শরীয়তকে যথাযথভাবে মেনে চলেছেন। এঁরাই প্রকৃতপক্ষে মুসলিম। কিন্তু যারা আল্লাহর পরিচিতি পায়নি যথাযথভাবে, তারা তাঁর উপস্থাপিত হেদায়েতকেও গ্রহণ করেনি। বাস্তব জীবনে তারা তাঁর শরীয়তকে মেনেও চলছে না। একালে ওরাই জাহিল – জাহিলিয়াত পরিবেষ্টিত। তা প্রচলিত ও নিয়মে বা অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে হলেও। আর ওরা নামকা-ওয়াস্তের মুসলিম হলেও কোনো তারতম্য হয় না।

উপরে ইতিহাস থেকেই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। আর তা এক সুস্পষ্ট সত্য আমাদের সামনে তুলে ধরে। এ আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে জানতে ও বুঝতে পারছি যে, মানুষের জীবন দুটি অবস্থার যে কোনো একটির মধ্যে অবশ্যই থাকবে ঃ হয় হেদায়েতের পথে, না হয় গুমরাহীর পথে। অন্য কথায়, হয় ইসলাম হবে জীবন ব্যবস্থা, না হয় হবে জাহিলিয়াত। তৃতীয় কিছু হবার নয়।

সমস্ত বিবর্তনই বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। তাতেও আবার এক যুগ থেকে অন্য যুগে পার্থক্য ঘটে। কিন্তু সে বিবর্তনও উল্লিখিত দুটি বেষ্টনীর যে কোনো একটির অভ্যন্তরে সংঘটিত হবে, তৃতীয় কিছুই নেই। হয় হেদায়েত, না হয় গুমরাহী; হয় ইসলাম, না হয় জাহিলিয়াত। কিন্তু এই বিবর্তন স্তর নিজেই নির্ধারণ করে না যে, হেদায়েত হবে, কিংবা জাহিলিয়াত হবে। একটি বিবর্তন স্তর যে পথ ধরে চলে তা-ই তার স্থান নির্দিষ্ট করে যে তা হেদায়েতের বেষ্টনীতে হবে কিংবা হবে জাহিলিয়াতের বেষ্টনীতে আর অপরদিক থেকে হেদায়েত মানব জীবনের কেনো নির্দিষ্ট পর্যায় নয়, জাহিলিয়াতও নয় কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়। বরং এ দুটির প্রতিটি বিবর্তিত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

উপরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে যে সব দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করেছি, এ পর্যায়ের আলোচনায় সেগুলোই আমাদের আসল লক্ষ্য নয়। মূলত আমরা যা বলতে চাই, তা তারই পূর্বাভাস বা ভূমিকা মাত্র। তারই আলোকে আমাদের মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলেই আমরা সেগুলো উদ্ধৃত করেছি। প্রকৃপক্ষে আমরা এখানে আধুনিক জাহিলিয়াতের ইতিহাস পেশ করতে চাই। তা কিভাবে সূচিত হল, তা যে ধারায় অগ্রসর হয়েছে সেই ধারায় অগ্রসর হয়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে তা এতটা সাংঘাতিক ও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করল কিভাবে, কোন সব কার্যকারণ তাকে এতটা স্ফীত ও বিরাট করে দিল তা একালের সমস্ত মানুষের সমগ্র বাস্তবতাকে গ্রাস করে ফেলল, আসলে এগুলোই হচ্ছে এ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য।

আজকের উইরোপ সমগ্র পৃথিবীর ওপর বিজয়ী হয়ে আছে। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপের উপস্থিতি না থাকলেও সেখানে তারই ফসল আমেরিকা

রয়েছে। সরাসরিভাবে না থাকলেও তারই সভ্যতা ও সংস্কৃতি তারই প্রচারিত ভাবধারা, চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যমান-মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি সারা পৃথিবীতে বিজয় ও সর্বাধিক প্রভাবশালী হয়ে আছে।

অথচ এই ইউরোপ-আমেরিকার গোটা ইতিহাসই হচ্ছে জাহিলিয়াতের ইতিহাস। যদিও তার শাখা-প্রশাখা রয়েছে অনেক।

ইউরোপের পূর্বে ছিল গ্রীক জাহিলিয়াত এবং তারপরই রোমান জাহিলিয়াত। তারপর ছিল মধ্যযুগীয় বিকৃত ধারণা-বিশ্বাস সম্বলিত জাহিলিয়াত। আর এই শেষকালে ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানের জাহিলিয়াত। যা প্রকৃতপক্ষে গ্রীক-রোমান জালিয়াতেরই রূপান্তর। এরই পাশাপাশি রয়েছে ডারউইনের নবোদ্ভাবিত জাহিলিয়াত। ইহুদীদের ধ্বংসাত্মক কলা-কুশলতা ও বুদ্ধিবৃত্তি তাকে অত্যন্ত শাণিত ও মারাত্মক বানিয়ে দিয়েছে।

এই গ্রন্থে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় যেহেতু আধুনিক জাহিলিয়াত, এই কারণে আমরা প্রাচীনতম ও মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াত পর্যায়ে খুবই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যাব। সে সংক্ষিপ্ত উল্লেখে অবশ্য আধুনিক জাহিলিয়াত সহজবোধ্য হবে, কেননা আধুনিক জাহিলিয়াত হঠাৎ করে তো আর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। তার শিকড় ইউরোপীয় মাটি ও ইউরোপীয় ইতিহাসের অনেক গভীরে বিস্তৃত।

বস্তুত গ্রীক জাহিলিয়াত ও রোমান জাহিলিয়াতই হচ্ছে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎস ও ভিত্তি। স্বয়ং ইউরোপীয় উৎসসমূহ একথা অকপটে স্বীকার করেছে, যদিও তা নিজেকে জাহিলিয়াত বলতে প্রস্তুত নয়। বরং এক নবতর সভ্যতা বলেই বিশ্বসভায় উদাত্ত দাবি জানিয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আধুনিক ইউরোপীয় নব জাগরণের মূলে নিহিত রয়েছে ইসলামী সভ্যতার বিরাট অবদান। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছে। এই কথাও স্বয়ং ইউরোপীয় উৎসসমূহ নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তা ইসলামের বিশেষ ধারায় চলেনি, অগ্রসর হয়নি, ইসলামী সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত সাধারণ রাব্বানী ধারাকে অবলম্বন করেও সম্মুখে চলেনি। বরং নিজেকে সম্পূর্ণ ও সার্বতোভাবে গ্রীক রোমান রঙে রঞ্জিত করে নিয়েছে এবং তার প্রাথমিককালীন পৌত্তলিকতার দিকে প্রত্যাবর্তিত ও পরিণত হয়েছে। আর তাকে হাল্‌কাভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে খ্রিস্টীয় ভাবধারা। প্রথমদিকে তাকে ইউরোপীয় গীর্জা ব্যবস্থার অধীন লালিত হতে হয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে এই ভাবধারাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে গীর্জা ব্যবস্থাকে চূড়ান্তভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে।

তাই এই পর্যায়ে বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের রূপরেখা বলার পূর্বে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ উদঘাটন জরুরী বলে আমরা মনে করছি।

গ্রীক জাহিলিয়াত ছিল বিভিন্ন শিল্প, দর্শন, রাজনৈতিক মতবাদ এবং বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ সমন্বিত।

এক্ষেত্রে তার উত্তরাধিকার বিরাট।

আধুনিক ইউরোপ তার উত্থানে-অভ্যুদয়ে গ্রীক উত্তরাধিকারের আতিপাতি করে অনুসন্ধান চালিয়েছে তার প্রতিটি দিকে ও বিভাগে। গ্রীক সভ্যতার অত্যন্ত ব্যাপক ও ফলপ্রসূ অধ্যয়ন করেছে, তার খুঁটিনাটি দিকগুলোও হাতছাড়া করতে প্রস্তুত হয়নি। কেননা ইউরোপের আধুনিককালীন অভ্যুদয়ে তা ছিল একান্তই অপরিহার্য।

এই পর্যায়ে মানবীয় চেষ্টা-সাধনার পক্ষে মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিনিয়োগ যতটা সম্ভব ছিল, তার বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটন ও নব দিগন্তের অন্বেষণে বিনিয়োগ করতে একবিন্দু ত্রুটি করেনি।

অবশ্য তাদের জ্ঞান-সাধনার ত্রুটি-বিচ্যুতির অবমূল্যায়ন এবং তাদের চিন্তার মৌলিক ভুল ও বিভ্রান্তি নির্ধারণে আমাদের ওপর বিশেষ কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয় না। আমরা স্বীকার করব তারা তাদের সর্বশেষ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের এমন কোনো শিক্ষাগুরু ছিল না যে, তাদের বিপথগামিতাকে প্রতিরোধ করবে এবং তাদেরকে নির্ভুল পথে পরিচালিত করবে। যদিও তাদের এই বিপথগামিতা রোধ করা ও তাদের বিকৃতি-বিপর্যয় থেকে ফিরিয়ে আনা কারোরই সাধ্যায়তও ছিল না। তাই আমরা কারোর ওপর দায়িত্ব না চাপিয়ে ও বিভ্রান্তি-বিপথগামিতার জন্যে কারোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ না করেই গ্রীক উত্তরাধিকারের বিভ্রান্তির দিকগুলোকে পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরতে চাই। গ্রীকদের এই বিভ্রান্তি একটা স্থায়ী জাহিলিয়াতেরই নিদর্শন। তারই আলোকে আমরা আধুনিক জাহিলিয়াতের রূপরেখাসমূহ স্পষ্ট করে তুলতে অনেক সহায়তা ও আনুকূল্য পাচ্ছি। আধুনিক জাহিলিয়াত তো সেই উত্তরাধিকার থেকেই রস ও খাদ্য গ্রহণ করছে প্রতিনিয়ত।

কারোর প্রতি দোষারোপ না করে— সেই প্রাচীনকালীন চিন্তাবিদ দার্শনিকদের বিশেষ কাউকে দায়ী না করেই— আমাদের বক্তব্য পেশ করব। আমরা জানি, তাদের চেষ্টার কোনো অন্ত ছিল না সত্য-নির্ভুল পথ লাভ করার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তারা এমন কাউকেই পায়নি যে তাদের নির্ভুল পথের ও লক্ষ্যের সন্ধান দিতে পারত। কিন্তু তাদের এই বিভ্রান্তিকে যারা আকড়ে ধরেছে এবং আধুনিক জাহিলিয়াতে সেগুলোকেই যথাযথ নিয়ে এসছে, বিভ্রান্তি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে কোনো চেষ্টাই করেনি, গ্রহণ করেনি কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, তাদের

আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না। কেননা গ্রীকদের বিভ্রান্তি যথাযথভাবে গ্রহণ করার মূলে গ্রহণকারীদের মনে বিভ্রান্তির প্রতি তীব্র আসক্তি ছিল বলেই সম্ভব হয়েছিল।

যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই, গ্রীক উত্তরাধিকারে বহু মূল্যবান ও কল্যাণকর উপকরণ ছিল। যেমন ছিল প্রাচীন মিশরীয় উত্তরাধিকারে, প্রাচীন আরব উত্তরাধিকারে, প্রাচীন পারসিক উত্তরাধিকারে, প্রাচীন ভারতীয় ও চৈনিক উত্তরাধিকারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুটি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম, ইউরোপ আধুনিক জাহিলিয়াত সৃষ্টিতে গ্রীক উত্তরাধিকারকে স্ফীত ও পরিপুষ্ট করে তোলায় খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। যদিও তা বিদ্বেষী মন-মানসিকতারই ফলশ্রুতি। লোকদের মনে শীর্ষস্থানীয় হওয়ার লোভ এমন অহমিকার সৃষ্টি করেছে, যার ওপর শীর্ষস্থানীয় হওয়া কল্পনাতীত। বরং তা এমন এক শীর্ষস্থানীয় হওয়ার অহমিকায় ডুবে যায়, যা কেবল আল্লাহ্‌র প্রেরিত ওহী সম্পর্কেই ধারণা করা চলে, যাকে সত্য বলে মানা যেতে পারে, কিংবা অসত্য মনে করে অমান্যও করা চলে। বেশির ভাগই অগ্রাহ্য করা হয়। কেননা তা এমন এক সত্যের অপলাপ মাত্র, যার তুলনায় অধিক সত্য কোথাও পাওয়া যেতে পারে না।

দ্বিতীয়, এই উত্তরাধিকারের কোনো কোনো দিক সম্পর্কে আমাদের বিস্ময় ঠিক প্রাচীন মিশরীয়, পারসিক, ভারতীয় বা চৈনিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমাদের বিস্ময়ের মতোই। তাই বলে উত্তরাধিকারকে যে নিরংকুশ ও সর্বোচ্চ মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, তা মনে করার কোনোই কারণ নেই। প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সময়ের মধ্যে রেখে মূল্যায়ন করতে হয়, তার বাইরে হয়ত তার কোনো মূল্য বা গুরুত্বই স্বীকৃত হবে না। অনুরূপভাবে সেই উত্তরাধিকারকে তার জাহিলিয়াত সঞ্জাত বিভ্রান্তি সহকারে পুনরুজ্জীবিত করতে চাওয়ারও কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেননা সে বিভ্রান্তি তো তার একটা অক্ষমতার ব্যাপারও হতে পারে। আর আমরা যদি জাহিলিয়াত থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আলোকের দিকে এসে যেতে পারি তাহলে তার পুনরুজ্জীবনেও আমাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

এই প্রেক্ষিতেই আমরা এখানে গ্রীক উত্তরাধিকারের বিকৃতি ও বিপথগামিতা পর্যায়ে আলোচনা করব। তাকে আমরা গ্রীক জাহিলিয়াতও বলতে পারি। এই জাহিলিয়াতই মানুষ ও দেবতা (বা দেবতাদের) মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের চিন্তা সূচিত— বরং দৃঢ়মূল করে দিয়েছে।

'বহু খোদা' সংক্রান্ত বিশ্বাসই হচ্ছে সর্বাত্মক জাহিলিয়াতের নিদর্শন। তা প্রাচীন জাহিলিয়াত হোক, কি নব্য ও আধুনিক। সে 'খোদাগণ' বস্তুগত অনুভবযোগ্য হোক; কিংবা হোক ভাবগত এবং সে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ও সরাসরি স্পষ্ট হোক, কি

আনুসঙ্গিক ও অস্পষ্ট। বহুত্বের সেই মূল বিতর্ক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েও বলা যায়, গ্রীক জাহিলিয়াত মানুষ ও সেসব কল্পিত খোদাগণের মধ্যে অত্যন্ত মারাত্মক ও ক্ষতিকর শত্রুতার চিন্তাকে শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছে।

তার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'পবিত্র আগুনের' চোর প্রোমিথিউসের কল্পকাহিনী।

উপকথার সেই প্রোমিথিউস জিউস ভগবানের দ্বারা পানি ও মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টির কাজ করাচ্ছিল। মানুষের প্রতি তার ছিল গভীর সৌহার্দ্য ও সৌহৃদ্য। তাই সে তাদের জন্যে আকাশমার্গ থেকে পবিত্র আগুন চুরি করে তা তাদেরকে দিয়ে দিল। এজন্যে জিউস তাকে কঠিন শাস্তি দিল। সে তাকে কোহকাফ পর্বত শৃংগে শক্ত শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখল। আর তার ওপর একটা শকুন বসিয়ে দিল। শকুনটি সারাদিন তার কলিজা ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাচ্ছিল এবং রাত্রিকালে তা আবার নতুন করে গড়ে উঠছিল। আর তাই দিনের বেলা তাকে নতুন করে শাস্তি ও কষ্টদান সম্ভবপর হতো। এদিকে মানুষের হাতে পবিত্র অগ্নি থাকার অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে জিউস পাণ্ডুরাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিল। আর সে-ই ছিল দুনিয়ার বুকে প্রথম নারীসত্তা। তার সঙ্গে ছিল একটি বাক্স এবং তাতে ভর্তি ছিল প্রজাতি মানব ধ্বংস করার লক্ষ্যে ব্যবহারযোগ্য নানা প্রকারের দুষ্কৃতি। এই পাণ্ডুরাকে বিয়ে করল প্রোমিথিউসের ভ্রাতা এপ্পিমিথিউস। সে পাণ্ডুরার হাতে ভগবানের উপঢৌকন বাবদ সেই বাক্সটি গ্রহণ করল। সে সেই বাক্সটি খুললে সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য দুষ্কৃতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং ভূ-পৃষ্ঠকে দুষ্কৃতিতে ভরে দিল। এটাই হল খোদা ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি। একদিকে পবিত্র আগুন– যা জ্বালায়, ভস্ম করে– তা হচ্ছে জ্ঞানের আগুন। মানুষ তা খোদাগণের কাছ থেকে চুরি ও অপহরণ করে নিয়ে আয়ত্তাধীন করে রেখেছে। বিশ্ব প্রকৃতি ও জীবনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য। আর তারপরে তারাই দেবতা হয়ে বসবে। আর দেবতারা তো চরম বর্বরতা, হিংস্রতা ও নৃশংসতা সহকারে তাদের ওপর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সদা সচেষ্ট। অন্যথায় তাদের শক্তির এককত্ব ও অনন্য ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে এবং মানুষ তাদের মোকাবিলায় কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের অধিকারী হয়ে বসবে।[১]

ইউরোপ আধুনিক ও নব্য জাহিলিয়াত প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রীক উপকথার ব্যাপক অবতারণা করেছে। বিশেষ করে এই উপখ্যানটির উল্লেখ হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। বলেছে, মানুষ তার নিজ সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এখান থেকেই দ্বন্দ্ব শুরু করে দিয়েছে। কেননা এর ফলেই তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। জীবন তার কর্মতৎপরতার মৌল কারণ এতেই নিহিত। তার সক্রিয়তার যৌক্তিকতাও

১. كتاب منهج الفن الاسلام দ্রষ্টব্য।

তারই দরুন স্বীকৃত। আর আল্লাহ্র নাফরমানী— আল্লাহ্দ্রোহিতাই হচ্ছে মানবীয় সক্রিয়তা— ইতিবাচকতা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার অকাট্য দলীল।

এ পর্যায়ে আমরা আধুনিক জাহিলিয়াত সম্পর্কে কোনো পর্যালোচনা করছি না। এখানে গ্রীক জাহিলিয়াতের বিভিন্ন রূপ ও রঙের উল্লেখ করছি মাত্র। উত্তরকালে তা ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনায় কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে ও বিষক্রিয়ায় জর্জরিত করে দিয়েছে, তা এই আলোকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

সত্য কথা, এ এক বীভৎস বিপথগামীতা ও বিপর্যয়। এদিক দিয়ে আমার জানামতে গ্রীক জাহিলিয়াত সম্পূর্ণরূপে একক ও অনন্য। এ-ও জানি যে, অপরাপর জাহিলিয়াতও বিপুল সংখ্যক খোদা থাকার ধারণা গ্রহণ করেছে। তাদের কতক খোদাকে অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির বলে কল্পনা করেছে। দুষ্কৃতি ছাড়া সে সবের আর কোনো কাজই যেন নেই। আর মানুষের ওপর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টিই যেন তাদের প্রতিমুহূর্তের ব্যস্ততা। কিন্তু গ্রীক জাহিলিয়াত একক ভাবেই মানুষ ও দেবতাগণের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে এই বিশেষ রূপ ধারণ করেছে মানুষের সক্রিয়তা ও ইতিবাচকতা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। ফলে মানুষের ওপর নেমে এসেছে মহা ধ্বংস ও অভিযানের জগদ্দল পাথর। এই বিশ্বাস গ্রহণ ব্যতীত মানুষও যেন তার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না। আর তার মন আল্লাহ্র সাথে সন্ধি করতে কখনোই প্রস্তুত হতে পারছে না। এই কারণে তার মনের অভ্যন্তরে তার স্বভাবগত আত্ম-প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আগ্রহ এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার স্বভাবগত প্রবণতা ও তাগিদের মধ্যে কখনোই কোনো সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে পারছে না।

গ্রীক জাহিলিয়াত রূহের পরিবর্তে বিবেক-বুদ্ধিকে অত্যন্ত মহান ও পবিত্র মনে করিয়াছে। আধুনিক জাহিলিয়াত মনে করছে, গ্রীক জাহিলিয়াতই মানব সত্তার বিকাশ, পবিত্রতা, ইতিবাচকতা, উচ্চতর মূল্য ও মর্যাদা, তার প্রাণশক্তির উচ্চমানতা এবং জীবনে তার উচ্চতর মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ তা-ই মানুষের বহু উচ্চতর ও বিরাটতর দিককে সম্পূর্ণ অর্থহীন ও তাৎপর্যশূন্য করে দিয়েছে। আর তা হচ্ছে মানুষের 'রূহ' বা আত্মার দিকটি। তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র করা হয়নি, কিছুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিবেক-বুদ্ধিকে এবং তাকেই বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রভু বা নেতা— চালক।

অস্বীকার করার উপায় নেই, বিবেক-বুদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় শক্তি তার পূর্ণমাত্রার যথার্থ ভূমিকার ফলেই মানবীয় সত্তা, মানুষের ক্রিয়াশীলতা এবং এই বিশ্বলোকের ইতিবাচকতা সম্ভবপর। কিন্তু কেবল তারই প্রতি ঈমান স্থাপন এবং 'রূহে'র পরিবর্তে সব গুরুত্ব কেবল তারই ওপর আরোপ করা কোনোক্রমেই

সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, তা এমন এক জাহিলী বিপথগামিতা, যা শেষ পর্যন্ত মানুষের মূল্য ও মর্যাদাকে নগণ্য ও হীন বানিয়ে দেয়। তখন সে এক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন জন্তু হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীক দর্শন মানুষ সম্পর্কে এই ধারণাই দিয়েছে। অথচ সত্য কথা এই যে, মানুষ জন্তু নয়, জীবজন্তুর বাইরে স্বতন্ত্র এক প্রজাতি হচ্ছে এই মানুষ, তার গোটা সত্তাই অত্যন্ত উচ্চতর, মহিমান্বিত। তা কেবল তার বিবেক-বুদ্ধির বদৌলতেই নয়, তার সকল দিক সমভিব্যবহারে, তার পূর্ণত্ব ও সকল যোগাযোগ সম্পর্কশীলতা সহকারেই সে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার সত্তা। আকার-আকৃতিতেও মানুষ একক। তার এ সব বিশেষত্ব কেবল মানুষের মধ্যেই রয়েছে, মানুষ ছাড়া আর কোথাও তা পাওয়া যেতে পারে না।[১]

মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিকে 'রূহ' বা আত্মার পরিবর্তে অথবা মানুষের স্বজ্ঞার বিনিময়ে অত্যধিক পবিত্র মনে করার ফলেই গ্রীক জাহিলিয়াতে সকল প্রকার বিপথগামিতার উদ্ভব হয়েছে। ফলে বিবেক-বুদ্ধি যা ধারণ করতে অক্ষম হবে, মানুষ তাকে কখনোই গণ্য বা গ্রাহ্য করতে প্রস্তুত হবে না। আর তার বিবেক-বুদ্ধি যতটা ধারণ করতে সক্ষম হবে— স্বয়ং আল্লাহ্‌র সত্তাও তার মধ্যে গণ্য— ঠিক ততটাই গ্রহণ করবে। তার বাইরে কোনো কিছু আছে বলে ভাবতেও কখনও প্রস্তুত হতে পারে না।[২] মানবীয় আত্মা যে আল্লাহ্‌কে ধারণ করে, বিশ্বাস করে, গ্রীক চিন্তার ফসলে তা অত্যন্ত প্রভাবহীন। পরবর্তীতে আধুনিক জাহিলিয়াতেও আত্মার অনুভূত আল্লাহ্‌র কোনো স্বীকৃতি নেই।

এই ধরনের বিমূর্ত মানসিক ধারণাসমূহ দ্বারাই গ্রীক দর্শন ভরপুর হয়ে আছে। বিবেক-বুদ্ধিকে অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়ার অনিবার্য ফলশ্রুতিই হচ্ছে তাই। ইউরোপের মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াতের শক্তি নিঃশেষিত হওয়ার মূলেও রয়েছে বিবেক-বুদ্ধির প্রতি এই বাড়াবাড়িপূর্ণ গুরুত্বারোপ। শেষ পর্যন্ত তাই বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত ধর্মমতের সৃষ্টি করেছে, যা এককালে মুসলমানদের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছিল। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি।

---

১. كتاب الراسات فى النفس الانسا نيه দ্রষ্টব্য।

২. অথচ আল্লাহ্ তাঁর নিজ সম্পর্কে বলেছেনঃ لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الطيف الخبيز. — দৃষ্টিসমূহ তাকে ধারণ করতে পারে না। তিনিই দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্তাধীন করেন। তিনি অতীব সূক্ষ্ম, সর্ববিষয়ে অবহিত। বলেছেনঃ ليس كمثله شيء — তাঁর মতো কেউ নেই, কিছু নেই। খোদায়ী মহাসত্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে গ্রীক দর্শন মারাত্মক রকমের ভুল করেছে। নিতান্তই আজে বাজে কথা বলেছে। তা বলেছে অক্ষম মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির ধারণ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকে। আর এভাবে জ্ঞানের যে ফসলই ফলানো হবে, তা অর্থহীন, বাতিল হতে বাধ্য। মানুষের জীবনের বাস্তবতার ওপর তা কোনো প্রভাবই ফেলতে পারবে না, তাতো আছেই— আকীদা-বিশ্বাসেও কোনো স্থান হবে না তার। কেননা কোনো মানুষই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না তার দার্শনিক মানসিক পরীক্ষার ফলস্বরূপ। ইতিহাসে কোনো উন্নত সমাজ বা মুমিন ব্যক্তি গড়ে তুলতে তা কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারে না।

আর এরই ফলে নৈতিকতা একটা মানসিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বাস্তব কর্ম জীবনে তাকে কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। একথা সত্য যে, গণতান্ত্রিক গ্রীক তার নাগরিকগণকে সুনির্দিষ্ট সামষ্টিক বিশেষত্ব ও মূল্যমানের ওপর গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা কেবলমাত্র বিবেক বুদ্ধির জোরে যতটা সম্ভব ছিল ততটাই। ফলে যৌন অরাজকতার ব্যাপারে নৈতিকতার বোধ আয়ত্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব রয়ে গেছে। সেজন্যে কোনো নিয়ম-বিধি না দিয়েই তাকে অবাধ ও অপ্রতিরোধ্য করে ছেড়ে দিয়েছে। আর তাই হয়েছে তার চূড়ান্ত ধ্বংসের মৌল কারণ।

গ্রীক জাহিলিয়াতের বিপর্যয় ও বিপথগামিতার এ হচ্ছে অতীব সামান্য নমুনা। আমরা এসবের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের মাধ্যমেই দ্রুততা সহকারে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কেননা এ আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ নয়, তা আমরা আগেই বলেছি। এ পর্যায়ে আমরা এমন সব সত্যকে তুলে ধরে সামনের দিকে বেরিয়ে যেতে চাই যা আধুনিক জাহিলিয়াতের এবং ইতিহাসের সব কয়টি জাহিলিয়াতের আলোচনায় আমাদের যথেষ্ট সহায়তা ও আনুকূল্য দিতে পারবে।

প্রথম কথা, যে কোনো জাহিলিয়াতে কোনো বিশেষত্ব, বিশেষ কোনো গুণপনা বা উচ্চতর উৎপাদনের অবস্থিতি কোনো বিস্ময়কর বা অসম্ভব ব্যাপার নয়। সম্ভবত কোনো জাহিলিয়াতই এই দিক দিয়ে একান্তভাবে শূন্য হয়ে থাকে না। কিন্তু তা একথা প্রমাণ করে না যে, সে জাহিলিয়াত জীবন্ত ও সুস্থ অবস্থায় রয়েছে।

একথারও দাবি করা চলে না যে, তা সর্বকালে অবশ্যই অনুসরণযোগ্য বা তা থেকেও কিছু গ্রহণীয় থাকতে পারে।

দ্বিতীয়, কোনো জাহিলিয়াতে উক্ত রূপ বিশেষত্ব, উত্তম গুণপনা ও উন্নত শুভফল থাকলেই তা জাহিলিয়াত হওয়ার কলংক থেকে মুক্ত হবে এমন কথা বলা চলে না। কেননা তার মধ্যে নিহিত বিকৃতি ও বিপথগামিতাই এসব বিশেষত্ব, শুভ গুণপনা ও উন্নতমানের ফল শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ও ধ্বংস করে দেবে, তাতে সন্দেহ করার কোনো উপায় নেই।

তৃতীয়, এসব বিকৃতি বিপর্যয় ও বিপথগামিতার প্রধান কারণই হচ্ছে এই যে, এই জাহিলিয়াত সর্ব বিষয়ে স্বীয় খাহেশ-কামনা-বাসনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিংবা করে সংকীর্ণ মানবীয় জ্ঞানের বলে।...... এ দুটি মূলত এক ও অভিন্ন। কেননা তা আল্লাহ্‌র হেদায়েত জানে না, চিনেও না। অথবা বলা যায়, হয়ত চিনে ও কিছু না কিছু জানেও। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে অন্য কিছুর সন্ধানে উন্মুখ হয়ে থাকে।

এই কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মহাসত্যের প্রতীক।

অতঃপর আমরা গ্রীক জাহিলিয়াতের ন্যায় রোমান জাহিলিয়াত সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার উদ্যোগ নিচ্ছি।

রোমান জাহিলিয়াতও বস্তুবাদী জাহিলিয়াত। ইন্দ্রিয়নিচয় কেন্দ্রিক জাহিলিয়াত। তবে এ জাহিলিয়াত এমন অনেক জিনিস নতুন উদ্ভাবন করেছে, যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর, সন্দেহ নেই। এর পূর্বে গ্রীক জাহিলিয়াতও অনেক কিছু নতুন উদ্ভাবন করেছিল। এ ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা অভিন্ন।

বিচিত্র ধরনের সংগঠন— রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামরিক ও নাগিরক সংগঠন রোমান সভ্যতারই উদ্ভাবন।

নাগরিক জীবন— 'নগর সভ্যতা' তারই উদ্ভাবিত। তার অর্থ বস্তুগত উপায় উপকরণ ও বস্তুনিষ্ট উৎপাদনকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ ও ব্যবহার। সে সবের দ্বারা জীবন সহজ ও যাপনযোগ্য বানানো। এজন্যেই সড়ক-পুল নির্মাণ, জলাধার, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার, বিবাহের ক্ষেত্র ও খেলার মাঠ তৈরি প্রভৃতি এরই সাথে জড়িত।

একটু উপরেই আমরা বলে এসেছি, কোনো জাহিলিয়াতই কিছু না কিছু কল্যাণের দিক নিয়ে থাকে। সেই সাথে একথাও বলেছি যে, এই অপেক্ষাকৃত কল্যাণ জাহিলিয়াতকে বিপর্যয়-বিকৃতি ও বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে না, রক্ষা করতে পারে না। আর তারই ফলে তার চূড়ান্ত ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।

রোমান জাহিলিয়াতের সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক বিপর্যয় হচ্ছে তার বস্তুনিষ্টতা। বস্তুর ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা। 'রূহ' বা আত্মা সেখানে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। সেখানে অস্তিত্ব কেবল 'বস্তুর'— বস্তুগত। বস্তুই সব, বস্তুর বাইরে সেখানে কিছুই নেই, কিছুই স্বীকৃত নয়। বস্তুগত অস্তিত্বও তা যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা কিছুই নয়, তার অস্তিত্বই নেই। সামান্য থাকলেও তা ধর্তব্য নয়। এর ফলেই রোমানদের জীবনে আকীদা-বিশ্বাসের দিক অত্যন্ত স্থূল ও গভীরতা শূন্য হয়ে পড়েছে।

রোমান জাহিলিয়াতের অত্যন্ত বড় বিপর্যয়ের অনুরূপ একটি দিক হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ, ইন্দ্রিয়গত স্বাদ আস্বাদন। এ কারণেই রোমানরা লাম্পট্য ও অনৈতিকতার অতল সাগরে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়েছিল যে, তার কেননাসীমা-পরিসীমা ছিল না। তারা যৌন স্বাদ-আস্বাদন সামগ্রীর প্রতি সীমাতিরিক্তভাবে লোলুপ হয়ে পড়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের ঔদার্য ও বাধাহীনতা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে স্বাদ গ্রহণের জন্যে তারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে, রক্তের বন্যা প্রবাহিত করেছে, নির্মম নিপীড়ন চালিয়েছে, লাশের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করেছে। এ

সবই করেছে পাশবিক খেলায় মেতে গিয়ে। আর এই রক্তাক্ত ঘটনা দুই চোখ মেলে আনন্দ লাভ করার জন্যে বিরাট জনসমাবেশ ঘটিয়েছে, আর এরূপ অনুষ্ঠানের জন্যে তারা দুই হাতে উদারভাবে পয়সা খরচ করেছে। আর যাদুমন্ত্রে বিমোহিত যেসব ব্যক্তিকে হত্যা ও মৃত্যুর উৎসবে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্যে উপস্থিত করা হয়েছিল,তারা তরবারি ও খঞ্জর হাতে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরস্পরের পেট ছিন্ন করছিল, রগ, নাড়ি-ভূঁড়ি কেটে দিচ্ছিল, পরস্পরের রক্তের লাল বন্যা প্রবাহিত করছিল। আর রোমান সমাজপতিরা নিতান্ত পশু হয়ে এই বীভৎস দৃশ্য দুই চোখ মেলে দেখে দেখে আনন্দ ও সুখ-রস পান করছিল। এই আনন্দ উৎসবের শেষে যখন পাশবিক মৃত্যু-উৎসব চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছত, তখন দেখা যেত যে, দুজনের একজন বা দুজনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, পুঞ্জিত রক্তে প্রাণহীন লাশ ভাসছে।

এই জাহিলিয়াতের আর একটি বড় ধরনের বিকৃতি ও বিপথগামিতা হচ্ছে প্রখ্যাত রোমান 'সুবিচার'। সে সমাজে ন্যায়বিচার ছিল একান্তভাবে রোমানদের জন্যে। কেবল তারাই ছিল ন্যায় বিচার পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তারাই লাভ করত তার সমস্ত সুফল। তাদের ছাড়া অন্যরা সব ক্রীতদাস— দাসানুদাস মাত্র। বিশাল মহান রোমান সাম্রাজ্যের অধীন রোমানদের ছাড়া আর সবাই অধীন প্রজাসাধারণ, দাসানুদাস মাত্র। তাদের কোনো অধিকার নেই, নেই ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো অধিকার। তাদেরকে শুধু কর্তব্য করে যেতে হবে। শাসকদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যা অবশ্য কর্তব্যরূপে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, চোখ-কান-মুখ বুঁজে তারা শুধু তা-ই করে গেছে।

রোমান জাহিলিয়াতের বিরাট অধ্যায় থেকে এ তো অতি সামান্য— যৎকিঞ্চিত মাত্র। বিশ্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণের অক্ষরে (?) লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

উপরের ঐতিহাসিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা মধ্যযুগে পৌঁছে গেছি। এখানে এসে আমরা এক অভিনব ধরন ও প্রকৃতির জাহিলিয়াতের সম্মুখীন হই। তা হচ্ছে ভিত্তিহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা-বিশ্বাসের জাহিলিয়াত। আমেরিকান গ্রন্থকার ড্রীপার তাঁর 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব' নামের গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> খ্রিস্ট ধর্মে শির্ক ও পৌত্তলিকতা অনুপ্রবেশ করল সে সব মুনাফিকের প্রভাবে, যারা রোমান রাষ্ট্রের উচ্চতর পদে আসীন হয়ে মোটা বেতন গ্রহণের মহা সুযোগ লাভ করেছিল। তারা বাহ্যত নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিত বটে; কিন্তু আসলে ধর্ম-কর্মে তাদের কোনোই অংশ ছিল না। সেজন্যে একটি দিনও তারা একান্তভাবে ব্যয় করেনি। কনস্ট্যানটাইনও এদেরই একজন ছিল। সে তার গোটা জীবনই অতিবাহিত করেছে অত্যাচার নিপীড়ন ও যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার

মধ্য দিয়ে। গীর্জার ধর্মীয় দায়িত্ব সে কখনোই পালন করেনি। তবে শেষ জীবনে. অতি সামান্য কিছু (৩৩৭ পৃঃ)।

খ্রিস্টান সমাজ যদিও তখন ততটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল যে, তারা কনস্ট্যানটাইনকে বাদশাহ্ বানাতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু সে পৌত্তলিকতার লেজুড় কাটতে ও তার বীজাণু ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। তার সম্মুখীন হওয়ার কারণে খ্রিস্ট ধর্মের মৌলনীতিতেই পৌত্তলিকতা সংমিশ্রিত হয়ে গেল। ফলে একটা নবতর ধর্মমত গড়ে উঠল। তাতে খ্রিস্টবাদের পাশাপাশি সমান মাত্রায় রয়েছে পৌত্তলিকতা। দ্বীন-ইসলাম এখান থেকেই খ্রিস্টবাদ থেকে ভিন্নতর হয়ে গেছে। ইসলাম পৌত্তলিকতাকে নির্মূল করেছে এবং কোনোরূপ অস্পষ্টতা ও সংমিশ্রণতা ব্যতিরেকেই উজ্জ্বল খালেস তওহীদী আকীদা পেশ করেছে।

এই সাম্রাজ্যবাদটি ছিল মূলত দুনিয়ার দাস। তার ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস একবিন্দু সুবিন্যস্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না। তা তার ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং খ্রিস্টীয় ও পৌত্তলিক— এই দুই পরস্পর সাংঘর্ষিক আকীদা-সম্পন্ন জনসমষ্টির কল্যাণে এই দুটিকে একত্রিত করা এবং এ দুটির মধ্যে পূর্ণ মিল সৃষ্টি করা জরুরি মনে করেছিল। এমন কি দৃঢ় আকীদাসম্পন্ন খ্রিস্টানরাও এই চেষ্টাকে অস্বীকার বা প্রতিরোধ করার প্রয়োজন মনে করল না। সম্ভবত তারা মনে করছিল যে, এই নতুন ধর্ম যদি প্রাচীন পৌত্তলিক মতে সমৃদ্ধ হয় তা হলে খুব আকর্ষণীয়, উন্নত মানের এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ কাজ হবে এবং খ্রিস্ট ধর্ম শেষ পর্যন্ত পৌত্তলিকতার মলিনতা ও কলংক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।[১]

উপরে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান লেখকের যে সাক্ষ্য উদ্ধৃত হয়েছে, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট একথা প্রমাণের জন্য যে, ইউরোপের সহীহ্ আকীদায় মারাত্মক রকমের বিকৃতি ও বিপথগামিতা সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর বিস্তারিত কিছু তালাস করে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় জাহিলিয়াত জীবনের বাস্তবতায় যে ব্যাপক বিপর্যয় ও বিকৃতি সংঘটিত হয়েছিল এবং বাহ্যত যদিও তারা ধর্মের শীতল ছায়ায় জীবন যাপন করত, কিন্তু কার্যত তা ছিল অন্তঃসারশূন্য, তা দেখাবার জন্যে উক্ত উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

বস্তুত খ্রিস্টীয় ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ অন্যান্য ধর্মের ন্যায় আকীদা ও শরীয়ত বাস্তব জীবনের বিধান সমন্বিত ছিল। যদিও তা বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিসহ কোনো বিধান নিয়ে আসেনি। তারও কারণ এই যে, খ্রিস্ট ধর্মের শরীয়ত মূলত ছিল 'তাওরাত' ভিত্তিক, তওরাতের ভিত্তিতেই তার শরীয়ত গড়ে উঠেছিল। যদিও তাতে

১. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী লিখিত ماذا خسر العالم بانحطا ط المسلمين দ্রষ্টব্য।

কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছিল, যা হযরত ঈসার প্রতি নাযিল হয়েছিল ইন্‌জীল গ্রন্থে। এই ইনজীল তার পূর্ববর্তী 'তওরাত' নিহিত বিধানেরই সত্যতা প্রমাণকারী— সত্যতা ঘোষণাকারী গ্রন্থ ছিল। তার কারণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -

যেন আমি হালাল করে দেই এমন কতক জিনিস যা ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছিল। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫০)

ফলে খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে স্বাভাবিক ধারণা এই ছিল যে, তওরাতে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুযায়ীই বিচার-ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সেই সাথে অবশ্য রক্ষিত হবে সে সব ব্যতিক্রমধর্মী বিধান, যা ইন্‌জিল গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু কার্যত তা ঘটেনি। মধ্যযুগে ইউরোপে গীর্জা প্রভাব বিস্তার করার জন্যে যত চেষ্টাই করে থাকুক, সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ের আইনের বাইরে খোদায়ী শরীয়ত বাস্তবায়িত হয়নি এবং বাস্তব জীবনের বিরাট অংশের ওপর খোদায়ী শরীয়তের কোনো প্রভাব ছিল না। তার পরিবর্তে রোমান আইনই ছিল কার্যকর। অন্য কথায় বললে বলা যায়, প্রাচীন রোমান জাহিলিয়াতই অত্যধিক প্রভাবশালী হয়েছিল তখনকার মানুষের ওপর।

ফলে ধর্ম ও বাস্তাব জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণায় বিজয়ী ধর্ম অনুপ্রবেশ লাভ করলেও ইউরোপের মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াতে একটা বিপদের লক্ষণ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। অবশ্য তাও মারাত্মক কিছু ছিল না।

একদিকে গীর্জা জনগণের মন-মানসিকতা ও আচার-আচণের ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু তা বাস্তব জীবনে রোমান আইন তার স্থান দখল করার মতো শক্তি পায়নি কখনোই। গীর্জা এই আধিপত্যের সূত্রে এতদূর বিস্তার লাভ করে যে, তা সকল যুক্তিসঙ্গত সীমাকে অতিক্রম করে যায়। পাদ্রী-পুরোহিতরা নিজেদের জন্যে আকাশমণ্ডলীয় কর্তৃত্ব আয়ত্ত ও একান্ত করে নিয়েছিল। আর তা বিন্দু বিন্দু করে সঞ্চিত ও মওজুদ করছিল। তাতে এমন কাউকেই তারা প্রবেশাধিকার দিত না; যাদের প্রতি তারা সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের মনোনীত ব্যক্তিরাই তাতে প্রবেশ করার অধিকার বা অনুমতি পেত। যারা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, তারাও। এদের বাইরের সব লোকই তাদের সন্তুষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েই ছিল।

অন্যদিকে গীর্জা জনগণের ওপর নানাবিধ কর ধার্য করে যাচ্ছিল। তা যেমন অর্থনৈতিক ছিল, তেমনি ছিল বিবেক-বুদ্ধিগত ও নিদারুণ চাপ সৃষ্টিকারী

আধ্যাত্মিকও। ব্যবসায়ী কর, মালিকত্বের কর (Royalty) এবং গীর্জার মালিকানাধীন ভূমিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান এবং বিদ্রোহী রাজা-বাদশাহদের শিক্ষাদানমূলক যুদ্ধে সৈন্য হিসেবে ভর্তি গ্রহণের কাজ করতে জনগণ একান্তভাবেই বাধ্য ছিল। আর এ-ই ছিল গীর্জার কল্পিত কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দাস জনগণের ওপর। তাতে ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদের সম্মুখে অপমানকর বিনয় গ্রহণ ছিল অপরিহার্য। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করতে হতো যে কোনো পাদ্রী ব্যক্তির গমনাগমন কালে। এ এক ভিন্ন ধরনের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। যে সব বিলুপ্তপ্রায় পচা-গলা জ্ঞানগত চিন্তা বিশ্বাস গ্রহণের জন্যে গীর্জা জনগণকে নির্দেশ করত, তাও গ্রহণ করতে হতো তাদের। কেউ তা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে তার ওপর সবকিছু থেকে বঞ্চিত থাকার শাস্তি কার্যকর করা হতো। অথবা এমন দৈহিক নিপীড়ন চালানো হতো, যার ফলে নির্ঘাৎ মৃত্যুবরণ করতে হতো। এই অত্যাচারী স্বৈরতান্ত্রিক আধিপত্যের এ ছিল তৃতীয় রূপ। কিন্তু উত্তরকালে চারদানভ— ব্রোনো, কোপারনিকাস ও গ্যালিলিওর দার্শনিক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যখন গীর্জা প্রচারিত ভ্রান্ত-ভিত্তিহীন মতবাদসমূহ বাতিল প্রমাণ করেছিল, তখন গীর্জা তাদের ওপর অমানুষিক আযাব ও নির্যাতনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগল। যার দরুন তারা হয় মৃত্যুবরণ করল, না হয় গীর্জা বিরোধী মত পরিহার করতে বাধ্য হলো।

প্রতিষ্ঠিত জাহিলিয়াত ধর্মের নামে এসব করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তা আরও অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে এবং তা ঘটল তখন যখন 'রাহ্বানিয়াত'— বৈরাগ্যবাদ সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে উপাসনা আরাধনায় আত্মনিয়োগ করাকে একান্তভাবে গ্রহণ করল। শুরুতে তা তাদের জন্যে বিধান থাকলেও তা ছিল ইচ্ছামূলক, কর্তব্য ছিল না। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ -

এবং বৈরাগ্যবাদ, তারা নিজেরাই তা উদ্ভাবিত করেছে। আমরা তা তাদের জন্যে ফরয করে দেইনি। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

এ বৈরাগ্যবাদ এমন পতনের দিকে বিবর্তিত হলো যে, তাতে সর্বপ্রকারের নৈতিক অপরাধ করাও অবাধে চলতে লাগল। পুরুষ বৈরাগী ও মেয়ে বৈরাগীর (?) একত্রিত জীবন কলুষতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাল। এই পর্যায়ে কুরআনের উক্ত আয়াতের পরবর্তী কথা স্মরণীয়ঃ

اِلَّاابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا -

তাদের জন্যে ফরয করা বিধান ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সন্ধান। কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে বহাল রাখতে পারেনি। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

এরপরই তারা ইতিহাসখ্যাত 'ক্ষমার সনদ' বিক্রয় করতে শুরু করে, যা ছিল অত্যন্ত হাস্যকর। ফলে ধর্মের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে হাসি ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত হলো। তার মাহাত্ম্যও কিছু থাকল না, থাকল না কোনো সত্যতা। নিছক খেল-তামাসার ব্যাপার, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও বাটপারিই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল।

এ হচ্ছে ইউরোপে মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত জাহিলিয়াত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও যৎকিঞ্চিৎ কথা। তা অবশ্য ধর্মের নামেই দাঁড়িয়েছিল ও দাপট চালিয়েছিল।

আধুনিক জাহিলিয়াত উপরিউক্ত জাহিলিয়াত সমষ্টিরই সারনির্যাস। তা-ই শেষ নয়, তারপরও বহু কিছু আছে—

আমরা এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আধুনিক জাহিলিয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করব, ধ্যান-ধারণার দিকটিও উপস্থিত হবে, তুলে ধরা হবে তার বাস্তব রূপরেখা। এ পর্যায়েও আমরা ইতিহাসের ধারাকেই অবলম্বন করে অগ্রসর হব।

আধুনিক ইউরোপের অভ্যুদয় ঘটেছিল ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনভাবে, ধর্মের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তা থেকে অনেক দূরে থেকেই ধর্মের প্রতি শত্রুতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এতটা অবশ্য আমরা বলতে চাইনে।

আর তদানীন্তন ইউরোপীয় পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিতে তা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও অবস্থার দিক দিয়ে তাই যথার্থ ও কাম্য ছিল না।

এই মধ্যযুগেই খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে ক্রুশ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

তখনকার ইউরোপ যদিও প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্টবাদী— খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিল না। পূর্বোদ্ধৃত আলোচনায়ই আমরা তা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এই খ্রিস্টবাদের নামে আত্মম্ভরিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ঐক্যবদ্ধতা তখন কিছুমাত্র নিষিদ্ধ ছিল না। সে যুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রে হীন পাশবিকতার সীমাও ছড়িয়ে গিয়েছিল। আর হিংসা-বিদ্বেষ ছিল ক্ষয়িষ্ণু ধার্মিক মনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কেননা প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনোই হিংসুক বা বিদ্বেষী হয় না; সাধারণত আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া যে কোনো হেদায়েত গ্রহণে তার কোনো কুণ্ঠা বা দ্বিধা থাকতে পারে না। কিন্তু তখনকার খ্রিস্ট ধর্ম আসলে প্রকৃত কোনো ধর্মই ছিল না।

ব্যাপার যাই থাক না কেন, আল্লাহ্র দ্বীন গ্রহণ ও তাঁর পদ্ধতি অবলম্বনের বিরাট সুযোগ ইউরোপকে দেওয়া হলেও তা করতে তারা অস্বীকার করেছিল। তারা তাদের উদ্ভাবিত জাহিলিয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকার ওপরই অবিচল হয়ে থাকল।

কিন্তু ব্যাপার এ পর্যন্ত এসেই থেমে গেল না। তথায় এমন অনেক কার্যকারণই ছিল, যা খুব দ্রুত সামনের দিকে যাওয়ার জন্যে শক্তভাবে ধাক্কা দিচ্ছিল। কিন্তু সে সম্মুখে কোনো পথে ?

মুসলিম জাহানের সাথে ক্রুশধারীদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ইউরোপীয় জীবনের মূলের ওপর কঠিন আঘাত হানছিল এবং সমূলে উৎপাটিত করে ফেলার উপক্রম হচ্ছিল। অবশ্য পাশ্চাত্যে— আন্দালুসিয়ায়— ইসলামের সাথে ইউরোপের মিলন ঘটাটা আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ব্রিফল্ট তাঁর Making of Humanity গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'আধুনিক জগতে আরব ইসলামী সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান।'[১] কিন্তু তার ফল অনেক বিলম্বে পেকেছিল। যে মেধা ও প্রতিভা স্পেনে আরব সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, তা তার কৈশোরেই প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। তাতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। অন্ধকারের মেঘের আড়ালে সে সভ্যতার প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়তেও অনেক সময় লেগেছিল। ইউরোপকে জীবনদানকারী কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানই একমাত্র উপকরণ ছিল না। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপুল প্রভাবও পড়েছিল। তার বিদ্যুচ্ছটা ইউরোপের একটি মাত্র দিকই আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি, তার মর্মমূলকে সুনিশ্চিতভাবে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবের দিকে ফিরিয়ে নেওয়াও সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। সে সব প্রভাব যতটা সম্ভব ততটাই প্রকট হয়ে আছে। আর তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই শক্তির উদ্বোধন, যা আধুনিক জগতকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট ও স্থায়ী শক্তিতে বলীয়ান করে দিয়েছে। আর দিয়েছে আধুনিক বিশ্বকে উদ্ভাসিত করার শক্তি উৎস। আর তা প্রকৃতি বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা-গবেষণার প্রাণচাঞ্চল্য।

সেই সংঘর্ষ ও এই অবদান, এ দুটিই তো আধুনিক ইউরোপের উত্থান ও অভ্যুদয়কে সম্ভব করে দিয়েছে। অবশ্য তার বদলে এ অভ্যুদয় আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেনি। অথচ তা-ই ইসলামী অভ্যুদয়কে বাস্তব করেছিল, কিন্তু ইউরোপ তা থেকেই আলো গ্রহণ করেও আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছে। তা একদিকে ইসলামের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের সাথে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

১. ইতিহাস আরবের ইসলামী সভ্যতা ছাড়া অপর কোনো বিশিষ্ট সভ্যতার সাথে পরিচিত নয়। আর ইসলামী সভ্যতা আরব সভ্যতা ছিল না। আরবে যে সভ্যতার উদ্ভব হয়, তা সরাসরি ইসলামেরই ফসল। সে সভ্যতার সব উপাদানই ইসলাম প্রদত্ত। তা ইসলামী প্রকৃতির ধারক ছিল, আরব প্রকৃতির নয়। এ সভ্যতা যে বহু সংখ্যক উপাদানে গড়ে ওঠেছিল, ইসলামই হচ্ছে তার একমাত্র উপাদান।

তবে ইসলামের সাথে ইউরোপের বিবাদ-সংঘাত নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা প্রসূত হিংসা ও বিদ্বেষের ফল। যার চরম পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর ক্রুশ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

আর তার নিজের ধর্ম ও ধর্মীয় আকীদার সাতে সংঘাত, তা ইউরোপীয় জনগণের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল গীর্জার নির্বুদ্ধিতা ও তার উত্তেজনা সৃষ্টিকারী স্বৈরাচার।

গীর্জা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কেননা মূর্খতাই ছিল জনগণের ওপর তার প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার ও তার সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় সনদ। জনগণ যেদিন মূর্খতা পরিহার করে শিক্ষিত হয়ে উঠবে, যেদিন তারা জানতে পারবে যে, গীর্জা তাদের যা কিছু শেখাচ্ছে, তা অপ্রামাণ্য পৌরাণিক কল্প-কাহিনীর স্তুপ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেদিন এই জনগণ আর গীর্জার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সহজে মেনে নিতে কিছুতেই রাজি হবে না। কেননা তার কর্তৃত্ব কেবল মূর্খতা ও অন্ধকারের মধ্যেই টিকে থাকতে পারে।

গীর্জা ছিল স্বাধীনতার দুশমন। কেননা স্বাধীনতা অত্যাচারী প্রভুত্ব আধিপত্যের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। যেদিন জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে ও তা আস্বাদন করবে, সেদিন তারা দাসত্ব করতে আর প্রস্তুত হবে না যদিও সে দাসত্ব ধর্মের নামে চলছে, ধর্মীয় কর্তৃত্বের দোহাই দিয়ে দাসত্ব করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

গীর্জার অভ্যন্তরে চলছিল পৈশাচিক চরিত্রহীনতা, যৌনতার পরাকাষ্ঠা। আর তা-ই জনগণের ওপর তাকওয়া-পরহেযগারীর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। উপদেশ দিচ্ছে উত্তম চরিত্র গ্রহণের জন্যে! কিন্তু তা কেন মানা হবে?

তা ছিল ব্যবসায়ী কর ও মালিকানা স্বত্ব বাবদ আদায়কৃত কর-এর ওপর চাপানো কর্তব্য। কৃষককুলকে যে গীর্জা-মালিকানাধীন জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হতো, অথচ তারা দারিদ্র ও বঞ্চনার আঘাতে ছিল জর্জরিত। এসব সত্ত্বেও তাদের ওপর ছিল নৈতিকতার বাধ্যবাধকতা!

এরূপ অবস্থায় যখনই— যে মূহূর্তে গণজাগরণ সৃষ্টি হবে, তখন যে তা এই মিথ্যা ধার্মিকতার সব বেড়াজাল ছিন্ন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তা আর বিচিত্র কি! চরম শত্রুতা ও আক্রোশের ঝাণ্ডা না-ই বা তুলল।

কার্যত তথায় তা-ই ঘটেছে।

তথায় যে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, তা এই কারণেই ধর্মীয় প্রভাব বিমুক্ত (Secular) ছিল। তা এমন কেন্দ্রবিন্দুতে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠেছিল যা বিন্দু বিন্দু করে ধর্ম ও ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল গোটা ইউরোপীয়

সমাজকে। গণ-অনুভূতি ও আচার-আচারণও হয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইউরোপ এক্ষণে তার সেই প্রাথমিক উৎস মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল যেখানে তা ছিল খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বনের পূর্বে। তা হল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান উত্তরাধিকার। অন্য কথায় সেই পূর্বতন জাহিলিয়াতের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। এ দুটি তো প্রধান জাহিলিয়াতই ছিল, মধ্যযুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিকৃত আকীদা গ্রহণের পূর্বে এ দুটিই প্রধান। আর তা ছিল চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ।

যদিও তারা এই প্রত্যাবর্তনকে 'আলো'র দিকে প্রত্যাবর্তনই মনে করে নিয়েছে। হ্যাঁ, তথায় 'নূর' ছিল, সত্য কথা। তা সেই 'নূর' যা মুসলিম জগত থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের ওপর বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তারই ফলে তাদের বিবেক-বুদ্ধি কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছিল। অত্যাচারী গীর্জার অপমানকর প্রভুত্ব আধিপত্যের সম্মুখে বিনীত হওয়ার লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়েছিল তাদের মন ও মগজ। মানুষের জন্যে এই দাসত্ব হয়ে উঠেছিল চরম ঘৃণ্য। সবদিক দিয়েই তারা স্বাধীনতার উন্মুক্ত ময়দানের দিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

কিন্তু তারা সেই 'নূর' কে তার স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত মৌলনীতির ওপর ধারণ করে রাখতে পারেনি। তারা নির্ভুল হেদায়েত অনুযায়ী পারেনি নিজেদের চালিত করতে। যে ইসলাম থেকে তারা এই 'নূর' গ্রহণ করেছিল, সেই ইসলামের শাশ্বত বিধান ও পদ্ধতির ওপর তারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি অথচ এই ইসলাম তো আল্লাহ্‌রই দেওয়া দ্বীন।

তাঁর প্রতি তারা চরম মাত্রায় ঘৃণা পোষণ করেছিল, চরম শত্রুতা শুরু করে দিয়েছিল তাদের সেই উস্তাদদের সাথে, যাদের কাছ থেকে তারা জ্ঞানের আলো গ্রহণ করে আলোকমণ্ডিত হয়েছিল। তারা প্রখ্যাত অনুসন্ধানের বর্বরতায় মেতে উঠেছিল। তারা বিতাড়িত করেছিল মুসলমানদের আন্দালুসিয়া থেকে। তারই অনিবার্য পরিণতিতে তারা সেই অত্যাচারী প্রভুত্ব কর্তৃত্বের দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেই দেশকে।

তারা মুসলমানদের কাছ থেকেই জ্ঞান শিক্ষালাভ করেছিল, শিখেছিল সভ্যতা, পেয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতিও তারা মুসলমানদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিল। এই পরীক্ষা পদ্ধতিই তো আধুনিক বিজ্ঞানের চরমোন্নতির মূল ভিত্তি।

গোষ্ঠীগতভাবে একত্রি হওয়ার পদ্ধতিও তারা মুসলমানদের কাছ থেকে পেয়েছিল। তার পূর্বে তারা ছিল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। আর আঞ্চলিক স্বৈরতন্ত্রীই তাদের ওপর চালাত একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ভিত্তিক শাসন ও শোষণ। তখন এক-একজন

শাসক বিধান রচনা, বিচারকার্য ও প্রশাসন পরিচালনা করত। সবই ছিল সেই এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আর সে ভূখণ্ডের জনতা ছিল তার হুকুম পালনকারী দাসানুদাস।

মানবাধিকার সম্পর্কে তারা জ্ঞান পেয়েছিল মুসলমানদের কাছে, তারপর তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মানব প্রজাতির মুক্তির দাবি উত্থাপন করা। যে দাসত্ব শৃঙ্খল তাদের মন ও চিন্তার ওপর জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে প্রতি মুহূর্তে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিচ্ছিল, তা থেকে নিষ্কৃতির উপায় জানতে পেরেছিল তারা মুসলমানদের কাছ থেকে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা জাহিলিয়াতের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাকল। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত পদ্ধতিকে অবলম্বন ও অনুসরণ করতে তারা অস্বীকার করে বসেছিল। আর মুসলিম জাহান থেকে সংগৃহীত সেই 'নূর' পেয়েও তারা তাদের সেই প্রাচীন জাহিলিয়াতের উত্তরাধিকারের দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছিল। সে উত্তরাধিকার ছিল গ্রীকদের, রোমানদের।

মুক্তির উন্মুক্ত মহাসড়ক সম্মুখে উপস্থিত পেয়েও তারা এই সুযোগ হারিয়ে ফেলল। তারা শিখেছিল, সভ্যতার সন্ধান পেয়েছিল, মুক্ত এবং স্বাধীনও হয়েছিল। আর এক সুউচ্চ সুপুষ্ট সভ্যতাও শক্ত করে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তা তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ভাঙ্গনমুখী নদীর তীরে।

পূর্বেই একথা বলে এসেছি যে জাহিলিয়াত জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা নাগরিকত্ব ও বস্তুগত উৎপাদনের অগ্রগতির বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক কোনো শব্দ বা পরিভাষা নয়। জাহিলিয়াতেরও এই সব থাকা ও পুরো মাত্রায় পাওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনগণের অন্ধ জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকাও একান্তভাবেই সম্ভব।

একথা বলতেও বাকী রাখিনি যে, জাহিলিয়াতে মানব কল্যাণকর কোনো উপাদান থাকবে না, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু তাতে আনুপাতিক ভাবে যে কল্যাণটুকু থাকে, তা জাহিলিয়াতের অকল্যাণ ও অসম্মান থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে কিছু মাত্র সক্ষম নয়। জাহিলিয়াতের চূড়ান্ত পর্যায়ের নিশ্চিত অধোগতি প্রতিরোধ করবে, এমন সাধ্য তার হয় না।

আমরা আসলে খুব তাড়াহুড়া করে কথা বলতে চাইনে। ইতিহাসের ধীর অগ্রগতির সাথে তাল রেখেই আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে চাই।

ধর্ম ও দ্বীনি ব্যবস্থা থেকে ইউরোপের উপরিউক্ত দূরবর্তিতা হঠাৎ করে ঘটেনি। আকস্মিকভাবে বা এক সাথেও সংঘটিত হয়নি তা। কেননা মানব প্রকৃতিই এই আকস্মিকতার পক্ষপাতী নয়।

মানুষের মনে এক একটি বিষয় ক্রমাগতভাবে ও খুব ধীর গতিতে জেগে ওঠে। এ ধীরতা অবশ্যম্ভাবী। আর এই ধীর গতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে যখন কোনো ভাবধারা স্থান করে নেয় ঠিক তখনই গোটা সমাজ তা গ্রহণ করে না। সামষ্টিকভাবে সেই ভাবধারা গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটি বাস্তবায়িত হয় আরও পরে এবং অত্যন্ত ধীর নিয়মে। সমাজ সমষ্টি এলোমেলোভাবে বিষয়গুলো স্তুপীকৃত করে এবং খুব দ্রুত প্রবাহিত হয়ে যাওয়া থেকে চিন্তা চেতনা ও আচার-আচরণকে রক্ষা করে। তা প্রত্যেক নাবাগতের জন্যে এক ধরনের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কল্যাণসমৃদ্ধ হোক, কি অকল্যাণের ধারক, উভয় অবস্থাই এ ক্ষেত্রে সমান। নবাগত বিষয় সম্পর্কেও এই কথা।

এই কারণে ইউরোপ বহু শতাব্দীকাল পর্যন্ত এক সংমিশ্রিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে জীবন যাপন করেছে। একই সময় খ্রিস্টবাদ ও পৌত্তলিকতার সংমিশ্রি রূপই হচ্ছে তার আসল অবস্থা।

নবজাগরণ— অভ্যুদয় তার নিজস্ব পথেই অগ্রসর হয়। তা একই সাথে শক্তি আহরণ করতে থাকে গ্রীক ও রোমান পৌত্তলিকতা থেকে আর প্রতি পদক্ষেপেই তা ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে— বহু দূরে সরে গিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় গভীরে শিকড় বিস্তীর্ণকারী উক্ত জাহিলিয়াত দুটির সাথে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হতেও ঘনিষ্ঠতর হচ্ছিল।

আকীদা-বিশ্বাস মানব মনে স্থির থেকে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে যতটা সম্ভব লোকদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণে এবং তাদের জীবনবোধে। কিন্তু এই জীবনটা যদি ধীরে ধীরে দ্বীন বা ধর্মীয় চিন্তা-বিশ্বাসে সমৃদ্ধ না হয় বা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক এমন পথে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তা দ্বীনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে, তাতে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে!

এই দ্বৈত ভাবধারা সমৃদ্ধ অবস্থায় সেই ঘটনা সংঘটিত হলো, ইতিহাসে যা সংশোধন (Reformation) নামে খ্যাত। তা ছিল ধর্মের সংশোধন। ধর্মকে পরিচ্ছন্ন করার জন্যে সূচিত এই আন্দোলনসমূহ একই সময় বিস্তৃর্ণ বিশাল জীবন ক্ষেত্রের ওপর তার প্রভাব বিস্তৃত করার জন্যেও চেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু কার্যত তা অসম্ভবই থেকে গেল। অন্তত এতটুকু বলা যায়, বাস্তবে তা ঘটতে পারল না। তার কারণও সুস্পষ্ট। এই সংশোধনকামীদের নিজেদের মনেও দ্বীন বা ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা তা-ই ছিল যা ধারণ করে আসছিল সেই জাহিলী প্রকৃতি থাকার সময় থেকে। আর তা হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও বাস্তব জীবন-বিধান শরীয়তের বিচ্ছিন্নতা ও দ্বৈততা। আল্লাহ্‌র শরীয়তকে বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনে ভিন্নতর কোনো শরীয়তকে চালু করা। ফলে আকীদা-বিশ্বাসের মানে বাস্তব জীবনের কোনো সঙ্গতি থাকবে না। ফলে সব ধর্মীয়

সংশোধনীই নিছক মানসিক খুঁত-খুঁতানি প্রতিকার হওয়ার জন্যে, বাস্তব জীবন-ক্ষেত্রে তার একবিন্দু প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারল না।

এর মূলেও বড় বড় কারণ নিহিত ছিল। উক্ত আন্দোলন সমূহের মূলে প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল নিছক 'জাতীয়তা' বা জাতিত্ব চেতনা, ধর্মীয় কারণ ছিল না মোটেই। জাতিসমূহ শুধু নিজেদের জাতিত্ব বা জাতি সত্তাকেই প্রকাশমান করতে চেয়েছিল তাদের গীর্জাকে রোমান গীর্জার প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রাধান্য থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু সাধারণত মানুষ যে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয় আল্লাহ্‌র দিকে চলার লক্ষ্যে, তা কখনোই উক্ত বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার সমর্থক হতে পারে না। তাদের জাতীয়তা বা ভূমির যে খণ্ডে তারা বসবাস করে তার আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেও একই এক্যবদ্ধতা সম্ভব হতে পারে না। ফলে তাদের জাতিত্ব চেতনা ছিল ধর্মীয় আকীদার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বস্তুত মানবীয় সত্তা অভিন্ন একক। তাকে অনুভূতি বা স্বজ্ঞা ও বাস্তবতা— এই দুয়ের মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারে না।

মানবীয় জীবন অবিভাজ্য একক। তাকে বিশ্বাস ও বাস্তব আচার-আচরণ এই দুটি বিভাগে বিভক্ত করা চলে না।

আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ দ্বীনও অনুরূপ এক, অবিভাজ্য। তাতে আকীদা ও বাস্তব বিধান— এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। স্বজ্ঞা ও বাস্তব জীবনের মধ্যে পার্থক্য করাও অসম্ভব।

ঠিক যে সময়ে ইউরোপে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠেছিল, তখন নবোদ্ভুত পুঁজিতন্ত্র ভূ-পৃষ্ঠকে ওলট-পালট করে দিচ্ছিল। এই পুঁজিতন্ত্র এক সম্পূর্ণ অ-ধর্মীয় ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মতাদর্শ। তাতে সুদ, অপহরণ, ছল-চাতুরী, ঠকবাজি, মূল্য বৃদ্ধি, অপকৌশল ইত্যাদিই হচ্ছে পুঁজিবাদের অবিচ্ছিন্ন গুণপনা। শ্রমজীবীদের ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন এবং তাদের লালতপ্ত রক্ত চুষে নেওয়া। আর ওদিকে ধর্মীয় সংস্কারবাদীরা লোকদের অন্ত চেতনার সংশোধন-সংস্কারে ব্যতিব্যস্ত। মোটকথা, ইউরোপীয় সমাজের লোকদের ব্যক্তিসত্তায় দ্বৈত অবস্থার টানা পোড়েন চলতে থাকে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে।

কিন্তু চক্ষুষ্মানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ইতিহাসের গতিধারার দিকে। ঘটনাবলীর ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ্য করতে একটুও ভুল করেনি। স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, ঘটনাবলীর প্রবণতা নিঃসন্দেহে ধর্মহীনতার (Secularism) দিকে জীবনের সকল পর্যায়ে ও বাঁকে এবং তা ক্রমাগতভাবে দ্বীন ও ধর্মের পথ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

যদিও বাস্তব কার্যক্রম ক্রমিক ও ধীর গতিতে চলছিল। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী এসে উপস্থিত হলো। আর ইউরোপীয় ইতিহাসে এই শতাব্দীই হচ্ছে বড় বড় ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার শতাব্দী। এই শতকে এমন দুটি বড় ঘটনা সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসের ধারাকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও ভিন্নতর একটি পথে পরিচালিত করে।

প্রথম ঘটনা, ডারউইনীয় বিবর্তনবাদে আত্মপ্রকাশ।

আর দ্বিতীয় ঘটনা, শিল্প বিপ্লব।

এ দুটি যেন যথাসময়ে সংঘটিত হলো। মধ্যযুগীয় ভাবধারার শেষ রেশটুকুকেও চিরতরে বিলীন ও ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে এ দুটি ঘটনা যথাসময়ে ঘটে গেল।

এই সময় নবতর এক জাহিলিয়াতের বিরাট উঁচু চোখ ঝলসানো চাকচিক্যময় প্রাসাদ নির্মাণের লক্ষ্যে মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াতের অবশিষ্টের নাম চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলল। আর তা-ই হলো এ যুগের জাহিলিয়াত।

ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ চিন্তা ও মতবাদের জগতে আকীদা-বিশ্বাসের ওপর কঠিন প্রলংয়কর আঘাত হানল। শিল্প বিপ্লবেও তা প্রয়োগীয় অবকাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করে।

ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ 'প্রজাতিসমূহের মূল' (Origin of Species) প্রকাশিত হয়। আর ১৮৭১ সনে প্রকাশিত হয় 'মানুষের মূল্য' সম্পর্কীয় গ্রন্থটি।

অতঃপর আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তার ক্ষেত্রে ভয়াবহ তোলপাড় ও ঘটনাবলীর তরঙ্গমালা ঘটতে থাকে অব্যাহত ধারায়।

বোতলবদ্ধ ভূত বোতল ভেঙে বেরিয়ে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনার আর কোনো উপায়— কোনো পন্থাই থাকল না। এ ভূত হচ্ছে 'বিবর্তনবাদ'। এ ভূত মহা অত্যাচারী। তার সম্মুখে যা কিছুই আসে, সবই ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়ে যায়। পথে স্থিতিশীল ও প্রতিষ্ঠিত যা কিছুই আছে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে না দিয়ে সে এক মুহূর্তও থেমে থাকতে পারে না।

আকীদা-বিশ্বাস ও ইউরোপীয় চিন্তা সবকিছুর ওপর ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ কি কঠিন সর্বধ্বংসী আঘাত হেনেছে, তার বিস্তারিত আলোচনা আমি ইতিপূর্বে পেশ করেছি 'বিবর্তন ও স্থিতি' নামক এবং অন্য একটি গ্রন্থে। সেই সব কথাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে যেন আমরা আমাদের সংশ্লিষ্ট পরবর্তী আলোচনার দিকে ফিরে যেতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এই প্রসঙ্গটি পুনরায় আসবে।

ডারউইন গবেষণাগারে বসে যে বিবর্তনবাদ রচনা করেছেন, পরবর্তীকালে তা আর গবেষণা ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। তার সীমিত বেষ্টনীর মধ্যে তাকে সীমিত করে রাখাও কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। সময়ের চিন্তাবিদ, মনীষী, বিশেষজ্ঞ ও জনগণ তা হাতে হাতে তুলে নিল। তাদের সকলেরই মাথা ঘুরে গেল। অতঃপর তারা অস্তিত্বের জগতে কোনো কিছুই স্থিতিশীল দেখতে পেল না। এমন কি আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহ্‌র চিন্তায় পর্যন্ত এই বিবর্তনবাদের প্রয়োগ হতে শুরু হয়ে গেল।

ফলে গীর্জা ও ডারউইনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হল। গীর্জা তাকে 'নাস্তিক' নামে আখ্যায়িত করল। আর ডারউইন গীর্জাকে মূর্খতা ও কুসংস্কারের লীলাকেন্দ্র বলে অভিযুক্ত করল। জনগণ প্রথম দিকে গীর্জার পক্ষে ছিল। গীর্জা তার বিশ্বাসকে জোরদার করে প্রচার করল। আর ডারউইন মানুষকে নিম্নমানের জীব-জন্তুর আকৃতিতে ভূষিত করলেন। শেষ পর্যন্ত জনগণ গীর্জার পক্ষ ত্যাগ করে ডারউইন সমর্থকদের কাতারে জমায়েত হয়ে গেল। কেননা ডারউইনীয় মতবাদের হাতিয়ার দ্বারা তারা অত্যাচারী ও দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করে মানুষকে লাঞ্ছিতকারী গীর্জার প্রভাব প্রতিপত্তি খতম করার এক মহান সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত 'ধর্ম' পরাজিত হলো। আর বোতল ভেঙে বের হয়ে আসা ভূত বিজয়ী হয়ে দাঁড়াল। তার পথে আর কোনো বাধাই থাকল না।

অপরদিকে এই সময়ই শিল্প পৃথিবীকে কঠিন ধাক্কায় কাঁপিয়ে দিল। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার রূপটাকেই আমূল বদলে দিল এবং নতুন সমাজ গড়ার একটা ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু এ নতুন সমাজ ব্যবস্থার সাথে আকীদা-বিশ্বাসের কোনোই সম্পর্ক থাকল না। তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠল নতুন সমাজ কাঠামো।

এ সমাজের প্রতিটি জিনিসই ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক, যুধ্যমান, ধর্মকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলার প্রবণতাসম্পন্ন।

সীমা লংঘনকারী পুঁজিতন্ত্র ধর্মীয় আদেশ-উপদেশসমূহকে অপমানিত করার ক্ষেত্রে কোনো সীমা পর্যন্ত এসে থেমে থাকল না। তা চুরি করতে লাগল জনগণের সম্পদ, লুটে পুটে নিতে লাগল সবকিছু। নিরীহ মানুষকে নির্দ্ধিধায় হত্যা করতে লাগল, নিরাপরাধ রক্ত বন্যা পানির মতো প্রবাহিত হতে লাগল। তা মানুষকে প্ররোচিত করল আবহমান কালের সহজ-সরল জীবন ধারা থেকে বের হয়ে এসে বিলাস ও সৌন্দর্যের দ্রব্যাদি বিক্রয় করে বেশি বেশি মুনাফা অর্জনের জন্যে। তারা অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতিতে বিপুল মুনাফা অর্জনের মহা সুযোগও পেয়ে গেল। এলো সামাজিক ক্ষেত্রে মহাবিপর্যয়।

তা নারী সমাজকে তাদের শান্তির নীড় ঘর-সংসার থেকে টেনে বের করে নিয়ে শিল্প-কারখানায় উপস্থিত করে দিল। যেন এখানে শ্রম করেই তারা মুঠোমুঠো খাবার যোগাড় করতে পারে। ক্রমশ তাদের সখ্যা বৃদ্ধি করা হলো, যেন পুরুষ শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনা বিরোধী আন্দোলনসমূহকে খতম করে দেওয়া যায়। কেননা এই পুরুষ শ্রমিকরাই পুঁজিতন্ত্রের বেশি বেশি আয়ের ওপর বাধার সৃষ্টি করছিল। মেয়েরা স্বল্প পরিমাণ মজুরী পেয়ে নিজেদের রক্ত পানি করতে ও শক্তি ক্ষয় করতে প্রস্তুত হলো। এমনিভাবে তারা একমুঠো খাবার পাওয়ার বিনিময়ে নিজেদের নৈতিকতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হলো।

পুঁজিবাদ সৃষ্ট শিল্প-কারখানায় সমাজের যুবক শ্রমিকদের একত্রিত করল। তারা বাধ্য হলো স্ত্রী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে। যৌনবকালীন এই নিঃসঙ্গ ও স্ত্রী বর্জিত জীবনে তাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের চরম বিপর্যয় ঘটে গেল। ব্যভিচারের পথেই তারা তাদের এই সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য হলো।

এভাবে, হ্যাঁ এভাবেই আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতার শক্ত বাঁধন ক্রমাগত ঢিলে ও আলগা হয়ে যেতে থাকল। চরিত্রের প্রাসাদটি ভেঙে পড়ল।

না, ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ডারউইনীয় চিন্তা-মতবাদ ও শিল্প বিপ্লব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল না।

শয়তানেরও কোনো অভাব থাকল না এই ময়দানে।

বিশ্ব ইহুদীবাদ তার এক মহাস্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে ওঁৎ পেতে বসেছিল। সে স্বপ্ন হচ্ছে বিশ্ব মানবের ওপর নিজস্ব নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আর কুরআনের ভাষায় তা হচ্ছে 'উম্মী'গণের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন।[১]

'তালমূদ' গ্রন্থে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ উম্মী লোকেরা হচ্ছে গর্দভ। ওদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টিই করেছেন এই জন্যে যে, ওদের পিঠে সওয়ার হবে আল্লাহ্র বাছাইকরা জনগোষ্ঠী।

আর তাদের গোপন শিক্ষা তাদেরকে (ইহুদীদের) বলেছে ঃ

'তোমরা অপেক্ষায় থাকো। শেষ পর্যন্ত তোমরা পেয়ে যাবে ওদের এমন এক অসতর্কতার সময়, যখন তোমরা গাধার পিঠের ওপর শক্ত হয়ে বসতে পারবে।' ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ যে ধর্মহীনতার ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছে এজন্যে অন্যরা যা-ই মনে করুক, বিশ্ব ইহুদীবাদ অত্যন্ত সন্তুষ্টিবোধ করেছে। ইউরোপের পুরাতন

১. এ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা। বলেছেঃ ذالك بانهم قالو اليس علينا فى الاميين 'তা এভাবে যে, তারা বলেছে আমাদের উম্মী লোকদের কোনো দাবী-দাওয়া নেই; আমরা এখানে 'উম্মিয়ীন' শব্দটির ওপর জোর দিচ্ছি। যার অনুবাদ করা হয়েছে Gentiles বলা। অর্থাৎ ইহা ইহুদীদের ছাড়া অন্যান্য সব জনগোষ্ঠী।

আকীদাকে খতম করার জন্যে এই ধর্মহীনতার দ্বারা অর্ধেক পথ এগিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর বিশ্ব ইহুদীবাদের পক্ষে স্থায়ী দুশমন হচ্ছে সেই আকীদা যা অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির ওপর স্থাপিত, যা শয়তানের সমস্ত ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। আর এই আকীদাই যদি অশক্ত ও ঢিলেঢালা হয়ে যায়, তাহলেই শয়তানদের পক্ষে গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে বসা খুবই সহজসাধ্য হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের চ্যালেঞ্জের জবাবে বলেছিলেন ঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ -

আমার একনিষ্ঠ বান্দাদের ওপর তোমার কোনো আধিপত্য কর্তৃত্ব থাকবে না তবে পথভ্রষ্ট মূর্তি-পূজারীদের মধ্য থেকে তোমায় যারা অনুসরণ করবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। (সূরা আল-হিজর ঃ ৪২)

শয়তান সম্পর্কে অপ র আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব-আধিপত্য নেই সেই লোকদের ওপর যারা প্রকৃতভাবে ঈমান এনেছে এবং তাদের আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ নির্ভরতা অবলম্বন করে থাকে। (সূরা-নহ্‌ল ঃ ৯৯)

অপর আয়াতে বলেছেনঃ

اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ -

শয়তানের আধিপত্য কর্তৃত্ব কেবল তাদের ওপরই প্রতিষ্ঠিত যারা তাকেই বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক বানায়। আর যারা তার সাথে শিরক করে মুশরিক হয়ে আছে। (সূরা-নহ্‌ল ঃ ১০০)

বস্তুত শয়তান তার বড় বন্ধু ও সাহায্যকারী পেয়ে গেছে বিশ্ব-ইহুদীবাদী শয়তানদের মধ্য থেকে। তারা প্রতীক্ষায় থেকে শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেছে মহা অনুকূল সুযোগ ও ক্ষেত্র। এই বিরাট ঘটনা দ্বারা বলা যায়, এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে! তার একটি ডারউইনবাদ আর অপরটি শিল্প বিপ্লব।

স্বীকার করছি, হতে পারে ডারউইন হয়ত শয়তান ছিল না। সে হয়ত বিশ্ব মানবতার কোনো অনিষ্ট করার চিন্তাই করেনি তার মতবাদের মাধ্যমে।

কিন্তু এ-ও অনস্বীকার্য যে, অনেক মনীষীই এক একটি বিশ্বাসের কথা এই মনে করে প্রকাশ ও প্রচার করে যে, তা সত্য হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যে ভুল করে তাঁর মতবাদ রচনায়— ডারউইনীয় চিন্তার মৌলনীতিসমূহর প্রতি বিশ্বাস রেখেও স্বয়ং নব ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism) যে কথা অকপটে স্বীকার করেছে,—

তার মাশুল গোটা মানবতাও হয়ত আদায় করে দিতে পারে না। কেননা ডারউইনের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ হচ্ছে পশু— জীব-জন্তু বিশেষ। কিন্তু উত্তরকালে তাঁর মত বিজ্ঞানের কাছে গৃহীত হয়নি। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মানুষ এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তার মতো দেহাবয়বসম্পন্ন সত্তাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয়েছে, তার মনমানসিকতা, বিবেক-বুদ্ধি ও রূহ-এর স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হওয়া তো একান্তভাবেই অবধারিত। কিন্তু ডারউইনের মতবাদে এই মারাত্মক ভুলটি রয়ে গেছে। তাই বলতে হচ্ছে, সে তার মতবাদ হয়ত খারাপ উদ্দেশ্যে পেশ করেনি, যদিও সে তার এই মতবাদটিকে ধর্মীয় আকীদা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপিত করেছে। সে নিজেই বলেছেঃ 'আল্লাহ্ স্বীকৃতির ভিত্তিতে জীবনের ব্যাখ্যাদান ব্যাপারটি ঠিক এ রকম, যেমন নিছক একটি যন্ত্রের মধ্যে তার প্রকৃতি পরিপন্থী কোনো উপকরণ প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে এ-ও বলেছে ঃ প্রকৃতি সব জিনিসই সৃষ্টি করেছে। তার সৃষ্টি ক্ষমতার কোনো সীমা নেই।

কিন্তু ইহুদী শয়তানেরা অত্যন্ত খারাপ উদ্দেশ্যে এই মতবাদটির মধ্যে অনেক খারাপ ধারণা শামিল করে দিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য মানবসত্তাকেই ধ্বংস করা।

ইহুদীবাদের প্রোটোকল-এ বলা হয়েছে ঃ ডারউইন ইহুদী নয়। কিন্তু আমরা জানি, কি করে তার মতবাদটিকে ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রচার করে দেওয়া যায়। আমরা এটিকে ধর্মের ভিত্তি ধ্বংস করার কাজে প্রয়োগ করব।

উক্ত বইতে এ-ও বলা হয়েছে ঃ আমরা ডারউইন, মার্কস ও নিট্‌শের সাফল্য সৃষ্টি করব তাদের মতবাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রচলন করে। অ-ইহুদী চিন্তায় তাদের বৈজ্ঞানিক মতবাদ নৈতিকতার জন্যে যে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া রয়েছে, তা তাদের সম্মুখে সর্বতোভাবে সুস্পষ্ট ও প্রকট।

সন্দেহ নেই, বিশ্ব ইহুদীবাদ ডারউইনের চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশবাদকে খুব বেশি বড় করে তুলেছে, বীভৎস রূপ দিয়েছে ইউরোপীয় জাহিলিয়াতের অবশিষ্ট সকল ভালো মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই কাজে তারা তিনজন প্রধান চিন্তানায়কের চিন্তাধারাকে ব্যবহার করেছে। তারা হচ্ছে ঃ মার্কস, ফ্রয়েড ও দরখায়েম। এ তিনজন চিন্তাবিদই ধর্ম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে খুব তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও হীনতা দেখিয়েছে। জনগণের মনে ধর্মকে জঘন্য রূপে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছে।[১]

দরখায়েম লিখেছে ঃ ধর্ম প্রকৃতি সম্মত নয়।

মার্কস বলেছে ঃ ধর্ম জনগণের জন্যে আফিম। তা এমন সব উপকথার সমষ্টি, যা সামন্তবাদী ও পুঁজি মালিকেরা রচনা করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমজীবী জনতাকে

১. التطور والثبات فى حياة البشريه গ্রন্থের . اليهود الثلاثة । 'তিন ইহুদী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চেতনাহীন করে দেওয়া এবং পরকালীন নিয়ামতের লোভ দেখিয়ে দুনিয়ার জীবনে বঞ্চিত থাকতে রাজি করা।

ফ্রয়েড বলেছেঃ ধর্ম সৃষ্ট হয়েছে মানুষের বঞ্চনা ও ব্যর্থতার ফলশ্রুতি হিসেবে। তা উৎসারিত হয়েছে যৌন কামনা থেকে, যা পুত্র সন্তান তার মার প্রতি বোধ করে। পুত্র যে তার পিতাকে হত্যা করার আগ্রহী হয় তা থেকে।

এ তিনজনই মানুষের নৈতিকতাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। দরখায়েম বলেছেন ঃ অপরাধ নিতান্তই কাল্পনিক জিনিস। বিয়ে স্বভাবসম্মত নয়; নৈতিকতার সম্পর্কে সেভাবে কথা বলা যায় না যেন তা স্থিতিশীল সত্তা। তা সবই সামষ্টিক বিবেক-বুদ্ধির সৃষ্টি, যা একই অবস্থায় স্থায়ী হয়ে থাকে না। তা এক 'অপোজিট' থেকে অপর 'অপোজিট'-এর দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। কার্ল মার্কস বলেছেনঃ চরিত্র হচ্ছে বিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন, যা সব সময়ই পরিবর্তন সাপেক্ষ, তা কোনো স্থায়ী মূল্যমান নয়।

ফ্রয়েড বলেছেন ঃ চরিত্র জুলুমের চিহ্ন, মানবতার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

ধর্মের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র এখানে এসেই থেমে যায়নি। এই ষড়যন্ত্র নারী জাতিকেও ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছে। তাকে নামিয়ে দিয়েছে রাস্তায়।

মার্কস বলেছেন ঃ নারীকেও অবশ্যই শ্রম করতে হবে।

দরখায়েম বলেছেন ঃ নারীর বিয়ে করা তার স্বাভাবিক দাবি নয়।

ফ্রয়েড যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে তাকে বলছেন, নারীর যৌন সত্তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সকল প্রকার বাঁধা-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েই।

বিশ্ব ইহুদীবাদ কেবল মতাদর্শের ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, বাস্তবতার ক্ষেত্রেও পদচারনা করেছে।

বস্তুত তারা ডারউইনীয় মতাদর্শকে এমন কুৎসিতভাবে কাজে লাগিয়েছে, যা ডারউইনের কল্পনায় হয়তো আসেনি। শিল্প বিপ্লবকেও তারা সামাজিক ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টির হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছে।

সন্দেহ নেই, পুঁজিবাদ ইহুদী উদ্ভাবিত। ইহুদী সুদখোরেরা এই সুযোগে দুই হাতে জনগণের রক্ত পানি করা অর্থ কামিয়েছে। তাদের শয়তানী সুদী কারবারই এজন্যে অমোঘ হাতিয়ার।

পুঁজিবাদ কেবল 'মুনাফাদাতা নিজেই' জিনিসই নিয়ে আসেনি, মানুষকে পাগল করার উপায় 'সিনেমা'ও তাদেরই অবদান। তা দিয়ে তারা সন্তান-সন্ততিদের নৈতিক ধ্বংসের অতল গহ্বরে ফেলে দেওয়ার কাজ নিচ্ছে। সিনেমায় প্রধানত যৌনতার

পংকিল দৃশ্যাবলীই দেখানো হয়। সাজঘর ও রূপচর্চাকেন্দ্রও তারা বানিয়েছে মেয়েদেরকে পুরুষদের নৈতিক পতন সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে। তাতে সুবিধাই পেয়ে গেছে। কেননা মার্কস আগেই তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছেন। লোকদের মন-মানসকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে, ফেতনা ও নৈতিক পদস্খলনের কারণ ঘটিয়েছে। আর আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিটিকেই এর দ্বারা নাড়িয়ে দিয়েছে— নড়বড়ে করে দিয়েছে।

যেন গোটা জগৎ জিনা-ব্যাভিচারের এমন আড্ডাখানায় পরিণত করা যায়, যেন তথায় সমাজের নারী ও পুরুষরা সমানভাবে নাক পর্যন্ত ডুবে যেতে পারে।

আর তাহলেই তো ইহুদীরা গাধার পিঠে টপ করে লাফিয়ে উঠে সওয়ার হতে পারবে। তখনই তো তারা তাদের শয়তানী স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে পারবে। তাদের পবিত্র গ্রন্থাবলী তো এ ধরনের স্বপ্নে রঙীন দৃশ্যাবলী দিয়ে ভরপুর হয়ে আছে।

০ ০ ০

এরই পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত সারাটি জগতের ওপর জাহিলিয়াত বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

যে ইউরোপে এই জাহিলিয়াত গভীর ঐতিহাসিক ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো, তাই বর্তমানে সমগ্র জগতের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছে ও শানস চালাচ্ছে। সেই জাহিলী চিন্তাধারা ও ভাবধারা সারা পৃথিবীতে প্রভাবশালী হয়ে আছে।

গ্রীক জাহিলিয়াত, রোমান জাহিলিয়াত, মধ্যযুগের বিকৃত আকীদার জাহিলিয়াত, ডারউইনীয় মতবাদের ছত্রছায়ায় ধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচিছন্ন হওয়ার জাহিলিয়াত এবং শিল্প-বিপ্লব— এই সবই আধুনিক জাহিলিয়াতের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও পরিণত। আর তা-ই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত।

এ জাহিলিয়াত কেবল ইউরোপেই রয়েছে, তা নয়। তা শুধু ইউরোপেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, কেননা ইউরোপ তার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে এই জাহিলিয়াতকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আর সর্বত্রই সেই জাহিলিয়াতই বিজয়ী, কর্তৃত্বসম্পন্ন ও প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এভাবে আলোচনার মাধ্যমে আমরা আধুনিক জাহিলিয়াতের ইতিহাস বর্ণনা শেষ করলাম। এক্ষণে আমরা আধুনিক জাহিলিয়াতের নিদর্শনাবলীর বর্ণনা পেশ করব।

আধুনিক জাহিলিয়াতের নিদর্শন

ইতিহাসের প্রতিটি জাহিলিয়াতের একটা নিজস্ব নিদর্শন ও বিশেষত্ব রয়েছে, যদ্দ্বারা তা বিশিষ্ট হয়ে প্রতিভাত হয়। আসলে সে নিদর্শন হয় সেই সমাজ পরিবেশের, যার মধ্যে জাহিলিয়াত অবস্থান গ্রহণ করে অথবা তা হয় তার চতুষ্পার্শ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার নিদর্শন। সেই সাথে এমন কিছু মৌলিক বিশেষত্বও থাকে, যা সব জাহিলিয়াতেই অভিন্ন মূল্যমান হিসেবে থাকে এবং সামষ্টিকভাবে তা জাহিলিয়াতের একটা স্পষ্ট নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা ধারণা-বিশ্বাস ও বাস্তব আচার-আচরণে আধুনিক জাহিলিয়াতের বিপর্যয় ও বিকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করব। কিন্তু সেই বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আধুনিক জাহিলিয়াতের এমন কয়েকটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা খুবই উত্তম হবে বলে মনে হয়েছে, যেমন করে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বলে এসেছি, আধুনিক জাহিলিয়াত কবে অস্তিত্ব লাভ করল এবং তার বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি কি করে সংঘটিত হয়েছিল বিগত শতাব্দীগুলোর মধ্যে।

সত্যি কথা, কোনো জাহিলিয়াতই মহান আল্লাহ্র প্রতি সত্যিকারভাবে ঈমানদার হয় না।

ইতিহাসের সব কয়টি জাহিলিয়াতের মধ্যে এটাই হচ্ছে অভিন্ন ও বড় বিশেষত্ব। বরং এটার ভিত্তিই আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এক একটি জাহিলিয়াত গড়ে ওঠে। আর তার ওপর ভিত্তি করেই ধারণা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল প্রকারের বিপর্যয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

সহীহ্ ও নির্ভুল আকীদা হচ্ছে তাই, যা এই বিশ্বলোকে মানুষকে তার যথার্থ স্থান ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। স্থান ও কালে তার যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তিকে সঠিক ও সুষ্ঠু করে দেয়। তার জন্যে সঠিক দিক নির্দেশ করে, তার জন্য সুদৃঢ় সরল সোজা পথ চিহ্নিত করে দেয়। তাহলেই তার অনুভূতি, মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, গতিবিধি ও তৎপরতা সঠিক হতে পারে, সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে তার নীতি ও বাস্তবতা, ফলে বাঞ্ছিতভাবেই তার এই সব কিছুই পরস্পর ভারসাম্যপূর্ণ, পরিপূরক ও নির্ভুল পথে অগ্রসর হতে পারে।

কিন্তু এই আকীদা যখনই বিকৃত হয়, তখনই মানুষের গোটা সত্তায় বিপর্যয় দেখা দেওয়া অবশম্ভাবী হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন চুম্বক-সূচ থরথর করে কাঁপতে ও দিগ্বিদিকহারা হয়ে পড়ে যখন তার ও তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মাঝখানে কোনো অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তখনই সুসংবদ্ধ মানব সত্তা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। স্থান

ও কালে তার পদচারণা হয়ে পড়ে দিশেহারা। অস্থির ও সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে তার আচরণ ও তৎপরতা, অনুভূতি, স্বজ্ঞা, মৌলনীতি ও বাস্তবতা। অতঃপর সেই বাঞ্ছিত ঐক্যবদ্ধতা ও সুসংবদ্ধ আর কখনোই ফিরে আসে না, তার গোটা সত্তাই স্থিরতা ও শান্তি নিরাপত্তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অথচ এই দুই জিনিসের নিশ্চিত সুফল মানুষ লাভ করতে পারে সুস্থ সঠিক বিশ্বাসের ছত্রছায়ায় এবং সঠিক কর্মপথ গ্রহণে।

উক্ত বঞ্চনা ও অস্থিরতার ফলেই জাহিলিয়াতের দেখা দেয়।

বোঝা গেল, মহান আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা থেকে বিপথগামী হওয়ারই নাম হচ্ছে জাহিলিয়াত। আল্লাহ্‌র এই দাসত্ব জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রের জন্যে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আইন-বিধান গ্রহণ ও আইন-বিধান ভিত্তিক বিচার-ফয়সালা গ্রহণও শামিল রয়েছে। এ সবের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌র ইবাদত— দাসত্ব প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত হয়। এই নীতিতে যে বিপথগামিতা সংঘটিত হয়, তা-ই মানব জীবনে নিয়ে আসে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলতা, ছিন্নভিন্ন হওয়া, দলে দলে বিভক্তি। তা নিয়ে আসে সংগঠনে বিপত্তি, চিন্তায় বিচ্যুতি। আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্কের, গোটা সৃষ্টিলোকের সাথে, চতুষ্পার্শ্বের জীবনের সাথে ও তার ভাই ও অন্য মানুষের সাথে সম্পর্কের ব্যতিক্রম ঘটে, বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

ইতিহাসে যখনই মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিপথগামিতা সংঘটিত হয়েছে, তার পরিণতিতে বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে, সংযোজনে, ধারণায় ও চিন্তা-ভাবনায়। অতএব, এই আকীদাই হচ্ছে সেই শক্তি যা মানুষের এসব দিককে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করে। মানুষ তা জানতে ও বুঝতে সক্ষম হোক আর না-ই হোক, এ ব্যাপারে তার ইচ্ছার কোনো ভূমিকা থাক আর না-ই থাক। আর আকীদা যখন যথার্থ ও সঠিক হয়, তখনই মানুষের গোটা সত্ত্বা সুসংবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার পদচারণা ও জীবনযাত্রা সবই সঠিক পথে অগ্রসর হতে থাকে। আকীদা-বিশ্বাসের বিপর্যয় গোটা জীবনেই বিস্তার লাভ করে।

তাই বলা যায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত যখন সঠিকরূপে হতে থাকে, তখন পৃথিবীতেও কোনো বিপর্যয় ঘটে না।

তবে অনেক সময় আকীদা হয়ত ঠিক থাকে, কিন্তু শুধু আকীদাটুকু থাকাই তো এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তকারী শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আকীদাকে অবশ্যই জীবন্ত, গতিশীল, সক্রিয়, ইতিবাচক, সর্বব্যাপক হতে হবে, এমন হতে হবে যা মানুষের গোটা জীবন পরিব্যাপ্ত হবে, জীবনের কোনো একটি খুঁটিনাটি ব্যাপার বা দিকও তার আওতার বাইরে থাকবে না। একই সময় ব্যক্তির গোটা চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ ও আচার-আচরণ পরস্পর সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। নীতি ও

বাস্তবতার মধ্যেও কোনো পার্থক্য থাকবে না। যা-ই হবে ধারণা ও বিশ্বাস, তা-ই হবে তার কাজ।

এর বিপরীত অবস্থা— তাতে আল্লাহ্‌মুখী আকীদা থাক আর না-ই থাক, এ এক প্রকারের জাহিলিয়াত। 'জাহিলিয়াত' শব্দটিই তার ওপর প্রযোজ্য হবে এবং তার নিশ্চিত পরিণতিই ভোগ করতে হবে। তার ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। কেননা তাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সুন্নাত— স্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়ম।

o o o

আরব জাহিলিয়াতের লোকেরা আল্লাহ্‌কে জানত, চিনত। তাঁর অস্তিত্বের প্রতিও তারা বিশ্বাসী ছিল। তাঁর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করতে ও তাঁকে স্মরণ করতেও তারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সে লক্ষ্য দান ও স্মরণ যথার্থ ছিল না, ছিল ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ।

এই জাহিলিয়াতের আরবদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ - (القمان : ٢٥)

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করোঃ বলো তো আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? ...তাহলে ওরা জবাবে নিশ্চয়ই বলবে ঃ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ -

তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো ঃ বলো তো এই লোকেদের কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে— আল্লাহ্। (সূরা-যুখরুফ ঃ ৮৭)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ - (يونس : ٣١)

জিজ্ঞেস করোঃ তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে কে রিযিক দেয় বা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে এবং জীবন্তকে মৃত থেকে বা মৃতকে জীবন্ত থেকে কে বের করে, কে ব্যবস্থা করে যাবতীয় ব্যাপারের ? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে— আল্লাহ্। (সূরা ইউসনুস ঃ ৩১)

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ - قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ

يَجِيْرُ وَلَايُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ -

জিজ্ঞেস করো ঃ এই পৃথিবী ও এর মধ্যে বসবাসকরীরা কার?...বলো, যদি জানো। নিশ্চয়ই তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র। বলো, তোমরা কি একথা মনে প্রাণে গ্রহণ করছ না? জিজ্ঞেস করো, সপ্ত আকাশের রব্ব কে, কে মহান আরশের রব্ব? তারা অবশ্য বলবে, আল্লাহ্‌র জন্যেই আরশ। বলো, তাহলে তোমরা কি সে আল্লাহ্‌কে ভয় পাও না? বলো, সব জিনিসের প্রকৃত কর্তৃত্ব কার হাতে? তিনিই তো আশ্রয় দেন, তাঁর ওপর আশ্রয় দানের কাজ কেউ করে না যদি তোমাদের জানা থাকে, তারা নিশ্চয়ই বলবে, তা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে— বলো, তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কোন দিক থেকে প্রতারিত হচ্ছ? (সূরা মুমিনুন ঃ ৮৪-৮৯)

এ সব কয়টি আয়াত একসাথে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আরব জাহিলিয়াতের লোকেরা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌কে জানত। তারা এ-ও বিশ্বাস করত যে, সৃষ্টিকর্তা, ব্যবস্থাপক তিনিই, তাঁর হস্তে সবকিছুর প্রকৃত কর্তৃত্ব নিবদ্ধ।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জাহিলিয়াতে নিমগ্ন ছিল। তাদের জাহিলিয়াত দিয়ে তারা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে জানত না, তাঁর প্রতি প্রকৃত কার্যকর ঈমান রাখত না।

তাদের যাবতীয় ব্যাপারে তাঁকেই একমাত্র আইন-বিধানদাতা, শাসক, প্রশাসক, বিচার-ফয়সালাকারী রূপে মানতো না— গ্রহণও করত না।

এই কারণেই আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ -

তারা আল্লাহ্‌কে সেই মূল্য-গুরুত্ব-মর্যাদা দিত না, যা তাঁর অধিকার। যা তাঁর জন্যে উপযুক্ত ও শোভন। (সূরা আন'আম ঃ ৯১)

হ্যাঁ, তারা আল্লাহ্‌কে জানত। কিন্তু তাদের এই জানা তাদের জীবনে প্রতিফলিত ছিল না। জানার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হতো না।

তারা এক আল্লাহ্‌কে জানা সত্ত্বেও একই সাথে অন্যান্য বহু ইলাহ্‌র পূজা-উপাসনা করত, দাসত্ব করত। ...তা ছিল তাদের অনুভূতিক ও স্বজ্ঞাজনিত আকীদা।

তারা আল্লাহ্‌কে জানত, কিন্তু তাঁরা শরীয়ত— আইন-বিধানকে কার্যকর করত না। তাঁরই কাছে আইন-বিধান বা বিচার-ফয়সালা চাইত না, তাদের জীবনে তাঁরই

আইন-বিধান একান্তভাবে মেনে নিতো না, মেনে চলত না।— এ ছিল তাদের বাস্তব জীবন-আচরণের অবস্থা।

আর এসব কারণেই তারা 'কাফের' আখ্যায়িত হয়েছে। তারা ছিল সত্যিকারভাবে জাহিল। কুরআন তাদের সে-জাহিলিয়াতের গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। তাতে এই সব কিছুই শামিল ছিল।

আকীদার ক্ষেত্রে কুরআন তাদের সমর্থন করেনি, তা সম্ভবও ছিলনা। তারা যেসব মূর্তি ও দেবদেবী— খোদা-ভগবানের ইবাদত বা পূজা-উপাসনা করত, তার লক্ষ্য সেইগুলোই ছিল না। তারা তা করত এইজন্যে যে,তারা মনে করত, এইগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেবে। অথচ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্যে তো খালেস তাঁরই ইবাদত একান্ত প্রয়োজন। তাই কুরআন বলেছেঃ

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ-

জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র জন্যেই হবে খালেস দ্বীন। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্যকে বন্ধু-পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করেছে এই মনোভাব পোষণের দাবি নিয়ে যে, আমরা তো ওদের ইবাদত করি না, আমরা ওদের কাছে শুধু এতটুকু চাচ্ছি যে, ওরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র অতি নিকটে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন সেই সব বিষয়ে, যাতে তারা পরস্পর মতপার্থক্য রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হেদায়েত করেন না কোনো কাফের মিথ্যাবাদীকে। (সূরা যুমার ঃ ৩)

শরীয়ত বা আইন পালনের ব্যাপারে কুরআন অত্যন্ত কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। কেননা বাস্তব জীবনে আইন পালন ও মনে আকীদা পোষণের মধ্যে একবিন্দু বিচ্ছিন্নতা বা বৈপরীত্য কুরআন মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। আর বস্তুতই শরীয়ত পালন থেকে বিপথগামী হলে তার ঈমান আছে বলে বিশ্বাস করা এক অসম্ভব ব্যাপার। জীবনের বিভিন্ন দিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের দেওয়া আইন-বিধান পালন করা হবে, অথচ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার হওয়ার দাবি করা হবে, তা নিতান্তই হাস্যকর। এই কথাই তো বলেছেন আল্লাহ্ নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ

شُهَدَآءَ ج فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط وَمَنْ
لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ - وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا
وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ لا وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ - وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ
ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا
ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ وَاَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ
ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ - اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ اَحْسَنُ
مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

আমরা তওরাত নাযিল করেছি। তাতে আছে হেদায়েত ও নূর। ইসলাম গ্রহণকারী নবীগণ, আল্লাহ্ওয়ালা ও আলিম-বুদ্ধিমান লোকেরা ইহুদীদের জন্যে তারই ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করে সেই অনুযায়ী, যা তারা আল্লাহ্র কিতাব থেকে হেফয করে রেখেছে, যার সংরক্ষক তাদের বানানো হয়েছিল। আর তারা তার সত্যতার সাক্ষী ছিল। অতএব তোমরা লোকজনকে ভয় পেয়ো না, ভয় আমাকেই করো। আর আমার আয়াত স্বল্পমূল্যের জিনিসরূপে বিক্রয় করো না। বস্তুত যারাই আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের, তাতে তাদের জন্যে এই আইন আমরা লিখে দিয়েছিলাম

যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত দিতে হবে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কিসাসের আওতাভুক্ত। তবে যদি কেউ তা মাফ করে দেয়, তাহলে তা তার জন্যে কাফ্ফারা হবে। আর যে লোকেরা বিচার-ফয়সালা করে না আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী, তারা জালিম। তাদের পরে পরেই আমরা নিয়ে এলাম মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে। তাদের কাছে তওরাতের যে অংশ রয়েছে তার সত্যতা ঘোষণাকারী হিসেবে। এবং তাঁকে আমরা ইন্জিল দিলাম। তাতে যেমন হেদায়েত আছে, তেমনি নূর। আর তা সত্যতা প্রমাণকারী তওরাতের যা বর্তমান আছে তার। এবং তা হেদায়েত ও উপদেশ মুত্তাকী লোকদের জন্যে। ইন্জিল-বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করা। আর যারাই আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক। অতঃপর আমরা তোমার প্রতি— হে নবী কিতাব নাযিল করেছি পরম সত্যতা সহাকরে। পূর্ববর্তী কিতাবের অবশিষ্টের সত্যতা বিধানকারী, তার সংরক্ষক। অতএব তুমি তাদের মধ্যে হুকুমত চালাও আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী, আর তাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করে আল্লাহ্র দেওয়া বিধান থেকে দূরে সরে থেকো না। তোমাদের জন্যেই একটা শরীয়ত ও একটা প্রশস্ত পথ বানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ চাইলে তোমাদের এক উম্মতভুক্ত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তা বানান নি, যেন তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। অতএব তোমরা সকলে সকল কল্যাণময় কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাও। আল্লাহ্ই তোমাদের সকলেরই চূড়ান্ত পরিণতি। তখন তিনি তোমাদের পারস্পরিক বিরোধিতার বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত সত্য কোনটি তা জানিয়ে দেবেন। আর তুমি তাদের মধ্যে হুকুমত চালাও আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী। তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। তাদের ব্যাপারে তুমি সতর্ক থাকবে, কেননা তারা তোমার প্রতি আল্লাহ্র নাযিল করা কোনো কোনো বিধানের ব্যাপারে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে। ওরা যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শনও করে, তবু তুমি জানবে যে, আল্লাহ্ চাহেন তাদের কোনো কোনো গুনাহের জন্যে তাদেরকে মুসীবতে নিমজ্জিত করবেন। যদিও বেশির ভাগ লোকই ফাসিক। ওরা কি জাহিলিয়াতের আইন—শাসন-প্রশাসন পেতে চায় ? অথচ দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন লোকদের জন্যে আল্লাহ্র চাইতে অধিক উত্তম বিধানদাতা— বিচার ফয়সালাকারী আর কে হতে পারে ?

(সূরা মায়িদা ঃ ৪৪-৫০)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ج وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ -

যার ওপর যবেহ কালে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তা তোমরা খেয়ো না– তা খাওয়া নিশ্চয়ই ফিস্‌ক। আর শয়তানেরা তাদের বন্ধু চেলাদের প্রতি অবশ্য গোপন কথা পাঠায়। যেন তারা তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। আর তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম ঃ ১২১)

এ দীর্ঘ উদ্ধৃত আয়াত থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল, শরীয়ত আইন পালনের ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে আকীদা বিশ্বাসেরই ব্যাপার, এ দুটির মধ্যে কোনোই তারতম্য হতে বা বিচ্ছিন্নতা হতে পারে না। হয় আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী আইন বিধান জারী ও বিচার-ফয়সালা করা হবে, না হয় হবে জাহিলিয়াত ও শিরক অনুযায়ী। অতএব আল্লাহ্‌র সত্যিকার পরিচিতি লাভ তাঁর প্রতি যথার্থ ঈমান গ্রহণ— এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, ইলাহ্ হিসেবে কেবল তাঁকেই গ্রহণ করার মতোই ব্যাপার। কেননা তিনি একাই তো সৃষ্টিকর্তা, মালিক। কাজেই তিনি একাই এই মর্যাদায় অভিষিক্ত যে, কেবল তাঁকে মান্য করা হবে, মেনে চলা হবে কেবল তাঁরই দেওয়া বিধান। মান্য করা কর্তব্য কেবল তাঁকেই। আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়াতের বিধান পালন এক অভিন্ন ব্যাপার, যার দুই অংশ বা দিক হলেও তা এক অভিন্ন মৌল থেকে নির্গত। একই পরিণতির দিকে অগ্রসরমান। সে অভিন্ন মৌল হলোআল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং অগ্রসর হওয়ার পথ বা পন্থা হচ্ছে ইসলাম।

পক্ষান্তরে প্রতিটি জাহিলিয়াতের নির্দিষ্ট দিক আছে। সেই দিকটিই তাকে জাহিলিয়াতরূপে নির্ধারিত করে। জাহিলিয়াতের সে দিকটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকার ঈমান না আনা অথবা যে কোনো বিষয়ে ইসলাম পালন না করা। এখানে আকীদা ও শরীয়ত, শরীয়ত ও আকীদা অভিন্ন, অবিচ্ছিন্ন। এ দুয়ের মধ্যে যেমন বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে না, তেমনি পারে না কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হতে।

ঈমানের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে আল্লাহ্‌কেই এককভাবে 'ইলাহ্' মেনে নেওয়া। আর ইসলামের দাবি হচ্ছে এককভাবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা, কেবল তাঁরই দেওয়া আইন বিধানকে একমাত্র আইন বিধানরূপে গ্রহণ ও অবলম্বন করা।

আর আল্লাহ্‌কে একক ইলাহ্ ও একক সার্বভৌম না মানলেই জাহিলিয়াত উদ্ভূত হয়। তখন আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা হয় অন্যান্য অনেক ইলাহকে। আর তখন এক

আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিচার-ফয়সালাকরণও সম্ভব হয় না।

বস্তুত জাহিলিয়াত যখন আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ ও বিচার-ফায়সালা করে না, তখন তা অনিবার্যভাবে লোকদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ইচ্ছা কামনারই অনুসরণ করতে বাধ্য হয়।

আর এটাই হচ্ছে প্রতিটি জাহিলিয়াতের দ্বিতীয় লক্ষণ। তা মৌলিকভাবে এক আল্লাহ্র প্রতি সত্যিকার ঈমান না থাকা এবং তাঁরই কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত না হওয়া থেকেই উৎসারিত।

> এবং হুকুমত করো তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী। তাদের ইচ্ছা-বাসনা অনুসরণ করো না। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। তারা তোমাকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ কোনো কোনো বিধানের ব্যাপারে বিপদে ফেলতে পারে।[১]

তাহলে বোঝা গেল, গোটা ব্যাপারটাই পরস্পর সম্পৃক্ত, অবিভাজ্য। হয় আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে হবে— আর এ থেকেই ইসলাম, একান্তভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পিত হওয়া এবং তাঁরই নাযিল করা বিধান পালন অনিবার্য ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে জাহিলিয়াত হচ্ছে লোকদের কামনা-বসান-ইচ্ছার অনুসরণ। এর প্রতিটি বিধান আল্লাহ্র বিধান থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর এবং নিছক কামনা-বাসনা মাত্র। এটা আল্লাহ্রই নির্ধারণ, জীবনের ইতিহাস থেকেই এই কথার সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

হ্যাঁ, লোকদের কামনা-বাসনা-চিন্তা এক যুগ থেকে যুগান্তরে, এক পরিবেশ থেকে ভিন্নতর পরিবেশে পার্থক্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক জনগোষ্ঠী থেকে অপর জনগোষ্ঠীতেও এই ভিন্নতা অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তা ইচ্ছা-বাসনা জনগণের মধ্য থেকে এক অংশের মাত্র। তা দিয়েই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শাসন করা হয়, সকলকে তা অকুণ্ঠিতভাবে মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। তাতে বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হলেও হতে পারে; কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত সৃষ্টি এই কামনা-বাসনা-ইচ্ছা অনুপাতেই অধীনতা বা গোলামী করতে বাধ্য হয়।

শরীয়াতের বিধান এক আল্লাহ্ প্রদত্ত। তাতে লোকদের কামনা-বাসনা-ইচ্ছার একবিন্দু স্পর্শও লাগেনি। কেননা আল্লাহ্র নিজের জন্যে কল্যাণের চিন্তা নেই এই জনগোষ্ঠীর সাথে। ফলে তাঁর কোনো পক্ষপাতিত্বও নেই। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ -

১. আল-মাদিয়াঃ ৪৯।

আমি তো তাদের কাছ থেকে কোনো রিযিক পেতে চাই না, তারা আমাকে খাওয়াবে এমন কোনো ইচ্ছাও নেই আমার। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৮)

সব মানুষই তাঁর সৃষ্ট, সকলেই তাঁর কাছে সমান। কারোর ওপর কারোর কোনো মর্যাদাধিক্য বা অগ্রাধিকার নেই তাঁর কাছে। তা পাওয়ার একমাত্র ভিত হচ্ছে তাকওয়া।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

হে মানুষ! আমরাই তোমাদের একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, আর বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি শুধু এজন্যে, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচিতি লাভে সক্ষম হও। নিশ্চিত কথা, তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক সম্মানার্হ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা হুযরাত ঃ ১৩)

অতএব হয় আল্লাহ্‌র শরীয়ত পালন করা হবে— আর তা-ই ইসলাম। অথবা লোকদের চিন্তা-ইচ্ছা-কামনা-বাসনার অনুসরণ করা হবে। আর তা-ই জাহিলিয়াত। সর্বকালে ও সর্বস্থানেই এই কথা যথার্থ, শাশ্বত।

তৃতীয় নিদর্শনটি সকল জাহিলিয়াতের ক্ষেত্রে অভিন্ন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌দ্রোহী সীমালংঘনকারী ক্ষমতাসীনদের অবস্থিতি। তারাই সর্বক্ষণ ও সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে এবং এক আল্লাহ্‌র দেওয়া শরীয়ত পালন থেকে বিরত রাখতে। যেন তারা বাধ্য হয়ে সেই আল্লাহ্‌দ্রোহী-সীমালংঘনকারী লোকদের দাসত্ব করতে এবং তাদের বানানো শরীয়ত-বিধান, আইন-পালন করতে (যা তারা নিজেদের খাহেশ-কামনা-বাসনা-ইচ্ছার ভিত্তিতে রচনা করছে) বাধ্য হয়। এই কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ -

আল্লাহ্ বন্ধু পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন ঈমানদার লোকদের। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে আসেন। আর কাফেরদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক হয়েছে আল্লাহ্‌দ্রোহী-সীমালংঘনকারী লোকেরা। তারাই তাদের বের করে আনে আলো থেকে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে। (সূরা-বাকারা ঃ ২৫৭

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ -

যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌দ্রোহী-সীমালংঘনকারীদের পথে....। (সূরা নিসা ঃ ৭৬)

এই আল্লাহ্‌দ্রোহী-সীমালংঘনকারী লোকদের কর্তৃত্ব থাকাটা একটা অবিচ্ছিন্ন লক্ষণ আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে নিঃসম্পর্ক হয়ে থাকার। তাই মানুষ যখনই সত্যিকার ইবাদত থেকে বিপথগামী হবে, তখন তারা অন্যান্য সত্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করবে— এটা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি অনিবার্য। তা একক সত্তার ইবাদত হতে পারে, হতে পারে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক সহকারে। আর আল্লাহ্ ছাড়া এ সব মা'বুদ তখনই আল্লাহ্‌দ্রোহী সীমালংঘনকারী হয়ে দাঁড়ায়।

সে 'তাগুত'– আল্লাহ্‌দ্রোহী-সীমালংঘনকারী এক ব্যক্তি হতে পারে। একটি গোষ্ঠী হতে পারে, হতে পারে একটি জনসমষ্টি। প্রচলিতভাবে হতে পারে, হতে পারে অন্ধ অনুসরণ হিসেবে। অথবা অন্য কোনো শক্তিও মানুষকে দাস বানিয়ে রাখতে পারে। তখন তাদের পক্ষে সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

'তাগুত'– সে এক ব্যক্তি হোক, কি হোক এক গোষ্ঠী বা দল, জনগণ এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনুক এবং কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদত করুক যেমন করে তাঁর ইবাদত করতে হয়, তা কোনো দিনই বরদাশ্‌ত করবে না। কেননা যেখানে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব প্রাধান্য-সার্বভৌমত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা সাধারণভাবে স্বীকৃত ও মান্য, তথায় 'তাগুত' মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না, টিকতে ও বসবাস করতেও পারে না। তাই তাকে মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে ফিরাবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করতে হয়। তারপরই তার নিজ ইচ্ছা-বাসনার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা করা সম্ভব।

এই কারণে তাগুত সব সময়ই সত্য নির্ভুল আকীদার সাথে চরম শত্রুতা করতে বাধ্য থাকে। কেননা জনগণের বন্ধুত্ব-পৃষ্ঠপোষকতা, কর্তৃত্ব— সব কিছু তার নিজের জন্যে একান্ত করে রাখতে বদ্ধপরিকর। সত্য-সঠিক আকীদা তো এ সবকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে একান্ত করে দেয়।

আরএই জন্যেই জাহিলিয়াত— আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিপথগামিতা— অনিবার্যভাবে 'তাগুতকে' বহাল তবিয়তে প্রতিষ্ঠিত রাখে। 'তাগুত' ছাড়া জাহিলিয়াত হয় না, জাহিলিয়াত তাগুত ছাড়া চলতে পারে না।

চতুর্থ নিদর্শনটিও সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে বর্তমান। তাও আল্লাহ্র নীতি ও পদ্ধতি থেকে দূরত্বের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। যদিও তার কারণসমূহ মানব প্রকৃতি নিহিত। আর তা হচ্ছে লালসা-কামনার স্রোতে ভেসে যাওয়া।

লালসা-কামনা মানুষের খুবই প্রিয় জিনিস। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

জনগণের কাছে খুবই প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে লালসা-কামনা স্ত্রীলোক, পুত্র সন্তান, আর স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপীকৃত সম্পদ, চিহ্নযুক্ত অশ্ব, গৃহপালিত পশু, ক্ষেতখামার ইত্যাদি বিষয়। এসব হচ্ছে বৈষয়িক জীবনের জন্যে জরুরী সামগ্রী। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪)

বস্তুত আয়াতে উল্লেখিত দ্রব্যাদির সব কিছুরই একটা পরিমাণ মানব জীবনের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। অপরিহার্য সেই খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে, যার দায়িত্বশীল বানিয়ে মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। আর এই কারণেই মানুষের দেহসত্তায় কতকগুলো জৈবিক দাবি একত্র করে রেখে দেওয়া হয়েছে। যেমন খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, পোশাক, যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, প্রকাশ ও মালিকানা দখল।[১] ব্যক্তিকে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্যে এবং তাকে জীবনের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে এগুলোর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু এগুলোর পরিমাণ যখন যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যায়, আর লালসা-কামনা যদি মানব সত্তর ওপর আধিপত্যশীল হয়ে বসে, তখন সে তার স্বভাবসম্মত দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, যার জন্যে আল্লাহ্ এগুলোকে উদ্ভাবিত করেছেন। তখন মানব সত্তাটিকেই তা ধ্বংস করে। তার শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। খিলাফতের দায়িত্ব পালন থেকে তাকে বিরত রাখে। ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত মহান মানবীয় মর্যাদা থেকেও অনেক নীচে নামিয়ে দেয়। (অথচ আল্লাহ্ তাকে মহা সম্মানিতই বানিয়েছিলেন) তখন তাকে জন্তু-জানোয়ার আর শয়তানের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।

এই মানব সত্তাটিকে এই পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে কেবলমাত্র তার আল্লাহ্তে বিশ্বাস এবং এমন এক জীবনধারা যা আল্লাহ্র শরীয়াতের বাস্তব ব্যবস্থার অধীন অতিবাহিত হয়।

---

১. دراسات فى اللنفس الانساني গ্রন্থের الدوافع والضوابط অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অতীত শতাব্দীসমূহে মানব সংক্রান্ত সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এই সত্যকে অনস্বীকার্য করে দেয়। হয় হেদায়েত অবলম্বন হবে আল্লাহ্‌র দেওয়া হেদায়েতে, না হয় লালসা-কামনার খরস্রোতে রসাতলে ভেসে যাওয়া হবে। তখন এই লালসা-কামনাই সবকিছু, সকল প্রকার বাসনা-কামনাই তখন প্রকট। তন্মধ্যে যৌন লালসা সর্বাগ্রে।

মানুষ এই যৌন লালসার তীব্র আকর্ষণ থেকে নিজেকে কখনোই বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।...হ্যাঁ পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে— আল্লাহ্‌র ভয়ে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে।

তবে আইন ও শাসন এবং শাস্তির ভয়টাও এ ব্যাপারে কম ভূমিকা পালন করে না। এই কারণে মানুষ অপরাধ করে গোপনে, লোকদের না দেখিয়ে। যেন ধরা পড়ে আইনের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য না হয়।

প্রচলিত আইন যে কাজকে অপরাধ গণ্য করে, অপরাধীরা সেই সব কাজ গোপনেই করতে চেষ্টা করে। আর লোকভয় থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্যে লোকদের না দেখিয়ে সে কাজ করে। কিন্তু সে অপরাধ থেকে নিজেকে প্রকৃতপক্ষে দূরে রাখতে পারে না। পারে কেবল তখন, যখন আল্লাহ্‌র ভয় তার মনে প্রবল হয়ে ওঠে। কেননা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কিছু লুকোনো যায় না।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একথা অকাট্যরূপে প্রতিষ্ঠিত যে, দুনিয়ার জাহিলিয়াতসহ নৈতিক নির্লজ্জতা— জ্বিনা-ব্যভিচারকে চূড়ান্তভাবে বন্ধ করার জন্যে কখনোই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এক্ষেত্রে আরব জাহিলিয়াত, পারসিক জাহিলিয়াত, ভারতীয় জাহিলিয়াত, গ্রীক, রোমান ও ফিরাউনী জাহিলিয়াত এবং তখনকার এই বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত সবই একাকার, অভিন্ন। অবশ্য কারণ বিভিন্ন।

কখনও কারণ হয়, শাসক-প্রশাসক তাগুত একান্তভাবে তার নিজের কল্যাণের বিষয়াদিতে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়ে; তার বাইরে অন্য সব ব্যাপারাদির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার অবসরই পায় না। আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া যে শাসন-প্রশাসন, আসলে তা-ই তাগুত। ফলে সাধারণ মানুষ যৌনতার ক্ষেত্রে কোনো গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে, তা লক্ষ্য করার মতো কোনো অবকাশই তা পায় না। ফলে এই বিপথগামিতা থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ থাকে না।

অনেক সময় 'তাগুত' নিজেই নির্লজ্জতা জ্বিনা-ব্যভিচারের প্রসারতা ঘটানোর জন্যে সচেষ্ট হয়, যেন সে নিজেই একদিকে হারাম সম্পদ আহরণ করে ভোগ-বিলাস করার সুযোগ পেতে পারে, অপরদিকে জনগণের ওপর তার চাপানো জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো কোনো মন-মানসিকতা বা ঈমানী সাহসিকতা কারুর মধ্যেই না থাকে। তার গোটা শাসন প্রশাসনই তো জুলুম। আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া যে শাসন, তা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই

কারণে জনগণের যৌন-উচ্ছৃংখলতায় ডুবে যাওয়া থেকে চক্ষু ভিন্ন দিকেই ফিরিয়ে রাখে। ফলে জনগণও তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, আর তাগুতি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠা থেকে দূরে সরে থাকে।

সে যা-ই হোক, প্রতিটি জাহিলিয়াতেই যৌন লালসা-কামনা-স্রোতে মানুষের বিপথগামী হওয়া এক অনিবার্য ও অবধারিত অবস্থা।

ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যতগুলো জাহিলিয়াতের অভ্যুদয় ঘটেছে তার প্রতিটিতেই এই লক্ষণটি প্রকটভাবে বর্তমান দেখা গেছে। তার প্রতিটিই সেই বড় ও প্রধান কারণ থেকে উৎসারিত, যা প্রতিটি জাহিলিয়াতেই অনিবার্যভাবে বিরাজিত। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিপথগামিতা।

এ এক অভিন্ন ও সম্মিলিত লক্ষণ। কোনো জাহিলিয়াতই তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। যা আরব জাহিলিয়াতে ছিল। পারসিক, গ্রীক, রোমান ও ফিরাউনী জাহিলিয়াতে তা পুরামাত্রায় বর্তমান ছিল। আর আধুনিক জাহিলিয়াতেও তা রয়েছে পুরোপুরিভাবে। তবে বাহ্যিক প্রকাশ হয়ত বিভিন্ন হতে পারে কখনও কখনও। কখনও আবার তা-ও হয় না।

আরব জাহিলিয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিপথগামিতা ছিল আকীদার দিকে যেমন, তেমনি শরীয়াতের ক্ষেত্রেও। আল্লাহ্‌র ঘরে ও আশে-পাশে মূর্তি-প্রতিমূর্তির হরদম পূজা হচ্ছিল। তথায় জাহিলিয়াতের আইন কার্যকর ছিল আল্লাহ্‌র শরীয়তের পরিবর্তে। মানুষের ওপর, তাদের যাবতীয় কর্ম তৎপরতার ওপর খাহেশ-কামনা-বাসনার প্রাধান্য ও আধিপত্য ছিল। তথায় শক্তিমান দুর্বলের ওপর অন্যায়ভাবে জয়ী হতো। বিচার ক্ষেত্রে সত্যতার কোনো যোগ ছিল না। যা কিছু হতো তা হতো শক্তির জোরে, শক্তির পক্ষে। কুরায়শ বংশের সরদাররাই সেখানে 'তাগুত' হয়ে বসেছিল। যারা গণকদার ও প্রাচীন রীতিনীতির পুনরুজ্জীবনকারী, তা যেমন বিপথগামী, তেমনি পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসরণের নামান্তর। তারা যা ইচ্ছা করত, হারাম ঘোষণা করত। যা পছন্দ হতো, তাকেই হালাল বানিয়ে দিত। কেবল তাই নয়— অনেক সময় এক বছর যা হারাম ঘোষণা করত, পরবর্তী বছর তাই হালাল ঘোষণা করে দিত। যখন তাদের মন যা চাইত, তাই করত। বাতিল শাসকরা ক্ষমতাসীন হয়ে জনগণকে অকথ্যভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত করত। তারা সাধারণ মানুষের গরদানের ওপর সওয়ার হয়ে বসেছিল। আর লালসা কামনার শক্তি মদ্য, নারী, জুয়া, হত্যা, লুটপাট, অধিকার হরণ, ছিনতাই, আত্মম্ভরিতা ও সীমালংঘনমূলক অহংকার গৌরব করার মাধ্যমে পূর্ণমাত্রায় কার্যকর ছিল এবং তার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলছিল।

আর আজ চৌদ্দশ বছর পর আধুনিক জাহিলিয়াত ঠিক সেই বিশেষত্ব ও লক্ষণাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিপথগামী হওয়ার ব্যাপারটি আকীদা ও শরীয়তের বিধান উভয় ক্ষেত্রেই সর্বজনবিদিত ব্যাপার। সেদিকে শুধু ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট। কিন্তু একালের জাহিলিয়াতে বিপথগামিতা বহু সত্যের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র আকীদা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। শরীয়ত পরিহারের ব্যাপারটিও তার সকল নিদর্শনসহ ব্যাপকভাবে কার্যকর। এ জাহিলিয়াত পূর্ণমাত্রায় নাস্তিকতা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মানুষ ব্যক্তিগতভাবেই সে নাস্তিকতা গ্রহণ করে থাকুক, অথবা তাগুতী শক্তি জনগণের ওপর চাপিয়েই দিক। আর শয়তানের সকল অবস্থাতেই তার মাত্রা অনেক বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

লালসা-কামনা ও নিজস্ব মনের চিন্তা-ভাবনার অনুসরণে বর্তমান শতাব্দীর জাহিলিয়াত শীর্ষস্থান দখল করে বসেছে। অতীতের কোনো জাহিলিয়াতেই নফসের লালসা প্রবৃত্তির এতটা দাসত্ব আর কখনোই করা হয়নি। প্রতিটি ব্যাপারেই তা লক্ষণীয়। আর পূর্বে ও পশ্চিমে কোনোই পার্থক্য নেই এ ব্যাপারে। সর্বত্রই আকীদার বিশ্বাসকে পদদলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। যা কিছু পবিত্র, সম্মানার্হ, তার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে, তাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। মানুষের কাজ-কর্মের সমস্ত নিয়ম-নীতি লংঘন করা হয়েছে। আর নিছক ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে নিতান্তই বেহুদা ও অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব উদ্ভাবন করা হয়েছে।

একালের 'তাগুত'দের সংখ্যা যে কত, তা হিসেব-নিকেশের আওতা ছাড়িয়ে গেছে। পুঁজিতন্ত্র, প্রোলেটারিয়েট, মিথ্যা কল্পিত কিস্‌সা-কাহিনী ও তাৎপর্যহীন মূল্যমান ও মূল্যবোধ, এসবই কি একালের বড় বড় তাগুত নয় ?

আর একালের লালসা-বাসনা-কামনার প্রচণ্ডতার কথা বরং না বলাই ভালো।

এই নিদর্শনসমূহ এতই সাধারণ যে, দুনিয়ার বুকে সৃষ্ট ইতিহাসের কোনো জাহিলিয়াতই এই সব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

সমস্ত জাহিলিয়াতে সমানভাবে বর্তমান থাকা অভিন্ন মূল্যায়ন ও নিদর্শনসমূহের সাথে পরিচিত হওয়ার পর, আধুনিক জাহিলিয়াতের বিশেষত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করব, যেন আমাদের মানসপটে সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণার সৃষ্টি হয়। এই বিশেষত্বসমূহ সেই প্রধান বড় ও মৌল নির্দশন থেকেই উৎসারিত। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিপথগামিতা। কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াত এই ক্ষেত্রেও তার রূপ ও খুঁটিনাটির দিক দিয়ে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্থান দখল করেছে। এর কারণ হচ্ছে পরিবেশগত পরিস্থিতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন এবং সেই চিন্তা যা আল্লাহ্ প্রদত্ত পন্থা ও পদ্ধতি থেকে দূরবর্তিতা এবং তার সাথে শত্রুতা গ্রহণের দরুন উদ্ভুত হয়েছে।

ইতিহাসের প্রতিটি জাহিলিয়াতে এমন একটা বিশেষ বিশেষত্বও রয়েছে, যা তার অভিন্ন ও সর্ব জাহিলিয়াতের বর্তমান বিশেষত্ব থেকে তাকে পৃথকভাবে প্রতিভাত করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আরব জাহিলিয়াতের একটি বিশেষত্ব ছিল সন্তান হত্যা ও তাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা, নারী ও পুরুষের এক মহা উলঙ্গ ও বস্ত্রহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করা, কোনো কোনো ফসল ও জীবজন্তু কোনো কারণ ছাড়াই হারাম বলে নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি। এই কাজ নিতান্ত হাস্যকর। তবু এগুলোই ব্যাপক প্রচলিত ছিল তখনকার সময়ে।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ج فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ج وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ - وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ - وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ - وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا ج وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ -

এবং এই লোকেরা আল্লাহ্‌র জন্যে তাঁর নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশুর একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে এবং বলেছে এটা আল্লাহ্‌র জন্যে, আসলে এটা হচ্ছে তাদের নিজেদের ধারণা অনুমান— আর এটা আমাদের বানানো শরীক মা'বুদের জন্যে। কিন্তু যে অশং তাদের বানানো শরীক মা'বুদদের জন্যে, তা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না, অথচ যা আল্লাহ্‌র জন্যে, তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কতই না খারাপ এই লোকদের সিদ্ধান্ত। এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্যে তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে, যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে। আল্লাহ্ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক। তারা বলে, এই জন্তু ও এই ক্ষেতে ফসল সুরক্ষিত। এগুলো কেবল তারাই খেতে পারবে, যাদের আমরা খাওয়াতে

চাইবে। অথচ এই বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কল্পিত। এছাড়া কিছু জন্তু, জানোয়ার এমন আছে যেগুলোর ওপর সওয়ার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আর কিছু কিছু জন্তুর ওপর তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। এসব কিছুই তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অতিশীঘ্র আল্লাহ্ তাদেরকে মিথ্যা রচনার প্রতিশোধ দেবেন। আর তারা বলে, এই জন্তুগুলোর গর্ভে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্যে বিশেষভাবে রক্ষিত এবং আমাদের নারীদের জন্যে তা হারাম। কিন্তু তা যদি মৃত হয়, তবে উভয়ই তা খাওয়াতে শরীক হতে পারে।... (সূরা আন'আম ঃ ১৩৬-১৩৯)

গ্রীক জাহিলিয়াতের পার্থক্যসূচক বিশেষত্ব ছিল জ্ঞানবুদ্ধির দাসত্ব ও দেহের পূজা। আর রোমান জাহিলিয়াতের বিশেষ লক্ষণ ছিল পাশবিক ধরনের মারামারির খেলার প্রতিযোগিতা। আর ভারতীয় জাহিলিয়াতের বিশেষ নিদর্শন হচ্ছে সেবা দাসী ব্যবস্থা যা এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে। তাতে এই মেয়েরা নিতান্ত বেশ্যা হয়ে মন্দিরসমূহের পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত থাকে এবং দেহদানের কাজকে ধর্মীয় কাজ মনে করে। মিসরীয় জাহিলিয়াতের বিশেষ বিশেষত্ব ছিল ফিরাউনের ইবাদত— দাসত্ব ও আনুগত্য এবং তার খেদমত করতে গিয়ে চরম মাত্রার লাঞ্ছণা ভোগ করতে বাধ্য হওয়া। আর মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াতের বিশেষত্ব ছিল গীর্জার সীমালংঘন, বিদ্রোহ, গীর্জার আভ্যন্তরীণ চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতা এবং ক্ষমার সার্টিফিকেট বিতরণ।

অনুরূপভাবে আধুনিক জাহিলিয়াত কতকগুলো যৌথ ও অভিন্ন বিশেষত্বের ধারক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্যসূচক বিশেষত্বেরও অধিকারী। এখানে সেগুলোর উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে মানবতাকে আল্লাহ্‌র হেদায়েত থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার, পথভ্রষ্ট করার এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলকে চরম দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করার কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করা।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ও বস্তুগত উন্নতি উৎকর্ষতার নেশায় মত্ত হয়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র সাথে মোকাবিলায় লাগিয়ে দেওয়া। আর এই কথা মনে করা যে, বর্তমানের এই চরম উন্নীত যুগে আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন মানুষের নেই। সেই সাথে এ কথাও যে, একালে স্বয়ং মানুষই আল্লাহ্ হয়ে গেছে।

— বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও মতাদর্শসমূহ। বর্তমানে এগুলোই সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি ও মনস্তত্ত্ব— জীবনের সকল বিভাগেই মানব জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

— বিবর্তনবাদী দর্শন।

— নারী সমাজের স্বাধীনতার নামে চমর মাত্রায় উচ্ছৃংখলতা।

এ অধ্যায়ে আমরা আধুনিক জাহিলিয়াতের পার্থক্যসূচক বিশেষত্ব কিংবা অপরাপর অভিন্ন ও সাধারণ বিশেষত্ব পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কিন্তু এ পর্যায়ে আধুনিক জাহিলিয়াত সৃষ্ট মহাবিপদ সম্পর্কে কথা বলছি।

এ জাহিলিয়াত যে সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কারণ এ জাহিলিয়াতের সমর্থনে নিয়োজিত রয়েছে সীমাহীন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সীমাতিরিক্ত বস্তুগত শক্তি-সামর্থ্য। এ জাহিলিয়াত মানুষের জন্যে কতিপয় সাংস্কৃতিক ও বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়াসের সরঞ্জাম যোগাড় করে দিয়েছে। এগুলো বাহ্যতঃ খবুই কল্যাণকর মনে হয় বটে! কিন্তু আসলে তা-ই জাহিলিয়াতের বড় ধারক ও পরিপোষক।

এ কারণেই এ গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা বলে এসেছি যে, আধুনিক জাহিলিয়াত ইতিহাসের অন্যান্য সকল জাহিলিয়াতের তুলনায় অধিক কর্দমাক্ত, অধিক জঘন্য এবং অধিক রূঢ়, নির্মম। প্রাচীন জাহিলিয়াতসমূহে 'বাতিল' ছিল সুস্পষ্ট, প্রকট। তার বাতুলতা জনতে বুঝতে কোনোই অসুবিধা হতো না। তা সত্ত্বেও প্রাচীন জাহিলিয়াতসমূহে জনগণের বিবেক-বুদ্ধির ওপর মুর্খতার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি থাকত। বাতিল সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা তাদের হতো না বা ছিল না। তখন তারা বুঝতে পারত যে, যে সত্যের আহ্বান তাদের দেওয়া হচ্ছে, তা নিতান্তই বাতিল ও ক্ষতিকর ছাড়া কিছুই নয়।

এতদসত্ত্বেও সে সব জাহিলিয়াতে অজ্ঞতা-মুর্খতা, অন্যায় ও বাতিলের পরিমাণ ও মাত্রা কমই ছিল এবং জাহিলিয়াতের সাথে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব সংগ্রামের শেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে হেদায়েতই সাফল্যমণ্ডিত হতো। অতঃপর সত্যকে সত্য বলে চিনে নিতে লোকদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো না। তাদের দ্বিধা-সংকোচেরও কোনো প্রয়োজন দেখা দিত না।

বস্তুগত শক্তিও এই বিপদের অন্যতম দিক।

একথা সত্য যে, ইতিহাসের প্রতিটি জাহিলিয়াতই কোনো-না-কোনো প্রকারের বস্তুগত শক্তির সমর্থনপুষ্ট ছিল। আর তাগুতরা সে শক্তির সহায়তা ও আনুকূল্য নিয়ে মানুষের মনের ওপর আধিপত্য স্থাপন করত। এ কারণেই তাগুতের বলা কথাকে চূড়ান্ত ফয়সালা ও সর্ববাদী সমর্থিত মনে করে নেওয়া হতো এবং সে বিষয়ে কোনো আলোচনা বা বিতর্কের একবিন্দু অবকাশ দেওয়া হতো না। তার পিছনে থাকত যেমন ভয় তেমনি আগ্রহ। কোনোরূপ প্রতিরোধ বা বিরোধিতা ছাড়াই বা তার চিন্তা না করেই তার আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া হতো। তা সত্ত্বেও

প্রাচীন জাহিলিয়াতে বস্তুগত শক্তি ছিল কম ভয়াবহ ও কম মারাত্মক। সংগঠনের দিক দিয়েও তা এখন আজকের মতো সর্ববিধ্বংসী ছিল না।

আজ কেবল সম্পদের প্রাচুর্যই নেই, কেবল ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্রই নেই। আজ সেই সাথে রয়েছে সংবাদ পৌঁছানোর ও প্রচার করার ব্যাপক উপায় ও মাধ্যম। সংবাদপত্র, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন— এই সব প্রচার মাধ্যম একত্রিত হয়ে মানুষের মন ও মগজকে নির্দিষ্ট একটি দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে একাত্ম হয়ে লেগে আছে। এরই ফলে আজ লোকেরা বাতিলকেই হক (সত্য) বলে মনে করছে। আর 'সত্য'কে মনে করছে এক অচিন বা বিরল পাখী, বাস্তব দুনিয়ায় যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেননা মানব সমাজ যতই বিকৃত ও বিপথগামী হোক, তা সর্বতোভাবে বিকৃতির সমষ্টি হতে এমনটা অসম্ভব। হ্যাঁ, ব্যক্তি হয়ত এ রকম হতে পারে, সমস্ত খারাবি তার ওপর বিজয়ী হয়ে দাঁড়াতে পারে এমনভাবে যে,তাতে কল্যাণের একবিন্দু সম্ভাবনাও থাকবে না।

তবে মানব সমষ্টি সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা যায় না। তাতে সকল অবস্থায় কিছু না কিছু কল্যাণের দিক অবশ্যই থাকবে। আর মানবীয় মনের এই অবশিষ্ট সৌন্দর্যের কারণে নিকৃষ্টতম অবস্থায়ও প্রতিটি জাহিলিয়াতেই কোনো-না-কোনো বাহ্যিক কল্যাণ ও ভালো দিক অবশ্যই থাকবে। বাহ্যিক এজন্যে বলছি যে, তা কখনও সত্যের আশ্রয়গ্রহণ করে না। সঠিক পথেও তা উৎসারিত হয় না। এই কারণে এই বাহ্যিক সৌন্দর্য ও ভালো দিকও কার্যত বাস্তব জীবনে এসে প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বাহ্যিক সৌন্দর্যই লোকদের চক্ষুকে ঝলসিয়ে দেয় এবং তারা মনে করে— আমরা কোনো জাহিলিয়াতের মধ্যে নেই। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ -

তারা মনে মনে ধারণা করে যে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক। (সূরা আরাফ ঃ ৩০)

আধুনিক জাহিলিয়াতের এই মহা বিদ্রোহ মানুষের মধ্যে এই চরম মাত্রার ফিত্না ও বিপদ সৃষ্টি করেছে। তা আল্লাহ্র দ্বীন থেকে বিপথগামী হওয়ার তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা থেকেই সৃষ্ট। তাই লোকদের বিপথগামিতার অনুপাতেই তাগুতের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর এই কারণেই এ কালের মানুষ আল্লাহ্র পথ ও পন্থা থেকে অত্যধিক মাত্রায় বিপথগামী হয়ে পড়েছে। মানুষের গোটা ইতিহাসেও এর কোনো নজীর নেই। আর এই কারণেই একালের 'তাগুত' অতীতের সকল পর্যায়ের তাগুতদের তুলনায় অনেক বেশি ও উচ্চতর শক্তির অধিকারী হয়ে বসেছে।

মোটকথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তি ও সংগঠন এ যুগের বিশেষ নিদর্শন এবং এ যুগের প্রতিভার প্রকাশ মাধ্যম। এ সবই আজকের তাগুতের খেদমতে একান্তভাবে নিয়োজিত। একালের তাগুত মানুষকে বিপথগামী বানাবার লক্ষ্যে এগুলো পুরা মাত্রায় ব্যবহার করছে। আর এগুলোও স্বভাবতঃই তারই কাজ করে, যে এগুলোকে নিজের অধীন বানিয়ে নেয় ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ভবিষ্যতের মানব সমাজ মহান আল্লাহ্‌র দিকে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে এ সব উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম মানবীয় কল্যাণের পথে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করবে। তখনই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে সমস্ত মানব প্রজাতির।

আধুনিক জাহিলিয়াতকে পেয়ে যারা মত্ত ও উল্লসিত, তাদের চিন্তা করা উচিত যে, এই জাহিলিয়াত তাদের অবস্থা ও প্রকৃতিকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে। তাকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসও করেছে। প্রকৃত কল্যাণের সকল পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। আজকের জাহিলিয়াত মাত্র তাদের সম্মুখে যে কল্যাণ নিয়ে এসেছে (তাদের ধারণা অনুযায়ী)–যেমন জীবন-যাত্রার সুখ-সুবিধা; চিকিৎসাগত সামাজিক ও আদালতী সুবিধা যা কিছুই দিয়েছে, মূলত তা সবই তাম্রের কয়েকটা মুদ্রা মাত্র। তাগুত তা মানুষের সম্মুখে ছড়িয়ে দিয়েছে শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সে নিজেকে যেন রক্ষা করতে পারে মানুষের রোষ-আক্রোশের সর্বধ্বংসী আগুন থেকে। যেন জনতা সেগুলো লুটপাট করার মধ্যে মশগুল হয়ে থাকে। আর ওদিকে সে ভয়াবহ তাগুতী রাজত্বের সাথে সাথে জনগণের গর্দানের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কায়েম রাখার অবাধ ও নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে যায়। সে এমন কর্তৃত্ব, ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই।

একথা যদি একালের লোকেরা অনুধাবন করতে পারে, তা হলে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, তারা এক সর্বগ্রাসী ও মহাবিধ্বংসী জাহিলিয়াতের করালগ্রাসে পড়ে গেছে এবং এ জাহিলিয়াতকে অবশ্যই খতম করতে হবে, তাকে অবশ্যই খতম হতে হবে। অন্যথায় চূড়ান্ত ধ্বংস থেকে নিস্তার নেই।

পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে বর্তমান জাহিলিয়াতের সৃষ্টি নিম্নোদ্ধৃত দুই বিপর্যয় সম্পর্কে কথা বলব ঃ

চিন্তার ক্ষেত্রে বিপর্যয়।

বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয়।

চিন্তার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয়

আধুনিক জাহিলিয়াত চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়নি এমন একটি ক্ষেত্রও অবশিষ্ট নেই। মানুষের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা-কল্পনা, মন-মানসিকতা ও মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে চরম মাত্রায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে আল্লাহ্, বিশ্বলোক, জীবন ও স্বয়ং মানুষ থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে।

আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেছে প্রধান বিপর্যয়, সব চাইতে বড় রকমের বিপথগামিতা, সেই সাথে আল্লাহ্র সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটিও মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে।

বিশ্বলোক সম্পর্কিত ধারণা, তার সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক, তার সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

জীবন সম্পর্কিত ধারণা, বিশ্বলোকের সাথে জীবনের সম্পর্ক এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক ধরনের ভুলের সৃষ্টি করে দিয়েছে।

স্বয়ং মানব সত্তা সম্পর্কিত ধারণাও ঠিক থাকতে পারেনি। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক— ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে এবং নারী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গের সম্পর্কটিও সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে।

মোটকথা, বর্তমানের এই বিপর্যয় ও বিপথগামিতা মানুষের গোটা জীবনকেই সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছে।

পূর্বে যেমন বলেছি, আধুনিক জাহিলিয়াত প্রাচীন ইউরোপীয় সমস্ত জাহিলিয়াতের সারনির্যাস। ওপরন্তু তা গ্রীক, রোমান, মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াতের উত্তরাধিকার পেয়েও সমৃদ্ধ হয়েছে। ইহুদী ও তাদের অনুসারী অ-ইহুদী চিন্তাবিদদের চিন্তার ফল ও ফসল তার সাথে যোগ হয়েছে।

বস্তুত ইউরোপ মহান আল্লাহ্র নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্যতা (Reality) পর্যায়ে খুব বেশি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

এই বিভ্রান্তি যেমন দর্শনে ঘটেছে, তেমনি বিজ্ঞানে, তেমনি বাস্তব জীবনেও। আল্লাহ্র মূল সত্তা এবং তাঁকে নিরংকুশ এককত্ব— তওহীদ সম্পর্কিত ইউরোপীয় ধারণার বিকৃতি ও বিপর্যয় সম্পর্কে আমরা খুব বেশি কিছু বলার প্রয়োজন মনে করিনে। কেননা পুর্বে যেমন বলেছি— এ পর্যায়ে আমেরিকান লেখক ক্রিপার রচিত 'বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেনঃ

যে কনস্ট্যান্টাইন রোমান সম্রাজ্যের ওপর খ্রিস্ট ধর্ম চাপিয়ে দিয়েছিল, সে নিজেই নতুন আকীদার সাথে বিপুল পৌত্তলিক চিন্তা-ভাবনা শামিল করে দিয়েছিল। তার লক্ষ্য ছিল পৌত্তলিকদের সন্তুষ্ট করা। অবশ্য এ করে তার আশা ছিল যে, তারা এই নতুন ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করবে।

সত্য কথা হচ্ছে, মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় খ্রিস্ট ধর্ম এবং আধুনিক নাস্তিক ইউরোপ মস্তবড় ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এই ভুল ধারণায় উভয় যুগের খ্রিস্টানরা সম্পূর্ণ সমান।

আর সে ভুল ধারণা হচ্ছে, ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপার। বাস্তব জীবন ও সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

তাদের ধারণা হচ্ছে ঃ আকীদা যা-ই হোক না কেন, তার স্থান কেবল মানুষের মনের অভ্যন্তরে গভীর অনুভূতি ও স্বজ্ঞায়। বাস্তব জীবন যাত্রার সাথে এই আকীদার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। তা চলবে আকীদা থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ও বিচ্ছিন্নভাবে। বাস্তব জীবনের ওপর অন্তরে প্রচ্ছন্ন আকীদার কেননাপ্রভাবই প্রতিফলিত হবে না।

কিন্তু এটাই হচ্ছে জাহিলিয়াতের সবচাইতে মারাত্মক ধরনের ভুল ধারণা, একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রকল্প।

কেননা মূলত আকীদাই হলো জীবন; তা নির্ভুল ও সহীহ্ হোক, কিংবা তাতেই বিকৃতি প্রবেশ করে থাকুক। আকীদার প্রভাব পড়ে সমগ্র মানব জীবনের ওপর। চেতনার কোনো একদিক বা কোনো একটি কাজও তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। মানুষের জীবন জগতটা আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না কোনোক্রমেই।

অন্ধকার যুগে ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াতে ধর্ম ও বাস্তব জীবন—চেতনা ও কাজ এবং আকীদা ও আইন-বিধানের মধ্যে সৃষ্ট পার্থক্য ছিল এক বড় রকমের নির্বুদ্ধিতা। এই নির্বুদ্ধিতার কোনো তুলনাই নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্ম কি বাস্তব জীবন থেকে কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন হয়েছে কখনও ? না, তা কখনোই হয়নি। কার্যতঃ যা ঘটেছে, যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা হচ্ছে, বিকৃত আকীদা গোটা ইউরোপীয় জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে সব কিছুতেই বিকৃতি ও বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে ক্রমাগতভাবে, ধীরে ধীরে। আর শেষ পর্যন্ত গোটা জীবনই বিকৃতি ও বিপর্যয়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

অতীব সত্য ও অনস্বীকার্য সত্য কথা হচ্ছে, জীবন কখনোই আকীদা থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হতে পারে না।

আকীদা কি ?

নিছক অন্তরের অনুভূতি বা চেতনা-স্বজ্ঞারই নাম আকীদা নয়।

তা হচ্ছে স্তম্ভ— খুঁটি বিশেষ। জীবন সম্পর্কিত ধারণা তারই ওপর দাঁড়ায়। জীবনের বাস্তব সম্পর্কসমূহ গড়ে ওঠে তারই ভিত্তিতে। আকীদা হচ্ছে মানুষ ও বিশ্বলোকের সম্পর্ক কেন্দ্র। আকীদাই হচ্ছে মানব সত্তার কেন্দ্রবিন্দু, মানবীয় অস্তিত্বের যৌক্তিকতা।

সাদাসিধা মানুষের কাছে ধর্মটা হয়ত মনের একটা অনুভূতি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তা নয়। এই সাধারণ মানুষ হয়ত বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সব ব্যাপার বুঝতে অভ্যস্ত নয়। হয়ত জীবনের গভীরতায় পৌঁছে না সব খুঁটিনাটি ব্যাপার। কিন্তু তারা তাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্মীয় অনুভূতির সাহায্যে জীবন সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা (বা Stand) গ্রহণ করে। এই কারণেই তারা কিছু গ্রহণ করে, কিছু কিছু করে অগ্রাহ্য, বর্জন— গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সমস্ত জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্কতা নির্ধারণ করে একটা সুনির্দিষ্টরূপে। তাতে এই হৃদয়ানুভূতিই হয় তাদের প্রধান সহায়ক হাতিয়ার।

বস্তুত এই ধর্মই হচ্ছে সাদাসিধা মন-মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের জীবন পর্যায়ে গৃহীত একটি নির্দিষ্ট বোধ বা ধারণা। জীবনের একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রতিটি মানুষের মনেই জাগরূক রয়েছে।

জাহিলিয়াতের প্রভাবে পড়ে যারা মনে করে, জনগণের জীবন ও বাস্তবতায় ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ ও নিষপ্রভ, তারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই মনে করে যে, ধর্ম আসলেই বুঝি এরূপ। বাস্তবতার সাথে যার সম্পর্ক না থাকার মতোই। আর জীবনের বাস্তবতা ঝুকি এ রকমই আকীদা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তা স্বতন্ত্র এমন সব কার্যকারণের অধীন অতিবাহিত হচ্ছে, যার সাথে ধর্মের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

আসলে এই ধরনের ধারণাই হচ্ছে জাহিলিয়াতের ফলশ্রুতি। মানব সম্পর্কিত ধারণার বিকৃতির কারণেই এরূপ ধারণার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে।

জনজীবনের বাস্তবতায় ধর্মের প্রভাব যদি ক্ষীণ হয়ে পড়ে কখনও, তাহলে বুঝতে হবে, মানব মনে আকীদার বিকৃতি ঘটেছে। অনুরূপভাবে তার এ-ও অর্থ যে, জীবন সামগ্রিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলছে না। এটা অনিবার্যভাবে কোনো-না-কোনো ধরনের একটা বিকৃতি। কিছু দিন পরই তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রকাশ হবে। বিরাট ও ব্যাপক হয়ে দেখা দেবে।

জনগণের জীবনে ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার আরও একটি অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহ্‌র দাসত্ব করছে না, তবে ইবাদত ত্যাগ করেছে অথবা আল্লাহ্‌র ইবাদত ঠিক

যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে— সেই মানে ও ভাবধারায় হচ্ছে না, সে ইবাদত একান্তভাবে এক আল্লাহ্র জন্যে হচ্ছে না। তাঁর সাথে অন্যান্য 'খোদাকে' শরীক করা হচ্ছে। আর তারাই তাদের বাস্তব জীবনের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ জীবনের ওপর একমাত্র আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য হওয়া উচিত ছিল, উচিত ছিল সমগ্র জীবন আল্লাহ্র নির্ধারিত ও নির্দেশিত পথে চলা।

বস্তুত এ-ই হচ্ছে আকীদার ক্ষেত্রে প্রথম বিপর্যয়, বিকৃতি। বহুত্ববাদ সৃষ্টি এই বিপর্যয় ইতিহাসের সকল জাহিলিয়াতেই সমানভাবে বর্তমান। এই বহুত্ববাদী জাহিলিয়াত বা জাহিলিয়াতের এই বহুত্ববাদী লক্ষণের কারণেই বাস্তব জগতের ওপর আকীদার প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এই বহুত্ববাদের কারণেই আকীদায় অভিন্নতা ও পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। এই কারণে তার দিকও অভিন্ন থাকে না। আর এই বিশেষত্বের কারণে জাহিলিয়াত তার নিশ্চিত ও অনিবার্য ফল প্রকাশ করে। যদিও সে ফল খুব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। জনগণ খুব বিলম্বেই তা অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়।

বহুত্ববাদের কথিত ধারণা প্রথম পরিণতিতে মানুষের গোটা জীবন দুনিয়ায় দুটি খাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুটি ভিন্ন ভিন্ন সমান্তরাল পথে চলতে থাকে। তার একটি পথ যদি আল্লাহ্র দিকে চলে, তাহলে অন্যটি চলে আল্লাহ্র পথের বিপরীত দিকে— বাস্তব জীবনের দিকে। আর তারই ফলে মানব মনে মূল্যবোধের সংঘাত সৃষ্টি হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে। একটি মুল্যবোধ আল্লাহ্র পথমুখী হওয়ার কারণে অতীব উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন হয়। আর অপরটি বাস্তব জীবনের দিকে নিম্নমুখী এবং আল্লাহ্র প্রদত্ত পথ থেকে বিপরীতগামী। দ্বিতীয়টি আল্লাহ্র কাছে নিষিদ্ধ। যদিও বাস্তব জীবনে তা জরুরী। আর প্রথমটি আল্লাহ্র কাছে অতীব কাম্য, কাঙ্ক্ষিত ও প্রার্থিত। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা অকেজো, অব্যবহৃত।

এই দ্বৈত বিভক্তির কারণে মানুষের চেতনা ও মন-মানসিকতা ছিন্নভিন্ন ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, যদিও তা অনুভব করা সম্ভব হয় অনেক কাল পরে।

এরই ফলে বাস্তব জীবন আকীদার আলোকরশ্মি থেকে দূরে সরে যায়। অথবা বলা যায়, এক আল্লাহ্র পরিবর্তে নবতর বহু খোদা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আর তাতে আল্লাহ্র পথের সাথে একবিন্দু সংযোগ থাকে না। ফলে গোটা পৃথিবীই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

অপরদিকে বাস্তব জীবন খাহেশাত— লালসা-কামনা-বাসনার অধীন চলতে থাকে। এরই দরুন তাগুতের আধিপত্যের অধীনে এবং ফলতঃ কামনা-বাসনা-লালসার অধীন হয়ে পড়ে। লালসার একচ্ছত্র রাজত্ব সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে দেখা দেয় বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়। আর তার শেষ পরিণতি ঘটে চূড়ান্ত ধ্বংসে। তখন

আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থান হয়ে পড়ে গৌণ, গুরুত্বহীন। আর অপরাপর 'খোদা'গণ মানব জীবনের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে সওয়ার হয়ে বসে।

আর এটাই হচ্ছে ইউরোপের ইতিহাস। ইউরোপের বাস্তব চিত্র। ইউরোপের এ দীর্ঘ ইতিহাস বহু শতাব্দী পরিব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ। এ ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল ধর্মকে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা থেকে। এরপর রেনেসাঁর যুগ আসে। তার ফলে ধর্ম ও জীবনের মধ্যকার দূরত্ব অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

মধ্যযুগের জাহিলিয়াতে ইউরোপ হযরত ঈসা (আ)-এর কথাটি যথাযথ অর্থে বুঝতে পারেনি। তাঁর কথাঃ 'কাইজারের যা তা কাইজারকে দাও আর আল্লাহ্‌র জন্যে যা তা আল্লাহ্‌কে দাও'। (ইনজীল-মথি ২২-২১ স্তোত্র) তাঁর সম্পর্কিত এ কথাটিও তারা বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষমই রয়েছে। কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ –

এবং আমি আমার সম্মুখবর্তী তওরাতের সত্যতা ঘোষণা প্রতিষ্ঠাকারী এবং আমি হালাল ঘোষণা করব তোমাদের জন্যে এমন কিছু জিনিস, যা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছিল। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫০)

আল্লাহ্‌র হেদায়েত থেকে বিভ্রান্ত হওয়ার কতগুলো ঐতিহাসিক কারণ থাকতে পারে। প্রাচ্যবিদ ও নও-মুসলিম লিওপো মুহাম্মদ আসাদ তাঁর Islam at the cross road নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ খ্রিস্ট ধর্ম রোমান আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সেই বিরাট সাম্রাজ্যের ওপর তেমন কোনো প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল না। সেখানে ধর্ম শুধু প্রকাশমান বাহ্যিক, অন্তঃসারশূন্য। তৃতীয় শতাব্দীতে কনস্ট্যান্টাইন যখন খ্রিস্ট ধর্মকে সরকারী বা রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিল, তখনও শুধু আকীদা হিসেবেই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করা হয়েছিল। খ্রিস্টীয় আইনের কোনো প্রশ্ন ছিল না। বরং অনেক সময় আকীদা ও রোমান মূর্তিপূজার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যেত, খ্রিস্টীয় আইন জারী হওয়া তো দূরের কথা। এতসব সত্ত্বেও লোকদের মধ্যে নিজেদের আকীদার ব্যাপারে কিছু-না-কিছু প্রীতি ও চেতনা ছিল। তাদের মনে-মগজে একথা বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল যে, আল্লাহ্‌ কিংবা ইলাহ মানুষের জন্যে কল্যাণকামী নয়। মানুষ তাঁর মারেফাত লাভ করুক, তা-ও তিনি চান না। মানুষকে এই মারেফাত আল্লাহ বা ইলাহর কাছ থেকে জোর করে কেড়ে আনতে হয়।

'রেনেসাঁ'র পর মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়ে গেল। আকীদার দিকে আকর্ষণ কেন্দ্র ফিরে এলো না। নতুন আন্দোলন প্রাচীন হেলেনীয়বাদ থেকে চিন্তা ও ধারণা গ্রহণ করতে শুরু করে দিল। আর নতুনভাবে ও ধীরে ধীরে তা গোটা জীবনের ওপর প্রভাবশালী হয়ে উঠলো।

এই সময় আকর্ষণ কেন্দ্র আল্লাহ্‌র পরিবর্তে হয়ে উঠল অসংখ্য ইলাহ।

তার বড় দুটি কারণ ছিল। একটি চেতনা ও চিন্তার সুস্পষ্ট আর দ্বিতীয়টি প্রচ্ছন্নতার গভীর তলায়।

বাহ্যিক কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে গীর্জার যুদ্ধের মাধ্যমে। আর আন্দোলন ও বিবর্তনের তাৎপর্যও প্রকাশমান হয়ে পড়ল। তার অন্ধ অনুসরণের আধিপত্যের ওপর ভয় ছিল যে, তা বিজ্ঞানকে তার যথার্থ স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তার পরিবর্তে অপর একটি প্রতিনিধি স্থলাভিষিক্ত হবে, যেন গীর্জা তার স্থান থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। অতঃপর যখন বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশ শুরু হলো, তা স্বভাবতঃই গীর্জার শত্রু ও প্রতিপক্ষ হয়ে উঠল। অন্ততঃ তার কর্তৃত্বের বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। যেমন চিন্তা ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছিল। কেননা তা যেমন আন্দোলন, তেমনি বিবর্তন। শেষকাল অবধি অবস্থার প্রতিষ্ঠায় গীর্জার ইচ্ছা সংকল্পের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

চিন্তা ও সভ্যতার অভ্যুদয় গোটা বাস্তব জীবনের ওপর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা তা স্বাভাবিকভাবেই জমিনের বাস্তবতা ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংযুক্ত। আর গীর্জা যতদিন থাকবে, এ অভ্যুদয় ততদিন জোরদার হতে পারবে না, তার সাথে সহযোগিতাও করবে না। গীর্জা ছিল ধর্মের প্রতীক। এই কারণে বাস্তব জীবনধারা ও এই ধর্মের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়া অব্যাহত থাকা এই অবস্থার মধ্যে নিতান্তই অবধারিত ব্যাপার ছিল।

এই সময়টা ছিল গোটা অবস্থাকে ঠিকঠাক করার জন্যে অতীব উপযুক্ত ক্ষণ। আর সর্বাত্মক জাহিলিয়াতের আওতা থেকে বের হয়ে মহান আল্লাহ্‌র সত্য সঠিক দ্বীনের দিকে চলে আসারও উপযুক্ত সময় এটাই ছিল। কিন্তু ইউরোপ— পূর্বে যেমন বলেছি— এই উপযুক্ত সময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসল। ক্রুশকেন্দ্রিক বিজয়ী ভাবধারাই ছিল এর প্রধান কারণ। ফলে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঞ্চয় গ্রহণ করল, নিয়ে নিল তাদের এ ক্ষেত্রের পরীক্ষা পদ্ধতি এবং তাদের সভ্যতার বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু খোদায়ী জীবন পদ্ধতিগ্রহণ করতে অস্বীকার করল। অথচ তারই ওপর নির্ভরশীল গোটা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা। ফলে রেনেসাঁর অভ্যুদয় প্রথম মুহূর্ত থেকেই আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী হয়ে উঠল সম্পূর্ণরূপে। এটাই হচ্ছে বাহ্যিক কারণ।

আর প্রচ্ছন্ন কারণটি হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক জাহিলিয়াত থেকে পাওয়া দুঃখজনক উত্তরাধিকার। তা-ই ইউরোপীয় জনগণের মনের গভীরে হেলেনীয় ভাবধারার সৃষ্টি করেছিল। সে হচ্ছে আগুন-চোর প্রোমিথিউস।

আধুনিক ইউরোপের মানুষের এটাই হচ্ছে পরিচিতি ও রূপ। এ কিংবদন্তী বা

পৌরাণিক কাহিনী ইউরোপীয় লোকদের মনে ও চরিত্রে তার পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে দিয়েছে। তা-ই তাদের এমন বানিয়ে দিয়েছে যে, তারা জ্ঞান অর্জন করে আর সেই সাথে অনুভব করে আল্লাহ্‌র প্রতি তীব্র শত্রুতা ও প্রতিহিংসা।

এই পৌরাণিক কাহিনী এবং অনুরূপ আরও অনেক কিছু তাদের চিন্তা-চেতনায় এই ভাবধারা ঢুকিয়ে বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, আল্লাহ্ কিংবা খোদাগণ— মানুষের জন্যে কিছুমাত্র কল্যাণ চায় না। আর বিশেষ করে মানুষ জ্ঞান আহরণ করুক, তা আদৌ পছন্দ করে না। মানুষ তো জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ্‌র কিংবা খোদাগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অর্জন করছে। আর অসন্তুষ্টি ও শত্রুতার ভিত্তিতেই কল্যাণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

জুলিয়ান হাক্সলী তাঁর 'আধুনিক জগতের মানুষ' নামক গ্রন্থে যেমন লিখেছেনঃ শুধু মুর্খতা ও অক্ষমতাই মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে নত বানায়। তাই মানুষের জ্ঞানের পরিধি ও তার শক্তি বৃদ্ধি পেলে তখন আর আল্লাহ্‌কে মেনে নেওয়ার বা তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করার কোনোই কারণ অবশিষ্ট থাকে না। ইবাদত করে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা রক্ষারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বরং তখন স্বয়ং মানুষই আল্লাহ্ হয়ে বসে।

ব্যাপারসমূহ এই অবস্থা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থার দরুন হঠাৎ করে পৌঁছতে পারেনি। কেননা মানব প্রকৃতিই এমন যে, তা খুব ধীরে ও বিলম্বেই পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে আকীদার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনে তো যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে থাকে। এজন্যে দীর্ঘ সময় ও যুগের পর যুগের প্রয়োজন হয়।

মধ্যম পর্যায়ে আল্লাহ্‌র দাসত্বের পরিবর্তে প্রকৃতির দাসত্ব শুরু হয়। আসলে প্রকৃতি পূজা ছিল গীর্জার খোদার পূজা থেকে বাঁচার একটা উপায় মাত্র। কেননা গীর্জা তো তার নামে মানুষকে দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছিল। তাদের ওপর ধার্য করেছিল অনেক প্রকারের করো, শুল্ক ও অর্থদানের দায়-দায়িত্ব এবং গীর্জার জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের বাধ্যবাধকতা, চাপিয়ে ছিল গীর্জার সেনাবাহিনীতে কাজ করার অপরিহার্যতা। ধর্মীয় ব্যক্তিদের— পাদ্রী-পুরোহিতদের দাসানুদাস হওয়ার অপমান ও লাঞ্ছনা আর প্রকৃতি ছিল এমন এক খোদা, যার কোনো গীর্জা ছিল না, ছিল না চাপিয়ে দেওয়া দায়-দায়িত্ব ও নানাবিধ বাধ্যবাধকতা। এই নতুন খোদা মানব প্রকৃতির চাহিদারও তৃপ্তিদান করছিল। কেননা কোনো-না-কোনো খোদার সম্মুখে আত্মসমর্পণ তো ছিল মানব প্রকৃতির— একটি অপরিহার্য দাবি ও তাগিদ। আর তা তাদের উদ্দেশ্যের পরিপূরক ছিল। কেননা মানুষ গীর্জার খোদা ও গীর্জয় ধর্মের প্রতিপত্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল যা তাদের ওপর দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে চেপে বসেছিল।

যে সময়ে প্রকৃতির দেবতাদের পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপের লোকদের হৃদয়ে আল্লাহ্ও মওজুদ ছিলেন। তারা ঐকান্তিক একাকীত্বে ও নিবিড় নিভৃতে তাঁরই দিকে মনোযোগী হতো, গীর্জায় তাঁরই ইবাদত করত। আর কম বেশি নিজেদের ধর্মীয় নৈতিকতা ও ঐতিহ্যের ওপরও দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এই সবকিছুই ছিল নিতান্ত অভ্যাসবশতঃ ঈমানী শক্তির তাগিদে তা হচ্ছিল না।

এভাবে খোদাদের সংখ্যা বিপুল হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কও অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ল।

গীর্জায় যখন উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়, তখন আল্লাহ্র সত্তাই হতো প্রিয়তর, তাঁকেই ভয় করা হতো। অথবা নামাযের বাইরে জীবনের অপর কোনো মুহূর্তে আল্লাহ্কেই মালিক মনে করা হতো।

আর যখন শিল্পগত চেতনার ব্যাপার দেখা দিত, তখন প্রকৃতিই হতো প্রিয়তর, ভয় তাকেই করা হতো। কেননা রোমান্টিকতার আন্দোলন প্রকৃতিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। গোটা কাজ প্রতিভা ও তজ্জনিত অনুষ্ঠানাদি তাকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রগতিতেও প্রকৃতিই চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির এমন নিয়ম আয়ত্ত করেছিল, যার ভিত্তিতে গোটা বিশ্বলোক আবর্তিত হচ্ছিল। এসব প্রাকৃতিক আইন বা নিয়মে মতপার্থক্যের কোনো অবকাশ ছিল না বিবেক-বুদ্ধির দৃষ্টিতে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির দৃষ্টিতেও তাতে কোনো মতবিরোধ ছিল না, যা এসব নিয়ম ও আইন উদ্ঘাটন করেছিল।

এদিকে রাষ্ট্র-সরকার ও তার আইন-কানুন ছিল তৃতীয় খোদা। জনগণ অত্যন্ত আগ্রহ-উৎসাহ সহকারেই অথবা বাধ্যবাধকতা সহকারে যে সব আইন-কানুন মেনে চলছিল, তার আধিপত্য ও কর্তৃত্বের অধীনতার কাছে তারা আত্মসমর্পন করছিল ঠিক যেমন আত্মসমর্পণ করতে হয় আল্লাহ্র কাছে।

এভাবে একই ধর্ম তিন খোদার মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ মধ্যযুগে ছিল দুই খোদা। তাদের একজন আকীদা'র দিক দিয়ে খোদা, অপরজন আইন-বিধান প্রদাতা খোদা। তাতে আকীদা ও শরীয়াতের বিচ্ছিন্নতাই ছিল ভিত্তি এবং প্রতিটিই তার অধীনত্বের ওপর কর্তৃত্ব করত।

অতঃপর ধীরে ধীরে অপর একটি পরিবর্তন সংঘটিত হলো।

আল্লাহ্ সমগ্র ইউরোপীয়দের অন্তর থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেলেন। লোকদের চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণের ওপর আল্লাহ্র প্রভাব হ্রাস প্রাপ্ত হল। আল্লাহ্র স্থান দখল করে নিল স্বয়ং মানুষ। জায়গীরদারী বা সামান্তবাদ খতম হয়ে গেল।

অতঃপর যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হলো। সেই সাথে চিন্তা-চেতনা ও ধারণা-বিশ্বাসেও বিপ্লব সূচিত হল।

এ জাহিলিয়াতে শিল্প বিপ্লব ঘটলো যখন, তখন আল্লাহ্‌র ইবাদত নিতান্তই বাহ্যিকভাবে হচ্ছিল। এ বিপ্লব জাহিলিয়াতের সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি কবুল করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তা জাহিলিয়াতকে নতুন পথ দেখাল, শক্তি ও গতিদান করল।

একদিকে গ্রাম্য জনতার মনের আবেগ আল্লাহ্‌র সাথে থাকলেও, তাঁর ইবাদত করতে থাকলেও অন্যান্য খোদাগণের সাথে শিরক করে যাচ্ছিল। কোনো তারা ফসল উৎপাদক, ফল-ফাক্‌ড়া প্রদাতা এবং বিপদাপদ ও ধ্বংস থেকে পৃথিবীকে রক্ষাকারী আল্লাহ্‌কেই মনে করত।

কিন্তু অপরদিকে নগরবাসী লোকেরা ছিল কল-কারখানায় পণ্য উৎপাদনে মশগুল। আর সে কাজটি তো আল্লাহ্ করত না। তাই সামগ্রিকভাবে জাহিলিয়াত শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে খোদাহীন হয়ে পড়ল। খোদার প্রতি তেমন কোনো সম্পর্কের তাগিদ তারা বোধ করত না।

শিল্প বিপ্লবে লোকদের ধারণা ছিল, শিল্পোৎপাদন আল্লাহ্ করেন না, করে মানুষ নিজেরা। মানুষ নিজেরাই নিজেদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বলে বস্তুর বিশেষত্ব জানতে ও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ নিজেরাই যন্ত্র চালনা করে, আবার ইচ্ছামত নিজেরাই তা থামায়, তারাই একদিকে কাঁচামাল ঢেলে দেয় এবং অপাদিক থেকে পূর্ণ গঠিত পণ্য (Finished good) বের করে আনে।

এ কারণে এক্ষণে শিল্পোৎপাদনকারী মানুষেরই ইবাদত উত্তম বিবেচিত হলো, আল্লাহ্‌র ইবাদতের কোনো প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করতে পারল না।

আর এই সময় কালেই প্রকৃতি তার সমস্ত যাদু-প্রভাব ও খোদায়ী ভাব-গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলল। জনমনে তার কোনো শক্তি মোহ অবশিষ্ট থাকল না। কেননা একদিকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে প্রকৃতি চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু থাকল না, রোমান্টিকতার পর্যায়ে যেমন ছিল। এ সময়ে বাস্তব অবস্থান দৃষ্টিকোণে মানুষই হয়ে দাঁড়াল নবতর খোদা।

অপরদিকে প্রকৃতির অনেক গোপন গূঢ় তত্ত্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনের মাধ্যমে। এই সময় তার ওপর মানুষের প্রতিপত্তিও বেড়ে গেল। ফলে মানুষের ওপর প্রকৃতির প্রাধান্য তেমন আর থাকল না।

এই কারণে খোদায়ী মর্যাদা আল্লাহ্ ও প্রকৃতি উভয় থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মানুষে এসে কেন্দ্রীভূত হলো।

এই অবকাশে মানুষ বলে উঠল আল্লাহ্‌র ইবাদত মানুষের জন্যে লজ্জাজনক।

যে শক্তি অপ্রকাশ্য, প্রচ্ছন্ন, যা ইন্দ্রিয়ানুভূত নয়, তার ইবাদত করা মানুষের পক্ষে খুবই লজ্জার বিষয়। এই অদৃশ্য গায়েবী শক্তির— যাকে কোনো দিন দেখা যায়নি, কোনো দিনই দেখা যাবে না, দেখা যেতে পারে না— তার কাছ থেকে মানুষ তার নৈতিকতা, চিন্তা, বিশ্বাস, আচরণ ও মান্যতা গ্রহণ করবে, তাও তার জন্যে শোভন হতে পারে না। মানুষের জন্যে আইন বানাবে কোনো পৌরাণিক শক্তি, যার কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, আর মানুষ অন্ধভাবে তার দেওয়া আইন বিধান মেনে চলবে, কোনো আলোচনা বা প্রতিবাদ করারও সুযোগ থাকবে না, তার কোনো সমালোচনা করা যাবে না, তার বিরুদ্ধে সে নিজের মত প্রকাশ করতে পারবে না, শুধু এইজন্যে যে, তা অবতীর্ণ হওয়া বিধান, এক পৌরাণিক জগৎ থেকে তা অবতীর্ণ হয়েছে— এটা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

মানুষ এক্ষণে এসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। আর মূর্খতার যুগে সে যা করত, তা এই জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোকোদ্ভাসিত যুগে করা কিছুতেই শোভা পায় না, আগে যে দুর্বল, অক্ষম ছিল, তার চতুষপার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রকৃতির কোনো নিগূঢ় তত্ত্বই তাদের জানা ছিল না, পরিবেশ ও প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব করার কোনো ক্ষমতাই তখন তাদের ছিল না। তখন যে খোদার তারা ইবাদত করত, এখনও সেই খোদার ইবাদত করা তাদের জন্যে কিছুতেই শোভা পেতে পারে না। তখন আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ বা আল্লাহর আদেশাবলী পালন করা তার পক্ষে আওয়াজ বুলন্দ করা মানুষের পক্ষে উচিত হতে পারে না।

এখন তো মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি জিনিসের যাচাই পরখ করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির মানদণ্ডে। এর ফলে যা তার বিবেক-বুদ্ধিসম্মত প্রমাণিত হবে, তাকে সত্য ও সঠিক বলে গ্রহণ করা, তাকে কার্যকর করা কর্তব্য। আরা যা তার বিপরীত হবে তাকে বাতিল ও পৌরাণিক কিস্‌সা কাহিনী মনে করে প্রত্যাখ্যান করাই তার জন্যে বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে মানুষের নিজেরই হওয়া উচিত নিজের জন্যে আইন বিধানের রচয়িতা। সে নিজেই নিজের জন্যে আইন প্রণয়ন করবে। সে নিজের প্রয়োজন ও তার বিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় খোদার তুলনায় অনেক বেশি অবহিত। কেননা সে 'খোদার' কাছে অবস্থা পূর্ববতই রয়েছে। নিতান্তই অপরিবর্তিত হয়ে।

বাঞ্ছনীয় হচ্ছে মানুষ নিজেই নিজের জীবনকে গড়বে। এ ব্যাপারে অন্য কাউকেই তার সাথে শরীক না করা।[১]

---

১. সমকালীন আমেরিকান গ্রন্থকার জর্দান ভুশায়েল্দ লিখিত বই Man makes himself দ্রষ্টব্য।

অতঃপর বিকৃতি ও বিপর্যয় আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গেল। সেই সাথে খোদ মানুষের দাসত্ব ও পূজার ব্যাপারটিও অন্তর্হিত ও বিলীন হয়ে গেল।

বর্তমান জাহিলিয়াতের শীর্ষে অবস্থিত এই সর্বশেষ পর্যায় সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করার পূর্বে এসব জাহিলিয়াতের অবশিষ্ট নির্দেশাবলী চিহ্নিত করা আবশ্যক, যার দরুন খোদায়ী নিগুঢ় তত্ত্ব পর্যায়ে ধারণা, বিশ্বাস এই ব্যাপক বিস্তৃতি ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

গ্রীক জাহিলিয়াতের নিদর্শন হচ্ছে তা মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উচ্চ প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজও তা অবশিষ্ট রয়েছে।

রোমান জাহিলিয়াতের নিদর্শন হচ্ছে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন এবং ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য জিনিসকে অস্তিত্বহীন মনে করা। আল্লাহ্ যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, এ কারণে তাঁর প্রতি ঈমানের কোনো প্রয়োজন নেই, তার প্রতি ঈমান না আনাই উত্তম এবং জরুরী।

গ্রীক জাহিলিয়াত নতুন বেশে আবার সম্মুখে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তা আজও বিবেক-বুদ্ধিকে পবিত্রতার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে রেখেছে। যেন তা সেই আল্লাহ্ হয়ে বসতে পারে যিনি ওহীর ভিত্তিতে হুকুমত করেন। বরং সেই বিবেক-বুদ্ধি নিজেই ইলাহ হতে পারে যখন তা ইচ্ছা করবে।

এই গ্রীক জাহিলিয়াত পুনরায় মানুষ ও আল্লাহ্— এই দুয়ের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সৃষ্টি করেছে।

রেনেসাঁর প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ্ই যখন মা'বুদ ছিলেন, তখন মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ছিল। মানুষ যদিও মূর্খতা ও দুর্বলতার কারণে আল্লাহ্‌র অনুগত হতো। পরে সে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান দক্ষতা অর্জন করল এবং শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠল, তার নিজের দৃষ্টিতে সে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হল। আর তার ধারণায় খোদার মর্যাদা অনেক নীচু ও হীন হয়ে গেল। আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবৃদ্ধি লাভে সে-ও উচ্চে ওঠে গেল। আর খোদার নিম্নগামিতা বৃদ্ধি পেল।

শেষ পর্যন্ত বর্তমান সময়ে মানুষ নিজেই 'জীবন' সৃষ্টি করে। ফলে সে-ই 'আল্লাহ্' হয়ে গেছে।

বিশ্ব প্রকৃতি যখন আল্লাহ্‌র সাথে সাথে মা'বুদ হয়েছিল, তখন দ্বন্দ্বটা ছিল মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। মানুষ প্রকৃতির ক্রোধ-আক্রোশের মোকাবিলা করত। প্রকৃতি নিহিত বিপুল তত্ত্ব ও শক্তি আয়ত্ত করে নিত। যেমন প্রাচীন প্রোমিথিউস্ করেছিল।

অতঃপর মানুষই যখন মা'বুদ হয়ে বসল, তখন এই দুঃখজনক দ্বন্দ্বটা মানুষ ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিকভাবে দাঁড়িয়ে গেল। একদিকে পূজাকারী মানুষ আর

অপরদিকে পূজ্য ও পূজিত মানুষ। এ সময়ে মানুষে মানুষে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো, তা ব্যক্তির সাথে সমষ্টির এবং ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের সমতুল্য। ব্যক্তির সাথে দ্বন্দ্ব তার সমাজ সমষ্টিতে বিজয়ী ও প্রভাবশালী মূল্যমানের সাথে। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তির সাথে স্বয়ং তার ব্যক্তিগত শক্তিসমূহের সাথে এবং তা মানুষের নিজের বেষ্টনীর অভ্যন্তরেই অবস্থিত।

এই সর্বশেষ দ্বন্দ্ব মানুষে মানুষে পারস্পরিক, তা-ই মানুষের পূজা-উপাসনা বা দাসত্বের অবসান ঘটিয়েছে।

মানুষ সব সময়ই তার সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অহংকারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এবং তার আনুগত্য না করার ওপর শক্ত হয়ে থাকা সত্ত্বেও সে আবিষ্কার করল যে, এই পৃথিবীতে প্রকৃত খোদা বলতে কেউ নেই। বরং এখানে আছে অন্যান্য অনেক খোদা। মানুষের ইতিহাসে মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব ধারা পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানুষই এই তত্ত্ব আবিষ্কার করল যে, এখানে রয়েছে অসংখ্য নিশ্চিত ব্যাপারাদি, কতগুলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আর তা হচ্ছে, অর্থনৈতিক চূড়ান্ততা, সামাজিক সামষ্টিক চূড়ান্ততা, ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা। এই সব কয়টি নিশ্চয়তাই মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

এগুলো সুনিশ্চিত মূল্যমান, তা প্রত্যাহার বা প্রতিরোধ করা যায় না। এ মূল্যমান সবসময়ই মানুষের জীবনের ওপর প্রভাবশালী হয়ে থাকে। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এর ওপর খাটে না।

কার্ল মার্কস বলেনঃ "সামষ্টিক ফলাফল যা মানুষ ভোগ করতে বাধ্য হয়, তা খুবই সীমিত সম্পর্ক বিশেষ। তা মানুষের জন্যে অপরিহার্য। তাতে মানুষের ইচ্ছারও কোনো দখল নেই। তাই মানুষের বস্তুগত জীবনে উৎপাদন পদ্ধতিই হচ্ছে এমন শক্তি যা জীবনের সামাজিক, সামষ্টিক, রাজনৈতিক ও ভাবগত দিকগুলোকে রূপায়িত করে। মানুষের নিজস্ব চেতনা এগুলোর অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করে না বরং এগুলোর অস্তিত্বই মানুষের চিন্তা-চেতনা নির্ধারণ করে।"

এ্যাঞ্জেল্স বলেন ঃ বস্তুগত মতাদর্শের সূচনা এখান থেকে হয় যে, উৎপাদন সকল সামষ্টিক জীবনের ভিত্তি। অর্থাৎ মৌলিক পরিবর্তন যাই হবে, উৎপাদন পদ্ধতিই হবে তার কারণ। লোকদের বিবেক-বুদ্ধি বা সত্য ও ন্যায়পরতার অনুসন্ধান।

মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে তা আলোচ্য বা বিবেচ্য নয়। এই পর্যায়ে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোনো অবকাশ নেই। উৎপাদন কাজ এবং উৎপাদন দ্রব্যের বিনিময়ই আসল নিয়ামক।

এমনিভাবে নিশ্চিন্ততার এই দেবতারাই মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং সত্য ও ন্যায়পরতার প্রতি দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার তাদের স্বভাবগত যোগ্যতার প্রতি কোনো দৃষ্টি না দিয়েই জনগণের জীবনকে নিজস্ব রঙ্গে রঙ্গিন করে দেয়। এগুলো এমন দেবতা যা মানুষের মনের ডাকে কোনোই সাড়া দেয় না, তাদের মনের সাথে আনুকূল্য স্থাপন করেও চলে না। যেমন করে আল্লাহ্ মানুষের চেতনায় সাড়া দেন, তাদের মন রক্ষা করে কাজ করেন। প্রাথমিক জাহিলিয়াতের দেবতাগুলো এ জাহিলিয়াতসমূহের বিপথগামিতা ও মানুষের সাথে তার পাশবিক দ্বন্দ্ব ঝগড়া থাকা সত্ত্বেও সেদিকে অনেকটা লক্ষ্য রেখে চলত।

কিন্তু বর্তমান জাহিলিয়াতের দেবতা স্বীয় স্বৈর বন্ধনে মানুষকে যন্ত্রের একটা নিষপ্রাণ অংশের ন্যায় শক্ত করে বেঁধে রাখে। ফলে সে এই সমাজ যন্ত্রের গতির সাথে একটি অংশের ন্যায় তাল রেখে চলতে একান্তভাবে বাধ্য হয়।

এভাবে মানুষ স্বীয় ইবাদতে চরম অধঃপতনের নিম্নতম পংকের দিকে নেমে গেল। প্রথমে যদি অন্যান্য খোদাগণের সাথে শিরক সহকারে এক আল্লাহ্র ইবাদত হতো, এখন তা প্রকৃতির দাসত্ব ও পূজার দিকে চলে এলো। পরে এই প্রকৃতি পূজা থেকে নেমে এলো তার নিজের পূজা ও দাসত্বের দিকে। মানুষ মানুষের পূজা ও দাসত্ব করেছে। আর তার ফলে ধ্বংসাত্মক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ সেই সব দেবতার পূজা ও উপাসনা করতে বাধ্য হয় যারা জালিম, নিষ্প্রাণ ও মানুষকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে। এদের হাতে নিশ্চয়তা বা নিয়তির কঠোরতা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই নেই।

এই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত এবং এর মতো খারাপ ও মারাত্মক জিনিস আর কিছুই হয় না।

এই সব পতনের পিছনে কোনো যুক্তি নেই, নেই দূরদৃষ্টি, নেই কোনো সনদ। কেননা আল্লাহ্র সাথে শিরক-এর বিপর্যয় যখন শুরু হল, তখনও তার কোনো মুক্তি ছিল না, কোনো সনদও ছিল না।

বস্তুত যে লোক যথার্থ ও নির্ভুলভাবে আল্লাহ্কে জানতে ও চিনতে পারে, তার পক্ষে তাঁর সাথে কোনো ধরনের শিরক চিন্তা করা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু ইউরোপ যেহেতু রোমান পৌত্তলিকতা মিশ্রিত আকীদা গ্রহণ করেছিল কনস্টান্টাইন সম্রাটের কাছ থেকে, এই কারণে তারা আল্লাহ্কে যথার্থ উচ্চতর মর্যাদার দৃষ্টিতে চিনতে ও জানতে পারেনি। তারা জাহিলিয়াতের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে থাকল এবং এ জাহিলিয়াতের গ্রাস ক্রমবর্ধমান হল।

জনৈক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ শরীয়ত যেহেতু রোমান সম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত-ক্ষুদ্র অংশে

প্রকাশমান হয়েছিল, এই কারণে ইউরোপের এত বিশাল বড় সাম্রাজ্যে তা কার্যকর করা সম্ভবপর ছিল না।

এই মত থেকে মূল ব্যাপারের বহু কয়টি দিকের মধ্যে একটি মাত্র দিক উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু অপর এক মহাসত্যকে আচ্ছন্ন করেই রাখে। আর সে সত্য হচ্ছে, স্বয়ং সেই খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মূল আকীদা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে স্থান পায়নি। যদি তা বাস্তবিকই নির্ভুল ও নির্দোষ থাকত, তাহলে রোমান আধিপত্য তার পথ রোধ করতে পারত না। যেমন করে আরব উপদ্বীপ ও তার বাইরের জাহিলিয়াতের শক্তিসমূহ ইসলামী শক্তির সম্মুখে মুহূর্তের তরেও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এই বাইরের শক্তিসমূহের মধ্যে ছিল সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য, পার্শ্ববর্তী পারসিক সাম্রাজ্য। সে যা-ই হোক। এই সমস্ত কারণ অবস্থার একটা ব্যাখ্যা তো দেয় বটে, কিন্তু তার পক্ষ সমর্থন করে না। দুনিয়ার কোনো জিনিসই আল্লাহ্ থেকে বিপথগামিতাকে সমর্থন দিতে পারে না।

মূলত এই মৌলিক বিকৃতিই সকল প্রকার বিপর্যয়ের অগ্রবর্তীর কারণ। মনে যদি শিরক গ্রহণের অবকাশ থেকে থাকে, তাহলে সে শিরক গ্রহণের পর সব কিছুই সহজ হয়ে যায়। আর এই বিপর্যয়ও যখন শুরু হয়ে যায়, তখন সেই পথটাই নিয়ে আসে পতনের পর পতন এবং অধিকতর বিপর্যয়।

ইউরোপের সূচনাটাই হয়েছে অত্যন্ত ভুলভাবে। পরে ক্রমশই তা আল্লাহ্র হেদায়েত থেকে দূরে— বহুদূরে সরে যেতে থাকে অব্যাহতভাবে। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে সে দূরত্ব অনেক দীর্ঘ হতেও দীর্ঘতর হতে থাকল।

গীর্জা যখন নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে সমস্ত খারাবি ও বিপর্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিল (যে বিষয়ে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করে এসেছি), তখন ইউরোপের লোকদের আকীদায় এক নতুন বিকৃতি সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দিল। আর তাই ক্রমাগতভাবে দীর্ঘ পরিক্রমার পরিণতিতে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত পর্যন্ত এসে ঠেকিয়ে যোগ করে দিল।

এটাও এক ধরনের ব্যাখ্যা বটে! কিন্তু তা-ও তাকে কোনো সমর্থন দিচ্ছে না। কেননা ইউরোপীয়রা আগে থেকেই মনে করত যে, গীর্জা যাই পেশ করে, তা প্রকৃত ধর্ম নয়। তা পাদ্রী-পুরোহিতদের নিজেদের মনগড়া কথাবার্তা, তাদের নিজেদের সৃষ্টধর্ম। তাতে এমন আকীদা রয়েছে যা তাদের বোধগম্য নয়, যা গ্রহণ করতে তাদের বিবেক-বুদ্ধি অস্বীকার করে, কেননা এখন তাদের বিবেক-বুদ্ধি নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ইউরোপীয় গীর্জা যে বিকৃত ধর্ম পেশ করছিল, তাকে প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাহার করে নবী-রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ্র নাযিল করা পরিচ্ছন্ন ও পরম সত্য

আকীদা ভিত্তিক ধর্মগ্রহণ অগ্রাহ্য করে বসল। বলতে লাগলঃ সব ধর্মই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পৌরাণিক কাহিনীমূলক।

কিন্তু সে যা-ই হোক, ইউরোপ যতই ওযর পেশ করুক, কোনো কিছু থেকেই ইউরোপ বাঁচতে পারে না।

মধ্যযুগে প্রকৃতি পূজার ব্যবস্থায় ইউরোপ যে কঠিন শির্‌ক-এ নিমজ্জিত হয়েছিল, তার সমর্থনে কোনো যুক্তিই পেশ করা যেতে পারে না। ইউরোপের নতুন আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা যে নতুন রূপে শিরক গ্রহণ করেছিল, তার কোনোই তাৎপর্য নেই। আমরা আগেই বলেছি, প্রকৃতি পূজা মূলত গীর্জার স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব থেকে বাঁচার একটা পন্থা হিসেবেই অবলম্বিত হয়েছিল। কিন্তু খোদ প্রকৃতি জিনিসটি কি ?

বিরোধী হেলেনীয় আদর্শের আলোকে এই বুদ্ধিবাদের যুগে একজন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ ডারউইনের এই কথাকে কি করে যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত বলে মানতে প্রস্তুত হতে পারে যে, প্রকৃতিই সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা ? আর প্রকৃতির শক্তির কোনো সীমা-শেষ নেই। এই নিষপ্রাণ-বুদ্ধিহীন প্রকৃতি বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, চিন্তাশীল সত্তা কিংবা অ-বুদ্ধিমান[১] সত্তা সৃষ্টি করেছে যা গোটা প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব করেছে ও তার ভাগ্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করছে। একথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ?

সেসব আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা নিজেদেরকে এ প্রশ্ন না করে পারল কি করে যে, তারা সুনির্দিষ্ট ও নিশ্চিতভাবে যে প্রকৃতির দাসত্ব করছে, সে প্রকৃতিটি কি ? তা সৃষ্ট, না অ-সৃষ্ট ? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, না বিবেক-বুদ্ধিহীন ? সে জিনিকে নিজে কি করে সৃষ্টি করল ? কেমন করে বানাল সেসব নিয়ম, যা বিশ্বলোককে নিয়ন্ত্রিত করছে ? এসব নিয়মের এমনকি কর্তৃত্ব ক্ষমতা রয়েছে যার বলে এ বিশ্বলোককে সেসব নিয়ম অনুযায়ী চালাতে সক্ষম হচ্ছে, তা এই নিশ্চয়তা ও অনিবার্যতা কোত্থেকে পেল, যা তা গোটা বিশ্বলোকের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং বিশ্বলোক সেই অনুযায়ী চলতে শুরু করে দিল ?

তা ছাড়া এ নবতর মাবুদ যাকে সকল প্রকার শক্তি-ক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও বিশ্বলোকের ওপর এই নিরংকুশ সংরক্ষণতার একমাত্র উৎস বলে মনে করা হচ্ছে, আর আল্লাহ্ এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যটা কি (যে আল্লাহ্‌কে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিতান্ত অযৌক্তিক ও অবোধ্যভাবে যাঁর ইবাদত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে) ?

---

১. ডারউইন তাঁর পূর্ব কথার বিপরীত বলেছে ঃ প্রকৃতি তার বিবর্তনে দিশেহারা অনিয়মিতভাবে কাজ করেছে।

অদৃশ্য গায়েবী শক্তিকে মেনে নিতে তো অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাহলে তারা এই প্রকৃতি সম্পর্কে নিজেদেরকে এ প্রশ্ন না করে চুপ থাকতে পারল কি করে ? তা কি গায়েবী নয় ? না, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণীয় ? তার প্রপঞ্চ ও প্রকাশমান যদি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে লক্ষণীয় হয়ে থাকে, বস্তু ও আলোকোচ্ছটাই যদি হয় তার বাহ্য প্রকাশ, তাহলে তার নিগূঢ়ত্ব ও প্রকৃত সত্যটা কি ? তা কি তাই, যা আকাশকে আকাশ বানিয়েছে আর পৃথিবীকে পৃথিবী ? বস্তুটি শুধু বস্তু ? ... ... তাকি গায়ব নয় ? নয় এমন প্রচ্ছন্ন যে, ইন্দ্রিয় নিয়ে তা আয়ত্ত করতে পারে না।

আল্লাহ্ও কি এ ছাড়া অন্য কিছু ? তিনিও তো গায়ব, ইন্দ্রিয়নিচয় তাঁকেও আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু তাঁর মহাশক্তির প্রকাশমানতার প্রতীক হয়েছে এই বিস্তীর্ণ বিশাল আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী। ... এই বস্তু ও আলোকোচ্ছটা।

এই প্রেক্ষিতে তো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপীয় সেসব আলোকমণ্ডিতরা এক মহা নির্বুদ্ধিতার আবর্তে পড়ে গিয়েছিল।

অতঃপর প্রকৃতি পূজার অবসান ঘটে। মানুষ নিজেই নিজের পূজা করতে শুরু করে। কিন্তু মানুষ পূজার একান্ত কি? কেন ঘটল ? কিভাবে ঘটল ? কি এর তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা ?

তাকি এ জন্যে যে, মানুষ বিদ্যা অর্জন করেছে এবং তার শক্তি বেড়ে গেছে ?

স্রষ্টা অস্বীকারকারী এই ঘৃণ্য জাহিলিয়াতকে খানিকটা সময়ের জন্যে চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখুন। কেননা এ জাহিলিয়াত এতই হীন ও নিকৃষ্ট যে, তা তার সেই স্রষ্টাকে চিনতে পারে না, যে তাকে এই জ্ঞান ও বিদ্যা দান করল। মহাদানকারী, নিয়ামতদাতা আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাদানের বিনিময়ে তাঁর শোকর আদায় করার পরিবর্তে মানুষ নিজেই সে মহাদানকে তাঁর প্রতি কুফর ও না শুকরির কারণ বানিয়ে নিয়েছে।

এ জাহিলিয়াত তো প্রাচীন গ্রীক জাহিলিয়াতের প্রাণশক্তিকেও বিষাক্ত জর্জরিত করে ফেলেছে মানুষ ও দেবতাগণের মধ্যে দুঃখজনক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম সৃষ্টি করে দিয়ে। যখই তা দেবতাগণের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ জ্ঞান ও বিদ্যা কেড়ে নিয়েছে, তখনই তার বিদ্রোহের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে শুধু এই কারণে যে, তার হাতে একটা কর্তৃত্ব এসে গেছে।

কিছু সময়ের জন্যে এ সবই দূরে সরিয়ে রাখুন। তারপরে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে, মানুষ কি বিজ্ঞানটা অর্জন করে বসেছে যে, মহাদাতা নিয়ামতদানকারী আল্লাহ্ তা'আলাকে সে চিনতে পারছে না, অস্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে গেল ?

আমেরিকান বিজ্ঞানী মারেট স্টেনলে কোংগডট তাঁর 'গোলাপ বাহার অধ্যয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

"বিজ্ঞান যদিও পর্যবেক্ষণীয় (বা পর্যবেক্ষিত) মহাসত্যের নাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবীয় কল্পনা অধ্যয়ন ও ফুল গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। এই পরিসীমার মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণার ফলাফল গ্রহণীয় বটে। কিন্তু পরিমিতির ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার শুরুও শুধু সম্ভাবনা, আর শেষ ও সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো পর্যায়েই দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বরং সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও চিন্তা গবেষণা ফল ভ্রান্ত হওয়াই সম্ভব ধারণা, অনুমান, পারস্পরিক তুলনা ইত্যাদির দিক দিয়ে। তাছাড়া তা যে কোনো সময় পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংশোধিত, বর্জনকৃতও হতে পারে। কোনো চূড়ান্ত কথাই নেই তাতে।"[১]

এ উক্তিটি কোনো ধার্মিক বা ধর্মবাদী ব্যক্তির উক্তি নয়।

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, মানবীয় বিদ্যা সম্ভাব্যতা পরিপূর্ণ। (এ হতে পারে, ও হতে পারে— ইত্যাকার কথাবার্তাই হচ্ছে বিজ্ঞান।) সেখানে দৃঢ় নিশ্চিত প্রত্যয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। তা যত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে যত সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই করা হোক না কেন।

আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটাও একবার দেখুন!

দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান বাধ্য হয়েছে বস্তুর আসল সত্যতা ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে চেষ্টা করার পরিবর্তে তার শুধু বাহ্যিক দিক ও রূপরেখা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করাকে যথেষ্ট মনে করত। কেননা তা জানতে পেরেছে যে, ইন্দ্রিয় অগম্য প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পারা কোনো ক্ষমতাই তার আয়ত্তে নেই। শুধু বাহ্যিক অধ্যয়ন ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর নেই। আর এই বাহ্য বিষয় অধ্যয়ন সম্পর্কেই উপরোক্ত বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এই জ্ঞান বা বিজ্ঞান কোনো নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ ও দৃঢ় প্রত্যয়মূলক জিনিস নয়। বরং তা সূচিত হয় সম্ভাবনা থেকে এবং পরিসমাপ্তও হয় এই সম্ভাবনা নিয়ে।

তাহলে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমষ্টির মধ্যে এহেন বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অবস্থাটা কি ? কি তার মূল্য ও গুরুত্ব ? এই বিজ্ঞানের কারণে আজকের মানুষ কোন কঠিন ধোঁকায় নিপতিত হয়েছে ?

তাছাড়া মানুষ বাস্তবিকই যা জানতে আগ্রহী, সে তুলনায় তার অর্জিত এই বিজ্ঞানের পরিমাণ বা মাত্রাই বা কি ?

১. 'আল্লাহ্ বিজ্ঞান যুগে প্রতিভাত' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ – ডঃ দম্‌রাশ আবদুল মজীদ মারহান।

সে গায়বী বিদ্যা কোথায়, যার সন্ধানে মানুষ প্রথম সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে এবং হাজার হাজার বছর থেকে মানুষ আকুল আগ্রহী হয়ে আছে ?

মানুষ গায়ব-এর কতটা জানে ? স্থান ও কালের দৃষ্টিতে দূরবর্তী জ্ঞানের কথা তো অনেক দূরে, সম্মুখবর্তী মুহূর্তকাল জ্ঞানও কি মানুষের আছে ? চলমান মুহূর্ত— যা সর্বদিক দিয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত, সেই মুহূর্তের জ্ঞানও কি মানুষ আয়ত্ত করতে পেরেছে ? তার ও এই জ্ঞানের মাঝে কি লক্ষ আবরণ ও অন্তরাল প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি ?

এই তো হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের দৌড়।

শক্তির কথা ? হ্যাঁ মানুষের শক্তি আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তা সত্য। মানুষ তার পরিবেশের ওপর...প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে, সন্দেহ নেই। বিন্দু ও অণুকে মানুষ চূর্ণ করে পরমাণুর উদ্ভাবন করেছে। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, রকেট ছেড়েছে। চাঁদের বুকেও পদ সঞ্চারিত হয়েছে, বিজয় পতাকা পতপত করে উড়ছে সেখানে।... এ সবই সত্য।

কিন্তু ...... মানুষ যে শক্তি অর্জন করতে আগ্রহী, তা কি সে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে ?

মৃত্যুকে প্রতিরোধ করার শক্তি কি মানুষ অর্জন করেছে ? চিরন্তন জীবন লাভের শক্তি কি আয়ত্তাধীন হয়েছে মানুষের ?.... স্বভাবগত সেই আগ্রহের কারণেই শয়তান আদমকে পদস্খলিত করতে সুযোগ পেয়েছিল। আদমের সন্তানরা আজও সেই কামনা নিয়ে বসে আছে, কেয়ামত পর্যন্তই থাকবে তার এই বাসনা! শয়তান আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করে এই কথাই তো বলেছিলঃ

مَانَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ .... فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ -

তোমাদের রব্ব তোমাদের দুইজনকে এই বৃক্ষটি সম্পর্কে যে নিষেধ বাণী দিয়েছেন, তা অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু এই জন্যে যে, (গাছটি থেকে কিছু আহার করলে) তোমরা দুজনই ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা দুজনই চিরতরে জান্নাতবাসী হয়ে যাবে.......ফলে সে দুজনকে প্রতারিত করে ফেলল। (সূরা-আরাফ ঃ ২০—২২)

অন্তত রোগ প্রতিরোধ ....রোগজীবাণু ধ্বংস করা কি সম্ভব হয়েছে মানুষের দ্বারা ? আজও অনুবীক্ষীয় রোগ জীবাণু বড় বড় চিকিৎসা অযোগ্য রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুর্খতা ও অক্ষমতাই নাকি আল্লাহ্‌র ইবাদতে মনোযোগী হওয়ার কারণ, ইলিয়ান হাক্সলী তার বুকের ওপর চড়ে বসা বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের কারণেই এইরূপ বলেছিলেন।

তা হলে তা-ই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু বিজ্ঞান ও শক্তি কিংবা মূর্খতা ও অক্ষমতা পর্যায়ে বাস্তবে কি ঘটেছে ? আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিহার করার প্রবণতা মানুষের কিছু মাত্র কমেছে কি ?

আমরা আবার সেই জাহিলিয়াতের প্রসঙ্গটাই তুলছি, যার সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের এবং কোনো কোনো প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্তাধীন বানানোর শক্তি কি এ জন্যে দিয়েছিলেন যে, মানুষ অহংকার-অহমিকায় দিশেহারা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিত্যাগ করবে ?

মূলত এ একটি মারাত্মক অভিশাপ। আগুন চোর প্রোমিথিউস সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনীই ইউরোপীয় চিন্তা ও বিজ্ঞানের ওপর টেনে নিয়ে এসেছে।

অহংকারী দাম্ভিক মানুষের ব্যাপারটাই দেখুন। সে বলছে ঃ আমি আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিহার করে সে কোনো অপরাধ করা বাদ দিয়েছে ?

সে বলেছে, আমিই আমার জন্যে আইন প্রণয়ন করব। .... কেননা সে এখন গোলামী থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

বলেছে, আমার আকীদা ও আনুগত্য বিধান আমি নিজেই রচনা করব।

বলেছে, আল্লাহ্‌র হেদায়েতকে পাশ কাটিয়ে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমি নিজেই গড়ে তুলব।

কিন্তু পেরেছে ... ... ?

আসলে এ সবই ছিল শয়তানের ধোঁকা।

এটাই যদি শয়তানের কৃত না হয়ে থাকে, তা শয়তানের কীর্তি আর কি-ই বা হতে পারে! ... ... মানুষ একা এই কাজ কি করে করতে পারে!

সমগ্র পৃথিবী অন্যায়, পাপ ও দুষ্কৃতিতে ভরপুর করে দেওয়ার এ সাধ্য মানুষ কোথায় পেল ? সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া এই জুলুম শয়তানের সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে করা কি করে সম্ভবপর হলো ? পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য এই অপমানকর দাসত্ব মানুষের ললাট লিখন কি করে হতে পারল ?

এ দাসত্ব বিচিত্র ধরনের।... ...

মূলধনের দাসত্ব ... ...

রাষ্ট্রের দাসত্ব... ...

মহান ব্যক্তিদের দাসত্ব ... ... মৃত অলী-আল্লাহ্গণের দাসত্ব।
সর্বধ্বংসী লালসা-কামনার দাসত্ব।
এ সব নিতান্তই দাসত্ব— অপমানকর— লাঞ্ছনাকারী।

পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তীর্ণ এই পাপ মানুষ কি করে করতে পারল, যা পৃথিবীর চেহারাটাই বদলে বিকৃত করে দিয়েছে, পাপের এই গভীর পংক কি আল্লাহ্ই করল যার মধ্যে যুবক-যুবতীরা পরপর নিপতিত হচ্ছে ?

সভ্য দুনিয়ার হাসপাতাল ও গারদসমূহ যে গাপলের দ্বারা ভর্তি হয়ে আছে, এমনভাবে যে কোথাও তিলমাত্র স্থান খালি নেই ?

পাগলামীও তো এমন রকমারি যে, সরকারীভাবে তা গণনায় আসেনা। কিন্তু তা যে রোগ, অনিয়মতা, অসুস্থতা, প্রকৃতপক্ষে তা পাগলামী না হয়ে যায় না।

...এ হচ্ছে বন্ধুত্বের পাগলামী, সিনেমা থিয়েটারের পাগলামী, টেলিভিশনের ফ্যাসন-শোর নৃত্য-গীতের পাগলামী, ছিনতাইয়ের পাগলামী.....এই ধরনের অন্যান্য বহু প্রকারের বিকৃতি, বিপথগামিতা ও বিপর্যয়। আল্লাহ্র ইবাদত করাকে অহংকারবশত ঘৃণাকারী আল্লাহ্র দ্বারা এই সব বিপর্যয় হওয়া তো কোনো প্রকারেই শোভা পায় না।

কখ্খন-ই না।

মানুষ যখন নিজকে 'খোদা' মনে করে বসেছিল, ধারণা করেছিল যে, দাসত্বের শৃঙ্খল বুঝি ছিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ্র হেদায়েত গ্রহণে আর কোনো প্রয়োজনই নেই, তখন মানুষ জঘন্যতার কোন চরমেই না পৌঁছে গিয়েছিল।

ইহুদী চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কল্পিত খোদার জন্ম দিয়েছিল এবং সেই সময় থেকেই উম্মীদের চিন্তা সেই চিন্তার দ্বারা বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক-সামষ্টিক ঐতিহাসিক দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা (determinism)। আর এসবই ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যার ফলশ্রুতি।

কথিত ও ঘোষিত এসব দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা আসলে কি ?

প্রথমত, ইতিহাসের বস্তুনিষ্ট ব্যাখ্যা বলছে, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে খাদ্যের আলোচনার ইতিহাস। ইতিহাসে তাই হচ্ছে অর্থনৈতিক দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা।

খাদ্য সংক্রান্ত আলোচনাকালেই যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এই সব যন্ত্রপাতিই তার জীবনকে ইতিহাসের দীর্ঘ অগ্রগতিতে স্তরে স্তরে অগ্রসর করে নিয়ে এসেছে।

প্রাথমিক অবস্থায় ছিল প্রাথমিক কমিউনিজম। তথায় কারোরই ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। অতঃপর কৃষিকাজ উদ্ভাবিত হয়। তারপরই মালিকানার প্রশ্ন দেখা দেয়। তা জমির মালিকানা ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা। তখন ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে এক জাতির অপর জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দরুন দাসত্ব প্রথার জন্ম হয়। পরে এক এক জাতিকে দাস বানিয়ে তাদেরকে ভূমি চাষে নিযুক্ত করে ভূমিদাস বানিয়ে দেওয়া হয়। তারপরই জায়গীরদারী বা সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটে। এক নিশ্চিত অনিবার্যতা বা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতার ফলশ্রুতি স্বরূপ। এরপর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদের জন্ম। এও এক সুনিশ্চিত অনিবার্যতা। এখন জায়গীরদারী খতম হয়ে যায় এক নিশ্চিত অনিবার্যতার ফলস্বরূপ। অতঃপর মূলধন ও শ্রমিকদের মধ্যে এক সুনিশ্চিত অনিবার্যতার ন্যায়ই চরম দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। যন্ত্রপাতির মালিকানা ও উৎপন্ন পণ্যের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে এক সুনিশ্চিত অনিবার্যতাস্বরূপ। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে বরং সর্বশেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় কমিউনিজম জন্মগ্রহণ করে। তার জন্মের এটাই হচ্ছে পথ। তথায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না কোনো একজন ব্যক্তির জন্যেও।

নিশ্চিত অনিবার্যতা ভিত্তিক মানবীয় ইতিহাসের এটাই হচ্ছে সারনির্যাস। এই ধারায় চিন্তা করা কেবল জাহিলিয়াতের পক্ষেই সম্ভব বলে ধারণা করা যায়।

ইতিহাসের এ ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে বিশ্বলোক জীবন ও মানুষের জন্যে তাঁর কৃত যাবতীয় কল্যাণময় ব্যবস্থাপনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা ইতিহাস কোনো মোক্ষম লাভ করল ? কোথায় পৌঁছল, এ তো এমন ব্যাখ্যা যা আজকের আলোকমণ্ডিত ও আজকের জাহিলি জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী ব্যক্তিবর্গও সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারে না।

জীবনের এই সমস্ত বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যাকে যদি সঠিক মেনেও নেওয়া হয় যদিও এখনই ভালোভাবে জানা যাবে যে, এ ব্যাখ্যা কোনোক্রমেই যথার্থ নয়, তবু মানুষের ইচ্ছা ও অবস্থার সাথে তার কোনোরূপ অসঙ্গতি সম্পর্ক হওয়া তো উচিত হতে পারে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষই কি জমি ও উৎপাদনযন্ত্রের মালিক হয়ে বসেনি অথচ পূর্বে তারা তার মালিক ছিল না? জমির ওপর মালিকানা কি জমি নিজেই চাপিয়ে দিয়েছে? জমি কি মানুষকে ডেকে বলেছিল যে, তোমরা শিগ্‌গীর আমার মালিক হয়ে যাও? জমিই কি মানুষের গলা চেপে ধরে বলেছিল যে, জমির মালিক হওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো গত্যন্তর নেই? কিংবা মানুষই জমির মালিক হয়েছিল এ জন্যে যে, মালিকানা লাভ মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা?

মানুষ নিজেরাই কি ইচ্ছা করে যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেনি? কিংবা যন্ত্রপাতিই

মানুষের গলা চেপে ধরে বলেছিল যে, আমাকে নির্মাণ কর? তার উন্নতমানের ও নিখুঁত নির্মাণের জন্যে মানুষ নিজেই কি আগ্রহী হয় নি?-- এবং এ আগ্রহও তার স্বভাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে?.......... সেই তো যন্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া শিক্ষা লাভ করেছিল, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল।

এক্ষণে এ কথা যদি ধরেও নিই যে, এসব যন্ত্রপাতিই মানবতার ইতিহাস লিখছে, তাহলেও কি বলতে হবে যে, তাতে মানুষের ইচ্ছা শামিল নেই?... ... ...তাহলে বিবর্তন মানুষের ইচ্ছার বাইরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিঃসম্পর্কভাবে কি করে সম্ভবপর হলো?

অতঃপর যখন পুঁজিতন্ত্র চালু হয়ে গেল, তখন কি মালিক হয়ে বসার জন্যে মানুষ নিজেরাই আগ্রহী হয়ে ওঠেনি? নিজেরাই কি স্বভাবের তাড়নায় চায়নি যে, তাদের মালিকানা সম্পদের পরিণাম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক। মানুষের মধ্যে তো এই স্বাভাবিক তাড়না রয়েছে যে, সে যখন বিপথগামী হয়, তখন বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

তারপর যখন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাকেই সত্য ও ন্যায়পর পথ মনে করেনি ? ফ্রেডারিক এঞ্জেল্‌স্ তো তারই ওপর বিদ্রূপ করে বলেছিল ঃ

'মানুষ বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকারই রাখে না।' এটা হলো প্রথম কথা। .... উল্লিখিত নিশ্চিত অনিবার্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টিতে এটা একটা খুবই নিকটবর্তী কথা!

আর দ্বিতীয় যে কথাটি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্যে প্রকৃত সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, তা হচ্ছে, এসব নিশ্চিত অনিবার্যতাকে সত্য বলে ধরে নিলেও প্রশ্ন থাকে যে, এসব কার নির্ধারিত নিশ্চিত অনিবার্যতা ?

মানব প্রজাতির অগ্রগতির পথে এসব নিশ্চিত অনিবার্যতা কে ধার্য করেছে, কে অপরিহার্য বানিয়ে দিয়েছে ?

তা-ই কি জীবনের জন্যে একটি মাত্র উপায় ?

মানুষের পক্ষে কি প্রাথমিক পর্যায়ের কমিউনিজম স্তরে চিরদিনের তরে চিহ্নিত হয়ে থাকা সম্ভবপর ছিল না ?

দাস প্রথার যুগে চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকাও কি অসম্ভব ছিল ? ...সামন্তবাদী যুগে? কিংবা পুঁজিবাদী স্তরে স্থায়ীভাবে ? যন্ত্র উৎপাদন মানুষের জীবনকে একটা নতুন দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। খুলে দিয়েছিল এক নবতর দিগন্ত।

হ্যা, যন্ত্র উৎপাদনও কি মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো নিশ্চিত অনিবার্যতা ?... কে তা চাপিয়ে দিল ?

আল্লাহ্‌র কথা স্মরণের ও তার বিধান পালনের ব্যাপারে এই অনাগ্রহের হেতুটা কি ? এই গোটা ব্যাপারে কি আল্লাহ্‌র কোনো অংশ নেই ?...অতন্তঃ একটা পক্ষও কি তিনি নন ? তিনি-তো শির্ককারীদের কথা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, পরম পবিত্র।

তিনিই কি মানুষকে সৃষ্টি করেন নি ?...মানুষকে যন্ত্র উৎপাদনের বুদ্ধি ও ক্ষমতা কি তিনি-ই দেন নি ?

মানুষকে তাঁর এই শক্তি ও বুদ্ধি দান করাও কি নিশ্চিত অনিবার্যতা ছিল ?...কে তা নিশ্চিত অনিবার্য করেছিল ? কে সেই সত্তা যে তা অবধারিত করে দিয়েছিল ?

উপরন্তু পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব হওয়াটাও কি নিশ্চিত অনিবার্য ছিল ? মহাবিশ্বের পৃথিবী নামের গ্রহটির অস্তিত্বের কি নিশ্চিত অনিবার্য ছিল ? না, তারও ওপরে গিয়ে বলো, এই গোটা বিশ্বলোকের অস্তিত্বটাও কি নিশ্চিত অনিবার্য ও অবধারিত ছিল ?...সে নিশ্চিত অনিবার্যতা কার নির্ধারিত, কে করেছে তাকে নিশ্চিত অনিবার্য অবধারিত ?

মহান আল্লাহ্‌র বিধান পালনের প্রতি এই অনীহা কেন ?

মানুষের অন্তদৃষ্টি মহাসত্যের ওপর উন্মিলিত ও নিবদ্ধ হওয়া উচিত নয় কি ?

আবার জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্‌ই কি এই বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেন নি ? যদিও তিনি তা করতে কোনোক্রমেই একবিন্দু বাধ্য ছিলেন না।...কে পারে তাকে বাধ্য করতে ?...তিনি তো তা থেকে সর্বতোভাবে পবিত্র।

তিনিই কি পৃথিবী সৃষ্টি করেন নি ?...মানুষকে সৃষ্টি করেন নি ?...অথচ তিনি তা সৃষ্টি না করেও পারতেন। সৃষ্টি না করলে তাঁর কিছুই ক্ষতি বা লাভ হতো না? ...তিনি তার ঊর্ধ্বে। কিংবা জীবন ও মানুষের আত্মপ্রকাশের অনুকূল কোনো পরিস্থিতি এখানে আদপেই হতো না, তা-ও তো হতে পারত।

...এ সবই যখন আল্লাহ্ নির্ধারিত...তিনিই তো সৃষ্টিকর্তা।...তাহলে আমরা কোনো এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে, না, না, তুমি নও হে খোদা! সে নির্ধারক হচ্ছে ঐতিহাসিক কিংবা অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক-সামষ্টিক নিশ্চিত অনিবার্যতা।...কিংবা বানানো দেবতাগণই হচ্ছে তার নির্ধারণ ?

ইউরোপীয় চিন্তা তার জাহিলিয়াতের তুঙ্গে ওঠে যে সব 'খোদা' বা 'দেবতা' উদ্ভাবন করেছে, তারা সবই অত্যন্ত নির্মম, অন্তঃসারশূন্য ও রুঢ়— বে-রহম। ওরা মানুষের ইচ্ছার কোনো অধিকারই স্বীকার করে না, দিন-রাত মানুষ যে ফরিয়াদ

আর্তনাদ করে, তা-ও তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না, মর্ম স্পর্শ করে না। কোনো ডাকেরই এক বিন্দু সাড়া দেয় না।

এই দেবতাগুলো নিজেদের উদ্ভাবিত নির্বুদ্ধিতা মূল নিশ্চিত অনিবার্যতার দরুন মানুষকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে উপেক্ষা করে গেছে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কাজের সাথে সেগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই।...মানুষের কাজ সঠিক কিংবা ভুল, তা নিয়েও তাদের কোনো ভাবনা বা দায়-দায়িত্ব নেই। মানুষের সত্যিকারভাবে উন্নতি হলো; কিন্তু লাঞ্ছনা-ব্যর্থতার অতল গর্ভে ডুবে গেল, তারা ঈমান আনল কি কুফরী অবলম্বন করল, সে বিষয়েও ওদের কোনো জবাবদিহি নেই। মানুষের সাথে এসব দেবতার আচরণ এমন, যেন মানুষ কোনো প্রাণহীন সত্তা, তারা তাদের পরাক্রমশালী নিশ্চিত অপরিহার্যতার সম্মুখে অত্যন্ত হীন ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। অথবা তাদের সাথে সেগুলোর আচরণ এমন যে, তারা যেন মানুষ পদবাচ্য নয়, তারা যেন ছাগল-ভেড়ার পাল। তাদেরকে এক অজানা পথে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে, সে পথ সম্পর্কে কোনো ধারণা করারও যেন কোনো শক্তি নেই তাদের।

বস্তুত এ ছিল মানবতার পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর, চরম লাঞ্ছনার ব্যাপার। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কার্যাবলী–যা মানবীয় মহাসত্য সম্বলিত মূল্যমান, তার পক্ষে এর চাইতে অপমানকর ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

মানুষ আল্লাহ্‌র হেদায়েত থেকে দূরে সরে গিয়ে কি এই মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী হয়েছিল ? এখানে তারা তো নিকৃষ্টতম দাস হয়ে বসেছে নির্দয় ও তাদের অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন দেবতাকুলের।

বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতে মানুষের কি চরম ও মর্মান্তিক অবস্থাই না হয়েছে।

মানুষের এ জাহিলিয়াতে দুর্গতি ও লাঞ্ছনার এই সীমা পর্যন্ত এসেও থেমে যায়নি। থেমে যাওয়া সম্ভবও ছিল না। আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণায় যদি বিপথগামিতা ও বিপর্যয় শুরু হয়ে যায়, তাহলে মানুষের সকল প্রকারের ও পর্যায়ের ধারণায় এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে চরম গুমরাহীর মধ্যে পড়ে যাওয়া অবধারিত হয়ে পড়ে। কেননা শুরুতেই যাত্রা লক্ষ্য ভুল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কারণে পথের প্রতি পদক্ষেপই ভুল দিকে ছুটে চলছে।

আধুনিক ইউরোপীয় জাহিলিয়াতে মানুষ বিশ্বলোক সংক্রান্ত ধারণায় তার সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক এবং তার সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণেও মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। ফলে তারা সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে।

মানুষ কখনও প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধানের নিশ্চিত অনিবার্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ঘটনা সঙ্ঘটনের কুদরতকেই

অস্বীকার করে বসেছে। আবার কখনও বলছে, সমগ্র সৃষ্টিলোক স্বতঃই উদ্ভূত, বিকশিত। কোনো তার জীবন রয়েছে। ফলে তারা বিশ্বলোক ও জীবনের স্রষ্টা মা'বুদকেই অস্বীকার করেছে।

কখনও তারা বলছে, বিশ্বলোকের স্বাভাবিক অবস্থা জীবনের উপযোগী জীবনোদ্‌গমের অনুকূলে ছিল না। এখানে জীবনের উদগম সম্ভব হয়েছে একটি সংঘর্ষের ফলে। আর এই সংঘর্ষেরই শেষ পরিণতিতে মানুষের অস্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে।

কখনও বলেছে, এই বিশ্বলোক এবং মানুষ নিতান্তই উদ্দেশ্যহীনভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

এভাবে কত ধরনের কত প্রকারের গুমরাহীর মধ্যে আজকের মানুষ নিমজ্জিত, তা বলে শেষ করা যায় না। আর সে গুমরাহীর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস-মূল্যবোধের ওপর, মানুষের আচার আচরণের ওপর। কোনো তা মূলত উদ্ভূতই হয়েছে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা থেকে।

নিশ্চিত অনিবার্যতা সম্পর্কে আগেই বলে এসেছি। যে নিশ্চিত অনিবার্যতার নাম দেওয়া হয়েছে প্রাকৃতিক আইন, তা অন্যান্য নিশ্চিত অনিবার্যতা থেকে কিছুমাত্র ভিন্নতর জিনিস নয়। তা সবই এই বিশ্বলোকে অবস্থিত একক মহাসত্য ভিত্তিক নিশ্চিত অনিবার্যতা থেকে বিভ্রান্ত ও গুমরাহ। সে একক মহাসত্য ভিত্তিক নিশ্চিত অনিবার্যতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এক নিরংকুশ ও অপ্রতিরোধ্য ব্যাপার। তাকে কোনো বন্ধনেই বন্দী করা বা আটকানো যায় না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পথে যে কোনো বাধারই কল্পনা করা হবে, তা অবশ্যই বাতিল মনে করতে হবে। এমন কে কোথায় আছে বা থাকতে পারে, যে নিজ ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ওপর চাপিয়ে দিতে পারে! তিনি নিজে সবকিছুর স্রষ্টা, উদ্ভাবক, অমোঘ ইচ্ছার মালিক। সর্বপ্রকার দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

বিভ্রান্তির উদ্ভব হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সুন্নাতকে (নিয়ম বিধান) বিশ্বলোকের জন্যে অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী মনে করে নেওয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে স্থিতি এই বিশ্বলোকের জন্যে নির্ধারণ করেছে, তা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতামূলক। তা ছিল রহমতস্বরূপ এই বিশ্বলোকের জন্যে যেমন, তেমনি মানুষের জন্যেও। তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে বন্দী ও বাধাগ্রস্ত করতে পারে না, একথা সুস্পষ্ট, মহান আল্লাহ্‌কে কেউ-ই কোনো শক্তিই অক্ষম করতে পারে না, বিরত রাখতে পারে না বিশ্বলোকে নিজ ইচ্ছামতো হস্তক্ষেপ করা থেকে।

তা সম্ভবই বা কি করে হতে পারে!...তিনি নিজেই তো সবকিছুর স্রষ্টা, স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী তিনি। মহান আল্লাহ্ মুক্ত স্বাধীন ইচ্ছা ফয়সালা করেছে যে, বিশ্বলোকের ওপর একটা স্থায়ী নিয়ম চালু হয়ে থাকবে। আধুনিক জাহিলিয়াত তারই নামকরণ করেছে প্রাকৃতিক নিয়ম। মনে হচ্ছে তার প্রকৃত নাম সুন্নাতুল্লাহ্ বা 'আল্লাহ্‌র নিয়ম' রাখতে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু সেই আল্লাহ্ই যদি এই স্থায়ী নিয়মের বিরোধিতা করতে ইচ্ছা করে, তাহলে কার অধিকার থাকতে পারে একথা বলার যে, না, না, প্রাকৃতিক নিয়ম কখনোই বদলানো যেতে পারে না?

এখানেই মুজিযার প্রশ্ন। বাহ্যিকভাবে স্থায়ী নিয়মের ব্যতিক্রমকেই তো মুজিযা বলা হয়। এটাও তো সেই আল্লাহ্‌র সুন্নাত, যা এই বিশ্বলোকে একমাত্র 'নিশ্চিত অনিবার্য' হিসেবে চেপে বসেছে, স্থায়ী হয়ে আছে।

জাহিলিয়াতের ধ্বজাধারীরা মনে করেছে, তারা স্থায়ী প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছে। কিন্তু 'সুন্নাতুল্লাহ' সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ জাহিল অথচ 'মুজিযা' বিশ্বাস করলে প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের পথে কোনোই বাধার সৃষ্টি হয় না। সে বিশ্বাস ও আকীদার অধীন জ্ঞান অর্জনও কিছুমাত্র বাধার সম্মুখীন হতে পারে না, বাধাগ্রস্ত হতে পারে না প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা ও প্রগতি লাভ। কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম ও সুন্নাতুল্লাহ্ এই দুটির মধ্যে কোনোই বৈপরীত্য নেই।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান এক মহামূল্য ও বিরাট উত্তরাধিকার। তা মুসলমানের বিস্ময়কর প্রতিভা ও শক্তি সামর্থ্যের উজ্জ্বল সাক্ষী। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবেই তো ইউরোপের আধুনিক পুনর্জাগরণের সব কয়টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আধুনিক কালের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান তারই ফলশ্রুতি, তারই ওপর স্থাপিত। মূলত সে বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল আকীদার ছত্রছায়ায়। মুজিযার প্রতি ঈমানের আশ্রয়ে। তখন মুসলিমদের হৃদয়ে ও চিন্তায় বিশ্বলোকে আল্লাহ্‌র সুন্নাতের স্থায়িত্ব এবং মুজিযার প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা পর্যালোচনা গবেষণা এবং লব্ধ ফল গ্রহণে অনুসন্ধিৎসা পুরোপুরি সম্ভবপর হয়েছিল। কোনো এটা যেমন, ওটাও তেমনি সত্য। আর চিরন্তন সত্য কথা হচ্ছে, প্রকৃত সত্য যা, তার একাংশের সাথে অপরাংশের কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না। তবে যে সব সংকীর্ণ, বিবেক বুদ্ধি দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনে অক্ষম, তাদের কথা আলাদা।

ইউরোপের সংকীর্ণ মন-মানসিকতায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই ধারণা যে, কোনো সময় 'মুজিযা' সত্য হয়ে দেখা দিলে গোটা বিশ্বব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে

যাবে। কোনো গোটা বিশ্বলোক এক স্থায়ী নিয়মে বন্দী, পরস্পর গভীরভাবে জড়িত। এজন্যে তাদের মতে প্রত্যেক ঘটনার সুনির্দিষ্ট ফল হওয়া অনিবার্য।

কিন্তু এই নিয়মগুলোকে কে পরস্পর সংযুক্ত করে দিয়েছে ?...এগুলোর সৃষ্টিকর্তা নিজেই তা করেছেন। তাই তিনি নিজেই চান, কোনো মুহূর্তে নির্দিষ্ট ফলের বিপরীত ফল প্রকাশিত হোক। সেই ফল বাস্তবায়িত হওয়া এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, তাহলে সেই সৃষ্টিকর্তাকে তা করা থেকে কে বাধাগ্রস্ত করতে পারে ? কে পারে তাকে ইচ্ছামতো কাজ করার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত করতে ? কোনো সেই বিশেষ উদ্দেশ্য, ব্যতিক্রমধর্মী ফল বের করার পর তা তো সেই স্থায়ী নিয়মেই চলতে থাকবে। তখন আর তাতে কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাবে না।

তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক নিয়মের নিশ্চিত অনিবার্যতা সক্রান্ত সব জ্ঞানই আনুমানিক সবই সম্ভাব্যতার পর্যায়ভুক্ত।[১]

স্যার জেম্স্ জীন্স্ প্রকৃতি বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্রের একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মনীষী। শুরু জীবনে তিনি নাস্তিক সংশয়বাদী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই মত গ্রহণে বৈজ্ঞানিকভাবেই বাধ্য হলেন যে, বিজ্ঞানের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। তিনি বলেছেন ঃ

প্রাচীন বিজ্ঞান সুদৃঢ়ভাবে মনে করত যে, প্রকৃতি একটি মাত্র পথেই চলতে পারে। সে পথ ছাড়া অন্য পথে হলো তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সে পথ তাই, যা বহু পূর্বেই স্থায়ীভাবে চালু করা হয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হলোর জন্যে। কার্য ও কারণের ধারাবাহিকতা রক্ষায়। আর তা হচ্ছে 'ক'-এর পর সব সময়ই 'খ' আসবে নিশ্চিত অনিবার্যতার কারণে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান আজও বলছে, 'ক' অবস্থার পর 'খ' অবস্থা যেমন আসা অসম্ভব, তেমনি সম্ভব গ, ঘ, ঙ ও চ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। এমনি আরও কোনো অবস্থা। ফলে তা নিশ্চিত অনিবার্যতাকেই ভুল প্রমাণ করে। তবে হ্যাঁ, একথা বলা যায় যে, 'ক' অবস্থার পর 'খ' অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অধিক সম্ভব গ, ঘ, ঙ, চ ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার তুলনায়। আর গ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া অধিক সম্ভব 'ঙ' অবস্থার তুলনায়। সেই সাথে খ, গ ও ঙ, এই তিনটি অবস্থারই সম্ভাব্যতা সুনির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু নিশ্চয় করে বলা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কোন অবস্থাটা কোন অবস্থার পর নিশ্চিতভাবে সৃষ্টি হবে। কেননা আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই হচ্ছে সম্ভাব্যতার ওপর। তবে কোনটা হওয়া জরুরী, এই কথাটি তকদীর বা নিয়তির ব্যাপার— সে নিয়তির মূল সত্য যা-ই হোক-না-কেন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আধুনিক জাহিলিয়াতের সমস্ত জাহিলিয়াতের মধ্যে একটা বিস্ময়কর জাহিলিয়াত হচ্ছে এই ধারণা যে, এই বিশ্বলোক আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে।

---

১. মার্কিন বিজ্ঞানী ম্যারিয়ট স্টানলী কুঞ্জদন-এর সাক্ষ্য দেখুন। তা এ অধ্যায়েই উদ্ধৃত হয়েছে।

চার্লস ডারউইন জীবনের বিভিন্ন স্তরের পর্যবেক্ষণ অধ্যয়ন করে জীবনের সুচনাকালীন ও বর্তমানকালীন আকার আকৃতির মধ্যবর্তী স্তরসমূহকে পরস্পর সংযোজিত করেছে। কিন্তু সে গীর্জার 'খোদা'কে মানতে প্রস্তুত ছিল না। কোনো গীর্জার সাথে তার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলে আসছিল। আর গীর্জাও সেই 'খোদা'র নামে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। ডারউইন জিদের বশবর্তী হয়েই আল্লাহ্-ই যে সৃষ্টিকর্তা এই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল সত্যকে মেনে নিতে রাজি হয়নি। আর তার ফলেই বিশ্বলোকের স্বতঃই অস্তিত্বমান হওয়ার জাহিলী পৌরাণিক কিংবদন্তির উদ্ভব ঘটেছে। অথচ এই ধারণাটি আদপেই এমন নয়, যা নিয়ে কিছুমাত্র আলোচনা করা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানিগণ নিজেরাই এহেন দুর্বল যুক্তিহীন পৌরাণিক অবিশ্বাস্য ধারণার অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে চেতনা লাভ করেছিল এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা সম্পূর্ণ পরিহার করেছে।

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক রাসেল চার্লস আর্নস্ট বলেছেনঃ 'নিষ্প্রাণ প্রস্তর থেকে জীবনের উদ্‌গম হওয়া পর্যায়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ পেশ করা হয়েছে। কোনো কোনো গবেষক বলেছেন, প্রোটোচিন বা ফিয়োম কিংবা বড় বড় প্রোটিনী অংশের সংমিশ্রণ থেকে জীবন উদ্ভূত হয়েছে। লোকেরা মনে করে এসব মতবাদ ও তত্ত্ব বুঝি জীবন জগত ও প্রস্তুর জগতের মধ্যকার শূন্যতা ভরে দিয়েছে। কিন্তু যে সত্য মেনে নিতে আমরা বাধ্য হচ্ছি, তা হচ্ছে এই যে, জীবন্ত বস্তুকে অ-জীবন্ত বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাদের কাছেও এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, বিন্দু বা অণু ও অংশসমূহের হঠাৎ করে একত্রিভূত হয়ে যাওয়ার ফলে স্বতঃই জীবনের উদ্‌গম হতে পারে ও জীবন্ত কোষের রূপ ধারণ করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্বতোভাবে স্বাধীন। কেউ ইচ্ছা করলে জীবনের এই ব্যাখ্যা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই মতবাদ গ্রহণ করলে বিবেক-বুদ্ধি এতসব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে যে, খোদ আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নিলে কোনো সমস্যাই দেখা দেয় না।

আমি মনে করি, জীবন্ত কোষসমূহের প্রতিটি কোষই এতই জটিল যে, তা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ্য কোটি কোষ তো সেই আল্লাহ্‌রই অতুলনীয় শক্তির সাক্ষ্য দান করে। সে সাক্ষ্য বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তিভিত্তিক। এই কারণে আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত সত্য সুদৃঢ় ঈমান গ্রহণ করছি।

আর বিশ্বলোক একটি দুর্ঘটনা (by chance) স্বরূপ অস্তিত্ব লাভ করেছে বলে যে মতটি প্রকাশিত হয়েছে, তার অযৌক্তিকতা, অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্ট করে তোলার জন্যেও ওপরে উদ্ধৃত কথাটিই যথেষ্ট হতে পারে। কোনো তা একজন বিজ্ঞানীরই উক্তি।

তা সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এক পাশে রেখে দিয়ে শুধু খোলা চোখে এবং দূর সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হৃদয় দিয়ে চিন্তা করি, তা হলেও অতি সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, গগনমন্ডলির আবর্তন এবং বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিসের অত্যন্ত সূক্ষ্ম জটিল ব্যবস্থা-শৃঙ্খলা হঠাৎ করে বা কোনো দুর্ঘটনার কারণে অস্তিত্ব পাওয়া কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই সব কিছু একজন মহাবুদ্ধিমান ব্যবস্থাপক প্রকৌশলীরই সৃষ্টি হতে পারে, অন্য কিছু নয়।

আকস্মিকভাবে কিংবা দুর্ঘটনাবশত অস্তিত্ব লাভের মতটি মূলতই সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তাছাড়া কোনো দুর্ঘটনাই যে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো জিনিসকে কখ্খনই অস্তিত্ব দিতে পারে না, যার কোটি কোটি বছর কাল ধরে অব্যাহত ধারায় ও নির্বিঘ্ন গতিতে চলছে, তবু তাতে কোথাও এক বিন্দু ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ছে না। এত কোটি বছর ধরে চলছে যে তা মানুষের গণনায়ও আসতে পারে না।

বিশ্বলোক দুর্ঘটনার ফলেও আকস্মিকভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে এই মতটির বিভ্রান্তির দরুন আরও বহু প্রকারের বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, বিশ্বলোক উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি লাভ করেছে এবং এখানে বসবাসকারী মানুষের জীবনেরও কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। এ-ও সেই অতিবড় বিভ্রান্তর ফলশ্রুতি। সে বিভ্রান্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র হেদায়েত বিবর্জিত হওয়া, আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতে চিন্তা ও বিশ্বাস গ্রহণ না করা। কোনো আল্লাহ্‌র স্বাধীন ইচ্ছাকারী উদ্ভাবনকারী সৃষ্টিকারী কুদরতের প্রতি যার ঈমান রয়েছে, তার মনে মগজে এই চিন্তা কখনোই স্থান পেতে পারে না

বিশ্বলোকের নির্মাণ কৌশল স্বতঃই অত্যন্ত বিস্ময়কর যেমন, তেমনই অতিশয় সূক্ষ্ম ও জটিল। তা কখনোই নিরর্থক ও উদ্দশ্যহীন হতে পারে না। তা স্বতঃই প্রমাণ করে যে, এই বিশ্বলোক উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি এবং এর একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকবে। অস্তিত্বেই অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের আবশ্যকতা প্রমাণ করে।

কিন্তু মানুষ নিজস্বভাবে সেই উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে— জানতে ও বুঝতে পারে না। কোনো মানুষ নিজে এই বিশাল বিশ্বলোকেরই একটা অংশ। অংশ কখনোই সমগ্রকে পুরামাত্রায় আয়ত্ত করতে পারে না। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। গোটা সৃষ্টিলোকের লক্ষ্য উপলব্ধি করতে মানুষের পক্ষে অক্ষম হওয়া কিছুমাত্র অযৌক্তিক নয়। কিন্তু এই অক্ষমতা সত্ত্বেও মানুষ যদি তার দৃষ্টিকে উন্মুক্ত রাখে, তাহলে সে

নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে যে, বিশ্বলোকের একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। অন্যথায় এই বিস্ময়কর সূক্ষ্ম সৃষ্টির কোনো অর্থ হয় না। তা এতই সূক্ষ্ম যে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয় না।

'বিশ্বলোক ও মানুষ উদ্দেশ্যহীন' এই ধারণার বিভ্রান্তি জীবন সম্পর্কিত ধারণা, জীবনের লক্ষ্য ও কাজ সম্পর্কেও বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সর্বত্র ব্যাপক বিপথগামিতা সূচিত হয়েছে।

কোনো যে জীবন আকস্মিকভাবে কোনো স্রষ্টা ব্যবস্থাপক যৌক্তিকতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে, মানুষও আকস্মিক সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে সে জীবনে কোনো ভারমাস্য রক্ষা পাওয়া, সামঞ্জস্য থাকা বা তার কোনো লক্ষ্য হওয়া আদৌ সম্ভবপর হতে পারে না।

ডারউইন বলেছেন, জীবন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বিবর্তিত হয়েছে। তা যেন অন্ধের ষষ্ঠি। এই অবস্থায়ই মানুষের উদ্ভব, মানুষের বিবর্তন।

এই ধারণা থেকেই বিপথগামিতা মানুষের মনে মগজে ও তার জীবনের উদ্দেশ্যের ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

বস্তুত এ একটি বিরাট ক্ষতি, সন্দেহ নেই।

এ অত্যন্ত পীড়াদায়ক দুর্ভাগ্য। তা কোনো সীমায় এসে থেমে যায় না।

এ হতাশা ও ব্যর্থতার যন্ত্রণা ছাড়া আর কি! এটা এক ধরনের স্বাদ-আস্বাদনের ছটফটানি।

তা এক নিরাশ হতাশ ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব। কোনো সমর্থনই তার পেছনে নেই। অপার করুণাময় আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। এই কারণে এ দ্বন্দ্ব পাশবিক ও পাগলপাড়া রূপে পরিগ্রহ করেছে।

এ ধারণা মানুষ ও তার কর্মের ওপর যে নিদর্শন রেখেছে, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব। সে মানুষ ব্যক্তি হোক, গোষ্ঠীবদ্ধ বা জাতি, সমষ্টি আমরা তাদের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয়-কুকৃতি ও বিপথগামিতার বিবরণ পেশ করব।

কোনো মানুষ যখনই আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার ও তাঁর মধ্যে কোনো সম্পর্কও যখন অবশিষ্ট থাকেনি, তখন মানুষ ভূপৃষ্ঠে দিশেহারা হয়ে হাতড়িয়ে বেড়াতে লাগল। তাকে পথ নির্দেশ করার কেউ কোথাও ছিল না।

মানুষ দিশেহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে মরতে লাগল। সে তা নিজের জীবনের কোনো লক্ষ্যের কথাই জানতে পারল না। আল্লাহ্র কাছে তার যে বড়

সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তা জানাও তার পক্ষে সম্ভব হলো না। এই বিশ্বলোকে তাকে কি ভূমিকা পালন করতে হবে, তা জানাও তার পক্ষে অসম্ভবই থেকে গেল। ফলে সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নিজেকেই পৃথিবীর 'খোদা' বানিয়ে নিল। পাগলের ন্যায় চিৎকার করে বলতে লাগল, সে মানুষ, এই বিশ্বলোকের সেরা এবং এখানকার যাবতীয় কর্তত্ব তার মুঠির মধ্যে, সেই সবকিছুর নিরংকুশ ব্যবস্থাপক ও কর্তৃত্বাধিকারী।

তারই সৃষ্টিকর্তার বিপরীতে সে উক্তরূপ অর্থহীন প্রলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সে যখনই আল্লাহ্‌র প্রভাববলয় ও তার হেদায়েতের আওতার বাইরে বেরিয়ে এলো, অমনি নিশ্চিত অনিবার্যতার শয়তানেরা তাকে পাকড়াও করল, ঘিরে ফেলল কল্পিত খোদার দেবতারা। আর তারা মানুষের নাক মাটির সাথে ঘষে ঘষে তাকে এতটা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়ল যে, মানুষ অসহায় অবস্থায় তাদেরই সম্মুখে সিজদায় পড়ে গেল।

মানুষ তার নিজের মধ্যে নিহিত মহাসত্যের পরিচয় পেল না, জানতে পারল না তার অস্তিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ডারউইনের মতে মানুষ নিতান্তই জীব বা জন্তু মাত্র, যেমন দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তু। এই কারণে মানুষের জীবন ও তার উন্নততর মর্যাদা পর্যায়ে তার মতের কোনো গুরুত্ব বা মূল্যই স্বীকৃত হতে পারে না। কেননা তার মতে এই মহাবিশ্বলোকে মানুষের স্থান হীন নগণ্য কীট পতঙ্গের তুলনায়ও বেশি কিছু নয়। বেঁচে থাকাই মূলত বিবর্তনবাদী দর্শনে সাফল্যের এক মানদণ্ড। তাই বিশ্বলোকে বেঁচে থাকা বর্তমান সব প্রাণী-জীব ও জন্তু সর্বতোভাবে অভিন্ন মূল্য ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী! অগ্রসর হওয়ার ধারণা কেবলমাত্র মানবীয় কল্পনা। অথচ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বর্তমানে মানুষই হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা ও শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে একটি পিপিলিকা বা বিড়াল ইঁদুরও এই স্থান ও মর্যাদা পেতে পারে।[১]

এ থেকেই মানুষ নিজকে জন্তু-জানোয়ার ধারণা ও তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে লক্ষ্যহারা হয়ে পড়েছে এবং কার্যতও তারা পিপিলিকা ও বিড়ালের পর্যায়ে এসে গেছে।

মানুষ এ-ও জানতে বুঝতে পারেনি যে ভূপৃষ্ঠের এই সীমিত অবকাশটুকু নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথেই জীবনেরও অবসান হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

জীবন এ পর্যন্ত এসেই যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তা হবে ছবির এক অপূর্ণাঙ্গ দিক। জীবন ও তার এতসব দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য ও অসীম জুলুম নিপীড়নের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যদি এখানেই শুরু ও এখানেই সবকিছু নিঃশেষ

---

১. জুলিয়ান হাক্সলী লিখিত 'আধুনিক জগতের মানুষ' শীর্ষক গ্রন্থ, আরবী অনুবাদের পৃঃ ২।

হয়ে যায়। কোনো এখানকার এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি এবং বাতিল কি তা পূর্ণমাত্রায় প্রতিভাত হতে পারে না। তাহলে মানুষের জীবন এতই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় যে, চিন্তাশীল মানুষ নিজের জন্যে সেরূপ জীবন কল্পনাও করতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র পক্ষে মানুষের জন্যে এত সীমাবদ্ধ জীবনের ব্যবস্থা হওয়াটা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

তাদের অন্তর যখন আল্লাহ্ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল, ছবি পূর্ণতা লাভের পূর্বেই কেটে ফেলা হলো, যখন তারা এই দুনিয়ার সীমাবদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যেই নিজেদের দৃষ্টিকে সীমিত করে নিল, তখন বৈষয়িক জীবনটা তাদের সম্মুখে কুৎসিত হয়ে দেখা দিল। এর যে কোনো অর্থ থাকতে পারে, থাকতে পারে কোনো তাৎপর্য— তা তাদের বোধগম্য হলো না। তখন তারা দেখতে পেল যে, এই জীবনটা নিরর্থক ব্যর্থ, তাৎপর্যশূন্য, অস্থিরতা ও অশান্তিতে ভরপুর, তখন তারা সম্ভাব্য দ্রব্য সামগ্রীর স্বাধ আস্বাদনে পাগলের মতো ছুটে গেল। কোনো তাদের কাছে ছিল এক বিলীয়মান মহাসুযোগ। এই সুযোগ হারিয়ে ফেললে তা আর কোনো দিনই ফিরে পাওয়া যাবে না। এই জীবনের পর আরও কোনো জীবন আছে তা তাদের ধারণায় আসছিল না।

ঠিক জন্তু জানোয়ারদের মতোই তারা যে দিকে ইচ্ছা দ্রুত দৌড়ে গেল। ছিল না কোনো উদ্দেশ্য, কোনো লক্ষ্য। যৌক্তিকার কথা চিন্তা করারও সাধ্য ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পাচ্ছিল না কোনো স্বস্তি, দেখছিল না সৌভাগ্যের মুখ, পাচ্ছিল না সত্যিকার আরাম বলতে কোনো কিছু। তখনকার এ দ্বন্দ্ব ও টানা-হেঁচড়া ঠিক পাগলের মতোই।

আল্লাহ্ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ার যে মৌল গুমরাহী তাদের ব্যাপকভাবে পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে, তা হলো মানব প্রকৃতি ও মানুষের মন সম্পর্কে আধুনিক জাহিলিয়াতের ধারণা এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। ব্যক্তিগতভাবে, দলবদ্ধভাবে— নারী ও পুরুষ এবং গোত্র ও জাতিগতভাবে।

মানুষ তার সর্বপ্রকারের গুমরাহী, সর্বপ্রকারের মুর্খতার প্রভাবে পড়েও ধারণা করতে লাগল যে, সে মানুষ। যদিও শেষ পর্যন্ত ডারউইন এসে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ সহকারে বলতে লাগলেন, মানুষ মানুষ নয়, নিতান্তই জন্তু-জানোয়ার মাত্র।

অথচ এই পৃথিবীতে মানুষের বসতি শরু হওয়ার সময় থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা মানবতার জন্যে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলে এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল (স)-ও একইভাবে অত্যন্ত তাগিদ সহকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ মানুষই, মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। আর তাঁরা মানুষের সম্মান ও মর্যাদা ঠিক ততদূর উন্নত করার জন্যে জিহাদ করেছেন, যতদূর উন্নীত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। তাঁরা

মানুষেকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা তাদের জন্যে পথ উদ্ভাসিত করে তুলছিলেন, যেন তারা আল্লাহ্‌র হেদায়েত অনুযায়ী জীবন পথে অগ্রসর হতে পারে। এ জন্যে তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে অনেক মুজিযাও দেখিয়েছেন।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নবী (?) এসে প্রচার করতে লাগল, না মানুষ মানুষ নয়, জন্তু মাত্র। মনে হচ্ছে, বিজ্ঞানের এ নবী শয়তানের নবীর কাজ করেছে এবং না বুঝে-শুনেই এ ধরনের ভিত্তিহীন ও হাস্যকর কথা বলছে।

মানুষ জীব বা জন্তু মাত্র। আর জন্তুর কাছ থেকে মানুষ কি-ই বা পেতে পারে, কি-ই বা পেতে চাইতে পারে ?

পাশ্চাত্যের গোটা চিন্তার সমগ্র ক্ষেত্রেই ডারউইনীয় চিন্তাধারার বিষাক্ত প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্য— কোনোটিই তার বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। জীবনের কোনো একটা দিকও এমন নেই যাকে বিকৃত ও বিষাক্ত করে দেয়নি।

তাই মানুষ নিজেকে যতদিন জন্তু-জানোয়ার মনে করতে থাকবে, ততদিন উপরোক্ত নিশ্চিত অনিবার্যতার কুফল ফলতেই থাকবে।

আর এ বিকৃত— অজ্ঞ মূর্খ ধারণার নিশ্চিত অনিবার্যতার ফল শুধু এ-ই হবে যে, মানুষ ও তার চরিত্র, ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা সংযোজনা সবকিছুরই তাৎপর্য পাশবিকতার দিকেই চলতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত মানুষ সত্যিকারভাবে পশুতে পরিণত হবে, পাকাপোক্ত পশু হওয়াই হবে তদের পরিণতি। কোনো তাদের চিন্তাবিদের কাছ থেকে মানুষের পাশবিক ব্যাখ্যাকেই পরম সত্য ব্যাখ্যারূপে পেয়েছে ও গ্রহণ করেছে।

ডারউইন যখন মানবদেহের আঙ্গিক সংস্থার অধ্যয়ন করে মনে করলেন, মানুষ ও পশুর দেহ-সংস্থার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে, তখন তিনি প্রতারিত হয়ে বিশ্বাস করটেত লাগলেন যে, মানুষ আসলেও মূলের দিক দিয়ে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু ডারউইন জেনে হোক না জেনে হোক কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য বলতে পারেন নি। ডারউইন-পরবর্তী বিজ্ঞান নতুন ডারউইনবাদ (New Darwinism) বিবর্তনে বিশ্বাসী হয়েও ডারউইনবাদকে অবৈজ্ঞানিক ও অসত্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। জুলিয়ান হাক্সলী'র মতো পূর্ণ মাত্রায় নাস্তিক বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী হয়েও মানুষের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন, মানুষের জন্তু হওয়ার কথা নয়। ডারউইনীয় মতাদর্শের পর মানুষ তার জন্তু হওয়ার কথা অস্বীকার তো করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও

বুঝতে বাধ্য হয়েছেন যে, মানুষ জন্তু বটে তবে এক স্বতন্ত্র ধরনের জন্তু। অনেক দিক দিয়ে মানুষ যে স্বতন্ত্র সত্তা, তা-ও বোঝা যায়। অথচ মানুষের জীবতাত্ত্বিক গবেষণা তখন পর্যন্তও অসম্পূর্ণ।[১]

যে জীবতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের কারণে ডারউইন মনে করেছিলেন যে, মানুষ জন্তু এবং তারই ভিত্তিতে মানুষের জন্তুর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, এক্ষণে সেই নৃতাত্ত্বিক তথ্যই স্বীয় সাংগঠনিকতার ও সংস্থার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিভাত হয়েছে।

হাক্সলী বলেছেন, সমস্ত জীবের মগজে দুই ধরনের স্নায়ু এসে মিলিত হয়েছে। একটা হচ্ছে ধারণকারী স্নায়ু মণ্ডলী আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে উন্মুক্তকারী স্নায়ুমণ্ডলী। একটি সময়ে একটি জন্তু একই ধরনের স্নায়ুমণ্ডলীকে নির্দেশ দিতে পারে। হয় প্রথমোক্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে নির্দেশ দিবে, না হয় দ্বিতীয় ধরনের স্নায়ুমণ্ডলীকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুকুর হয় দৌড়াবে, না হয় মড়ক ছিন্ন ভিন্ন করে খাবে। একই মুহূর্তে দুটো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা সৃষ্টিলোকে মানুষই হচ্ছে এমন সত্তা, যা একই সময় পরস্পর বিরোধী কাজ করতে সক্ষম। কোনো মানুষ পরস্পর বিরোধী ব্যাপারাদিকে একই সময় বিন্যস্ত ও সমন্বিত করতে পারে।[২]

হাক্সলী মানুষের জীবতাত্ত্বিক বিশেষত্ব বিশ্লেষণ পর্যায়ে বলেছেনঃ "মানুষের সবচেয়ে বড় ও সর্বোত্তম বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রতীকী চিন্তার ক্ষমতা রাখে। পরিভাষিকভাবে বললে বলা যায়, মানুষ সুস্পষ্ট কথা বলতে সক্ষম।"

মানুষের এই বিশেষত্বের দরুনই বহুবিদ সুফল ফলেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান রসম-রেওয়াজ ও ঐতিহ্যের সৃষ্টি। আর এই রসম-রেওয়াজ বা ঐতিহ্যের প্রবৃদ্ধির দরুন মানুষের আরাম-আয়েশের দ্রব্য সরঞ্জামে সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব জেগে উঠেছে। আর তারই দরুন মানুষ এই বিশ্বলোকে বিশিষ্ট স্থান লাভ করতে পেরেছে। বর্তমান সময়ে এই জীবতাত্ত্বিক বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের একক বিশেষত্বসমূহের মধ্যে অন্যতম। মানুষ যে তাতে বিপুল অগ্রগতি লাভ করেছে তা-ই নয়, বরং বিবর্তিত হয়েছে, তার প্রভাব বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। আর জীবনে তার চলোমান পথের বৈচিত্রও অনেক বেড়ে গেছে।

মোটকথা, দুনিয়ার সমস্ত ধর্মমতই মানুষকে সেরা সৃষ্টি বলে মর্যাদা দিয়েছে। এমনিভাবে জীববিদ্যা মানুষকে অপরূপ এক কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার দরুন তার পক্ষে সেরা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভব বানিয়ে দিয়েছে।

বাকশক্তি, রসম-রেওয়াজ ও ঐতিহ্য এবং সংখ্যাগত বিপুলতা মানুষের এমন কিছু বিশেষত্বের সৃষ্টি করেছে যা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের মধ্যে কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

১. নতুন যুগের মানুষ, জুলিয়ান হাক্সলী, পৃ. ৩।
২.নতুন যুগের মানুষ, জুলিয়ান হাক্সলী, পৃ. ৩।

তন্মধ্যে বড় বড় বিশেষত্বসমূহ খুবই পরিচিত ও সুস্পষ্ট। এ কারণে আমি তার উল্লেখের প্রয়োজন মনে করছি না। বরং বহু সংখ্যক অপরিচিত বিশেষত্ব সম্পর্কে কথা বলা উত্তম মনে করছি। কেননা মানব জাতি তার খালেস জীবতাত্ত্বিক গুণের দিক দিয়ে এক বিরল প্রজাতি বিশেষ। সেসব গুণের প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব কখনোই আরোপ করা হয়নি। তা প্রাণীবিদ্যার দৃষ্টিকোণ দিয়েই হোক কিংবা সমাজবিদ্যার দৃষ্টিকোণ দিয়ে।

...শেষ কথা, বিবর্তনের পথে অগ্রসরমান প্রাণীগুলোর মধ্যে মানুষের কোনো প্রতিরূপ নেই। নেই তার কোনো দৃষ্টান্ত।

নব্য ডারউইনবাদ মানুষের এই স্বতন্ত্র বিশেষত্ব কিংবা বিশেষত্বের এই স্বাতন্ত্র্য ও এককত্বের কথা অকপটে ঘোষণা করেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দিক দিয়ে নয়। কেননা হাক্সলী তো কট্টর নাস্তিক, সে তার নাস্তিকতার কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণাও করেছে। তা সত্ত্বেও মানুষ সম্পর্কে উক্ত রূপ কথা নিছক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত ও গবেষণাকেন্দ্রিক বা প্রয়োগশালায় প্রাপ্ত তত্ত্ব হিসেবেই বলা হয়েছে।

কিন্তু ডারউইন কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক সনদ ছাড়াই খুব তাড়াহুড়া করেই মানুষের পশু হওয়ার কথাটি ঘোষণা করে দিয়েছেন। কেননা তাঁর সম্মুখে তো অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল। আর তা-ই তাঁকে মানুষের এই জন্তুর বা পাশবিক ব্যাখ্যা জনিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর এই তাড়াহুড়া করা উচিত হয়নি, বরং ধৈর্য ধারণ করা উচিত ছিল, যতক্ষণ না প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, যেমন করে নব্য ডারউইনবাদের সম্মুখে তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং তা মানুষকে মানুষ বলেই ঘোষণা দিয়েছে।

মানুষের এই পাশবিক ব্যাখ্যা যখন বিতাড়িত শয়তানের মতই মানুষের চিন্তায় ও চেতনায় ও আকীদার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে ফেলল, তখন তা এমন এক সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটালো, যা ইতিহাসের কোনো জাহিলিয়াতই ঘটাতে সক্ষম হয়নি। তা মানুষের গোটা জীবনকে বিকৃতি করে দিয়েছে। তাকে জন্তু-জানোয়ারের স্তর থেকেও নিম্নে ফেলে দিয়েছে। মানুষ হয়েছে পশুর চাইতেও অধিক বিভ্রান্ত। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে।

মানুষের চরিত্র ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যৌন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। চিন্তা চেতনার দেহকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, মানব জীবনের মানবীয় ব্যাখ্যা ছাড়া আর সব ধরনেরই ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যার উপস্থাপক হচ্ছে কার্ল মার্কস। তা মানব জীবনের সম্পূর্ণটার ব্যাখ্যা দিয়েছে পশুত্বের দিক দিয়ে। এই ব্যাখ্যানুযায়ী মানবীয় ইতিহাসের

মৌল বিষয়বস্তু হচ্ছে খাদ্যালোচনার ইতিহাস। অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, মানব জীবনের ওপর সবচেয়ে প্রভাবশালী পরাক্রমশালী প্রয়োজন হয়েছে খাদ্য।

আর বস্তুগত উৎপাদন হচ্ছে তা-ই, যা মানুষের অস্তিত্ব ও তাদের চিন্তা চেতনার সাহায্যকারী অর্থাৎ মানুষের ভাষাগত মর্যাদা ও মূল্যমান এক অস্থায়ী বিলীয়মান জিনিস, তাতে অক্ষয় মৌল পদার্থ কিছু নেই। জীবন ও মানুষের জন্যে তার বস্তুগত দেহ কাঠামোই হচ্ছে একমাত্র স্থায়ী বিশেষজ্ঞ।

তাছাড়া এই ব্যাখ্যা ডারউইনীয় তত্ত্ব থেকেই বির্তনবাদী চিন্তাটা গ্রহণ করেছে। আর তা সমস্ত মূল্যবোধ মূল্যমান এবং এ পর্যন্ত চলে আসা সকল হিসাব-নিকাশই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।

ভাবগত মূল্যমান বস্তুগত মূল্যমানের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী। আর তাই বিবর্তনশীল। কোনো একটি অবস্থাই স্থিতিশীল হয়ে নেই। তাতে কোনো চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য বা ন্যায়পরতা বলতে কিছুই স্বীকৃতব্য নয়। বস্তুত মূল্যমান মূল্যবোধই চিরন্তন ও অব্যাহতভাবে পরিবর্তনশীল। সমস্ত ভালো ও শুভই হচ্ছে অর্থনৈতিক, বস্তুগত ও সুনির্দিষ্ট বিবর্তনের ফলশ্রুতি। ফলে আজ যা ভাল ও শুভ, কালই তা অত্যন্ত হীন, নিকৃষ্ট ও মন্দ। কোনো অর্থনৈতিক, বস্তুগত ও উৎপাদনগত স্তর পরিবর্তিত হলে সবকিছুই বদলে যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আর এটা শুধু ধরে নেওয়া বা কল্পিত কথা নয়। এটাই নাকি মহাসত্য ও পরম তত্ত্ব!

এ দৃষ্টিতে জায়গীরদারী সামন্তবাদী সমাজের ধর্ম পালন একটা বিশেষত্ব বা শুভ কাজ রূপে বিবেচিত। কিন্তু শিল্পস্তরে সেই ধার্মিকতাই হবে পশ্চাদপদতা, স্থবিরতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। নাস্তিকতাও একটা বিশেষ গুণ বৈশিষ্ট্য। আর নৈতিক পবিত্রতা, সতীত্ব ও যৌন রক্ষণশীলতার জায়গীরদারী সামন্তবাদী সমাজে যথেষ্ট মূল্য স্বীকৃত হলেও বিবর্তনশীল শিল্পোন্নত সমাজে তা খুবই হাস্যকর ও কৌতুকবহ। কেননা এই সমাজে নারী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন হয়ে আছে। পুরুষরা তাদের জন্যে অর্থব্যয় করার সুযোগ লাভে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার এবং তাদের আচার আচরণে বিশ্বাসী পবিত্রতা রক্ষার দাবি জানানোর কোনো অবকাশই এখানে পেতে পারে না। পুরুষরা নারীদের প্রতি উক্তরূপ দাবি রাখলেও তারা নিজেরা কিন্তু সকল বাধা বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। তারা নিজেরা নিজেদের চিন্তা চেতনায় ও বাস্তব কাজে কর্মে পবিত্র থাকার কোনো বাধ্যবাধকতাই মেনে চলে না। কোনো নতুন খোদা— তা পাশ্চাত্যের মূলধন হোক, কি প্রাচ্যের রাষ্ট্রই হোক— কাউকেই এরূপ করতে বলে না। মানুষ পবিত্র চরিত্র থাকুক, কি নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত

হোক সে জন্যে সেই নতুন খোদার দিক থেকে যেমন তাগিদ বা দাবি কিছু নেই, তেমনি সে জন্যে তো সাহায্য-সহযোগিতাও করছে না। বরং সে নব খোদা মানুষকে শেষোক্ত অবস্থার জন্যেই অধিক সহায়তা-সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

এ ব্যাখ্যা মানুষের কেবল বস্তুগত ও পাশবিক জীবনকেই সম্মুখে রাখে। রূহ্‌কে ঠাট্টা ও বিদ্রূপবাণে করে অপমানিত। কোনো বর্তমান জাহিলিয়াত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী নয়, মানুষের দেহ কাঠামোর মধ্যে যে আল্লাহ্‌র 'রূহ' অধিষ্ঠিত, তার প্রতিও তার ঈমান নেই।

মানুষের যৌনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ভয়াবহ গুমরাহী ও বিপথগামিতার বড় প্রবর্তক হচ্ছে ফ্রয়েড। ফ্রয়েড মানুষকে শুধু পশু বা জন্তু বানিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, এক বীভৎস আকার-আকৃতি সম্পন্ন পশু বানিয়ে ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষের সমস্ত কাজের মৌল উৎস হচ্ছে যৌনতা।

পশুরা যখন খাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে, তখন খায়। আবার পিপাসা লাগলে পান করে। দৌড়াবার ইচ্ছা হলে দৌড়াতে শুরু করে, আবার যখন যৌনতার তাড়না অনুভব করে তখন যৌনতৃপ্তি লাভের কাজে নিমগ্ন হয়।...কিন্তু ফ্রয়েড চিত্রিত বীভৎস জঘন্য মানুষ! সে যখন মা'র স্তন চোষে, তখন তা করে যৌন সুড়সুড়ি লাভের জন্যে। ফ্রয়েড মানুষকে বিকৃত চেহারার জন্তুই বানিয়ে ছেড়েছেন। তাই মানব শিশু তার বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষে সেই যৌনসুখ লাভের জন্যে। প্রস্রাব-পায়খানা করে যৌণ সুখ পায় বলে, তার গ্রন্থিসমূহ নাড়ায় এই যৌন সুখের আশায়। যৌন সুখের তাড়নায়ই সে তার মা'র প্রতি প্রেম বোধ করে। কিন্তু ফ্রয়েড চিত্রিত মানুষ-পশুর শিশু এখানে পৌঁছেও থাকে না। তার গোটা ভাবগত সত্তা, তার ধর্মপালন, নৈতিকতা ও ঐতিহ্যানুসরণ সবকিছুই যেন দাউ দাউ করে জ্বালানো যৌন-অগ্নির তাপে ও ধাক্কায়ই অনুষ্ঠিত হয়।

আর মানুষের চিন্তা-চেতনার বা মনস্তত্ত্বের যে দেহাবয়ব কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার উদ্ভাবক হচ্ছেন বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপন্থী বিজ্ঞানীরা। তাঁরা গোটা জীবনেরই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন দেহকেন্দ্রিক, যেন মানুষও প্রাণী বা জন্তু-জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই দৃষ্টিকোণে চিন্তা-চেতনা ও ভাবনা-মতবাদ সবই বৈদ্যুতিক, মাংসপেশী কেন্দ্রিক ও রাসায়নিক।

যৌন-ইন্দ্রিয়ই যৌন চেতনার উদ্‌গাতা।

মাতৃত্ব ইন্দ্রিয়ই মাতৃপ্রেম ও মাতৃচেতনা সৃষ্টি করে।

কাজের-ইন্দ্রিয়ের কারণে বীরত্ব কিংবা ভীরুতার সৃষ্টি হয়।

আর চর্মেন্দ্রিয়ের কারণে স্নায়ূবিক ভারসাম্য কিংবা শীতল মেজাজ গড়ে ওঠে। স্যার উইলিয়ম জেম্‌স[১] তাঁর 'ঝোঁক প্রবণতা মতাদর্শ' গ্রন্থে বলছেন ঃ

ঝোঁক প্রবণতা ও বাৎসল্য আকর্ষণ পর্যায়ে লোকেদের সাধারণ মতাদর্শ হচ্ছে, কোনো জিনিসের এমন বুদ্ধিগত উপলব্ধি, যার দরুন সজ্ঞাগত অবস্থায় উচ্ছ্বাস-উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমার নিজের মত হচ্ছে, কোনো উত্তেজকের উপলব্ধির তাৎক্ষণিক পরবর্তী সময়ে দেহে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আর যে অনুভূতি আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তা সেই পরিবর্তনসমূহের ফলশ্রুতি আর এরই নাম ঝোঁক বা প্রবণতা, আকর্ষণ।

কথার সারনির্যাস হচ্ছে, 'মন' দেহেরই ফসল। তা মানবীয় স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ ও রূপায়ণে কোনো মৌলিক ও আণবিক গুরুত্বের অধিকারী নয়। 'মন' দেহেরই অনুসারী মাত্র। দেহ থেকেই মনের উৎপত্তি।

মানবীয় জীবনের এই সব ব্যাখ্যার বহু সমালোচনা ইতিপূর্বে আমার লিখিত আরও কয়েকটি গ্রন্থে পেশ করেছি।[২] এখানে অধিক কিছু আলোচনা-সমালোচনার তেমন প্রয়োজন নেই। মানব জীবনের যে দিকটি এসব ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা অত্যন্ত বীভৎস এবং বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। অবশ্য পথ উজ্জ্বলকারী কিছু জরুরী বিষয়ের উল্লেখ এখানে করে দিচ্ছি।

---

১. উইলিয়াম জেমস মনস্তত্ত্বের পরীক্ষণ পন্থীদের অগ্রনেতা।

২. কয়েকখানি বইয়ের নামঃ الانسان بين المادية ولاسلام - معركة التفاسد دراسات فى النفس الانسانية التطور والثبات- فى حياة البشريه-

বস্তুত মানব জীবনের ওপর উদ্ভব সব কটি ব্যাখ্যাই চরম পূঞ্জীভূত গুমরাহীর শিকার। এই সবগুলোই মানুষের কেবল মাত্র দেহ-সংস্থা কেন্দ্রিক ব্যাখ্যাই দিচ্ছে এবং তা মানব জীবনের সকল দিকের ওপর একটি নিম্নমানের ও নগণ্য দিককে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দিয়েছে। মানবতার এই নগণ্য ও হীন দিকটি হচ্ছে মানুষের দেহ ও তার প্রয়োজনাবলী। পরে এই সমস্ত ব্যাখ্যার সম্পর্ক একই মৌলিক মতাদর্শের সাথে মিলিত সম্পৃক্ত। তাতে মানুষকে চূড়ান্তভাবে জন্তু বা পশু মনে করে নেওয়া হয়েছে।

মানবতা সম্পর্কে প্রতিটি আংশিক বা খণ্ড মতাদর্শই ভুল। কেননা সে ব্যাখ্যা অন্য সব দিককে অর্থহীন করে দিয়ে মানুষকে এমন এক বীভৎস চিত্রে উদ্ভাসিত করে যার প্রকৃত বাস্তবতার সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। আর এই আকৃতিটি আরও অধিক কুৎসিত ও বীভৎস হয়ে যায়, যখন সমগ্র মানবাত্মাকে সেই পক্ষপাতদৃষ্ট মতাদর্শকে কেন্দ্র করে আবর্তিত করে দেবতা এবং মানুষকে সেই একই দৃষ্টিতেই বিচার করা হয়।

আরও মজার ব্যাপার এই যে, মানবতার সে দিকটির প্রতি এসব ব্যাখ্যা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি, আসলে তাই হচ্ছে মানবতার সেই বিরাট দিক, যার জন্যে মানুষ 'মানুষ' নামে অভিহিত হয়েছে এবং জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে অর্থাৎ এসব ব্যাখ্যাই রূহকে উপেক্ষা করেছে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এক মুঠো অন্নের সন্ধানকেই মানবীয় চিন্তা-চেতনার উদ্বোধক ও পথ-প্রদর্শক বানিয়ে দিয়েছে।

মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্মের যৌনতাভিত্তিক ব্যাখ্যা মানবতাকে যৌনতার গভীর পংকিল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।

চিন্তা-চেতনার দেহকেন্দ্রিক ব্যখ্যা দেহকেই মানবীয় মনস্তত্ত্বের উৎস বানিয়ে দিয়েছে। এ ভাবে সব কয়টি ব্যাখ্যাই রূহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। মানব জীবনে তাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। গুরুত্ব দেয়নি পৃথিবীর বুকে তার জীবন্ত বাস্তবতাকে। এ সব কয়টি ব্যাখ্যাই মানুষকে জন্তু বা পশু পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মানুষকে নিতান্ত পশু ছাড়া আর কিছুই মনে করা হয়নি। এ-ও দেখেনি যে, মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বহু দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিরাট ও মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে।

জন্তু-জানোয়ার খাওয়ার সন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

জন্তু-জানোয়ার যৌন মিলনও সাধন করে।

আর সে সবের এ সব কার্যকলাপের মৌল উৎসও সেই দেহ-ই।

তাহলে মানুষের আকার-আকৃতি জন্তু-জানোয়ার থেকে ভিন্নতর হলো কেন?

এতদুভয়ের জীবন পথই বা কেন ভিন্ন ভিন্ন হলো।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এ সকল ব্যাখ্যায় মানুষের প্রকৃত ও পর্যবেক্ষিত অবস্থার বাস্তবতার ওপর কোনো দৃষ্টি রাখা হয়নি, সেই দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষাই করা হয়েছে।

অথবা বলা যায়, হীন ও জঘন্য শয়তানী প্ররোচনায় পড়ে ইচ্ছা করেই মানুষকে নিকৃষ্ট পশু চরিত্রের চিত্রিত করা হয়েছে, পশু সাব্যস্ত করে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়েছে।[১]

প্রকৃত ব্যাপার যা-ই হোক, এ সব ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা ব্যাখ্যায় 'মানুষ'-এর সত্যিকার ব্যাখ্যা পেশ করা সম্ভব হয়নি, এটাই হলো আসল কথা। আর সত্যি কথা, মানুষ সম্পর্কে নির্ভুল ব্যাখ্যাদান এ সবের পক্ষে আদৌ সম্ভবও নয়।

মানুষ তার যে কোনো ধরনের তৎপরতায়ই খাদ্য, যৌনতা, বাসস্থান, কিংবা পোশাকের সন্ধানে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে পথেই এই তৎপরতা শুরু হয়ে থাকুক, শেষ পর্যন্ত তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সংস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তার মৌল নিয়ম বিধানও গড়ে তুলেছে এ সব সংগঠন-সংস্থাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তা কেন এবং কিভাবে সম্ভব হলো ?.....এ সব কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট মৌল নিয়ম-বিধান বাদ দিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা চালাতে তারা অসমর্থ হলো কেন ?...তা কি তারা করতে পারত ?

মানুষ কেন শুধু পেট ভর খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না ? তাও খাচ্ছে তারা এক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রজনৈতিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে— তা সঠিক হোক, কি বে-ঠিক। এ এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। এভাবেই তাকে তার খাদ্যের অংশ পেতে হয়। আর তার এই ভাবা এবং তা গ্রহণ পদ্ধতির ওপর প্রশাসনিক ও সামাজিক ব্যবস্থা এবং লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিশ্চিত অবিনার্যতা প্রতিফলিত হয় কেন ? কেন এই সব একটা বিশেষ ধরনে ও পদ্ধতিতে চলতে থাকে।

মানুষ তার যৌন ক্ষুধা কেবলমাত্র যৌন আবেগ-উচ্ছ্বাসের অধীন পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ করে না কেন? কেন তা করার জন্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার আবশ্যকতা বোধ করে ?...তা যথার্থ নীতিভিত্তিক হোক, কি ভুল নীতিমূলক— সে তো স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই সংস্থাই তার যাবতীয় প্রয়োজন পরিপূরণের পথ নির্ধারণ ও প্রশস্ত করে দেয়। তার ওপর নিশ্চিত অনিবার্যতার ফলাফলই বা প্রবর্তিত হয় কেন ?

---

১. التطور والثبات গ্রন্থে তিন ইয়াহুদী অধ্যায় পাঠ করুন।

এভাবে মানুষের যাবতীয় তৎপরতাই সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। মানুষ ইচ্ছা করুক আর না-ই করুক, তার সে সব তৎপরতা সুসম্পন্ন করার জন্যে কতিপয় সংগঠন ও সংস্থা গড়ে উঠবেই এবং সে জন্যে কিছু মূল্যমান, চিন্তা-বিবেচনা ও আকীদা-বিশ্বাস, তা ভুল হোক কি নির্ভুল— ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া হবে। কিন্তু কেন ? কি ভাবে ?

এ সবই মূলত একই মহাসত্যের ফলশ্রুতি আর তা হলো, মানুষ দেহ ও রূহ এই দুটির সমন্বয়। এ দুটি এমনভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত যে, কখনোই একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। উক্ত ব্যাখ্যাসমূহে যেভাবে ধারণা দেওয়া হয়েছে, তা কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

মূলত এ সব ব্যাখ্যাই ভুল, ভিত্তিহীন ও তাৎপর্যশূন্য। এ সবই হচ্ছে জাহিলিয়াত। আর আল্লাহ্‌র হেদায়েত থেকে সম্পর্কছিন্ন করার ফলে সৃষ্ট জাহিলিয়াতেরই উৎপন্ন ফসল। আল্লাহ্ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও দূরে সরে থেকে জীবনের যে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তারই ফলে এসব ভ্রান্ত ধারণা ও জাতিলিয়াতের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে।

মানব মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে আধুনিক জাহিলিয়াত কেবল এই একটি ভুল বা বিপথগামিতারই সৃষ্টি করেনি। মানুষের দেহ ও রূহ-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দ্বৈততা সৃষ্টির বিপথগামিতা বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলছে। শুধু তাই নয়, তাতে 'রূহ' কে কোণঠাসা করে দেহকেই অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো 'রূহ' তো সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। অথচ জাহিলিয়াত আল্লাহ্ থেকে পালিয়ে দূরে সরে যেতে প্রতিনিয়তই সচেষ্ট। আল্লাহ্‌র সুউজ্জ্বল আয়াতসমূহ থেকে পাশ কাটিয়ে চলারই এই জাহিলিয়াতের স্থায়ী নীতি। তার কাছে মানুষের দৈহিক চাহিদা-কামনা-বাসনা লালসারই গুরুত্ব সর্বাধিক। আর এই কারণে মানব জীবনের গোটা ব্যাখ্যাই এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা হয়েছে। যদিও এরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত অবস্থায় মানুষের কোনো অস্তিত্বই এই দুনিয়ায় নেই।

কিন্তু এ বিপথগামিতা এখানে এসেও শেষ হয়নি, থেমে যায়নি।

জাহিলিয়াত যখনই আল্লাহ্‌র হেদায়েত— পথ ও পন্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তখন তার সমস্ত ধারণাই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। সে ভারসাম্য তো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র পদ্ধতি গ্রহণ করলেই এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া হেদায়েতের ভিত্তিতে মানব জীবনের ও বিশ্ব প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হলেই রক্ষা পেতে পারে।

এ ভারমাস্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে সব মানদণ্ডই অকেজো ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে, এক্ষণে মানব সত্তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের বাহ্যিক অবস্থার ওপরই বর্তমান জাহিলিয়াত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে। কোনো কোনো জাহিল

চিন্তাবিদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে। আর কিছু সংখ্যক জাহিলিয়াতপন্থী দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে মানুষের সামাজিক সামষ্টিক রূপের ওপর। প্রথমটি মানুষের সামষ্টিক দিকটিকে অস্বীকার করেছে, আর দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে। কেউ একটিকে অধিক মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছে, আবার কেউ অপরটিকে। ফলে বিপর্যয়, বিকৃতি ও বিপথগামিতা সর্বাত্মক— সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র যেখানে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সমাজ সমষ্টি একটি বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী জালিম শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তিসত্তকে তথায় কোণঠাসা করে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিলীন করে দিতে সচেষ্ট।

পক্ষান্তরে সামাজিক সামষ্টিকতা যেখানে সত্য হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তথায় ব্যক্তিরা জালিম, সমাজ বিরোধী নীতিতে অগ্রসর এবং শোষণ নির্যাতনে দক্ষ হস্ত। ব্যক্তি তার নিজ ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সমাজ সমষ্টিকে করে ছিন্নভিন্ন। সেজন্যে সমাজ-সমষ্টির ওপর মরণাঘাত হানতেও দ্বিধা করে না। সমষ্টির নামে ব্যক্তি জাতীয় ধন-সম্পদ লুটে পুটে নিয়ে যায়। সম্পূর্ণ হারাম কামাই রোজগারে নিজেকে ধনশালী বানায়।

আধুনিক জাহিলিয়াতের ধারণায় এই উভয় দিক কখনোই ভারসাম্যপূর্ণভাবে একত্রিত হতে পারে না। এই দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোনো পন্থা জাহিলিয়াতের জানা নেই।

পরে এই দুটি বিকৃত বিপথগামী ধারণার উৎস থেকেই সংস্থাসমূহ গড়ে ওঠে রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে ও সমাজ সমষ্টিতে।

কিন্তু কেন?

জাহিলিয়াত বাস্তব ও প্রকৃত সত্যকে কেন দেখতে পায় না ?... কেন বুঝতে পারে না– বুঝতে রাজি হয় না যে, মানুষ উক্ত উভয় দিকের সমন্বয়ই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারে ? মানুষ স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি, একথা সত্য; কিন্তু সেই সাথে এ-ও সত্য যে, ঠিক সেই একই সময়ের মানুষ সমাজেরও অঙ্গ বা অংশ। ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি মানুষ নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় স্বতন্ত্র। সে তা বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট। কিন্তু সেই সাথে সে সমাজ-সমষ্টির সদস্য হিসেবে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে একান্ত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। তাদের সংস্পর্শে থাকার জন্যে হয় সদা আগ্রহী। এই মানুষগুলো পরস্পরের সাথে গভীর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

বস্তুত ব্যক্তি ও সমষ্টি বা সমাজ— এ দুয়ের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব নিহিত। কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে দুটির অস্তিত্ব একসাথে মনের অভ্যন্তরে ও বাইরের বাস্তবতায় বর্তমান নেই। সেই সাথে এ দুটির মধ্যকার দ্বন্দ্ব অনেকটা প্রশমিত করে ও তার তেজ কমিয়ে এ দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সৃষ্টি করাও যে সম্ভব, তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কোনো আল্লাহ্ প্রদত্ত পন্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন সুন্দরভাবে ভারসাম্যপূর্ণ করা খুবই সম্ভব, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, জাহিলিয়াত কখনোই সঠিক সুস্থ ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয় না। কোনো সে পথ তো আল্লাহ্র দেখানো পথ।

উক্ত জাহিলিয়াতের কারণেই মানুষের ধারণা ও জীবনাচরণ অসংখ্য প্রকারের বিপর্যয়, বিকৃতি ও বিপথগামিতার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা অবশ্য এই অধ্যায়ে কেবল ধারণা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা আলোচনা করতেই আত্মনিয়োগ করেছি। আমরা সর্ব ক্ষেত্রেই আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখব।

এক কথায় মানব জীবনে সৃষ্ট সকল বিপর্যয়ের মৌল উৎসই হলো আল্লাহ্ থেকে দূরত্ব, আল্লাহ্র ইবাদত অস্বীকার করা। আর তা থেকেই উৎসারিত হয়েছে মানবীয় মনস্তত্বের ধারণা জাহিলিয়াত। সেই কারণেই মানুষের পরস্পরে ব্যক্তি সমষ্টি দুই বিপরীত লিংগ, গোষ্ঠী ও জাতি হিসেবে পরস্পরের মধ্যে অবস্থিত সম্পর্কের ধারণা সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি।

ব্যক্তির নিজেরই দুটি দিক; সে নিজে এবং তার মন। বলা হয়েছে যে, এই দুটির পরস্পরের মধ্যে এত অসংখ্য দ্বন্দ্ব যা গুণে শেষ করা যায় না। তা সম্ভবও নয়। জাহিলিয়াত এই দ্বন্দ্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে। ফলে এ দ্বন্দ্ব কোনো সময় এত সাংঘাতিক হয়ে পড়ে যে, পৃথিবীতে তার বদৌলতেই অগ্রতি, উন্নতি ও ইতিবাচক কার্যক্রমকে একমাত্র উন্নত উপায় বলে ধারণা করা হয়। আর মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তি, শান্তি, নির্লিপ্ততা নেতিবাচক, রোগাক্রান্ত। মানুষের উচিত তারও উর্ধ্বে ওঠে যাওয়া। তাদের উপরোদ্ধৃত ব্যাখ্যাসমূহে বলা হয়েছে যে, মনের অস্থিরতা অতীব পবিত্র। তার দরুনই জীবন সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আমরা দেখছি, তাদের মনের এই পবিত্র অশান্তি ও অস্থিরতা তাদেরকে সম্মুখের দিকে ঠেলে নিয়েছে। কিন্তু তা শান্তি-স্বস্তি-সমৃদ্ধির দিকে নয়। ঠেলে নিয়েছে চরম অস্থিরতা, উদ্বেগ, কাতরতা, পাগলামী, শ্বাসরুদ্ধতা এবং স্নায়ুবিক-মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি ও বিপর্যয়ের দিকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও বিবেক-বুদ্ধিগত রোগের হাসপাতালসমূহে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের ভিড়ে তিল ধারণেরও স্থান বাকী নেই। পাগলামীকে

তারা নাগরিক জীবনের রোগ মনে করেছে এবং স্নায়বিক বিকলাঙ্গতাকে তারা ধরে নিয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ।

হ্যাঁ, এটাই জাহিলিয়াত। জীবন্ত সুস্থ মানুষের তৎপরতা ও মনের অশান্তি-অস্থিরতা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, কখনোই এক জিনিস নয়, তা এই জাহিলিয়াতের পক্ষে বোধগম্যও হচ্ছে না।

প্রাথমিক কালের মুসলমানরা ছিলেন সর্বাধিক কর্মতৎপর ও কর্মব্যস্ত জনগোষ্ঠী। ইতিহাসে এ ধরনের একনিষ্ঠ কর্মব্যস্ত জনগোষ্ঠী আর কখনোই দেখা যায়নি। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাঁরা অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন ইসলামের বিজয় পতাকা হাতে নিয়ে। তাঁদের জ্ঞান বিজ্ঞান ভিত্তিক আন্দোলন ছিল সর্বব্যাপক ও বিজয়ী। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ তাঁদের হস্তেই গড়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাখ্যায় চিন্তাভিত্তিক মতাদর্শ এবং সমাজ -সমষ্টির ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন ছিল তাদের দায়িত্ববোধের উৎস। বিভিন্ন বিষয়গত ফিক্‌হী মতের শিক্ষালয়সমূহ তাঁদের হাতেই গঠিত, কর্মতৎপর ও গতিশীল হয়ে উঠেছিল। এই সব কিছুই এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল যে, তার চাইতেও কম সময় এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। মানুষ ছিল জীবন্ত, গতিশীল, অনলস-অবিশ্রান্ত পরিশ্রমী। কিন্তু অত্যন্ত শান্ত-শ্লিষ্ট সুস্থ ও স্বস্তিপূর্ণ মন-মানসিকতা সহকারেই তারা এই বিরাট ও তুলনাহীন কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। কোনো তাঁরা তাঁদের এই সব জ্ঞানগত কাজ ও বাস্তব কর্মতৎপরতা দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডেকে নিচ্ছিলেন। ফলে আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণেই তাঁদের হৃদয় ছিল সদা শান্ত-প্রশান্ত, নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ ও নিরুদ্বিগ্ন।

ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার সম্পর্কটিও এক চিরন্তন দ্বন্দ্বরূপে চিত্রিত করা হয়েছে বর্তমান জাহিলিয়াতে। এ দুয়ের মধ্যে তা এত কঠিন সংঘর্ষের কারণ ঘটিয়েছে ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে যে, তা গণনা করাও যায় না, সংযত করাও সম্ভব নয়। এরই ভিত্তিতে বর্তমান জাহিলিয়াত জীবন ও মানুষের ব্যাখ্যা পেশ করেছে। আর তা হচ্ছে, অত্যন্ত কঠিন নির্মম ও ন্যাংটা জাহিলিয়াতের দেওয়া ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাই ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে কঠিন সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে নিশ্চিত অনিবার্যতা সহকারে। তা থেকে নিষ্কৃতির কোনো পথই খোলা নেই। এতদুভয়ের মধ্যে মধুর মিষ্টি প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কোনো দিনই সম্ভব হতে পারে না।

কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সত্য ও মিথ্যার— 'হক্' ও বাতিলের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নয়। অথচ আল্লাহ্ যে মানুষকে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান বানিয়েছেন, তাদের মধ্যে এরূপ দ্বন্দ্ব আদৌ কাম্য হতে পারে না। কাম্য হতে পারে শুধু সত্য ও মিথ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব মাত্র।

কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াত 'হক' ও 'বাতিল' চিনে না। হক–সত্য, ন্যায়পরায়ণতা ও চিরন্তন সুবিচারকে তা অসহ্য অশ্রাব্য ভাষায় বিদ্রূপ করে। তার কাছে কাম্য হচ্ছে এক শ্রেণীর স্বার্থ ও অন্য শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যকার চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। কিন্তু তা নৈতিকতার মানদণ্ডে কখনোই যাচাই বা ওজন করা চলে না। এবং একটিকে 'হক' ও অপরটিকে 'বাতিল' মনে করা যায় না। কোনো একটি শ্রেণী 'হক্'-কে অতিক্রম করলে কিংবা মানুষের জন্যে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা কেউ লংঘন করলেও বলা যাবে না যে, এই শ্রেণী বা গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তি অন্যায় বাড়াবাড়ি করেছে ও ন্যায়পরায়ণতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কেননা বর্তমান জাহিলিয়াতের দেওয়া ধারণানুযায়ী প্রতিটি শ্রেণীই স্বীয় স্বার্থের দিক দিয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে অনিবার্যভাবে তা অতীব কল্যাণকর এবং তা অবশ্যই ও নিশ্চিত অনিবার্যতার ভিত্তিতেই হতে হবে, তাহলে-ই না তাদের স্বার্থ বিনষ্টকারী বা অপহরণকারী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এ দ্বন্দ্ব মানবতার কল্যাণে নয়, নয় সত্যের জন্যে চিরন্তনের সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্যে। বরং তা যে শ্রেণীটি নবতর অর্থনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, তা তারই জন্যে।

হ্যাঁ, আজকের জাহিলিয়াতে কার্যত এরূপেই ঘটেছে। এখানে প্রত্যেকের কল্যাণবোধ বা স্বার্থচিন্তা ভিন্ন ভিন্ন এবং তা পরস্পর সংঘর্ষশীল। এতে বিজয়ী হওয়া অবধারিত তার পক্ষে, যার হাতে কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা নিবদ্ধ। আর মার্কসীয় জাহিলিয়াতের ধারণায় প্রোলেটারিয়েট শ্রেণীই শেষমেশ বিজয়ী হবে এবং তার ফলে সমস্ত শ্রেণীই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তখনই হবে সমস্ত বিশ্বলোকের পরিসমাপ্তি— চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিলয়।

নারী ও পুরুষ— এই দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান জাহিলিয়াতের মধ্যে যে বিপর্যয় ও বিকৃত ঘটেছে, তা হচ্ছে বীভৎসতম ও কলুষতম বিপর্যয়। বর্তমান জাহিলিয়াতের দৃষ্টিতে যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিছকই একটা জৈবিক ও দৈহিক কার্যক্রম মাত্র। তার সাথে নৈতিকতার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। যৌনক্রিয়া পরিহার সম্পর্কের আওতার মধ্যে সীমিত থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যৌনক্রিয়াই হচ্ছে মানব সত্তার পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ বাস্তবায়নের প্রধান উপায়। যৌন আবেগই হচ্ছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের বড় মাধ্যম। উন্মুক্ত ও বাধা নিষেধ বিমুক্ত যৌন চর্চাই হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা।

যৌনতা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাতে ভারসাম্য রক্ষিত হওয়া বা বিঘ্নিত হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কেউ যদি তাতে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে, তাহলে চলতে পারে আর যদি কেউ তা বিঘ্নিত করে, তা করাও তার ইচ্ছাধীন।

জাহিলিয়াতের এ ধরণের কথাবার্তা বা মতাদর্শের কোনো সীমা সংখ্যা নেই। আর এ সবই যৌনতার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের অকাট্য প্রমাণ। সত্যিকথা, যৌনতার ব্যাপারে মানুষের স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ আচার সব কয়টি জাহিলিয়াতই সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। আর তার পরিণতিতে যৌনতার ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার সৃষ্টি করেছে ব্যাপকভাবে। মানবতার ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ্‌র পদ্ধতি থেকে বিভ্রান্ত জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত জাতি-জনগোষ্ঠীসমূহ পরস্পরের ওপর ঠিক হিংস্র জন্তুর মত ঝাপিয়ে পড়ার ও জয় বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এদের পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই যেন কল্পনা করা যায় না। যখনই তারা পরস্পরের মুখোমুখী হয়, হয় জাতীয়তার সীমারেখার মধ্যে, ঠিক যেমন জন্তু চারণভূমিতে একত্রিত হয় কিংবা মিলিত হয় যৌনতার সীমার মধ্যে অথবা পারস্পরিক মিলিত স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্ট মানবতাবাদের ভিত্তিতে মানবীয় রীতিনীতি অনুযায়ী তারা কখনোই একত্রিত হতে পারে না।

এ-ই হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহিলী ধারণার বাস্তব রূপ। এবং এ পর্যায়ের মাত্র কয়েকটি দিকেরই উল্লেখ করা হলো এখানে।

এক্ষণে মানব মনস্তত্ত্ব ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক তত্ত্বের চরম মূর্খতা ও জাহিলিয়াতের আলোচনা শেষে আলেক্সেস ক্যারেল লিখিত Man The un-known গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃত তুলে ধরা খুবই উত্তম বলে মনে করছি।

আলেক্সিস ক্যারেল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ— ওহীর মাধ্যমে পাওয়া ধর্মের আলোকে নয়— লিখেছেন ঃ

> সত্য কথা হলো মানুষ নিজেকে বুঝবার জন্যে প্রানান্তকরভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং প্রত্যেক যুগেই বিশিষ্ট মনীষী, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ অসংখ্য চিন্তা-ভাবনা পেশ করেছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আমরা আমাদের সত্তা ও অস্তিত্বের মাত্র কয়টি দিকই বুঝতে পেরেছি। আমরা আসলে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থভাবে জানি না। শুধু এতটুকু জানি যে, মানুষ বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ। আর সে উপাদানসমূহও আমাদের মনের উৎপাদন মাত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই কতগুলো ছায়ার পশ্চাতে দৌড়াচ্ছে, আর এ সব ছায়ার পিছনে এমন সত্য হয়ত আছে, যা চির অজ্ঞাত।
>
> আরও সত্য কথা এই যে, আমাদের অজ্ঞতা পুঞ্জীভূত। কোনো মানব জাতি অধ্যয়নরত ব্যক্তিদের সম্মুখে যেসব প্রশ্ন তীব্র হয়ে দেখা দেয় তার বেশির

ভাগেরই কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। আর আমাদের আভ্যন্তরীণ জগতের অনেকগুলো দিকই তখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

"সে যা-ই হোক, একথা স্পষ্ট যে, মনীষী পণ্ডিৎ ব্যক্তিরা মানব অধ্যয়ন পর্যায়ে যত গবেষণার ফলশ্রুতিই পেশ করেছে, তা একেবারেই অযথেষ্ট এবং অধিকাংশই আমাদের নিজেদের সম্পর্কে জ্ঞান-লাভের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে রয়েছে।"

পরে বিজ্ঞানী মানব-তত্ত্ব পর্যায়ে পুঞ্জীভূত অজ্ঞতার যে প্রভাব পড়েছে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সভ্যতার ওপর তার ব্যাখ্যাদান পর্যায়ে লিখেছেনঃ

আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি নিজেকে এক কঠিন অবস্থার মধ্যে আটক পাচ্ছে। কেননা তা আমাদের জন্যে অনুকূল নয় মাত্রই। তা আমাদের প্রকৃতি নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও না থাকার দরুন উদ্ভূত হয়েছে। সেগুলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনজনিত চিন্তা-বিশ্বাসের ফলশ্রুতি মাত্র। মানুষের লালসা-কামনা, ভিত্তিহীন ধারণা, মতাদর্শ ও আগ্রহের আতিশয্যে সেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমান সভ্যতা আমাদেরই চেষ্টা সাধনার ফলে গড়ে উঠলেও তা এই মানুষের পক্ষেই মারাত্মকভাবে অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের আকৃতি ও দৈহিক সংগঠনের সাথে তার কোনো মিল নেই।

"একালের মতাদর্শ পূজারীরা মানবতার কল্যাণের জন্যে নানা সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু এই সব সভ্যতায়ই মানুষের একটা কুৎসিত ও অসম্পূর্ণ ছবিকে সম্মুখে রাখছে। অথচ প্রতিটি ব্যাপার পরিমাপের মানদণ্ড হওয়া উচিত ছিল স্বয়ং মানুষ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ তো তার নিজের গড়া এই জগতে নিজেই অপরিচিত সাব্যস্ত হচ্ছে। এখন মানুষ নিজের এই জগতের সংগঠন নিজে থেকে করতে পারছে না। কোনো মানব প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো বাস্তব জ্ঞান-ই তার জানা নেই। এই কারণেই, জীব-বিজ্ঞান-এর বিপরীতে 'প্রস্তর-বিজ্ঞানের' উন্নতি একটি ভয়াবহ বিপদ হয়ে মানুষের সম্মুখে সমুপস্থিত। আসলে আমরা বড়ই হতভাগ্য। কেননা আমরা বিবেক-বুদ্ধি ও নৈতিকতা—উভয় কি দিয়েই ক্ষয়িষ্ণু ও বিলয়মুখী। যেসব জাতি বর্তমানে বস্তুনিষ্ঠ সভ্যতার শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে তাদেরকে দুর্বলতার শিকার দেখা যাবে। বরং দুনিয়ার সমগ্র জাতির মধ্যে এই চরমোন্নত জাতিগুলোই পুনরায় বর্বরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্ব করে বসবে।"

মানব সংক্রান্ত ধারণায় আধুনিক জাহিলিয়াতের সৃষ্ট সর্বাত্মক বিপর্যয়ের সারনির্যাসই উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে বিধৃত।

আধুনিক জাহিলিয়াত বিকৃতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি এমন একটি ক্ষেত্রও অবশিষ্ট নেই। আর এই সব কিছুই সেই মহা বিপথগামিতারই ফলশ্রুতি, যা সূচিত হয়েছে আল্লাহ্র দাসত্ব অস্বীকৃতি থেকে।

আধুনিক জাহিলিয়াত

আধুনিক জাহিলিয়াত অতীত জাহিলিয়াতসমূহের চাইতেও অনেক বেশি করে মনে করে নিয়েছে যে, দ্বীন বা ধর্ম নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাস্তব জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো ধর্ম হচ্ছে একান্তভাবে ব্যক্তি ও তার আল্লাহ্র মধ্যকার বিষয়। এটাই হচ্ছে ধারণা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জাহিলিয়াতের মৌল বিপর্যয়। কিন্তু ইউরোপের বাস্তবতা এবং ইউরোপীয় অধিকৃত সমস্ত জগতের অবস্থা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয় এবং আল্লাহ্র দাসত্ব অস্বীকৃতির বিপথগামিতা ব্যক্তির যতই অভ্যন্তর মন-মানসিকতার ক্ষেত্রেই বিপর্যয় সৃষ্টি করে না— বীভৎস করে তুলে না, জাহিলিয়াতের এই ধারণা ভুল— বরং তার ছায়াপাত ঘটে মানব জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে। তাই দেখা যাচ্ছে, জীবনের কোনো একটি দিকও আজ বিকৃত ও বিপর্যয়ের প্রচণ্ড আঘাত থেকে এক বিন্দু রক্ষা পায়নি।

এ সত্য ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃতি সমগ্র জীবনকেই বিপর্যস্ত করে। কোনো বিশ্বাস ও আকীদা কেবলমাত্র ব্যক্তি ও তার আল্লাহ্র মধ্যকার এমন কোনো ব্যাপার নয়, যার সাথে বাস্তব জীবনের কোনোই সম্পর্ক নেই। আসলেই তা-ই হচ্ছে জীবনের পরিচালক— চালিকা শক্তি। তাই আকীদা যখন শুরু থেকেই বিপর্যয়ের পথে মানুষকে চালাবে, তখন মানুষের সব কিছুই সেই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবে অনিবার্যভাবে। আর গোটা জীবনই অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরের অতল গর্ভে নিপতিত হবে।

মানুষের আকীদার বিপথগামিতা কিভাবে সমগ্র জীবনকে বিপর্যস্ত করে তা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে দেখেছি। কিন্তু তা শুধু বিশ্বাসের বিপর্যয়েরই ব্যাপার নয়, তা নিশ্চিতভাবে যেমন ধারণা বিশ্বাসের বিপর্যয়, তেমনি বাস্তব জীবন ও আচার-আচরণের বিপর্যয়।

আচার-আচরণে বিপর্যয়

আধুনিক জাহিলিয়াত আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার থেকে যখন বিপথগামী ও বিভ্রান্ত হলো তখন সম্ভবত এই ধারণা করতে পারেনি যে, আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃতি বিশ্বলোক, মানুষ ও জীবন সম্পর্কিত ধারণায় চরম বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে অনিবার্যভাবে। শুধু তাই নয়, শুরু থেকেই তা বাস্তব কর্মজীবনে সূচিত যথার্থতা থেকে বিকৃত লক্ষ্য করতে পারেনি। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে যেন তার অবস্থারই বাস্তব চিত্র অংকিত হয়েছে ঃ

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ -

ওরা শয়তানদেরকে নিজেদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। আর তারা মনে মনে ধারণা পোষণ করছে যে, তারা বুঝি সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েই আছে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৩০)

কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি যে, আকীদা বিশ্বাসে সৃষ্ট বিপথগামিতা জাহিলিয়াতের সকল বিষয়ের ধারণা বিশ্বাসই ব্যাপক বিকৃতি ঘটিয়েছে। ফলে তার উপস্থাপিত যাবতীয় ধারণা বিশ্বাসেই চরমভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। কোনো একটিও সঠিক নেই, কোনো যুক্তির ওপরই কোনো একটি ধারণাও দাঁড়িয়ে নেই। কোনো একটি ধারণাও নয় সত্য ও নির্ভুল। আসলে জাহিলিয়াতকে পরিচালিত করছে কতিপয় ব্যক্তির খাম-খেয়ালী, ভিত্তিহীন ধারণা-কামনা-বাসনা এমনকি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেও বিকৃত ঘটিয়েছে। অথচ জাহিলিয়াতের প্ররোচনায় অনেক লোকেরই ধারণা হচ্ছে, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ভিত্তিহীন ধারণা অনুমান থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। কিন্তু আসলে তা সত্যের বাকচাতুর্য ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের ধারণায় বিজ্ঞানই হচ্ছে সকল ব্যাপারে পবিত্রতা। তা-ই সত্য মিথ্যা নির্ধারক। আর তাতে কোনোরূপ দ্বিধা সন্দেহের স্থান নেই।

আমরা বিজ্ঞানীদের দেওয়া সাক্ষ্যসমূহ ইতিপূর্বেই শুনতে ও পড়তে পেরেছি। জানতে পেরেছি তাদের উক্ত ধারণা কতই না ভিত্তিহীন। তা থেকে এ-ও নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, বিজ্ঞান কখনোই চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলে না, বলতেই পারে না। দিতে পারে না কোনো দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ সত্যভিত্তিক বিশ্বাস। বিজ্ঞান শুধু সম্ভাব্যতার কথা বলে। তা মানুষের নিজস্ব কামনা-বাসনার পুরোপুরি অধীন। মানুষের ধারণার ভিত্তিতেই বিজ্ঞানের দিক নির্দেশ করা হয়, আর সর্বোপরি, বিজ্ঞান শুধু বস্তুর বাহ্যিক দিকের অধ্যয়নের ফসল, প্রকৃত অন্তর্নিহিত মহাসত্য পর্যন্ত তার গতি নেই।

কিন্তু লোকেরা জাহিলিয়াতের প্রভাবে পড়েই মনে করেছে যে, ধারণা বিশ্বাস বিকৃত ও বিপথগামী হলেও বাস্তব জীবন ও আচার-আচরণ অবশ্যই ঠিক হবে। রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও শিল্প সাহিত্য সবই ঠিকভাবে চলবে, কোথাও বিকৃতি দেখা দেবে না। কোনো চিন্তা ও মতাদর্শ এক জিনিস আর বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

মতবাদ-মতাদর্শ তো মানুষের চিন্তার ফসল, মানুষের কামনা-বাসনারই ফলশ্রুতি, কিন্তু বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ বাস্তব ও অভিজ্ঞতার ব্যাপার। তারই ওপর গড়ে ওঠে নানা সংগঠন ও সংস্থা। পূর্বে আকীদার কারণে যা বিপর্যস্ত হয়েছিল তা এক্ষণে সঠিক হয়ে ওঠে, ফলে তা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও সুদৃঢ় হয়।

এই প্রেক্ষিতেই পাঠ করতে হয় কুরআন মজীদের এ আয়াতটি ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا - اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

বলো, আমরা কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব সেই লোকদের অবস্থা, যারা আমলের দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। ওরা সেই লোক, যাদের সব চেষ্টা সাধনাই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে গেছে দুনিয়ার জীবনে। অথচ ওরা মনে মনে ধারণা করেছে যে, তারা খুবই ভালো কাজ করছে। (সূরা কাহাফ ঃ ১০৪)

প্রাচীনকালের একজনের কথাঃ লাঠি বাঁকা হলে তার ছায়া কি কখনও সোজা-ঋজু হতে পারে ?

আর আসলে এটা হচ্ছে জাহিলিয়াত সৃষ্ট আর একটি ভিত্তিহীন ধারণা। বর্তমান জাহিলিয়াতের যুগে বাহ্যিকভাবে ভালো যা-ই সংঘটিত হয়, তা দেখেই ওরা প্রতারিত হয়। কোনো কোনো ব্যাপারে কিছু কিছু মানুষ যদি আংশিকভাবে সত্য পথগামী হয়ও, তাহলে তাই দেখেই ওরা মনে করে নেয় যে, না, সবই ঠিক আছে। কিছুমাত্র ত্রুটি বা বিকৃতি ঘটেনি।

পূর্বে আমরা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছি যে, যে কোনো জাহিলিয়াতই সম্পূর্ণরূপে কল্যাণশূন্য হয় না। প্রতিটাতেই ফায়দার একটা দিক থাকে। ফলে তা দেখে লোকরা চরম বিভ্রান্তিদর মধ্যে পড়ে যায়। মনে করতে থাকে যে, না, সবই ভালো হচ্ছে, অন্যায় কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু আসলে তা ক্ষয়িষ্ণু ভালো। প্রকৃত কল্যাণের তা কিছুমাত্র অনুকূল নয়, প্রকৃত কল্যাণের পথ উন্মুক্তকারীও নয় তা। তা মনযিলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পথেও চলছে না।

অনুরূপভাবে একথাও আমরা স্পষ্ট করে বলেছি যে, আধুনিক জাহিলিয়াত সৃষ্ট বিপদ অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা বিজ্ঞানেরই ফসল। জীবনকে সহজতর করার জন্যে এই বিরাট আবিষ্কার উদ্ভাবন। কিন্তু তার বাহ্যিক কল্যাণধর্মী চেহারা দেখেই সমস্ত মানুষ গভীরভাবে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়েছে। এ কারণেই তারা মনে করেছে যে, প্রকৃত কল্যাণই বিজয়ী হয়ে আছে এবং সব কিছুই যথাযথভাবে চলছে ও অগ্রসর হচ্ছে।

হ্যাঁ, শয়তানের বিরাট বিশাল উপায় উপকরণের কারণেই তারা অন্যায়, অসত্য ও পাপের প্রকৃত রূপ জানতে ও বুঝতেই পারেনি। যদিও তারা তারই পরিবেষ্টনের মধ্যে জীবন যাপন করছে।

এ অন্যায়-অসত্য ও পাপের বিরাটত্ব সম্পর্কে ওরা যদি একটুও সঠিক ধারণা করতে পারত, তাদের জীবনের বাস্তবতায় যে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে তারা যদি তার পরিমাপ করতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা অবশ্যই এই তত্ত্বও পেয়ে যেত যতটুকু কল্যাণ দেখে আধুনিক জাহিলিয়াত বাহাদুরী করে বেড়াচ্ছে তার ভিতরকার কুৎসিত চেহারাকে লুকোবার উদ্দেশ্যে— আসলে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো হয়ে বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাতে এক বিন্দু সত্য নিহিত নেই। তারা এও জানতে পারবে যে, অন্যায় জুলুম ও পাপের এই মহাসমুদ্রে এই সামান্যটুকু কল্যাণও ডুবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তারা আরও জানতে পারবে, মানুষের আসল জীবনটাই ধ্বংসের মুখে এসে গেছে। পাপ ও অন্যায়ের বিরাটত্বের চাপে গোটা পৃথিবীই এই মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুলিকণায় পরিণত হতে যাচ্ছে।

কোনো কোনো লোক আধুনিক জাহিলিয়াতের মান রক্ষার্থে বলে বেড়ায় যে, যা কিছু খারাপ দেখা যাচ্ছে, তা তেমন মারাত্মক কিছু নয়। এ বিপর্যয় সমগ্র জীবনকে গ্রাস করেনি; বরং জীবনের কোনো কোনো দিকে হয়ত কিছু বা বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় মাত্র। নৈতিকতার ক্ষেত্রে চরম বিকৃতি ও বিপর্যয়ের প্রশ্ন তুললে তারা বলে, হ্যাঁ! নৈতিকতার ক্ষেত্রে কিছুটা বিকৃতি এসেছে বটে, কিন্তু তা ছাড়া সমগ্র জীবনই তো পবিত্র ও সুস্থ-সঠিক রয়েছে।

শুধু তাই নয়, সব কিছুই অতি উত্তমভাবে চলছে। সবকিছুই উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে যে, তার ওধারে উন্নতির আরও কোনো স্তর বা দিক বাকী আছে, তা মনেই করা যায় না। না, তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। আধুনিক জাহিলিয়াত এমন এক সর্বাত্মক সর্বগ্রাসী বিপর্যয় নিয়ে এসেছে মানুষের জীবনে, যার ব্যাপকতা ধারণার আওতার মধ্যেও আসে না। জীবনের দূরতম কোনো একটি দিকও তার কলুষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকতে পারেনি।

বক্ষ্যমান অধ্যায়ে আমরা এই বিপর্যয়ের ব্যাপকতা— রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিকতা, দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল দিক ও বিভাগ পরিব্যাপ্ত বিপর্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরব। কি করে তা সম্ভব হলো, তা-ও বলা হবে।

কিন্তু সে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার পূর্বে এই সুস্পষ্ট সত্য উপস্থাপিত করতে চাই যে, এভাবে সব ধারণা বিশ্বাস বিপর্যস্ত হবে আর তারপরও বাস্তব জীবন ও জীবনের আচার-আচরণ সুস্থ ও সঠিক থাকবে, তা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। এই সত্যের সত্যতা অবিসংবাদিত ও প্রশ্নাতীত।

সেরূপ হওয়া কিরূপেই বা সম্ভব হতে পারে ?

আধুনিক জাহিলিয়াত তার ক্রমবর্ধমান বিরাট-বিপুল প্রকাশ ও প্রচারের উপায় উপকরণের সাহায্যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রচার চালিয়ে এই ধারণা বিশ্বাসের বিকৃতি বিপথগামিতা থেকে লোকদের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। তা লোকদিগকে বোঝাতে চাচ্ছে যে, তারা যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছে, তা সর্বতোভাবে সুষ্ঠ সঠিক হওয়ার উচ্চমার্গে উন্নীত।

কিন্তু জনগণ যখন কোনো কোনো ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করল, তারা দেখাতে লাগল যে, এটা আল্লাহ্‌র ঘোষণার পরিপন্থি— এটা সত্য ও ন্যায়পরতার বিপরীত অথবা নৈতিকতার পক্ষে মারাত্মক তখন জাহিলিয়াত তার সর্বাত্মক প্রচার যন্ত্র লাগিয়ে জবাব দিতে ওঠে পড়ে লেগে যায়......।

বোঝাতে চায় যে, আরে, এ তো উন্নতি, অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশ। তোমরা কি তা জানোনা, বোঝ না ? ক্রমবিকাশের দ্রুত গতিশীলতার দিকে কি তোমার কোনো দৃষ্টি নেই ? তুমি কি বিংশ শতাব্দীতে বাস করো না ? ..... এই শতাব্দী হচ্ছে বুদ্ধিমানদের চরম উন্নতির শতাব্দী।...তাহলে তুমি কি প্রতিক্রিয়াশীল ? কি ব্যাপার! কি মুসিবত! সর্বক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখা যাচ্ছে!... বড়ই আফসোসের কথা! এখনও মানুষ প্রাচীনতার আবর্তে বন্দী হয়ে পড়ে আছে!.. সবই সহ্য করা যায়; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ক্রমোন্নতির চরম শীর্ষে ওঠে প্রাচীনত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীলতা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি...

আধুনিক জাহিলিয়াতের প্রচার যন্ত্র ও প্রচার মাধ্যম; উপায়-উপকরণের কোনো সীমা-শেষ নেই। কি না আছে জাহিলিয়তের হাতে! পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা— এই সব কিছুই এক সাথে লেগে যায় সেই ব্যক্তির কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্যে, যে বর্তমান জাহিলিয়াতের কোনো দোষ বা অনিষ্টকারিত সম্পর্কে টু শব্দ করবে।

যে ব্যক্তিই জনগণকে প্রকৃত সত্যের পথ দেখাতে এবং এ জাহিলিয়াতের বিপর্যয় ও বিকৃতির কথা বলে জনগণকে সজাগ ও জাগ্রত করতে চেষ্টা করবে, তার ইশারায় প্রতিক্রিয়াশীলতার এই বোমা বিস্ফোরিত হবে।

হায়রে প্রতিক্রিয়াশীলতার গালি!

সত্য, কল্যাণ ও ন্যায়পরতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যে লোকই দাঁড়িয়েছে, তারই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এই অস্ত্র।...বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার গালি। আর বোকা জনগণকে বিভ্রান্তি করার জন্যে উন্নতি, প্রগতি ও ক্রমবিকাশের লোভনীয় বুলি।

কিন্তু জাহিলিয়াতের বিপদ এ পর্যন্তই থেমে যায় নি। জাহিলিয়াত পরিস্থিতিকে অত্যন্ত জটিল ও দুসমাধ্য করে দিচ্ছে। সত্য ও মিথ্যা— হক্ ও বাতিলকে সংমিশ্রিত করেছে প্রতি মুহূর্তে। স্বয়ং মজলুম মানবতাকেও নানাভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাদেরকে বোঝাতে চাইছে যে, তারা পরম ন্যায়পরতার ও সুবিচারের মধ্যে জীবন যাপন করছে। গুমরাহ পথভ্রষ্ট লোকদেরকে বোঝাতে চাইছে, তারা যেন মনে করে যে— তারা ঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। যাদের ওপর অন্যায় জুলুম পীড়ন ও নির্যাতন ভেঙ্গে পড়ছে, তাদের আসল অবস্থা থেকে বিভ্রান্ত করে বোঝাতে চাচ্ছে যে, তারা সর্বাত্মক কল্যাণের মধ্যেই দিনাতিপাত করছে।

সত্যি কথা হচ্ছে, ইতিহাসের সব কয়টি জাহিলিয়াতের তুলনায় বর্তমান জাহিলিয়াত এক কঠিনতর রূঢ়তা, অকল্পনীয় বীভৎসতা ও নির্লজ্জতার মধ্যে ফেঁসে গেছে। এ অবস্থা থেকে তার মুক্তিলাভের কথা চিন্তাও করা যায় না।

জাহিলিয়াতের মারাত্মক ব্যাপকতা ও প্রাধান্য সত্ত্বেও তার বর্ণনা দান কঠিন কিছু নয়। কোনো যা সত্য ও বাস্তব, তা স্বীকৃত না হয়েই পারে না। তার একটা নিজস্ব ওজন ও ভারিত্ব রয়েছে। তা অস্বীকৃত হওয়া সম্ভব নয়।

জাহিলিয়াতের যতই প্রভাব-প্রতিপত্তি হোক, লোকদের চোখ থেকে সত্যকে চিরদিন লুকিয়ে রাখা কোনো জাহিলিয়াতের পক্ষে সহজ নয়। সম্ভব নয়।

এ জাহিলিয়াতের সর্বাত্মক কুফল ও ব্যাপক দুষ্কৃতি সম্পর্কে জনগণ ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছে। পরবর্তী আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মানব জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে বর্তমান জাহিলিয়াত যে ব্যাপক গভীর অন্যায়, দুষ্কৃতি ও পাপের স্তুপ জমা করে দিয়েছে, তার মারাত্মকতা সম্পর্কে বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি খুবই সচেতন হয়ে উঠেছে।

তবুও ব্যাপার যে খুবই সহজসাধ্য, খুব শীঘ্র তা সম্ভব হবে, সে কথা মনে করা উচিত নয়। জাহিলিয়াতের ব্যাপকতা-গভীরতা এবং তার অনিষ্টতার বিরাটত্বের

পরিমাণ অনুপাতে হক্ ও বাতিল— সত্য ও মিথ্যার চরম সংগ্রাম একান্তই অনিবার্য এবং এই অত্যাসন্ন সংঘর্ষে জয়ী হওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনার একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু একটি নির্দিষ্ট জিনিস আমাদের সকলকেই জানতে বুঝতে এবং তাকে বিশ্বাস করতে হবে। তা হচ্ছে, বাতিলের বিপুল স্তূপ— কখনোই সত্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। অন্যায় ও পাপের ব্যাপকতা কখনোই কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে না।

এই মহাসত্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখেই আমরা বাস্তব কর্ম-জীবনে আচার-আচরণে বর্তমান জাহিলিয়াত সৃষ্ট ব্যাপক বিপর্যয়ের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পেশ করতে চাচ্ছি। এর পূর্বে আমরা ধারণা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয়ের বিশদ বর্ণনা পেশ করে এসেছি।

মানুষের ধারণা-বিশ্বাসের বিপর্যয় যেমন আল্লাহ্‌র মহাসত্যতা সম্পর্কিত ধারণাকেও গ্রাস করেছে, শামিল করেছে বিশ্বলোক, জীবন ও মানুষ সম্পর্কিত ধারণাকেও, তাদের পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ধারণাকেও, ঠিক তেমনি বাস্তব আচার-আচরণের বিপর্যয় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমগ্র জীবন–জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিকতা, দুই লিংগের মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক এবং শিল্প সংস্কৃতি কোনো কিছুকেই নিষ্কৃতি দেয়নি।

অতঃপর প্রতিটি বিষয়ের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা পেশ করা যাচ্ছে।

রাজনীতিতে বিপর্যয়

এই যুগটি নাকি মুক্তি ও স্বাধীনতার যুগ! কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুগের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে ইতিহাসের প্রচণ্ডতম স্বৈরতন্ত্র— ডিক্টেটরবাদ। অন্ধশক্তি ও মারণাস্ত্র সৃষ্ট নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞ।

বেশি দিনের কথা নয়, সমগ্র ইউরোপে ব্যাপক হয়ে বসেছিল জায়গীরদারী সামন্তবাদী ব্যবস্থা। মানুষ প্রকৃতপক্ষেই ছিল ভূমি-দাস— ভূমি-দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী। সামন্তদের দাস ছিল সাধারণ মানুষ। তারা একটি জমি ত্যাগ করে অন্য জমিতে চাষ করতে যাওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। আর যদি কেউ চলে যেত, তাহলে তাকে পলাতক সাব্যস্ত করা হতো এবং আইনের শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ঘরে এনে সেই জমি চাষাবাদ করতে বাধ্য করা হতো, যা ত্যাগ করে সে চলে গিয়েছিল। তার দেহে আগুনে উত্তপ্ত দগদগে লৌহ শলাকা দিয়ে দাগ দিয়ে দাসত্বের দূরপনেয় কলংক বসিয়ে দেওয়া হতো। তার অপরাধ ছিল শুধু এই যে, সে তার 'ছোট খোদা' সামন্তের অবাধ্য হয়ে তার দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস করেছিল। এখানে তাকে কঠিন বন্ধনে বেঁধে রাখা হতো যেন আবার কখনও ছুটে যেতে না পারে।

এ-ই ছিল তখনকার ভূমি-দাসদের অবস্থা। আর এই সামন্ত প্রত্যেক ভূমি-দাসের জন্যে এক-এক খণ্ড জমি নির্দিষ্ট করে দিত, সে তা চাষাবাদ করত, সেখানেই সে বসবাস করত। কিন্তু সে জমির ওপর তার কোনো মালিকত্ব বা স্থায়ী ভোগ-দখল স্বত্বও স্বীকৃত হতো না। এসব পশুদের মধ্যে চারণভূমি বন্টন করার মতো ব্যাপার। পশু সেখানেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে, দুগ্ধ ও মাখন দেয়। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট ভূমি খণ্ডের চৌহদ্দী অতিক্রম করার কোনো সাধ্যই তার হয় না। কোনো পশুটি তো সেখানে শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

সামন্তবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন স্বাধীন হয় না কখনও। তার জন্যে পার্থক্যকারী বিষয় হচ্ছে স্থায়ী অধীনতা (Serfdom)। তারা জানত যে, তা এমন এক ব্যবস্থা, যার ছত্র-ছায়ায় থেকে প্রত্যক্ষ উৎপাদক তার মালিক মনিবের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ইত্যাদির বিনিময়ে ভূমি চাষের সুযোগ লাভ করত। সেই দেয় 'কর' হয় মনিবের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দেওয়ার মাধ্যমে আদায় করত কিংবা আদায় করত নগদ অর্থ বা জিনিসপত্র দিয়ে— ফসল দিয়ে।

এ কথাটির অধিক বিশ্লেষণের জন্যে আমরা বলব, সামন্তবাদী সমাজ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

প্রথম শ্রেণীতে ছিল স্বয়ং ভূমি-মালিকরা, সামন্তরা।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হত চাষাবাদকারী লোকেরা–কিষাণ, শ্রমিক, দাস, চাষী ইত্যাদি। এদের মর্যাদা হতো বিভিন্ন।

যদিও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের সংখ্যা খুব দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছিল, এই কৃষক চাষীরা–প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীরা ভূমির একটি নির্দিষ্ট খণ্ড দখল করে থাকার অধিকার পেত। তাদের জীবিকার্জনের জন্যে তার যাবতীয় উপায় উপকরণসহ তারই ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকত। জীবন যাত্রার সুবিধার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণাদিও তারা উৎপাদন করতে পারত। তারা নিজেদের ঘরে কৃষি সংক্রান্ত হালকা যন্ত্রপাতিও গার্হস্থ্য শিল্প হিসেবে বানাতে পারত। কিন্তু তার বিনিময়ে তাদেরকে বহু কয়টি জিনিস দিতে বাধ্য থাকতে হতো। যেমন মালিকের জমিতে নিজের কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে সপ্তাহে একবার করে বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করে দিতে হতো। এ ছাড়া কৃষি মৌসুমেও তাদের অতিরিক্ত কাজ করতে হতো। আর উৎসব, পার্বন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ ভেট-উপঢৌকনও পেশ করতে হতো। অনুরূপভাবে মনিবের ফসল মাড়াই ক্ষেত্রেও তারা কাজ করে দিতে বাধ্য হতো। মদ্য কেন্দ্রে তাদের মালিকদের জন্যে মদ চোলাই করে দিতেও বাধ্য হতো তারা।

সামন্ত সকল প্রশাসনও বিচার কার্যের নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হতো। এক কথায়, সামন্ত সমগ্র সামষ্টিক জীবন অধীনস্থ এলাকার সমস্ত মানুষের রাজনীতির ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করত।

"এই সামন্তবাদী ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী কখনোই সেই অর্থে স্বাধীন হতো না, স্বাধীনতার যে অর্থ উত্তরকালে আমরা জানতে পেরেছি। তারা ভূমির পুরোপুরি মালিক হতো না। তা বিক্রয়, উত্তারাধিকার নিয়মে বন্টন, হস্তান্তর বা দান ইত্যাদি করারও তাদের কোনো ক্ষমতাই ছিল না। সে তো সামন্তের নির্দিষ্ট জমিতে শুধু লাঙ্গল চালাতে বাধ্য হতো তার নিজের ইচ্ছা ও কল্যাণ চিন্তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। এ ছাড়া তাকে করও দিতে হতো। তার পরিমাণ কখনোই নির্দিষ্ট থাকত না। এই কর দিয়ে তারা অধীনতার সম্পর্কের স্বীকৃতি দিত। তার জন্যে নির্দিষ্ট জমি হস্তান্তরিত হলে সে-ও সেই জমির সঙ্গে সঙ্গে হস্তান্তরিত হয়ে যেত। কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকা কিংবা অন্য কোনো মনিবের খিদমতের কাজে জড়িত হওয়ার কোনো অধিকার থাকত না। এখানে তারা সেই প্রাচীন কালের দাসপ্রথা এবং আধুনিক কালের স্বাধীন চাষীদের মধ্যবর্তী অবস্থার প্রতীক হয়েছিল।"[১]

বস্তুত মধ্যযুগীয় জাহিলিয়াতের যে অন্ধকারে ইউরোপ অবস্থান করত তারই বীভৎস চিত্র এখানে অংকিত হয়েছে। তখনই এই বিশাল অঞ্চল ছিল ইউরোপীয় গীর্জার কঠিন নির্মম শাসনের অধীন। কিন্তু একমাত্র ইসলামী জগতেই এরূপ অবস্থার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। প্রশাসন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের আংশিকভাবে যত বিপর্যয়ই হোক-না কেন, তারা ওরূপ অবস্থার সাথে মাত্রই পরিচিত নয়, যদিও বাস্তব জীবনে আল্লাহ্‌র শরীয়ত এই সময় আংশিকভাবেই জারী হয়েছিল, তখন এই জালিম কাফের সমাজ আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসিত হচ্ছিল না। শাসিত হচ্ছিল প্রখ্যাত রোমান আইনের ন্যায় বিচারের দ্বারা।

উত্তরকালে এমন একটা সময় আসে, যখন এই সামন্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটে। কিন্তু তা এ কারণে নয় যে, তদানীন্তন ইউরোপীয় আত্মা মানবতার চরম দুর্গতি দেখে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। কোনো তা ছিল জাহিলিয়াতে আচ্ছন্ন। আর জাহিলিয়াতে আচ্ছন্ন আত্মা ওসব দেখেও কখনোই ফরিয়াদ করে ওঠে না। সামন্তবাদের অবসান ঘটেছিল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অনিবার্য দাবি হিসেবে। আর এই ব্যাখ্যা ইতিহাসের গতিশীলতায় মানুষের জাহিলিয়াতের পক্ষে যথার্থ ব্যাখ্যা। সামন্তবাদের অবসানের কারণ অর্থনৈতিক বিবর্তন যন্ত্রের আবিষ্কারে এক নবতর অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বলে।

১. 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা' গ্রন্থ থেকে। লেখক রাশিদুল বরারী।

বস্তুবাদী বিবর্তন-আবর্তনের অনিবার্য কারণে উন্নয়নশীল শ্রেণী সেই শ্রেণীকে খতম করে দেয়, যার ভূমিকা পালন শেষ হয়ে গেছে বস্তুবাদী পরিবেশের দাবিতে। তখন তার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়াই ললাট লিখন হয়ে যায়। আর এ কারণেই তার অবসান লাভ ছিল একান্তই নিশ্চিত ও অনিবার্য।

এই বস্তুগত শ্রেণী-আবর্তনে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। কোনো ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় সত্য বা মিথ্যা, হক বা বাতিল বলে কোনো জিনিসই নেই।

যদিও সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবসান নেই— অবসান বাঞ্ছনীও নয়; কেননা তা জালিম। কিন্তু যেহেতু তা তার বস্তুগত ও শ্রেণীগত ভূমিকা পালন করে শেষ করেছে, আর নবতর ব্যবস্থা কায়েম হতে পারছে না— এক জুলুম তারই মতো আর এক জুলুমকে নির্মূল করতে পারে না বলে। কিন্তু যেহেতু তার বস্তুগত শ্রেণীভিত্তিক ভূমিকা রীতিমত পালিত হয়ে গেছে; অন্য কথায়, ঐতিহাসিক নিশ্চিত অনিবার্যতা কার্যকর হয়েছে, তাই তার অবসানও হয়েছে নিশ্চিত ও অনিবার্যভাবে এবং নবতর অর্থ ব্যবস্থার জন্যে পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উৎপাদন উপায়ের বিবর্তনে গড়ে ওঠা অর্থ ব্যবস্থা ও শাসক-শ্রেণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। শাসক শ্রেণীই তথায় প্রধান ও প্রভাবশালী। যেহেতু একসাথে বাস্তব ও ব্যাখ্যাগত জাহিলিয়াত মানুষকে আল্লাহ্র নাযিল-করা বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, শাসন করে নিজেদের ইচ্ছা ও খামখেয়ালীর ভিত্তিতে, এ কারণে মালিক শ্রেণীই হয় কর্তৃত্বশালী জালিম শাসক ও শোষক। আর জনগণ সেখানে চিরদিনের তরে নির্যাতিত হয় বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়।

আর বাস্তব বা ব্যাখ্যাগত জাহিলিয়াত কখনোই এমন অবস্থার ধারণাও করতে পারে না, যখন অর্থ ব্যবস্থা এক স্তর থেকে ভিন্নতর স্তরে চলে যাবে উৎপাদন উপয়ে বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কারণে এবং তা স্বভাবতই বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে থাকবে— তাতে একটি শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে অবৈধভাবে ফায়দা লুটে না। কোনো জাহিলিয়াত-পাগলেরা নিজেদের সুদীর্ঘ জাহিলিয়াতকালে কখনোই আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান কার্যকর করেনি। আর এই বিধানের অধীন ব্যবস্থায় সমস্ত ব্যাপার হক ও ইনসাফ সহকারে কি করে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাও দেখতে পায়নি— কিছুক্ষণের জন্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দৃষ্টিতে রাখা হলেও। কেননা আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান ক্রম বিবর্তনের কোনো একটি স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতেও

বিস্তৃতি লাভ করেনি। তার বিস্তৃতি হয়েছে মানুষের দৈর্ঘ-প্রস্থ অনুপাতে, বিবর্তনের স্তর-পার্থক্যে মানুষ যেখানেই পৌঁছে থাকে-না-কেন।

সে যা-ই হোক, ইউরোপীয় সামন্ত ব্যবস্থা নবতর উৎপাদন যন্ত্রের আবিষ্কারে তিরোহিত হয়ে গেল এবং সমাজে এক নবতর আবর্তন সূচিত হলো।

যান্ত্রিক উৎপাদনের কেন্দ্রসমূহে, শিল্প-কারখানাসমূহে শ্রমিক কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দিল। তারা আসতে পারত কেবল মাত্র গ্রামাঞ্চল থেকেই। এরই ফলে সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিলীন হয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠল। কেননা কৃষিজীবীরা তো তারই অধীন জমির সাথে বাঁধা পড়েছিল। তারা জমির দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করে গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে শহরে চলে আসতে শুরু করল। কেননা এখানেই গড়ে উঠেছে নতুন কর্মব্যবস্থা নতুন শিল্প নগরে।[১]

অতঃপর মানুষ কার্যত ভূমি-দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে গেল। তারা গ্রাম্য দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করে নাগরিক জীবনের মুক্ত পরিবেশে এসে গিয়েছিল।

অবশ্য প্রথম দিক দিয়ে তারা তা-ই মনে করে নিয়েছিল।

মনে করেছিল যে, তারা তাদেরকে বন্দী করে রাখার সব বাঁধা-বন্ধনই ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে, আর আজ তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যা ইচ্ছা হয়, তা-ই তারা করতে পারে। কিন্তু মূলত তারা এক জাহিলী বিবর্তন-স্তর থেকে অপর এক জাহিলী বিবর্তন-স্তরে চলে এসেছিল মাত্র। মৌলিক কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি তাদের জীবনে। তারা তখন পর্যন্তও তাদের জন্যে অপেক্ষমান নবতর দাসত্ব শৃঙ্খলকে দেখতে পায়নি। হ্যা, সে সব বন্ধন তাদের জন্যে অপেক্ষাই করছিল। আর তারা নিজেদের পা ও গলদেশ নিয়ে সেখানেই উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল নতুন করে দাসত্বের সুকঠিন শৃঙ্খল পরবার জন্যে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বলেছে, উৎপাদন যন্ত্র যে নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করল এবং উৎপাদন কার্যক্রম সামন্তবাদী প্রক্রিয়া থেকে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হলো— এই দুটিই এক নবতর দাসত্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলল এবং তার পরিধি ক্রমশ

---

১. ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সামন্তবাদের অবসানের এই ব্যাখ্যাই দিয়েছে। অথচ এখন ভুলে গেছে যে, ইউরোপীয় কৃষকরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বভাবের তীব্র তাড়নার কারণেই— সামন্তবাদের জালিম ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বিদ্রোহ করেছিল। কোনো দীর্ঘকাল ধরে তারা উক্ত জালিম ব্যবস্থার অধীন অমানুষিকভাবে নিপীড়িত ও নিষেপষিত হচ্ছিল এবং ধৈর্য ধারণের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল যদিও উৎপাদন উপায়ে তখন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তারা যখনই জমি ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন নবতর অর্থ ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

সংকীর্ণ করে আনতে আনতে এতদূর নীচে নামিয়ে আনল যে, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসই রুদ্ধ করে দিতে লাগল।

কিন্তু ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বাহ্যিক অবস্থার যতটা বর্ণনা দিয়েছে, প্রকৃত অবস্থা ছিল তার চাইতেও গভীরতর। এ ব্যাখ্যাতে যা মনে করেছে, তাতে বুদ্ধিমত্তার চরম পরাকাষ্ঠা ঘটেছে। এবং অবস্থার ব্যাখ্যাদানে তা বিস্ময়কর কীর্তি দেখাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো ভিন্নতর।

প্রকৃত ব্যাপার এই হয়েছিল যে, নবতর জাহিলিয়াত তো পুঁজিবাদের অধীন সমাজে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান দিয়ে শাসনকার্য চালাত না। তা ছিল সেই প্রাচীন জাহিলিয়াতেরই সম্প্রসারণ মাত্র, যা সামন্তবাদের অধীন অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা রাষ্ট্র শাসন না চালানো।

মূল শাসন প্রতিভা ছিল সেই একই নফ্‌সের খাহেশ লালসা-কামনা, যা এক্ষণে ছিল বিবর্তিত। সেই একই খামখেয়ালীপনা, যা কৃষককুলের নামে বিপুল মুনাফা লুটে নিত।

আর আসলে তা সেই তাগুত, যা প্রতিটি জাহিলিয়াতেই প্রবলতর, যা মানুষকে শাসন করে খামখেয়ালীর ভিত্তিতে। আর মানুষ যতদিন না আল্লাহ্‌র বিধান দ্বারা শাসনকার্য চালাতে শুরু করবে, ততদিন এরূপ অবস্থাই অব্যাহত হয়ে থাকবে। তার থেকে নিষ্কৃতি নেই।

মুসলিম জাহানেও এই তাগুতী শক্তি দেখা গেছে, দেখা যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। মানুষ যতটা আল্লাহ্‌র দেওয়া পদ্ধতি থেকে বিভ্রান্ত, তাগুত শক্তি ততটাই বিস্তার ও প্রসার লাভ করেছে তা-ও নিঃসন্দেহ। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্‌র শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য চালাতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় যতটা বিকৃতি সহকারেই হোক-না-কেন— মানুষকে কোথাও অতটা দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধতে পারেনি, যতটা বাঁধতে সক্ষম হয়েছে ইউরোপ। তথায় তো মানুষের গোটা জীবনকেই জাহান্নামে পরিণত করে দেওয়া হয়েছিল।

মুসলিম জাহানের কোথাও ইউরোপের ন্যায় বীভৎস ও জঘন্য ধরনের সামন্তবাদী ব্যবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। ইসলাম মৌলিকভাবেই স্বাধীনতাবাদী। তাই তা পূর্বে যেমন সামন্তবাদের তাগুতকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল, অনুরূপভাবেই পুঁজিবাদের তাগুতের হাত-পা বেঁধে তাকে অক্ষম করে রাখতেও পেরেছিল— পেরেছিল জনতা যদ্দিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র শরীয়াতের শাসন চালিয়েছিল, তা যতই আংশিকই হোক-না কেন।[১]

---

১. الشبهات। গ্রন্থের الراسالية والاسلام। অধ্যায়

তা যা-ই হোক, আমরা সেই ইউরোপেই ফিরে যাচ্ছি। যেখানে জাহিলিয়াতের ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চলেছে একের পর আর এক।

সেখানে যা কিছু ঘটেছে তা কোনো অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্য বিবর্তনের ধারা ছিল না। এ বিষয়ে মার্কসীয় জাহিলিয়াতের ধারণা যেমন অবান্তর, তেমনি ভিত্তিহীন। আসলে তাগুতী শক্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পদচারণা করেই যাচ্ছিল। এই নবতর বিবর্তন উৎপাদন উপায়ে শোষণকে অত্যন্ত ভারী ও ব্যাপক করে তুলেছিল। তাতে তার সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল, মানুষকে আরও শক্ত করে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধতে সক্ষম হলো।

তা কোনো বাধ্যতামূলকভাবে হয়নি। তা ছিল স্থিতিশীল পরিবেশের স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। অথবা বলা যায়, তা নিশ্চিত অনিবার্য ছিল একটি মাত্র দিক দিয়ে। আর তা হচ্ছে, মানুষ যতদিনে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা না করছে, ততদিন পর্যন্ত একটি মাত্র বিকল্প হিসেবে অবশ্যই তাগুত দ্বারা শাসিত হবে এবং তা জনগণকে দাসত্ব ও অপমান-লাঞ্ছনার তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করাতেই থাকবে। এর অন্যথা অকল্পনীয়।

উদীয়মান পুঁজিবাদী শ্রেণীও বিলীয়মান সামন্তবাদী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টির হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত শেষোক্তের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অর্থ এ থেকে ভিন্নতর কিছু নয় যে, উত্তম অবস্থায়ই আসল শাসন হয়ে রয়েছে সেই তাগুতী শক্তিই। কোনো তাগুত ব্যক্তিগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। নয় তা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর নাম। তাগুত বলতে যে কোনো জালিম ক্ষমতাধরকেই বোঝায়। তা জনগণের ওপর খুব দ্রুততার সাথে ক্ষমতা স্থাপন করে এবং সমস্ত মানুষকে দাসানুদাস বানিয়ে নেয়। এ সময় পারস্পরিকভাবে কঠিন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না, এমন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা সেই মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর হাতেই একান্তভাবে এসে যায়, যাদের আনুকূল্য করে অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা যেমন তদানীন্তন আরব জাহিলিয়াতে কুরায়শরা তাদেরই মতো পথভ্রান্ত ও শিরকে নিমজ্জিত গোত্রসমূহের সাথে বহুবার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাগুতী কর্তৃত্ব একান্তভাবে তাদের হাতেই চলে এসেছে। অথচ অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর তাদেরই কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল। তারাই মালিক হয়েছিল, হয়েছিল শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী। আর নানাবিধ উপায়ে মানুষকে কঠিনভাবে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করে নিয়েছিল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এক তাগুতের হাত থেকে অপর তাগুতের কাছে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পরিস্থিতিরই শুধু ব্যাখ্যা দিতে পারে; কিন্তু সে ব্যাখ্যায় গভীরতা বলতে কিছুই নেই। মূলত তাগুতের অস্তিত্ব কি করে হয়, তার কার্যকারণ

কি, সে ব্যাখ্যা থেকেই তা কখনোই জানা যেতে পারে না। আসলে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব নিশ্চিত অনিবার্য কিছুই নয়। ...মানুষ যখন তার ইচ্ছা করে, তখনই তা ঘটে।

আসলে সে ব্যাখ্যাটা নিছক জাহিলী ব্যাখ্যা মাত্র। তা শুধু জাহিলিয়াতেরই ব্যাখ্যা দিতে পারে, প্রকৃত কারণের সন্ধান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। শুরুতে নবতর দাসত্ব প্রথার দিক ও রূপ কিছু মাত্র স্পষ্ট ছিল না। বাহ্যত তারা যাত্রা করেছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে পাগলপারা হয়ে, তা ছিল জমির শৃঙ্খল থেকে শ্রমিক জনতার মুক্তি। সামন্তবাদের শৃঙ্খল থেকে জাতিসমূহের নিষ্কৃতি।

আর এ সময় রাজনৈতিক ও সামাজিক আবর্তনও সংঘটিত হয়। তার ওপর স্বাধীনতার সীলমোহরও লেগেছিল। সে আবর্তনসমূহের নাম দেওয়া হয়েছিল গণতন্ত্র।

সন্দেহ নেই, এই নবতর জাহিলিয়াত অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা মুক্তি ও স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে এসেছিল। অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা কল্যাণও নিয়ে আসেনি, তা বলা যায় না। কিন্তু জনতা তাতে চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে নবতর তাগুত জনগণকে ধীরে ধীরে ও ক্রমাগতভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে নিচ্ছিল। নবতর তাগুত এই কর্মটাই করেছে অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সহকারে। চিন্তা করা যেতে পারে, এক ব্যক্তি যখন আইনসম্মতভাবে তার জন্যে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড ত্যাগ করে চলে যেতে পারে না, বস্তুগত ও আদর্শগত উভয় দিক দিয়েই যখন তাকে জমির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে, কিংবা যে ব্যক্তি সমাজেরই নৈতিক ও সামাজিক বন্ধনসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন করে বের হয়ে আসার সাহস করতে পারে না, সে নৈতিক-সামাজিক বন্ধনসমূহ ভালো হোক, কি মন্দ— যদিও সেই সমাজের লোকেরা এমন বন্ধনকে আন্তরিকভাবে কোনো গুরুত্বই দেয় না কিংবা যে ব্যক্তি গীর্জার নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারছে না— করলে তাকে ধর্মত্যাগী, অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হতো; অভিশাপ বর্ষণকারীরা চতুর্দিক থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।...

এরূপ এক ব্যক্তিকে যদি ধরে কোনো শহরে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, কোনো-রূপ পাহারাদারীরও ব্যবস্থা তার ওপর রাখা না হয়, তা হলে সে যে অলিতে গলিতে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা করে বেড়াবে এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে মনে করবে তা আর বিচিত্র কি? সেখানে তো তাকে বাঁধবার বা গীর্জার কঠোরতার ভয় করার এবং তাকে ধর্মত্যাগী বলে অভিশাপ দেওয়ারও কেউ নেই।

তাই বলছিলাম, নবতর জাহিলিয়াত সদ্য বন্ধনমুক্ত মানুষকে শহর নগরে নিয়ে এই স্বাধীনতার মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিল। এখানে সে এমন স্বাধীনতা পেয়ে গিয়েছিল

যার কোনো অস্তিত্বই ইতিপূর্বে তার জীবনে ছিল না। এখানে সে যত্রতত্র যাওয়ার, ঘোরাফেরা করার স্বাধীনতা পেয়েছে। যে-কোনো কাজ করার স্বাধীনতা পেয়েছে। একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, সভা সম্মেলন সংগঠন করার স্বাধীনতা লাভ করেছে। কথা বলার, সমালোচনার স্বাধীনতাও আছে। সাংবাদিকতার স্বাধীনতাও স্বীকৃত। সেই সাথে এমন স্বাধীনতাও পেয়ে গেছে যার কোনো অস্তিত্বই পূর্বে ছিল না।

তারা পেয়ে গেল অকারণে অভিযোগ আরোপ থেকে নিরাপত্তা, তদন্তের নিরাপত্তা এবং বিচারের নিরাপত্তা।

এসব বাস্তব স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পেয়ে কেউ যদি মনে করে যে, সে সত্যিকার স্বাধীনতা পেয়ে গেছে তা হলে তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না।

হ্যাঁ, তারপরও রয়েছে পার্লিয়ামেন্ট— সংসদ, জাতীয় সংসদ। সেই সাথে নির্বাচন। এটাও স্বাধীনতার একটা বড় দিক। জাতীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যাপার, এ কি কম কথা। সরকার গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে, শাসনকার্য চালায় জাতির ইচ্ছানুযায়ী। হাঁ, হ্যাঁ.......

হ্যাঁ, জনতা পূর্ণ স্বাধীনতাই তো পেয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে এসবই হচ্ছে আকাশ কুসুম কল্পনা, ভ্রান্ত মনের ধারণা, মনের বিভ্রান্তি মাত্র। পুঁজিবাদের যুগে নবতর জাহিলিয়াতই এই সব ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে।

সন্দেহ নেই, এ জাহিলিয়াতের বাহ্যিক দিকটি খুবই সুন্দর। এতদূর সুন্দর যে, তা বলে শেষ করা যায় না। তা জনগণের চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছে, হৃদয় মনকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এরপরই আসে বিজ্ঞান, বস্তুগত উন্নতি, অগ্রগতি। ফলে এ জাহিলিয়াতের রূপ ও সৌন্দর্য পূর্ণাঙ্গ হয়, অধিকতর চাকচিক্যময় হয়ে ওঠে।

এক্ষণে মানুষ কেবল ভূমি দাসত্বের শৃংখল থেকেই মুক্ত হয়নি, কেবল নৈতিকতার বন্ধন থেকেই মুক্ত হয়নি, শুধু গীর্জার আধিপত্যের অধীনতা থেকেই নিষ্কৃতি পায়নি, এক্ষণে কেবল প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও আইন পরিষদই কায়েম হয়নি, এ সময় মানুষ অমানুষিক দৈহিক শ্রম থেকেও মুক্তি পেয়ে যায়। কোনো ও বস্তুগত অগ্রগতি দৈহিক প্রাণান্তকর শ্রম থেকেও মানবীয় শক্তিকে মুক্তি দিয়েছে। কোনো এক্ষণে যন্ত্রপাতি সেই সব শ্রমকেই প্রায় সামলে নিয়েছে, যা দৈহিকভাবে করতে মানুষ বাধ্য হতো। ফলে মানুষ অনেক হালকা কাজের সুযোগ পেল। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেল। আর আনন্দ উৎফুল্লতা সহকারে জীবনীশক্তির পূর্ণ সংরক্ষণের মহা অবকাশ পেয়ে গেল।

এ পর্যায়ে আমরা এই নতুন জাহিলিয়াত সৃষ্ট চিন্তা-নৈতিকতা, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিপথগামিতা-বিকৃতি সম্পর্কে কোনো কথাই বলব না। যদিও জীবনের এই সব দিক বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত, সব দিক ও বিভাগ পরস্পর ওতপ্রোত বিজড়িত। একটি দিক বা বিভাগ অন্য দিক বা বিভাগ থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানব জীবনে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিক ব্যবস্থা ও চিন্তা পদ্ধতি থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন কোনো জিনিস নয়। কোনো মানুষের মন ও জীবন বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন খণ্ডে কোনো মতেই বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু তবুও এ পর্যায়ে আমরা প্রয়োজনের তাগিদেই রাজনীতি বিষয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয় সম্পর্কেই আলোচনা করব, আমাদের মূল আলোচনাকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে নবতর জাহিলিয়াত যদিও গীর্জার কর্তৃত্ব থেকে বাঁচার লক্ষ্যে জনমত ও গণ-সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জাহিলী রাজনীতি জনমতের ভিত্তিতে শাসনকার্য চালাত না। গোটা রাজনীতিই চলছে এমন একটা ধারণার ভিত্তিতে, বাস্তবে যার কোনো নাম চিহ্নও কোথাও ছিল না। কেননা নবতর জাহিলিয়াত যখন আল্লাহ্‌র বিধানকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন তার মুখে তাগুতের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য চালানো ছাড়া আর কোনোই উপায় ছিল না।

"জাতির ইচ্ছা ও তার দোহাই ছিল বর্তমান জাহিলিয়াতে রাজনীতির বাহ্যিক দিক, লোক দেখানো দিক"। কিন্তু এ ঘৃণ্য জাহিলিয়াতের আসল ও প্রকৃত রূপ হচ্ছে তাগুতের ইচ্ছানুযায়ী চরম স্বেচ্ছাচারিতা সহকারে রাষ্ট্র শাসন ও সরকার পরিচালনা।

ইতিহাসের বস্তুবাদী দর্শন জাহিলিয়াতসমূহের ব্যাখ্যাদানে খুবই সততার পরিচয় দিয়েছে। তার ব্যাখ্যানুযায়ী যে শ্রেণীর মুঠির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা-সার্বভৌমত্ব থাকে তা-ই ক্ষমতার জোরে অন্যান্য সব শ্রেণীর লোকদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত নিজ স্বার্থকে পুরোপুরি রক্ষা করেই দেশ শাসনের কাজ সম্পন্ন করে।

তার গড়া সংস্থাসমূহ হচ্ছে নির্বাচন, পার্লামেন্ট, পার্লামেন্টারী সরকার, সংবিধান ইত্যাদি। মূলত এসব লোক-দেখানো সংস্থার পশ্চাত থেকে অলস জাহিলিয়াতই দেশ শাসন করে।

প্রথম দিক দিয়ে এই সব ব্যাপার খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। বরং আধুনিক জাহিলিয়াতের অধীন জীবন-যাপনকারী কতিপয় সাদা হৃদয়ের লোক মনে করছিল যে, তারা তাদের এই নবতর জীবনকে অতীব উত্তম ও উন্নত ও মানবীয় উচ্চতার

সাথে সামঞ্জস্যশীল ভিত্তিসমূহের ওপর সুদৃঢ়ভাবে নির্মাণ করছে। ব্যবস্থাপনার বাহ্যিক চাকচিক্যই তাদেরকে এই কঠিন ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল।

এই বেচারারা মনে করছিল যে, তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করছে এবং নির্বাচিত এই প্রতিনিধিরা অবশ্যই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ও তাদের কল্যাণের দৃষ্টিতেই আইন প্রণয়ন করবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, মুলধনের 'তাগুত'ই নিরংকুশ কর্তৃত্ব সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা করছিল।

এই ব্যাপারটি বর্তমানে এতই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, তা কারোর কাছেই অজানা থাকেনি। ফলে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজনই হয় না। বিগত বছরগুলোতে দুনিয়ার প্রত্যেক দেশে সকল প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজি বাদ সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করা হয়েছে, তার ভিতরে যে অনিষ্ট, সীমালংঘনমূলক জঘন্যতা ও বিপর্যয় রয়েছে, তা বোঝার জন্যে তা-ই যথেষ্ট। এ পর্যায়ে বিগত বছরগুলোতে অনেক কিছু লেখাও হয়েছে। পুঁজিবাদী তাগুত তার বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কত যে বাড়াবাড়ি করেছে, তাও আজ কারোর কাছে গোপন নেই। বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের রক্ত কিভাবে শুষে নেওয়া হয়, তা আজ সকলের কাছেই স্পষ্ট। প্রকৃত স্বাধীনতাকামী ও প্রকৃত সুবিচার ও ন্যায়পরতার পক্ষপাতী লোক এবং তাগুতের হাত থেকে যারা কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কি ভয়াবহ কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল— যার ফলে সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়েছিল, বর্তমানে তা কারোরই অজানা নেই।

এখানে এই জুলুম নির্যাতন-নিপীড়নের কয়েকটি হালকা ধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংলণ্ডে আহুত ধর্মঘট বন্ধ ও ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে সরকার সম্ভাব্য সকল উপায়ই অবলম্বন করেছিল। পুঁজিবাদ ঘোষণা করেছিল এ ধর্মঘট বেআইনী। অতঃপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী ধর্মঘটীদের ওপর ট্যাংক ও কামান দিয়ে আক্রমণ করল। ধর্মঘট বন্ধ করার জন্যে বহু শত পন্থাও গ্রহণ করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক ছাত্ররা এসে বাস ও ট্রাক চালাল। রেডিও ও পত্র-পত্রিকায় ধর্মঘট বিরোধী প্রচারণা চালানো হলো। গোটা সরকারযন্ত্র শিল্প-মালিকদের হাতে এসে গিয়েছিল। জনগণ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে হিসেব পেশ করতে বাধ্য করার এবং তাদের নেতাদের গ্রেফতার করার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।...

এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল গণতন্ত্রের সুতিকাগার ইংলণ্ডে। উক্ত বিবরণ কোনো শত্রুর দেওয়া নয়, একজন ইংরেজেরই দেওয়া।[১]

১. হেন্‌রী নোয়েল ব্রেইলজ ফোর্ড

আমেরিকার অবস্থা ইংল্যান্ড অপেক্ষাও অধিকতর বীভৎস। সেখানকার পেশাদার বিলটিজী দলসমূহ তথাকথিত গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে চলছিল। কোনো লোক যদি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তা হলে তাদেরকে কারাগারে বন্দী করে কঠিনভাবে শাস্তি দেয়। প্রয়োজনবোধে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না।

হ্যারল্ড লাস্কি 'আধুনিক যুগের বিপ্লবসমূহ' শীর্ষকগ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া বিস্তারিত বিবরণ লোকদের পাঠ করা উচিত। যথা 'লাফলুত' সমিতির সিদ্ধান্ত। আমেরিকার লর্ডদের মজলিস তা এই জন্যে মোতায়েন করেছিল যে, এই সমিতিটি নাগরিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপকারীর পর্যালোচনা করে। সে হস্তক্ষেপ কতদূর সম্প্রসারিত হয়েছে সে বিষয় পরিমাপ করবে। ঘুষ, গোয়েন্দাগিরি, প্রতারণা, ঠকবাজি ও বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি এমন সব ব্যাপার, আমেরিকান নেতা ও কর্মীগণ যা করতে খুব বেশি অভ্যস্ত।

বড় বড় শিল্প সমিতিসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা যেন ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদেরকে নিষ্পেষিত ও নির্মূল করার জন্যে বন্দুক ও টিয়ার গ্যাসে সমৃদ্ধ সৈন্য নিয়োগ করতে পারে।

'এতদ্ব্যতীত সিনেটর লঙ-এর সময়ে লুয়েজানা, জার্সিও, ক্যালিফর্নিয়ার কোনো কোনো এলাকায় অধিকার ঘোষণার কোনো প্রভাব পড়েনি। কোনো ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি সর্ব প্রকারের স্বার্থ একান্তভাবে নিজেদের জন্যে মনে করত। তার কারণ এই ছিল যে, অর্থনীতির গোটা উৎসই ছিল তাদের মুটির মধ্যে। আমি তো মনে করি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকান ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের মনে ফ্যাসিবাদী মনোবৃত্তি মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়েছিল। অবশ্য গণতন্ত্রের একটা সূক্ষ্ম আবরণ ফেলে রেখে ছিল সব কিছুর ওপর।[১]

সে যাই হোক আমেরিকার অবস্থা এতই স্পষ্ট যে, সে জন্যে বইয়ের উদ্ধৃতি দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না।

আমেরিকার পুঁজিবাদ এত নিকৃষ্ট ধরনের যে, তথায় দিন রাত অসংখ্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুঁজিপতিদের ইংগিতে। এমন কি পুঁজিপতিদের সন্তুষ্ট করার জন্যে দিবালোকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে হত্যা করা হলো। কোনো পুঁজিপতিরা ভয় করছিল, বিশ্ব উত্তেজনা হ্রাস করার জন্যে কেনেডীর পুঁজিবাদী চেষ্টা-সাধনার কারণে শিল্পোৎপাদন প্রবণতা যুদ্ধ সামগ্রীর দিক থেকে সরে গিয়ে সাংস্কৃতিক-তমদ্দুনিক সামগ্রী উৎপাদনের দিকে ঘুরে যাবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক তমদ্দুনিক সামগ্রী দ্বারা পুঁজিপতিরা এত বেশি মুনাফা লুটতে পারে না, যতটা তারা উপার্জন করতে পারে যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদন করে।

১. আধুনিক যুগের বিপ্লবসমূহ — হ্যারল্ড লাস্কি।

এই হলো পুঁজিবাদের অপরাধসমূহের গুরুত্বহীন চিত্র। নতুবা চরিত্র নষ্ট করণ, লোকদের জীবিকা হরণ এবং বিভিন্ন জাতিকে দাসানুদাসে পরিণত করণের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি তো স্বতন্ত্র দিক। আমেরিকা সেজন্যে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছে।

মোটকথা, একথা অনস্বীকার্য যে, কাল্পনিক গণতন্ত্র আসলে পুঁজিপতিদের স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। আর এই স্বৈরতন্ত্র একটি তাগুত হয়ে তা জনগণকে দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছে। মানুষকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছে।

কিন্তু এই মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় যে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী হওয়ার কারণে ঘটেছে, জাহিলিয়াত তা কিছুতেই স্বীকার করবে না। তা মূলতই আল্লাহ্‌র পথ চিনে না, গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নয়। তার গোটা জীবনটাই আল্লাহ্‌র পথ ও তাঁর ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা বিধান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েই অতিবাহিত হচ্ছে। তা সমস্ত ব্যাপারকে মাটির দ্বন্দ্ব, স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের সংকীর্ণ বেষ্টনীর সীমিত পরিসরেই দেখে থাকে ও বিচার বিবেচনা করে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাব্বানী বিধানে যখন সুদ ও মওজুদকারীকে হারাম ঘোষণা করেছিলন, তখন তিনি মানুষ সম্পর্কে এত বেশি জানত, যা মানুষও তাদের নিজেদের সম্পর্কে জানত না। তিনি তো মানুষের কল্যাণই চান কিন্তু তা যে কল্যাণ, মানুষ তাও জানে না। যে পথে মানুষের কল্যাণ ভারসাম্যপূর্ণ, যাতে প্রকৃত সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সীমালংঘনমূলক তৎপরতা বন্ধ থাকে, আল্লাহ্ তো তাদের জন্যে তারই নির্দেশ করছিলেন।

রাজনীতি আলোচনা এ অধ্যায়ে সুদ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিছু বলব না। অর্থনীতি পর্যায়ের আলোচনাই তার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু এখানে আমরা শুধু এতটুকুই বলে রাখতে চাই যে, পুঁজিবাদের সীমালংঘনকারী স্বৈরতন্ত্র মানুষকে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌছে দিয়েছে। কিন্তু এই সুদ ও মওজুদদারীর পন্থা কার্যকর না হলে তা কখনোই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। মূলত এই দুটিই হচ্ছে পুঁজি বাদের দুটি বড় স্তম্ভ, বড় দুটি ভিত্তি। আর আল্লাহ্‌র বিধানে এ দুটিই হচ্ছে নিষিদ্ধ ও হারাম। ফলে রাজনীতি ও অর্থনীতি— উভয় ক্ষেত্রে তাও মানুষের দাসত্বের মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিধান ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা ইতিহাসের আরো কয়েকটা অধ্যায় আমরা অতিক্রম করতে চাচ্ছি। পুঁজি ও পুঁজি বাদের সীমালংঘনমূলক তৎপরতা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন তা দেখে মানুষ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন জনতার বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দিল।

কিন্তু এই জিহাদকারীরা তো চিরদিন জাহিলিয়াতের মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ থেকে অনেক দূরে পড়েছিল। চূড়ান্ত মাত্রার শ্রম ও কার্য স্বীকার

করার পর তারা নিজেদেরকে পুঁজিবাদের তাগুতের অক্টোপাশ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিল। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের নির্যাতনে নিষেপষণ ভোগের পরও তারা কোনো শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হলো না বরং যে মুহূর্তেই তারা পুঁজি বাদের অক্টোপাস থেকে নিষ্কৃতি পেল, তখনই তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল আর এক তাগুত। এ তাগূতের মুখে গণতন্ত্রের নেকাবটাও ছিল না। তা হচ্ছে শ্রমিক শেণীর স্বৈরতন্ত্র (Dictatorship of the Proletariats)

জনগণ পুঁজিবাদের স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি পেতেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্রের গ্রাসের মধ্যে পড়ে গেল। একটি তাগুত থেকে মুক্তির পর পরই অপর এক তাগুতের পায়ের তলায় পড়ে নিষ্পেষিত হতে লাগল। আর আসল কথা, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে বহু দূরেই পড়ে থাকল।

ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যা অবোধগম্য কার্যকারণ ও সেসবের ফলাফল সম্পর্কে এক দীর্ঘ আলোচনার পর শ্রেণী-সংগ্রামের উল্লেখ করে। তারপরে বলে অনিবার্যভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। অতঃপর জাহিলিয়াতের পাগলরা ভাঙ্গের নেশা খেয়ে শ্রমিক শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্রের ছত্রছায়ায় পাওয়া কাল্পনিক স্বর্গের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন দেখায় মগ্ন হয়ে পড়ে। সে স্বর্গ তো পাওয়া যাবে তখন, যখন শ্রেণীসমূহ নির্মূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং অবিশিষ্ট থাকবে শুধু প্রোলেটারিয়েটরা।

অতঃপর নিশ্চিত অনিবার্যতা হিসেবে মূলধন ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সে যুদ্ধ সত্য ও সুবিচারের নামে হচ্ছিল না। কেননা ফ্রেডারিক এ্যাঞ্জেলস তো সত্য ও সুবিচারকে সব সময়ই ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করেছে। এ যুদ্ধের ভিত্তি ছিল পরস্পর বিরোধী ভাবধারার বাধ্যতামূলক বিরোধ।

পুঁজিবাদ সকল প্রকার আইন ও বে-আইনী উপায় অবলম্বন করে শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করছিল নির্মমভাবে। বিচার বিভাগ ও প্রশাসনকেও তা এজন্যে ব্যবহার করেছে। কিন্তু নিশ্চিত অনিবার্যতা শেষ পর্যন্ত দেখা দেওয়া ছিল একান্তই জরুরী। সেই কারণে শ্রমিক শ্রেণী সরকারতন্ত্র দখল করে প্রোলেটারিয়েটদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। পরে তা উৎপাদন উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে দেয় আর তদস্থলে সামষ্টিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। এর ফলে সমস্ত শ্রেণী নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রোলেটারিয়েটদের স্বার্থ রক্ষার নীতি সরকার পরিচালনা করতে থাকে। তা সত্য ও ন্যায়ের দাবি হিসেবে করা হয়নি। করা হয়েছে এজন্যে যে, প্রোলেটারিয়েটরাই এখন শাসনদণ্ডের ধারক। প্রোলেটারিয়েটরা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে সামর্থ্যানুযায়ী সম্পদ ও শক্তি কেড়ে নেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তা দিয়ে থাকে তার প্রয়োজনমতো।

এভাবে চলতে থেকে শেষ পর্যন্ত সরকারও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন ভাঙ্গ ও আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে হারানো স্বর্গ লাভ ঘটে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী দর্শন এই বিষয়ে যে পৌরাণিক তত্ত্ব রচনা করেছে, তা অবশ্যই প্রশংসনীয় মনে করতে হবে।

কার্লমার্কস ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডেই কায়েম হবে। কেননা ইংল্যাণ্ড শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে অধিকতর অগ্রসর। সেখানেই ইতিহাসের নিশ্চিত অনিবার্য সংঘর্ষ সংঘটিত হবে, যার ফলে সরকার পুঁজিবাদীদের হাত থেকে সড়কে গিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে চলে যাবে। অথচ লক্ষণীয় হচ্ছে, যে সব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, তার প্রত্যেকটি দেশই শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে অত্যন্ত পশ্চাদপদ। রাশিয়া ও চীন তা থেকে ব্যতিক্রম ছিল না কিছুমাত্র। আর ইংল্যাণ্ড মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীর একশত বৎসর পরও এই বিংশ শতাব্দীর যুগে একটি পুঁজিবাদী দেশ হয়েই আছে।

এর সাথে যোগ করা যেতে পারে এই পৌরাণিক কল্পকথা যে, সুদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্র ব্যবস্থাই বিলীন হয়ে যাবে। সমস্ত যেন কল্পিত ফেরেশতা হয়ে যাবে। তাদের হৃদয় হবে স্বচ্ছ দর্পনের ন্যায় পরিচ্ছন্ন। কোনো লোভ-লালসাই তাদের বিপথগামী করতে পারে না।

সত্যি কথা হচ্ছে, সমাজতন্ত্র তার পঞ্চাশ ষাট বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার পর লেনিন ও স্ট্যালিনের অনুসৃত নীতি থেকে অনেকখানি সরে গেছে। এখানে ব্যক্তিগত মালিকানাও চালু হয়েছে— যদিও অনেক বাধ্যবাধকতা সহকারে। মজুরী ও পারিশ্রমিকের মধ্যেও আকাশ-পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সামষ্টিক কৃষি কাজের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। এখন সমাজতন্ত্রই জমির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তনের স্বপক্ষে এসে গেছে।

এসব পৌরাণিক কথাবার্তা উল্লেখের পরিবর্তে আমরা এখানে শুধু রাজনীতি সম্পর্কেই কথা বলব। এখানে আমরা অবশ্যই উল্লেখ করব ক্রুশ্চেভের সেই ভাষণ, যা সে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশতম অধিবেশনে পেশ করেছিল।

ক্রুশ্চেভ বলেছিল ঃ

স্ট্যালিনের শাসনকালে দলীয় নেতৃত্ব, সরকার এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে অনেক কিছু দোষত্রুটি প্রবেশ করেছিল। একদিক থেকে শুধু নির্দেশ জারী করা হতো। ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন করে রাখা হতো। ভয়ে ভয়ে কাজ করা হতো।

প্রতিটি নতুন জিনিসকেই ভয় করা হতো। আর এরূপ পরিস্থিতিতে বহু সংখ্যক তোশামুদে ও ধোঁকাবাজ তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল।

সম্ভবত লোকেরা এখনো ভুলে যায়নি যে, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ার পত্র-পত্রিকায় তাকে খুনী, অপরাধী ও সমাজতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

প্রোলেটারী স্বৈরতন্ত্র যে তার কঠোরতা, নির্মমতা, পাষণ্ডতা ও পাশবিকতার ক্ষেত্রে এতো বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, যা মানুষ কল্পনা করতেও রীতিমত ভয় পেয়ে যেত।

ইচ্ছা হলো কাউকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কারাগারে বন্দী করে রাখলো, এমন এমন শাস্তি দিতে শুরু করল যে, তার কল্পনায়ও রোমাঞ্চিত হতে হয়। এমন সব বিচারালয় গড়ে তোলা হয়েছিল, যার প্রতিটা মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কয়েদ করার দণ্ড দেওয়া হতো। সমাজতান্ত্রিক দেশে এ সব ব্যাপার তো অত্যন্ত সাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। যে কোনো লোক তার খপ্পরে পড়ে যেতে পারে। যার মনে সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লেশমাত্র ভাব জেগে উঠবে, তাকেই মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

এ সময় গোটা সরকারই গোয়েন্দাগিরির আড্ডাখানায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাতে লোকদেরে ভীত-সন্ত্রস্ত করে এবং মানবীয় বিশেষত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারের একান্ত বাধ্য অনুগত বানাতে চেষ্টা করা হচ্ছিল।

এসব অমানুষিক কাণ্ড-কারখানা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে আর বাইরে ছিল লোক দেখানো গণপ্রতিনিধিত্ব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বের দুর্ভেদ্য আচরণ বাইরের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছি।

সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন সাংবাদিকতা সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায় সব সময়ই পঞ্চমুখ হয়ে থাকে। কিন্তু সেই নেতাই যখন দুনিয়া থেকে চলে যায় তখন তারই ওপর অভিশাপ বর্ষণের ডংকা বাজানো হয়।

প্রোলেটারী স্বৈরতন্ত্রের অধীন রাজনীতির বাস্তব অবস্থা এরূপই। প্রতিটি সমাজ তান্ত্রিক দেশেই এরূপ অবস্থা বিরাজমান। সমাজতান্ত্রিক দেশ ও সমাজে এ থেকে ভিন্নতর কিছু হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

ভাল ধারণা পোষণকারী সাদা হৃদয়ের লোকেরা স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন বলে ব্যাপারগুলোর গভীর সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতে অক্ষম। চিন্তার জাহিলিয়াতে জীবন যাপনকারী লোকেরা প্রকৃত সত্যের সন্ধান এবং তার প্রতিবিধান করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

এরা মনে করে, তাদের কামনাও এই হয় যে, পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র এবং প্রোলেটারী স্বৈরতন্ত্রের সব দোষক্রটি ও ভুল-ভ্রান্তির প্রতিকার শুধু এভাবেই হতে পারে যে, সেখানে কিছুটা স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধা ও গণতান্ত্রিকতা সূচিত হোক। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যও শুধু এতটুকু।

বস্তুত আল্লাহ্র হেদায়েত ও আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত-বঞ্চিত হওয়া ও জাহিলিয়াতের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে জীবন যাপনকারী লোকেরা জাহিলিয়াতের গোটা ব্যবস্থায় নিহিত যাবতীয় দোষক্রটি দেখতে পায় না। জাহিলিয়াত যে তাগূতের অনুসারী, জাহিলিয়াত যে আল্লাহ্র দেখানো পথে চলে না, আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী কোনো কাজও করে না, তা এই লোকদের মোটেই জানা নেই।

তাগুতী শক্তিসমূহের অস্তিত্ব এমন নয় যার প্রতিকার করা খুব সহজ কাজ। কিছুটা স্বাধীনাতা ও গণতান্ত্রিকতার দ্বারা এই প্রতিকার কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। তাগুত স্বতঃই এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। তার ভিত্তিসমূহ মাটির গভীর তলায় নিহিত ও বিস্তীর্ণ।

পুঁজিবাদ অবশ্যই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা হবে। আর সমাজতন্ত্রও স্বৈরতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়— হতে পারে না। আসল কথা, যা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বভিত্তিক শাসন নয়, তা অনিবার্যরূপেই তাগুত, তাই স্বৈরশাসন। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ছাড়া আর সব শাসন ব্যবস্থা— সকল প্রকারের শাসন ব্যবস্থাই পুরা মাত্রার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। কোনো তাগুতী বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ করা হলে তা এমন হবে না যে, তার মধ্যে নিহিত তাগুতী দোষ-ক্রটি দূরীভূত হয়ে যেতে পারে এবং স্বাধীনতা ও শাসনতন্ত্রের পূর্ণ কল্যাণ লাভ করা যেতে পারে। কোনো আসল দোষ তো এসব ব্যবস্থার বাস্তবায়ন উপায়ের মধ্যে নয়, ক্রটি-বিচ্যুতি তো এসব ব্যবস্থার মূলে ও ভিত্তির মধ্যেই নিহিত। ফলে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ ও সংযোগের ফলে সে ক্রটি-বিচ্যুতি দূরীভূত হওয়া সম্ভব হয় না। তা ছাড়া আসল কথা হচ্ছে, এসব জাহিলিয়াত সুলভ শাসন ব্যবস্থার সাথে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ আদপেই সম্ভব নয়। তার প্রতিবিধান একটি মাত্র উপায়ে হওয়াই সম্ভব। আর তা হচ্ছে, জাহিলিয়াতের এই সব ব্যবস্থাকেই সমূলে উৎপাটিত করে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে এবং তদস্থলে এমন একটি নবতর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার ভিত্তি হবে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর বানানো সিরাতিম মুস্তাকীম অনুযায়ী এবং তার নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয় স্বৈরতন্ত্রই স্বাধীনতা হরণ ও লোকদের জীবন সংকীর্ণ করে দেয়। আর তা ব্যখ্যা দেয় এই বলে যে, আমরা এখানে পবিত্র সংগ্রামে লিপ্ত।

পুঁজিবাদী— মূলধন ভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র যে নিতান্তই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা কখনোই স্বীকার করবে না। তার ধারণা এবং দাবি হচ্ছে তা হচ্ছে শতকরা একশত ভাগ গণতান্ত্রিক। তা জাতির জনগণের ইচ্ছা ও আগ্রহের সারনির্যাস। কিন্তু পুঁজিবাদের কাছে তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে— শ্রমিক ও তাদের ইউনিয়নসমূহকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও কোনোঠাসা করা, প্রকৃত স্বাধীনতাকামী লোকদেরকে পথ থেকে হটিয়ে দেওয়া এবং এই ধরনের লোকদেরকে প্রধান পদ ও স্থান থেকে বিচ্যুত করা কিংবা তাদের জীবনকেই চিরদিনের তরে খতম করে দেওয়া ইত্যাদি কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে (যে, এই ধরনের গণবিরোধী কাজ কেন করা হয়?) জবাবে বলে, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই এই সব করা হয়। (অন্যথায় সমাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে!)

প্রোলেটারী ব্যবস্থারও দাবি বা ধারণা হচ্ছে, তা-ও নাকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যদিও তার ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক নামই হচ্ছে প্রোলেটারী ডিক্টেটরশিপ। কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লোকদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা এবং বিরোধী পক্ষের জীবনটাকেই শেষ করে দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই জবাব দেয় যে, তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

এই উভয় মতের লোকেরাই যুদ্ধের ময়দানে পবিত্র যুদ্ধে লিপ্ত! প্রত্যেক মতের লোকেরাই মনে করে, প্রতিপক্ষের লোকেরা তাদের ব্যবস্থাকে খতম করতে বদ্ধপরিকর। অতএব তাদেরকে এই ব্যবস্থা রক্ষার খাতিরে অত্যন্ত কঠোর হস্তে দমন করতে হবে, যেন গণ-কল্যাণ ও গণ-স্বার্থ রক্ষার চলমান প্রচেষ্টা সংরক্ষিত হতে পারে।

এই ব্যবস্থাগুলো যে কোনোরূপ সমালোচনাই বরদাশ্ত করতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। কোনো ইতিহাসে চিরদিন এরূপই হয়ে এসেছে যে, কোনো প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাইরে অথবা ভেতরে শত্রু হয়ে উঠল কিছু লোক, তারা সেই ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও উৎপাটিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য যুধ্যমান লোকদের শিবিরে একত্রিত হয়ে গেল— যেন সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা-প্রচেষ্টার দ্বারা সে ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করতে পারা যায়।

কাজেই জাহিলিয়াতের উপরোক্ত বক্তব্য হাস্যকর, ভিত্তিহীন এবং যৌক্তিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কেননা এরূপ ঘটনা এই দুনিয়ায় কিছুমাত্র নতুন নয়। তা তো খুবই স্বাভাবিক। তাই তার বিরুদ্ধে অমানুষিক দমন নীতি গ্রহণ করা নিতান্তই বর্বরতা এবং জাহিলিয়াতের তাগুতী আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবু এ বিষয়ে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিন্তাধারা অভিন্ন নয়। ইসলাম তার জন্ম মুহূর্ত থেকে এক প্রচণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যেও সে যুদ্ধ সীমালংঘন থেকে বিরত থাকেনি।

সে যুদ্ধ যেমন ছিল আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, তেমনি রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে প্রচণ্ডরূপ পরিগ্রহ করেছিল। যুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে। চিন্তাধারায় ইসলামের সুসংবদ্ধ সারিগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জাহিলিয়াত সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সে জন্যে দৈহিক নির্যাতন, অভুক্ত রাখা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল গ্রহণ— কোনোটাই বাদ রাখা হয়নি এবং এই সব কিছুই আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইসলামের আকীদা যাতে লোকেরা গ্রহণ না করে এবং গ্রহণ করে থাকলে যাতে তা ত্যাগ করে তার জন্যে অবলম্বিত হয়েছিল।

উত্তরকালে মদীনায় যখন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠল, তখন ইসলামের বিরুদ্ধেও এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটিকে অংকুরেই খতম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল, সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা হয়েছিল। সে যুদ্ধ যেমন ছিল প্রকাশ্য, তেমনি অধিকতর রূঢ় ও নির্মম।

মুসলিম সমাজে সৃষ্ট মুসাফিরদেরকে ধন-দৌলত দিয়ে, লোকজন দিয়ে এবং সর্বপ্রকারের বস্তুগত প্রস্তুতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল। সময় সুযোগ মতো নানা ধরনের সামাজিক ফিত্‌নার সৃষ্টি করা হয়েছিল, জনগণের মনে অস্থিরতা, উদ্বেগ ও ভয়-ভীতির সঞ্চার করা হয়েছিল— অর্থনৈতিক বয়কট করা হয়েছিল। খাদ্যের উৎস থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

আরও পরে গোটা আরব উপদ্বীপটি ব্যাপী যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেল, ইসলাম তার আসল স্বদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই নবতর ইসলামী দাওয়াত ও বিপ্লবের চেষ্টা রোধ করা যখন আর সুযোগ থাকল না, তখন যুদ্ধ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ভয়াবহ, সর্বধ্বংসী এবং খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দিল।

একদিকে রোমান সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল, প্রস্তুতি গ্রহণ করল ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করার। আর অপরদিকে পারস্য সাম্রাজ্য ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাকল।

অতঃপর কার্যত সংঘর্ষের সৃষ্টি হলো। যুদ্ধ হলো ততই প্রচণ্ড, যতটা প্রচণ্ড হওয়া সম্ভব ছিল। ইসলাম এই পবিত্র জিহাদে নেমে পড়ল। ইসলামের দৃষ্টিতে এ যুদ্ধ প্রকৃতই পবিত্র ছিল। কেননা তা ছিল আল্লাহ্‌র পথে, আল্লাহ্‌র কালেমার বিস্তৃতি ও

বিজয়ীকরণের জন্যে। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এরূপ জরুরী অবস্থায় মুসলিম জাহানের অভ্যন্তরে সরকারের নীতি ও ভূমিকা কি হওয়া শোভন ছিল।

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের আমল। তাঁরই খিলাফত আমলে উপরোক্ত দুটি মহা ও পরাশক্তির সাম্রাজ্যবাদী নীতি সৃষ্ট এই মারাত্মক যুদ্ধসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই উভয় পরাশক্তিই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে গোপন ও প্রকাশ্য যত ষড়যন্ত্র করা সম্ভব ছিল, তা সবকিছুই করেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে খলীফা উমর (রা) তাঁর সরকারাধীন মুসলিম জাহানের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন ?

ঐ যে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন উনি কি উমর নন ? ভাষণে কি বলছেন তিনি ?..বলছেন— হে জনতা! আমার কথা শোন...। মান্য করো...।

সহসাই একজন মুসলমান— তিনি আরব ভাষাভাষী কেউ নন। তিনি সালমান ফরসী— দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন ঃ না, আপনার কথা শুনতে ও তা মানতে আমরা বাধ্য নই— যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই— এই কাজের যথার্থ ব্যাখ্যা দিবেন, বুঝিয়ে না বলবেন, আপনি তা কেন করেছেন ?[১]

কিন্তু খলীফা এই কথা শুনেও একবিন্দু ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হলেন না। তখন তিনি একথাও বললেন না ঃ "আমি ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংস করতে চায় এমন সব শত্রুর সাথে কঠিন যুদ্ধ কাজে লিপ্ত আছি। আর এই সময়ই তুমি আমার বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলছ, আমার কাজে বাঁধা দিচ্ছ!ঃ না, তিনি এই তাগুতী কথা না বলে প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে তাকে শান্ত করলেন। তখন সালমান ফারসী বললেন, "হ্যাঁ, এখন আপনার বক্তব্য বলুন, আমরা শুনব এবং মানবও।"

তিনি কি সেই উমরই ছিলেন না, যিনি নামাযের খুতবা দিচ্ছিলেন মিম্বরে দাঁড়িয়ে। তখন একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বাঁধা দিলেন। বললেন, 'তুমি ভুল করছ।'

১. ব্যাপারটি ছিল এই যে, ইয়ামন থেকে সদ্য আসা কাপড় জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। তাতে উমর ও অন্যান্য মুসলমান সমপরিমাণ কাপড় ভাগে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘদেহী ব্যক্তি ছিলেন বলে প্রাপ্ত পরিমাণ কাপড়ের তাঁর কোর্তা তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর পুত্রের প্রাপ্ত অংশটিও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর মাপের জামা তৈরি হতে পেরেছিল। আর তা দেখেই হযরত সালমান (রা) আপত্তি তুলেছিলেন, আপনি এত বেশি কাপড় কোথায় পেলেন? তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে ডেকে এই আপত্তির জবাব দিতে বললেন। তিনি দাঁড়িয়ে প্রকৃত ব্যাপার যখন খুলে বললেন এবং প্রমাণ করলেন যে, খলীফা কারো চাইতে বেশি নেয়নি। তখন ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

জবাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, উমর ভুল করেছে আর একটি মেয়েলোক ঠিক কথাই বলেছে।'

তিনিও কি উমর ফারুক খলীফাতুল মুসলিমীন নন্, যিনি 'ফাই' সম্পদ বিজয়ী মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা না-করার বিষয়ে মুসলিম কল্যাণের দিকের একটি বিশেষ মত পোষণ করতেন, (তিনি বণ্টন না করার মত পোষণ করতেন, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে রেখে দেওয়াই ছিল তাঁর ইচ্ছা) কিন্তু হাবশী ক্রীতদাস বিলাল অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় তাঁকে বাঁধা দিলেন। অন্যান্য বিরোধী মতের লোদেরও তিনি একত্রিত করছিলেন। কিন্তু বিলালের বিপরীত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনো পথই থাকল না। অথচ তিনি তাঁর মতের যথার্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও দৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন। কেননা তিনি তো সাধারণ মুসলিমের কল্যাণের জন্যেই সেই মত পোষণ করছিলেন। তিনি নিরুপায় হয়ে স্বীয় আল্লাহ্র সমীপে হাত তুলে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন ঃ

اللهم اكفنى بلالا واصحابه -

হে আল্লাহ্! তুমি বিলাল ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে আমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও।

এ-ই হচ্ছে আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ ও পন্থা। এই পন্থাই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হয়েছিল। এরই আলোকে জাহিলিয়াতে কার্যকর তাগুতী সরকারের বীভৎস রূপ উদ্ঘাটিত হয়।

জাহিলিয়াতে যে যুদ্ধকে পবিত্র যুদ্ধ বলে মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ চালায়, তা মূলত এবং আদপেই কোনো পবিত্র যুদ্ধ নয়। স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে দেওয়া যুক্তি আদপেই কোনো যুক্তি নয়, চরম স্বেচ্ছাচারিতা, পাশবিকতা ও বলাৎকার মাত্র।

জাহিলিয়াতের কথিত যুদ্ধ নিতান্তই অপবিত্র, অপরিচ্ছন্ন, অভদ্রজনোচিত এবং অমানবিক। করায়ত্ত করা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তা একান্তই তাগুতী যুদ্ধ।

পুঁজিবাদী ও মূলধন ভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র বর্ণিত কার্যকলাপ ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারে না। প্রোলেটারিয়েটের স্বৈরতন্ত্রের কার্যকলাপও তাই হতে বাধ্য, যা উপরে দেখানো হয়েছে। সকল স্বৈরতন্ত্রই মানবীয় সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক। মানুষের ওপর মানুষের সার্বভৌমত্ব। তা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

তাই বলতে হচ্ছে, মানুষ যদ্দিন পর্যন্ত আল্লাহ্র দেওয়া আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সরকার গঠন না করছে, তদ্দিন স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ছাড়া মানুষের ভাগ্যে আর কিছুই জুটতে পারে না।

মূলধন যদ্দিন মানুষের ওপর প্রধান প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রক ও নীতি-নির্ধারক হয়ে থাকবে, তদ্দিন তা জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছুই হবে না। তদ্দিন তার পক্ষে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে রজনীতি গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তদ্দিন পর্যন্তই জাহিলিয়াতের দুর্ধর্ষ স্বৈরতন্ত্র থেকে মানবতার মুক্তি নেই। তদ্দিন পর্যন্ত বিদ্রোহী শ্রেণীর পক্ষ তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া কখনোই সম্ভব হবে না। তদ্দিন পর্যন্ত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সেই মুখোমুখী দাঁড়ানো শ্রেণীকে স্বৈরতন্ত্রের নিষেপষণ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তদ্দিন তা এমন সব আইন কার্যকর করবে, যা তাদের ক্ষমতাকেই সুদৃঢ় করবে, শাসক পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষা করবে, সর্বাঙ্গীনভাবে।

তা থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি সম্ভব নয় এজন্যে যে, সেই অবস্থাটা মূলধনের কর্তৃত্ব কায়েম করার নিশ্চিত অনিবার্য ফলশ্রুতি।

তবে তা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যানুযায়ী নিশ্চিত অনিবার্য নয়। কেননা মূলধনের ব্যাপারটাই ঐ রূপ। 'ব্যক্তি' ও মানুষের দিকে না দিয়েই একথা বলা হয়েছে। ঐ কথা নিশ্চিত অনিবার্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র জারীকৃত সুন্নাতের দৃষ্টিতে। আল্লাহ্‌র সুন্নাত হচ্ছে, মানুষ যদ্দিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম না করবে তদ্দিন পর্যন্ত তাগুতী শক্তিই তাদের শাসন করবে।

পুঁজিবাদী অবস্থায় তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, মানুষ শুরু থেকেই আল্লাহ্‌র পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে অস্বীকার করেছে। কেননা তা সুদ ও মুজদদারীকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। অথচ এ দুটিই হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রধান স্তম্ভ। এ দুটির ওপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদ গড়ে ওঠে। আল্লাহ্‌র পদ্ধতি মুষ্টিমেয় ধনী লোকদের হস্তে মূলধনের আবর্তন সীমিত হয়ে যাওয়াকেও হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু লোকেরা যখন সে বিধান অমান্য করে বসল, তখন তাগুতই তাদের ওপর শাসক ও ধন-মালের মালিক হয়ে বসল। আর মানুষ হলো তারই নিকৃষ্ট লাঞ্ছিত দাস। এই দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তিলাভ কখনোই সম্ভব নয়।

তাগুত মানুষকে দাসানুদাস বানানো থেকে কখনোই বিরত থাকবে না। কেবলমাত্র দুটি উপায়েই মানুষ এই অপমানকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। হয় মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসবে। তা হলে তখনই মূলধনের তাগুত ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। অথবা মানুষ অপর এক তাগুতের সন্ধান করবে। তা এসে পুঁজিবাদের ওপর কঠিন আঘাত হানবে। মূলধনের কৃর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে।

আধুনিক জাহিলিয়াতের এই শেষোক্ত অবস্থারই একটি তাগুত এগিয়ে এসে মানুষের জানপ্রাণ ও ধন-মালের নিরংকুশ মালিক হয়ে বসেছে। এটাও আর একটি জাহিলিয়াত।

এই নতুন তাগুত যদ্দিন পর্যন্ত জাহিলিয়াতের মধ্যে থেকে শাসন ও নিয়ন্ত্রক হয়েই থাকবে, আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে না, তদ্দিন পর্যন্ত এই তাগুতকে মাথা ও বুকের ওপর দিয়ে সরিয়ে দেওয়া কখনোই সম্ভব হবে না। বিদ্রোহী শ্রেণীর পক্ষেও সম্ভব হবে না সেই শাসন কর্তৃত্ব তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া। তথাকথিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়েই থাকবে তাদের জীবনে। এই সুযোগে এই তাগুত নিজের স্বার্থেই আইন প্রণয়ন করবে। তার হাত থেকে এই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ও তার স্বৈরশাসনের পথে বাধার সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ তা দেবে না।

না, তা কখনোই হবে না।

এই প্রেক্ষিতেই বলতে হচ্ছে, স্বৈরশাসন— তা মূলধন তথা পুঁজিবাদেরই হোক কিংবা হোক প্রোলেটারিয়েটের অথবা অন্য কোনো নামই ধারণ করুক— কোনো হালকা ও অস্থায়ীভাবে সওয়ার হয়ে বসা জিনিস নয় যে, সহসাই তা দূর হয়ে যাবে। আর জাহিলিয়াতের আকাশ থেকে লোকদের ওপর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বর্ষণ হবে এই তাগুতের ছায়াতলে, তা কোনো ক্রমেই কল্পনা করা যায় না।

ইতিহাসের জাহিলী বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় সবচেয়ে প্রধান সমস্যা— সব সমস্যারই গোড়ার কথা— হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা ও তজ্জনিত রাজনৈতিক ফলাফল।

পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র সীমা-নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তি মালিকানার অবাধ সুযোগ দিয়েছে, আর যদ্দিন তা এমনি সীমা ও নিয়ন্ত্রণহীন থাকবে তার রূপ যা-ই হোক— তার নিশ্চিত অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে, তারই হস্তে ধীরে ধীরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে। পরে তা এই ক্ষমতাকে সংরক্ষিত করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করবে। এ ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান, ক্রমবর্ধমানতা-ই তার প্রকৃতি। ফলে সুদ ও সুদী কারবার সম্পদকে ক্রমাগতভাবে ও চক্রবিদ্ধ হারে বাড়িয়ে দিবে তিন-চারগুণ বেশি-মুনাফা লাভের সুযোগ দিয়ে (আর পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র তো এরই ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।) শেষ পর্যন্ত তা মজুদদারী ব্যবসায়কে জমজমাট করে দেবে।[১] বর্তমান দুনিয়ার পুঁজিবাদ দেশসমূহে আমরা তাই ঘটতে দেখছি। আর তারই দরুন প্রভাব ও কর্তৃত্ব খুবই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। তারা খুব ভালো করেই জানে যে, তারা জীবিত মানুষের তাজা-তপ্ত রক্ত নিঃশেষ শুষে নিচ্ছে। একথাও তার জানা আছে যে, জনগণকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হলে তারা এই মুষ্টিমেয় লোকদের খতম করে তাদের ধন-মাল, শ্রম-মেহনত ও ঘাম-রক্তের প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে।

---

১. সুদ ও মজুদদারী থেকেই উত্তরকালে অর্থনীতিতে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু আমরা এখানে তার শুধু রাজনৈতিক কুফলের কথা বলেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি।

এই কারণে পুঁজিবাদের গোষ্ঠী আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের মুঠির মধ্যে রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুধু তা-ই নয়, সরকার যন্ত্র দখল করে কিংবা রাজনৈতিক দল গঠন করে আইন কার্যকর করার ক্ষমতাটাও নিজেদের মুঠির মধ্যে ধরে রাখে, আর জনগণকে কিছুটা সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্যান্য কিছু আনন্দানুষ্ঠানের স্বাধীনতা দিয়ে মশগুল রাখে যেন তাদের অন্যায় গণ-স্বার্থবিরোধী ও শোষণমূলক কার্যকলাপের প্রতি তাদের দৃষ্টি না পড়ে।

হ্যাঁ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেশ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।

সেই সুযোগ-সুবিধা নৃত্যগীত, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, মদ্যপান, জুয়াখেলা ও জেনা-ব্যভিচারের। তার ঘোষণাই হলো, যা ইচ্ছা করতে পারো। এটা তোমার ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। তোমাকে কেউ কোনো কাজে বাধা দিতে পারবে না, বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। কারুর কর্তৃত্ব হলোবে না তোমার ওপর। মনে যেমন ভালো লাগে পোষাক পরিধান করো আর ন্যাংটা হতে চাও ? তাতেও কোনো বাঁধা নেই। তোমার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করো যেমন তোমার ইচ্ছা— যার সাথে ইচ্ছা। তুমি তো মহা স্বাধীনতার ছত্রছায়ায় বাস করার সুযোগ পাচ্ছ।

এই ধরনের সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করেই পুঁজিবাদ টিকে থাকে। জনগণের বুকের ওপর চাপা থাকে তাগুতের জগদ্দল পাথর।

প্রোলেটারী স্বৈরতন্ত্র অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানাও খতম করে দেয়। আর যদ্দিন এই ব্যক্তিগত মালিকানা বন্ধ থাকবে, তদ্দিন তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সম্পূর্ণ রূপ শাসন ক্ষমতার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে। জনগণের হাত থেকে সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে নিয়ে নেওয়া হতে থাকবে। এই শাসন যদ্দিন স্থায়ী থাকবে, কোনো ব্যক্তিই একবিন্দু জিনিসেরও মালিক হতে পারবে না। একমুঠি খাবারও পেতে হবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে। এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথেই এক মুঠি খাবারও পাওয়া যাবে না। এরই নিশ্চিত অনিবার্য ফলে ব্যক্তি হবে রাষ্ট্রের নিকৃষ্টতম গোলাম। এই গোলামীর বিনিময়ে সে পাবে এক মুঠি খাবার মাত্র। তার পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে বা তার কোনো আচরণের প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়ানো কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কেননা তার জীবিকা— তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় একমুঠি খাবার তো সরকারের কাছ থেকেই তাকে পেতে হচ্ছে। তার কর্তৃত্বের আওতার বাইরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কোনো তা গেলে তাকে না খেয়ে মরতে হবে। এরূপ অবস্থায় প্রোলেটারী পত্র-পত্রিকার সরকারী মালিকানাধীন থেকে প্রত্যেক জীবিত থাকা শাসকের খুবই পবিত্র চরিত্র নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক একনিষ্ঠ হওয়ার কথা বলে। আর সে মরে গেলেই কিংবা ক্ষমতাচ্যুত হলেই তাকে

বর্বর, নির্মম, বিশ্বাসঘাতক, খুনী ও মানুষের দুশমনরূপে চিত্রিত করে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিকভাবে কোনোই পার্থক্য নেই। কার্যত এটা ওটা দুটোই সমান। এটা হলেও কিছু যায় আসে না, ওটা হলেও কোনোই লাভ নেই। কেননা স্বৈরতন্ত্র কেবল মাত্র শাসক ব্যক্তির মধ্যে নিহিত নয়। এই গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিই রক্ষিত হয়েছে স্বৈরতন্ত্রের ওপর। তাতে একজন শাসক চলে গেলে আর একজন এসে তারই মতো স্বৈরতন্ত্র চালায়। জনগণ যে অবস্থায় পূর্বে ছিল পরেও ঠিক সেই অবস্থায়ই পড়ে থাকে। বিন্দুমাত্র পার্থক্য কোথাও লক্ষ্যগোচর হয় না।

অবশ্য প্রোলেটারী স্বৈরতন্ত্র— সামাজতান্ত্রিক শাসন— বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে বেড়ায়, তা সেইসব মানুষকে সম্পূর্ণ মুক্তিদান করেছে যারা সামন্তবাদের অধীন অপমানকর অবস্থায় বাস করত ভূমিহীন ছিল বলে এবং মূলধনের পুঁজিবাদের নিকৃষ্ট গোলামী থেকেও। তথায় মানুষ এক মুঠি খাবারের জন্যে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছিল।...হ্যাঁ, মুক্তি পেয়েছিল বটে; কিন্তু কিছু সময় যেতে না যেতেই আবার সেই লাঞ্ছণা ও অপমানের মধ্যে পড়ে গেল সেই একমুঠি খাবারের জন্যে। একজন মালিক চলে গেল, আর একজন এসে গেল, জনগণ যেমন নিকৃষ্ট দাস পূর্বে ছিল, পরেও তাই থাকবে। মৌলিকভাবে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হলো না। শুধু তাগুতের আকৃতি বদলে গেল। জনগণ পূর্বের মতই পুঞ্জীভূত জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকল। নিতান্তই দাস হয়ে থাকল।

সমাজতন্ত্রও জনগণকে তার স্বৈরশাসন থেকে গাফিল বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদের মতোই জনগণকে কিছুটা স্বার্থ, কিছুটা সুযোগ-সুবিধা, কিছুটা সামাজিক সুবিচার ও আনন্দ লাভের নানা অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দিয়েছে। তা-ও সেই নৃত্য-গীত, নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, যৌন-প্রবৃত্তির অবাধ নির্বিঘ্ন চরিতার্থতা ইত্যাদি! সমাজতন্ত্রও জনগণকে বলে যা-ইচ্ছা হয় করো, এখন তো তোমরা মুক্ত ও স্বাধীন।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছু কিছু প্রকৃত সুযোগ-সুবিধাও জনগণ লাভ করে বটে— তাতে সন্দেহ নেই। কিছু আংশিক ন্যায়পরতাও পায়, পায় কিছুটা আনন্দ স্ফূর্তি। যেমন কুকুরের ঘেউ ঘেউ থামাবার জন্যে তার সম্মুখে কিছু মাংসহীন হাড় ছুড়ে দেওয়া হয়, এইভাবে জনগণকে সম্পূর্ণ বেখেয়াল অপ্রতিবাদী বানিয়ে রেখে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ও রুঢ়তম তাগুতের নিরংকুশ শাসন কায়েম হয়ে যায়। আর স্বয়ং শাসকগোষ্ঠী সর্বপ্রকারের ফিস্‌ক ফুজুরী পাপানুষ্ঠানের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে।

পুঁজিবাদী তাগুতের অধীন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে এত ধন-সম্পদ ও শক্তি-ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হয়ে যায় এবং তাদের জীবনে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ গৌরবের তত সীমা-সংখ্যাহীন সামগ্রী ও তার চাকচিক্য এসে যায় যে, তা দেখে লোকদের চোখ ঝলসে যায়।

আর সমাজতান্ত্রিক তাগুতী ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব সম্পন্ন ও শাসনদণ্ড ধারণকারী কতিপয় দলীয় নেতা ও কর্মী দুনিয়ার সীমাহীন আনন্দ ও ভোগ-সম্ভোগ সামগ্রী দুই হাতে লুটেপুটে নেয়। আর অভাব-অনটন দারিদ্র্য দেশের আপামর জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বন্টন করে দেয়। এরা কোনো দিনই সুখের মুখ দেখে না। আর কর্তারা কোনো দিনই জানতে পার না অভাব ও ক্ষুধা কাকে বলে।

এই উভয় ধরনের স্বৈরতন্ত্রই প্রচারযন্ত্রসমূহ নিজেদের ইচ্ছামতো প্রোপাগাণ্ডা চালানোর কাজে ব্যবহার করে। জনসাধারণ তাদের দয়ায় কি কি সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, সরকার তাদের খিদমতে কিভাবে দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে— তার ব্যাপক প্রচার চালানো হয়, যা শুনে জনগণ স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। তারা শাসক গোষ্ঠীর অন্যায়-অত্যাচার ও অনাচার দেখাবার ও তার বিরুদ্ধে বলার কোনো সুযোগই কখনও পায় না। তারা যে মানুষগুলোকে নির্বাক জন্তু-জানোয়ারে পরিণত করে রেখেছে তাদের সকল মানবিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে— তা বোঝার সামর্থ্যও অনেকেরই হয় না।

ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যায় এসব কিছুই বিপ্লব ও উন্নতির নামে চলে আসছে আবহমানকাল ধরে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্যক্তি মালিকানা ও সমাজের রাজনৈতিক অবস্থায় তার প্রভাবের দিকে আমরা ইঙ্গিত করেছি। আমরা বলে এসেছি —

আমরা 'মালিকানা' শব্দের ব্যাখ্যায় মূল জাহিলী যুক্তি গ্রহণ করেছি। কিন্তু তার চিন্তা-বিশ্লেষণে এই যুক্তির অনুসরণ আমাদের ইচ্ছা নয়। কেননা তা কারণ ও ফলকে ওলট-পালট করে দেয়। আরও ভালো ভাবে বললে বলা যায়, তা শিকলের ধারার মধ্য হতে একটি মাত্র কড়া গ্রহণ করে এবং মানব জীবনের বাস্তবতায় তার স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা থেকে সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তা রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাখ্যা করে অর্থনৈতিক রূপরেখা দিয়ে। অর্থনীতিকে তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে রেখে ব্যাখ্যা করতে তা আদৌ প্রস্তুত নয়। মানুষের চিন্তা-বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়েও তার ব্যাখ্যাদান তার অনভিপ্রেত। কোনো ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যায় মানুষ অর্থনৈতিক সংস্থা ও অবস্থার অধীন। অর্থনৈতিক সংস্থা ও অবস্থা মানুষের অধীন নয়।

> "সামষ্টিক উৎপাদন— যা লোকেরা করে আসছে, মানুষ তার ভিত্তিতে একটা সীমাবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই। তা তাদের ইচ্ছা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। অতএব বস্তুগত জীবনে উৎপাদন পদ্ধতিই জীবনে আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামষ্টিক কার্যক্রমের রূপ নির্ধারণ করে। মানুষের নিজের চেতনা তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না বরং তাদের অস্তিত্বই তাদের চিন্তা-চেতনা নির্ধারণ করে।"— (কার্লমার্কস)

আমরা পূর্বে ধারণা ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয় সম্পর্কিত আলোচনায় এই জাহিলী ধারণার মধ্যে নিহিত বিপর্যয় সম্পর্কে বলে এসেছি। তাতে মানুষের মেধা ও মূল্যবোধ এবং তার কর্মশীলতার ইতিবাচকতা সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে যায়। আর এই মানুষ যে যন্ত্রপাতি উৎপাদ করেছে, ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের সবকিছুকে তারই ফলশ্রুতি বলে দাবি করছে। এই মানুষ তার নিজের মধ্যে নিহিত আগ্রহ ও প্রতিরোধক উদ্দীপতাকে অস্বীকার করে।

যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হওয়ার পর সমগ্র জীবনে বিবর্তন সৃষ্টি করে এই কথা তার উৎপাদনকারী যখন তা উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তখন আদৌ চিন্তা করেনি। কিন্তু এই কথা বস্তুবাদী ব্যাখ্যার এই কথাকে সত্য বলে স্বীকার করে না যে, এই বিবর্তন মানুষের ইচ্ছাবাসনা থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। এই বিবর্তন পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টিগোচরও ছিল না যখন তা উৎপাদন করা হচ্ছিল। কাজেই তা স্বয়ং

মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই চলতে পারে। পারে তাকে উন্নত করতে, পারে অধঃপতনে পৌঁছে দিতে। মানব মনের সকল সোজা ও আঁকা বাকা পথ ধরেই তার গতিবিধি হলো একান্ত জরুরি। তার বাইরে তার জন্যে আদৌ কোনো পথ খোলা নেই। কোনো তা শূন্যে— বায়ূলোকে কাজ করতে পারে না। তা সব সময়ই মনের পথে মনের মধ্য দিয়েই কাজ করে।

মানুষ যখন উড়োজাহাজ আবিষ্কার করল, তখন বস্তুগত কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না, যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিরত রাখতে পারত। মানব মনে প্রাচীনকাল থেকেই একটা উদ্বুদ্ধকারী আগ্রহ কাজ করছিল। বলছিল, সে পাখির ন্যায় শূন্যলোকে উড়ে বেড়াবে। এই আগ্রহ উৎসাহই শুরুকালীন বহু প্রকারের চেষ্টা সাধনায় রূপায়িত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার বৈজ্ঞানিক পন্থা উদ্ভাবিত হলো, যখন মানুষের জ্ঞান ও অর্জিত তত্ত্ব ও তথ্য বৈজ্ঞানিকভাবেই এই আগ্রহ বাস্তবায়নে তাকে সক্ষম করে দিল। এই আগ্রহ ও উৎসাহের মূলে আর একটি কারণ ছিল এক স্থান থেকে অন্যস্থানে খুবই দ্রুততা সহকার যাতায়াত করতে পারার সুবিধা লাভ। তার এটাও স্বাভাবসিদ্ধ আগ্রহই বটে! শুরুতে সাহসিকতা সহকারেই তা পূরণের চেষ্টা হয়। পর সে একটি জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়। পরে চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত হয় কোনো দ্রুত উপায় উদ্ভাবনে। আর তার এই চেষ্টা-প্রচেষ্টাই তাকে উড়োজাহাজ উৎপাদনে সক্ষম করে দিল। তারপর রকেট আবিষ্কৃত হলো।

উড়োজাহাজ যখন কার্যতই উৎপাদিত ও নির্মিত হলো, তখন সমাজে একটি বিপ্লবাত্মক বিবর্তন ঘটিয়ে দিল। যুদ্ধ ও শান্তি— উভয় অবস্থায়ই তার ব্যবহার হতে লাগল।

কিন্তু তাতে বিবর্তন ঘটল কেমন করে ? এ বিবর্তন কি মানুষের মনের দিকটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে, তার আগ্রহ-উৎসাহ এবং তার সোজা ও বাঁকা গতিবিধিকে বাদ দিয়ে ভিন্নতর কোনো পথ ধরে চলেছে ? এবং চলে এসে মানুষের জন্যে এই কাজ করেছে ?

বস্তুত উড়োজাহাজ উৎপাদন সহজতর হওয়ার পশ্চাতে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ধারণা ও সংস্কৃতি-সভ্যতার ব্যাপক সংযোগ রয়েছে। তা কি নতুন কোনো ব্যাপার যা উড়োজাহাজ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে ? কিংবা তা অতীব প্রাচীনকালীন অন্তর্নিহিত বাসনা, যা পূরণের জন্যে মানবতা প্রাথমিক সহজ যন্ত্রপাতি দ্বারা চেষ্টা চালিয়েছিল প্রাচীনকালে। পরে এ পর্যায়ে বড় ও ব্যাপক আকারে চেষ্টা চালিয়েছে, যখন তার জন্যে সমস্ত সম্ভাবনাই গড়ে তোলা হয়েছিল। এ সম্ভাবনাই তা নিজ হস্তে গড়ে তুলেছে।

কোনো এক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অপর কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রধান প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশালী বানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উড়োজাহাজকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার কাজেও তা ব্যবহৃত হয়নি, তা বলার উপায় নেই। তা করা হয়েছে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের উপায় অবলম্বন করে। তাহলে তা কি এমন কিছু নতুন ব্যাপার যা উড়োজাহাজ ঘটিয়েছে কিংবা ইতিহাসের গভীরে তার জন্যে বহু সাক্ষ্য রয়েছে।

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উদার উন্মুক্ত করে খুলে দিয়েছে এই উড়োজাহাজ। কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে যা করেছে তা হচ্ছে বাড়তি সম্ভাবনা ও আগ্রহ উৎসাহ বাস্তবায়ন, যা এতদিন প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল; কিন্তু কার্যকর হওয়ার পথ পাচ্ছিল না। কিন্তু তা এমন কিছুই নতুন করে সৃষ্টি করেনি, যা পূর্ব থেকেই মানুষের মনে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশমানভাবে বিরাজ করছিল না। তা কোনো নতুন মানুষও সৃষ্টি করেনি। যদিও বস্তুগত ব্যাখ্যা এই সব কিছুই ধারণা করে নিতে বলতে চেয়েছে!

এখান থেকেই আমরা চিরন্তন মানুষের কাছে ফিরে যাব এবং মানবীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে অর্থনীতির ব্যাখ্যা করব,— অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে মানুষের ব্যাখ্যা নয়।

মালিকানা ব্যাপারটি অর্থনীতির জগতে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মালিকানা কি করে হয়, তার ফলাফল কি?

বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ইতিহাসের স্তরসমূহের জন্যে কতগুলো নিশ্চিত অনিবার্য রূপ নির্দিষ্ট করে দেয় মালিকানার জন্যে নিশ্চিত রূপ ও প্রকারের মধ্য থেকে।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ দিয়েই ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, এই ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক নিশ্চিত অপরিহার্যতা নিতান্তই যুক্তিহীন ও দুর্বল কথা।

ইসলাম যখন তার মৌল নীতিসমূহ সহকারে তার এই জমিনে এই অবকাশের মধ্যে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদত্ত নিশ্চিত অনিবার্যতার একবিন্দু সহায়তা ও আনুকূল্য ছাড়াই আত্মপ্রকাশ করল, তখন একবার আমরা ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতার সর্বাত্মক কৃত্রিমতা ধরতে পেরেছিলাম। তখন কোনো ক্রীতদাস মুক্তিলাভের জন্যে উদগ্রীব হয়ে যায়নি। তখন এমন কোনো অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতাও ছিল না, যা তাকে মুক্ত করতে পারত— যেমনটা ইউরোপে ঘটেছে ইসলামের সাত শতাব্দী পর। তখন কোনো নারীও মুক্তির জন্যে পাগল হয়ে ওঠেনি। তাকে মুক্ত করার কোনো নিশ্চিত অর্থনৈতিক অনিবার্যতাও ছিল না। ছিল না তাকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করার, মালিকানার অধিকার দেওয়ার ও তাতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার— বিয়ে-তালাকে স্বাধীনভাবে মত দেওয়ার অধিকার দেওয়াবার পক্ষে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির কোনো কিছুই কোথাও ছিল না। এইগুলো এমন সব মৌল

অধিকার যা ইউরোপ নারীকে দিয়েছে এই সেদিন— ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মাত্র। তাও আবার নৈতিকতার ক্ষেত্রে বীভৎস দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও ধ্বংসকারী বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার পর।

তখন সাধারণ জনগণও মুক্তি চায়নি গোত্রীয় কর্তৃত্ব আধিপত্য থেকে কিংবা স্বেচ্ছাচারী শাসনের গোলামী থেকে। কোনো অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতাও এই মুক্তির ব্যবস্থা করেনি। ধন-মাল ও শাসন সংক্রান্ত রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অভিনব তাৎপর্য নিয়ে আসারও তখন কোনো বাধ্যকারী কারণ কোথাও ছিল না ইউরোপে। যার অনেকগুলোর প্রকাশ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ঘটতে পারেনি। তাও ঘটেছিল মালিক ও অ-মালিকদের মধ্যে বহু রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার পর।

এই সব ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো একটিতেও নিশ্চিত অপরিহার্যতা বলতে কোনো কিছুই ছিল না।

আমরা আর একবার এই নিশ্চিত অনিবার্যতার কৃত্রিমতা ও ভিত্তিহীনতা দেখতে পেয়েছি, যখন দুটি শিল্প-কারখানার দিক দিয়ে অত্যন্ত বেশি পশ্চাদপদ সামন্তবাদী দেশে কমিউনিজম শিকড় গেড়ে বসল, সে দেশ দুটি হচ্ছে রাশিয়া ও চীন। অথচ যে ইংলণ্ডে তার শৈল্পিক অগ্রবর্তিতার কারণে সমাজতন্ত্র কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা ছিল একান্তই নিশ্চিত অপরিহার্য ব্যাপার। কিন্তু সেখানে তা কায়েম হয়নি বরং এখন পর্যন্ত সেই পুঁজিবাদই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইংল্যাণ্ডের বুক জুড়ে।

তাই মালিকানার সেই রূপ পরিগ্রহ করাও কিছুমাত্র নিশ্চিত অনিবার্য নয়, যা বর্তমান জাহিলিয়াতের স্থলে গ্রহণ করেছে। তা পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্রের হোক কিংবা হোক সমাজতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে।... ... এ সবকিছুই ভিত্তিহীন কথাবার্তা।

ইউরোপে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাহিলিয়াতের ছত্রছায়ায়, যা সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠার কারণে পূর্ব থেকেই আনুকূল্য পেয়ে গিয়েছিল। পূর্বে ঠিক যে নিয়মে ও ধারায় সামন্তবাদ কায়েম হয়েছিল, পুঁজিবাদও ঠিক সেই নিয়মে ও ধারায় কায়েম হয়েছিল, আর তা হচ্ছে মালিকানার সীমাহীনতা ও নিরংকুশ স্বাধীনতা— সর্বতোভাবে।

ইউরোপীয় জাহিলিয়াতেরও আনুকূল্য তার জন্যে নিশ্চিত অনিবার্য ব্যাপার ছিল না। এ পর্যায়ে যা বলা যায় তা শুধু এতটুকুই যে, তা কার্যত সংঘটিত হয়েছে। তার বাস্তবমুখী শক্তি ছিল বলেই তা হয়েছে। কিন্তু তা তার কল্যাণময় হওয়ার পক্ষের কোনো যুক্তি নয়। কোনো সীমালংঘনের সাফাই গাওয়ার জন্যে কোনো কিছুই প্রস্তুত নয়।

আর পুঁজিবাদী জাহিলিয়াতে যে বিবর্তনই ঘটেছে, তা হচ্ছে প্রকৃতির বিবর্তন। তাগুত তার দ্বারাই মানুষকে গোলাম বানিয়ে ছেড়েছে। পূর্বে তারা ছিল ভূমিদাস। উত্তরকালে তারাই হলো শিল্প-কারখানার শ্রমিক দাস, মূলধন ও পুঁজিবাদের ক্রীতদাস। কিন্তু মৌলিকতা ও সারবত্তার দিক দিয়ে সীমালংঘন ও আল্লাহ্-দ্রোহিতার প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। আর দাসানুদাস হওয়ার— লাঞ্ছিত অবমানিত হওয়ার দিক দিয়ে দাসত্ব প্রকৃতিও অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

মূলধনের প্রকৃতি অর্থনৈতিক রূপ পরিগ্রহের ক্ষেত্রে জমির প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কিন্তু দখল, আয়ত্তকরণ, মালিকত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের আগ্রহ উৎসুকের দিক দিয়ে তা ভিন্নতর কিছু নয়।

যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যকরতার জন্যে নগদ মূলধনের প্রয়োজন দেখা দিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে।

কিন্তু এ পর্যন্ত চলে আসা ভূমি মালিকদের পক্ষে হঠাৎ করে মূলধন ও শিল্পপতি হয়ে যাওয়া প্রথম দিক দিয়ে খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। কোনো ঝোঁক-প্রবণতা ও অভ্যাস দুটোই মানুষের মনের সাথে সম্পৃক্ত। সামন্তবাদীরা তো এতদিন সম্পূর্ণ শান্ত ও নিশ্চিতভাবে সেই পথে কাজ করে আসছিল, যে পথে তারা ধন-মাল আয়ত্ত করার সাথে সাথে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছিল। এই ক্ষেত্রে ক্রমাগত কয়েক শতাব্দীকালের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের ছিল। এদিকে সামন্তবাদীদের তাগুত শিল্পের ক্ষেত্রে নেমেছে মাত্র কয়েকশ বছর হলো। তাই এক্ষেত্রের চড়াই-উৎরাইয়ের অভিজ্ঞতা অনেক বিলম্বে অর্জিত হয়েছে। এটা কোনো ব্যক্তিগত নিশ্চিত অনিবার্যতার ব্যাপার নয়। বরং তা জনগণের একান্তভাবে সেদিকে ঝুঁকে পড়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে, ... যদিও আল্লাহ্র পথ থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়ার পরিণামে।

প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের জন্যে জমির মালিকানার পথ বাদ দিয়ে নতুন একটি পথের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ...... আর সেই সুযোগেই সুদখোর বেনিয়া ইহুদীরা পুঁজিবাদ সৃষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুই হাতে ঋণ বিতরণ করতে শুরু করল। যদিও ঋণের বিনিময়ে সুদখোর সমাজের সৃষ্টি নতুন কিছু ছিল না, যা পুঁজিবাদ সৃষ্টি করেছে। ইহুদীরা এই কাজ করে এসেছে ইতিহাসের সেই সূচনাকাল থেকেই। সুদ তাদের দেহের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতই সদা প্রবহমান। যদিও আল্লাহ্ তাদেরকে তাওরাত কিতাবে এই সুদখোরী থেকে বিরত থাকার জন্যে আদেশ করেছিলেন, সুদী কারবার করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা মুহূর্তের তরেও এই কাজ থেকে বিরত থাকেনি। বরং তারা এই কারবার নিয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্র সূদী কারবারের এই জাহিলিয়াত একমাত্র ইহুদীদেরই সৃষ্টি।

তাওরাত তাদের বলেছিল; তোমার ভাইয়ের খাতিরে তুমি সুদী কারবার করো না। তখন তারা নিজেদেরকে বললে— অথবা বলা যায়, তাদের লোভ ও লালসাই তাদের মনে জাগিয়ে দিল এই কথা ঃ "তোমার ভাইয়ের জন্যে অর্থাৎ ইহুদীদের সঙ্গে সুদী কারবার করতে নিষেধ করা হয়েছে। খুব ভালো কথা! কিন্তু অ-ইহুদী উম্মীদের সাথে সুদী কারবার করে সর্বতোভাবে তাদের রক্ত শুঁষে নিতে তো কোনো দোষ নেই।" কুরআন মজীদে তাদের এই কথাটিই উদ্ধৃত হয়েছে এই ভাষায় ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ-

তা এই ভাবে যে, তারা বলেছিল যে, উম্মী লোকদের মধ্যে আমাদের জন্যে কোনো নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা নেই। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৫)

সুদের ভিত্তিতে ঋণ দানের কারবারী এই ইহুদীদের জন্যে প্রয়োজন ছিল তাদের ঋণ ও সুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। যেমন ঋণ গ্রহণকারীর জন্যে জরুরি ছিল এমন মুনাফা লাভ, যা ঋণ শোধ দেওয়ার সাথে সথে তার সুদ আদায় করার ব্যবস্থা করে দেবে। আর সেই সাথে ব্যক্তিগত মুনাফার একটা অংশ তার নিজের হাতে অবশিষ্ট থাকা। আর এখান থেকেই সূচিত হলো পুঁজিবাদ গড়ে ওঠা— সেই প্রথম দিন থেকেই। বিপুল মুনাফা লাভের আগ্রহই হলো এর মূল নিয়ামক। আর তা খুব সহজ পথেই হতে লাগল।

কিন্তু তা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় কথিত কোনো ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতার ব্যাপার ছিল না।

সংশ্লিষ্ট সকলের পূর্ণ সহযোগিতায় পুঁজিবাদ গড়ে উঠার পথে সেখানে কোনো প্রতিবন্ধকই ছিল না। এই সময় ইউরোপীয় সমাজের ব্যবসায়ীরা যে ধন-মালের মালিক ছিল, তা শিল্প উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগকৃত ছিল। তারাই আরও মূলধন সংগ্রহ করল ইহুদীদের কাছ থেকে সুদের ভিত্তিতে।

এই সময় জনগণ ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসতে পারত। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌র পথ— ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছে। আর তদস্থলে সম্পূর্ণ জায়েয ঘোষণা করেছে নির্দোষ শর্তে ব্যবসায়ী সহযোগিতা।

তাই বলতে হয়, পুঁজিবাদ সৃষ্টি কোনো নিশ্চিত অনিবার্যতার ফলশ্রুতি ছিল না। এটা পুরাপুরি বিপথগামিতা, গুমরাহী ও বিভ্রান্তি মাত্র। আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করেনি বলেই জাহিলিয়াতের এই মারাত্মক বিভ্রান্তি।

জাহিলিয়াত অর্থনৈতিক কায়-কারবারে সুদী ব্যবস্থাকে অবাধ ও নির্বিঘ্ন করে দিয়েছে। আর এটাই ছিল মানবতার জন্যে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনার নিশ্চিত অনিবার্যতা। একটু পরেই আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত বলব। কিন্তু আমরা তার পূর্বে

বলতে চাচ্ছি যে, ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যা যেমন বলে, অর্থনৈতিক কায়-কারবার জনগণের নৈতিক মূল্যমান ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিলনা।

যে জাহিলিয়াত আল্লাহ্‌র পথের বিপরীত গিয়ে যে সুদী কারবারের প্রচলন করেছে, তারও পূর্বে ধোঁকা, প্রতারণা, অপহরণ, অধিকার কেড়ে নেওয়া ও লুণ্ঠনের কাজ করতে সিদ্ধহস্ত হয়েছিল সামন্তবাদী ব্যবস্থার ছত্রছায়ায়। এক্ষণে সেখান থেকে ফিরে এসে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ঠিক সেই কাজই করছে। নতুন কিছুই নয়।

যে জাহিলিয়াত কৃষক চাষীদেরকে ভূমি চাষের কাজে একান্তভাবে মশগুল করে রেখেছিল, যেখানে তাদের সমস্ত কর্মশক্তি নিঃশেষ নিয়োজিত হয়েছিল, একমুঠি খাবারের বিনিময়ে, ঠিক সেই জাহিলিয়াতই শ্রমিক কর্মচারীদের মশগুল করে রেখেছে শিল্প কারখানার চার দেওয়ালের মধ্যে, যেন তাদের সমস্ত কর্মশক্তি এখানে নিঃশেষ হয়ে যায়, ঠিক সেই একমুঠি খাবার পাওয়ার বিনিময়ে।

না, জাহিলিয়াত নতুন কোনো সৃষ্টি হিসেবে গড়ে ওঠে না, যা পূর্বে ইউরোপীয় জাহিলিয়াতে বর্তমান ছিল না। মূলত তা ছিল, বর্তমানের রূপটা তারই সম্প্রসারণ মাত্র।

সুদী কারবারের অন্তর্নিহিত কথা হলো, তার ফলে মূলধন দ্রুততা সহকারে দুইগুণ তিনগুণ চারগুণ বৃদ্ধি পায়। এটাই তার স্বভাব। জমি থেকে প্রাপ্ত মুনাফা তার সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি এবং দ্রুত মূলধন বৃদ্ধি পায় এই সুদী কারবারে। আর এই কারণে পুঁজিবাদের হাতে সামন্তবাদী জাহিলিয়াতের নৈতিকতাও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই বৃদ্ধিটা বীভৎসতা, কদর্যতা ও অধপতনে গমনের দিকে।

পুঁজিবাদ তার অগ্রগতিতে বিপুল সাহায্য ও সহযোগিতাও পেয়েছে। তার সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধিই পেয়ে গেছে চতুর্দিক থেকে ব্যাপক আনুকূল্য পেয়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান তার সমস্ত সম্ভাবনা দিয়ে পুঁজিবাদেরই সহায়তা করেছে। ফলে তার পথের সব প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার ক্ষমতা ও মারত্মকতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

কিন্তু তাও কোনো ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতার কারণে হয়নি।

উত্তর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো অন্যান্য বহু সংখ্যক ব্যাপারে তার বিপথগামিতা ও জাহিলিয়াত থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ সহযোগিতামূলক পুঁজিবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি দেশে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতিতে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

এসব দেশের জনগণই তা করতে ইচ্ছা করেছে এবং তা-ই কার্যকর করেছে। ফলে পুঁজিবাদের সহযোগিতা করার পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতারই সম্মুখীন হয়নি। এমন কোনো দুর্ঘটনাই ঘটেনি, যার দরুন বীভৎস রক্তপাতকারী খুনীর ভূমিকা পালন করতে কোনোরূপ অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

এটা কোনো নিশ্চিত অনিবার্যতা নয়। এটা নিতান্তই বিপথগামিতা মাত্র। পুঁজি বাদ ক্রমশ সমৃদ্ধ, বিরাট বপু ও ক্রমবর্ধমান হতে থাকল। আর পাশাপাশি চলতে থাকল বিজ্ঞানের বেশি বেশি অগ্রগতি ও উন্নতি। ফলে এমন একদিন এলো, যখন বড় বড় পুঁজিদার বৈজ্ঞানিক পন্থায় সম্ভাব্য বিপুল মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে ছোট ছোট পুঁজিদারের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াল। এরই ফলে বড় পুঁজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিকে খেয়ে ফেলল। অথবা তাকে বাধ্য করল তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে তার ভিতরে ঢুকে যেতে। আর শেষ পর্যন্ত এক এক দেশে এক এক স্থানে পুঁজির স্তুপ জমা হয়ে গেল। পূর্ণ ইজারাদারী বা একচেটিয়া ব্যবসায় কর্তৃত্ব গড়ে উঠল। কোনো শিল্পে নিয়োজিত মূলধন যখন পারস্পরিকভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলো, একটা আর একটার সাথে মিলিত হয়ে একটি একক ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তুলল, তখন সেই শিল্পের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব অনিবার্যভাবে কায়েম হয়ে গেল সেই ঐক্যবদ্ধ পুঁজিবাদের। ফলে অপর কোনো মূলধন সেই ক্ষেত্রে তার সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে সাহস পেল না। কোনো তাতে ইতিমধ্যেই একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং তার সেই একচেটিয়া কর্তৃত্ব সর্বদিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এর-ও কোনো নিশ্চিত ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক অনিবার্যতা ছিল না। উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কার্যত সহযোগিতা যত বেশি বৃদ্ধি পেল, এই দেশগুলোর মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের পরস্পরেও তত বেশি সহযোগিতা গড়ে উঠল। অনুরূপভাবে সবগুলো দেশে একই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল ও সেইগুলো পরস্পরের মধ্যেও ব্যাপক সহযোগিতার কাজ করতে থাকল। বিনিয়োজিত হলো পরস্পর সহযোগিতাকারী বিরাট বিরাট মূলধন। তখন পণ্য ব্যবহারকারীদের অপেক্ষা পণ্য মূল্য নির্ধারণে একচেটিয়া কর্তৃত্ব করাটাই লক্ষ্য থাকল না। এ সব যৌথ কারবারের অংশীদারদের সকলের বিপুল মুনাফা লাভ করিয়ে দেওয়াই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। যদিও এই সব লোকই ছিল পণ্যের ব্যবহারকারীও। তাই এক্ষণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি বা হ্রসপ্রাপ্তিতে কল্যাণ বা ক্ষতি কোনোটাই তেমন থাকল না। তাই এই ব্যবসায় কোম্পানীসমূহের অংশীদাররা নিজেরাই যদ্দিন ব্যবহারকারীও তদ্দিন সর্বাবস্থায় অভিন্ন ফল দেখা দেওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। শিল্পোৎপাদনের গতি বৃদ্ধি পেল, নিত্যনতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠল এবং উৎপন্ন পণ্যের স্তুপ জমা হয়ে গেল। তখন এই পণ্য দেশ-বিদেশের জনগণের মধ্যে বিস্তীর্ণ করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। আর তখন থেকেই পুঁজিবাদী দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি,

তার সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতা সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দিল। যেন উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য সাম্রাজ্যের অধীন দেশসমূহে বিক্রয় করা সম্ভব হয়।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাবি করছে, এই সবই হয়েছে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতার কারণে।... কিন্তু তার এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন।

পুঁজিবাদ ও উদ্বৃত্ত পণ্যসম্ভার সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করেনি। তাই যদি হবে, তা হলে ইতিহাসখ্যাত রোমান সাম্রাজ্যবাদের কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে?...আসলে সাম্রাজ্যবাদ জাহিলী সমাজের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী কামনা বাসনারই অনিবার্য ফল। আর প্রতিটি জাহিলী সমাজই বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও আধিপত্য কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকে।

উদ্বৃত্ত পণ্যসম্ভারকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে সাম্রাজ্যবাদই একমাত্র উপায় ও পন্থা নয়, যাকে নিশ্চিত অনিবার্য মনে করা যেতে পারে।

ব্যবসায় বাণিজ্যই তার স্বাভাবিক গতিতে উদ্বৃত্ত গণ্য বিস্তারের জন্যে যথেষ্ট মাধ্যম। আর উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হলেই উদ্বৃত্ত পণ্যের কোনো প্রশ্ন থাকে না, যাকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারে।

এসবই হচ্ছে পুঁজিবাদের ছত্রছায়ায় সৃষ্ট নিশ্চিত অনিবার্যতা। আরও ভালোভাবে বললে, পুঁজিবাদ সমৃদ্ধ জাহিলিয়াতের ছত্রছায়ায়ই তা সম্ভব। পরে তার সকল ফলাফলই তাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে। ফলে এটাই নিশ্চিত অনিবার্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। কোনো তার সীমালংঘনমূলক বাড়াবাড়িকে রুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এমন কোনো জিনিসই কোথাও ছিল না।

অবশ্য একটু একটু করে চেষ্টা করা হলে এ বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হতো। অবশ্য জনগণ যদি তা চাইত, যা চেয়েছি তা না চেয়ে এবং তারা যদি আল্লাহ্‌র পথে চলতে প্রস্তুত হতো। কুরআন মজীদে এই কথাই বলা হয়েছেঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ -

গ্রাম জনপদবাসীরা যদি সত্যিই ঈমান আনত এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করত, তাহলে আমরা ওপর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল থেকে বরকত বিপুলতা-ব্যাপকতার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতাম। (সূরা-আরাফ ঃ ৯৬)

অতঃপর এই জাহিলিয়াত অপর একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ...আর তা হচ্ছে, এই সকলের কাছ থেকেই মালিকানা কেড়ে নেওয়া হলো...।

পূর্ববর্তী জাহিলিয়াতকালে এই ধারণা করা হয়েছিল যে, ব্যক্তিগত মালিকত্বই বুঝি পৃথিবীতে সার্বিক বিপর্যয় সৃষ্টির আসল কারণ। আসলে বিপর্যয় কে সৃষ্টি করল— কোন দিক থেকে বিপর্যয়টা এলো, জাহিলিয়াত তা আদৌ ধারণা করতে পারেনি। মানুষই যে সকল বিপর্যয়ের মূলে— বিপর্যস্ত হয়েছে খোদ মানুষ— তা এই জাহিলিয়াতের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। আসলে সংশোধন যদি কাউকে করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে এই মানুষকে। আর মানুষের সংশোধন কেবল একটি উপায়েই সম্ভব। তা হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহ্‌র পথের পথিক হতে হবে। আল্লাহ্‌র পথের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই তার গোটা জীবনকে— সামগ্রিক জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। তা হলে মানুষ তার নিজের নিগূঢ় সত্যতা ও যথার্থতা বুঝতে সক্ষম হবে, তার মধ্যে নিহিত যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য ও মেধা-প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব হবে, সম্ভব হবে জীবন ও বিশ্ব প্রকৃতি পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কেন্দ্রীয় মর্যাদার কথা জানতে ও বুঝতে পারা।

কিন্তু জাহিলিয়াত তার ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যার আলোকে মনে করে দিয়েছে যে, অর্থনীতিই বুঝি মানুষ গড়ে, তাই অর্থনীতি ঠিক হলেই মানুষও ঠিক হয়ে যাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তখন কোনোরূপ হস্তক্ষেপ বা স্বতন্ত্রভাবে কোনো সংশোধনী প্রচেষ্টা চালানোর কোনো প্রয়োজন হবে না। কোনো এই ব্যাখ্যানুযায়ী যান্ত্রিক নিশ্চিত অনিবার্যতাই জীবনকে তার দাবি ও তাগিদ অনুযায়ী পরিচালিত করে এবং তা যান্ত্রিকরূপেই তার নিশ্চিত অনিবার্য ফলাফল প্রকাশিত হয়। গোটা বিশ্ব প্রকৃতিও সেই অনুসারে সংশোধিত হয়ে যায়, যখন লোকদের কাছ থেকে তাদের মালিকানা অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

কিন্তু এটা কোনো বিজ্ঞান ছিল না। এ ধারণা কোনোক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এটাকে নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা, বোকামী ও জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের একটা অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। তারই অন্তর্ভুক্ত ছিল জাহিলিয়াতের সকল প্রতিক্রিয়া। তার সাথে বাড়তি জিনিস ছিল মানব মনে নিহিত যাবতীয় মেধাশক্তি ও প্রতিভা সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও মুর্খতা, জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একদিকে এবং অন্যদিকে মানব সমষ্টির সাথে তার কার্যক্রম সম্পর্কেও চরম অজ্ঞানতা একটা বিরাট কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বস্তুত অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থার নিজস্ব গুরুত্ব যতই বেশি হোক, তা মানব জীবনের একটি অংশ মাত্র। তার অধিক কোনো গুরুত্বই তা পেতে পারে না। অবশ্য সে অংশ নিতান্তই মৌলিক, অত্যন্ত প্রভাবশালী ও নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই তো আর গোটা জীবনটা নয়। জীবনের ওপর একমাত্র প্রভাবশালী অংশও তা নয়।

কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াত তাতে অত্যন্ত বেশি অস্বাভাবিক রকমের বাড়াবাড়িমূলক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর জীবনের অন্যান্য সব দিকের গুরুত্বকে অনেক বেশি কম ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমা পুঁজিবাদ ও প্রাচ্যদেশীয় সমাজতন্ত্র সমান ও অভিন্ন ভূমিকাই পালন করেছে। আর তারই দরুন মানব জীবনে মারাত্মক ধরনের বড় বড় গণ্ডগোল ও বিঘ্নতার সৃষ্টি করেছে। তার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত মানুষের কেবল ধ্বংসই অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর বেশির ভাগে উৎপাদন যন্ত্রপাতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কোনো যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ধারিত হবে তা বস্তুগতভাবে কতটা উৎপাদন করতে পারছে সেই দৃষ্টিতে। মানুষের মূল্যায়ন মানবীয় মূল্যমানের দৃষ্টিতে হবে না।

উপরে যে বিশৃঙ্খলা, বিঘ্নতা ও দোষত্রুটির কথা বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত ব্যাপক। সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিকতা ও দুই লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কের বিকৃতি পর্যায়ের আলোচনায় বিস্তারিত কথা বলব। এখানে শুধু এতটুকুই বক্তব্য যে, উক্ত বিঘ্নতা ও দোষত্রুটির কারণে আধুনিক জাহিলিয়াত ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার কেড়ে নিয়ে সমস্যার সমাধানে যে বিশেষ পন্থার প্রয়োগ করেছিল, তা তাদের ধারণানুযায়ী কোনো সুফল দিতে পারেনি, যদিও তারা সেটাকেই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের একমাত্র চাবিকাঠি মনে করে বসেছিল।

আসলে বর্তমান জাহিলিয়াত বিকৃত বিপথগামী বলে তা মানব প্রকৃতির মৌলিক ভাবধারার সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানা (দখলী অধিকার) কেড়ে নিয়ে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকেও খতম করে দিতে উদ্যত হয়েছে। আর দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক ঝগড়ার সৃষ্টি করেছে। তার দাবি হচ্ছে, মালিকানা প্রবণতা কোনো স্বাভাবিক— প্রকৃতিগত— প্রবণতা নয়, তা সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের উত্তরাধিকার মাত্র। মানব প্রকৃতিতে তা মৌলিকভাবে নিবদ্ধ নয়। ...এখানেই থেমে যায়নি। তা যখন বুঝতে পারল, বিরোধীয় বিষয়টিকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করার জন্যে তাদের উপস্থাপিত যুক্তি কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়, তখন তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। তখন তা মানুষের আসলেই কোনো প্রকৃতি বা স্বভাব আছে, একথাই অস্বীকার করে বসল। মনে হচ্ছে, মানুষের মধ্যে এই প্রকৃতিটাকে তার গভীরে বিস্তীর্ণ শিকড় সহ উপড়িয়ে ফেলতেই বদ্ধপরিকর হয়েছে। বলতে শুরু করল, মানুষ প্রকৃতিগত কোনো প্রবণতা ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেছে (কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস্ প্রমুখ এই মতই প্রকাশ করেছে।) বিশেষ করে মানুষের জন্মকালে মালিকানা লাভের কোনো প্রবণতাই তার প্রকৃতিতে ছিল না। সমাজ-ব্যবস্থা এই খারাপ চিন্তার বীজ তার মনের জমিনে বপন করে দিয়েছে। এখানে তা উৎপাটিত করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কেননা তা-ই মানুষের সকল দুর্ভাগ্যের মৌলিক কারণ।

কিন্তু জাহিলিয়াতের এ ধ্বজাধারীরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো আলোচনা করতেই প্রস্তুত হয়নি। অথচ বিষয়টির ঐতিহাসিক দাবি ছিল তা করার। প্রশ্ন রয়েছে, সমাজই যদি এ প্রবণতা মানব-প্রকৃতিতে বদ্ধমূল করে থাকে, তাহলে সমাজ তা করল কেন ? ...... এই সমাজ জিনিসটাই বা কি, যা এই কর্মটি করেছে ?...তা কি খোদ মানুষকে বাদ দিয়ে ভিন্নতর কোনো জিনিস ?...হ্যাঁ, একথা সত্য যে, সমাজ ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। ব্যক্তি যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রের মর্যাদা পায়, সমাজের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব তা থেকে অনেকটাই ভিন্নতর হয়।...কিন্তু তবু তা কি মানুষ ছাড়া কিছু ?

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেই যে, মার্কস ও দরখায়েম যেমন মনে করে, সমাজ-কাঠামো ব্যক্তির ওপর অনেক কিছুই চাপিয়ে দেয়, মানুষের মনের কোনো তাগিদ ছাড়াই— কোনো ইচ্ছা ও উদ্যোগ ব্যতীতই ব্যক্তির মনে ভালো ও খারাপ উভয় ধরনেরই ভাবধারার সৃষ্টি করে, তা হলে প্রশ্ন ওঠে, কেবল একজন ব্যক্তিই মানুষ, সমাজ নয়। এই ধারণা কে সৃষ্টি করেছে?...সমাজ তো মানুষেরই সমষ্টি। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির সমন্বয়কে কি সমাজ বলা হয় ?

না, তা কখনোই নয়। অবশ্য জাহিলিয়াতের ধ্বজাধারীরা এই তর্কে এগিয়ে আসেনি। অথচ তারাই সর্বশক্তি প্রয়োগে ব্যক্তির মন মগজ থেকে এই ব্যক্তি-মালিকানার ভাবধারা ও প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটিত করা জন্যে ওঠে পড়ে লেগে গিয়েছে। তাদের ধারণা হচ্ছে, প্রাথমিক কালের মানুষ ব্যক্তিগত মালিকানা চিনত না, জানত না সমাজের সকলের মধ্যে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার— যার অস্তিত্ব এখন নেই, ছড়িয়ে ছিল। আর উৎপাদন হতো অনুরূপভাবে সামাজিক সামষ্টিক পদ্ধতিতে। পরে যখন কৃষি ও চাষাবাদের কাজ শুরু হলো, কেবল তখনই ব্যক্তি মালিকানার প্রশ্ন দেখা দিল, লোকেরাও তার সাথে পরিচিতি লাভ করল। মানুষ তখন জমির মালিকানা লাভের জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠল। আর সেই সাথে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকত্বও করায়ত্ত করতে চাইল। তা উৎপাদনকারী জনগণের মালিকানা, যা দাসত্ব স্তরে কার্যকর ছিল, পরে সামন্তবাদী স্তরেও তা ছিল, পুঁজিবাদের স্তরে এসেও তা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

জাহিলিয়াতের এই অন্ধ লোকগুলোকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে যা যুক্তি পেশ করা হয়, তা কিছুমাত্র যথেষ্ট ছিল না।

প্রথম সূচনাকালীন যুগে মালিক হওয়ার যোগ্য— যার মালিক হওয়া যায় কোন জিনিসটি ছিল ?

প্রস্তরখণ্ড.........চাকুর মতো শানিত, তীক্ষ্ণ। তার মালিক হলে কার কি লাভ? কাঁচা মাংস কেটে খণ্ড করার কাজে দাঁত ও নখ যখন ব্যর্থ হয়ে যেত, তখন এই

ধারালো পাথর খণ্ড ব্যবহার করা হতো। কিন্তু খোদা এই মাংস ও মাছ— যা টুকরা করা হতো এর মালিক হওয়া যেত কেমন করে? কোনো জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে সংগৃহীত মাছ ও মাংস দুর্গন্ধময় হয়ে যেত, পঁচে যেত। তা খাওয়ার যোগ্য হতো না, ...তা হলে তা পুঞ্জীত করে দখল করেই বা রাখা হতো কেন ? কেনই বা তা সংরক্ষণের প্রশ্ন দেখা দিত, কি ভাবে তা সংরক্ষিত হতো ?

এ পর্যায়ে মালিকত্ব মূলতই অর্থহীন ছিল। কোনো মালিক হওয়ার মতো কোনো জিনিসই তখন ছিল না। মালিক হওয়ার কোনো প্রবণতা মানব প্রকৃতি নেই, এ কারণে নয়, জাহিলিয়াতের ধ্বজাধারীরা কি এই নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেছে যে, সেই প্রাথমিক সমাজে কোনো জিনিসেরই মালিকত্ব নিয়ে কখনোই কোনো ঝগড়ার সৃষ্টি হয়নি ?.... তা হলে ? কোনো নির্দিষ্ট মেয়েলোকের মালিকত্ব লাভ নিয়ে কি তখনকার লোকদের মধ্যে কখনোই কোনো পাশবিক দ্বন্দ্ব ও বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়নি ? যার চোখে সে মেয়েটি অধিক সুশ্রী, সুন্দরী গণ্য হতো, তার প্রেম পাওয়ার জন্যে সে হতো পাগল। তখন সে তাকে নিজের একক দখলে পাওয়ার জন্যে চেষ্টা শুরু করে দিত। গোত্রপতি কিংবা সম্প্রদায়ের কোনো সাহসী যুবক যদি তাই হতো, তা হলে শক্তি পরীক্ষায় অন্য সকলের ওপর জয়ী হয়ে সে মেয়েটিকে রীতিমত দখল করে নিত।

গোত্রপতি কি নিজেকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করত না ?... অন্ততঃ বাহ্যিক পোশাকে, মাথায় একটি পাখির পালক লাগিয়ে ? অন্যদের থেকে তার মালিকত্ব কি ভিন্নতর ছিল না ? অন্যদেরকে তা ব্যবহার করতে কি নিষেধ করা হতো না ?

হ্যাঁ, খুব সামান্য ও জঘন্য জিনিসেই এই মালিকত্ব প্রতিফলিত হতো। তবু তাও মালিকত্ব, ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপার নয় কি তা ?... এ তো সেই সময়ের কথা, যখন সেই প্রাথমিক যুগে সকল মানুষ যখন সমান মানে জীবন যাপন করত? তখনও ঠিক যতটা সম্ভব হতো, ব্যক্তিরা তার মালিক হয়ে বসত।...তা কি অস্বীকার করা যায় ?

ক্রমশ এই মালিকত্বের ভাবধারার বিকাশ ঘটে। মনস্তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে তা ক্রমশ অধিকতর পরিপক্ক হয়ে ওঠে। তাদের বস্তুগত শক্তি সম্ভাবনাও অনেক বড় হয়ে ওঠে। আর তাদের জ্ঞানগত সামর্থ্য হয় দিগন্ত বিস্তীর্ণ। তখন তারা মালিকানা লাভ করতে লাগল প্রশস্ত বেষ্টনীতে। মালিক হলো জমির, মালিক হলো জমি চাষের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের।

তারপরই সূচিত হয় বিভ্রান্তি, বিপথগামিতা।

কিন্তু তাদের এই বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা এজন্যে ছিল না যে, তারা কিছু না কিছুর মালিক হয়ে বসেছিল, এর পূর্বেই তারা তাদের মনস্তাত্ত্বিক, বস্তুগত ও জ্ঞানগত মানের সীমার মধ্যেই কিছু না কিছুর মালিক হয়েছিল।

পরে তারা যখন জমির ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিকত্ব চিনল, জানল, ঠিক তখনই তাদের বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা শুরু হয়ে যায়নি।

এ বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা অনেক পুরাতন ব্যাপার। মানুষ যত পুরাতন, তাও ততটাই প্রাচীন।

তারা যখন একটি নারীর মালিকত্ব নিয়ে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলো, গোত্রপতিত্ব নিয়েও— তা লাভ করার জন্যেও তারা পরস্পরের সাথে কঠিন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। যে পাখির পালক মাথায় লাগিয়ে স্বীয় শোভা বর্ধন করা হতো ও অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত হতো, তার মালিক কে হবে, তাই নিয়ে ছিল তাদের পারস্পরিক ঝগড়া, দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা।

পরে দৈহিক শক্তিবলে এই সব কিছু অর্জনে তারা প্রবৃত্ত হয়। যে বিজয়ী হতো সেই হতো তাদের প্রধান কর্তৃত্বশালী। ...হ্যাঁ, এটাও ছিল বিভ্রান্তি, বিপথগামিতা। আসলে মানুষের মালিক হয়ে বসার এই বাসনা, পরে তারা নিজেরাই নিজেদের মালিক হতো ? তারই জন্যে এই কামনা ও লোভ। মনুষ্যত্বের সূচনাকালীন এই বাসনা-কামনাই হচ্ছে মূল বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা।

আর বিভ্রান্তি বিপথগামিতা তো কোনো সময়ই কোনো চূড়ান্ত অনিবার্য শক্তি ছিল না। মানুষের জন্যে তা-ই একমাত্র উপায় ছিল না কখনোই।

বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা— তা যে সময়ই হোক— একটা মানবীয় সম্ভবনা মাত্র। তা ঘটে, ঠিক যেমন ঘটে ভারসাম্যতা, সৎপথে হলো। এ দুটো ব্যাপারই সমান।

আর এ দুটিই মূল মানব প্রকৃতি থেকে উৎসারিত। সেই প্রকৃতি যেমন হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতার ধারক, তেমনি ধারক গুমরাহীর পথ গ্রহণের যোগ্যতারও। তাই মানব প্রকৃতি বিভ্রান্তিতে পড়ে, যেমন তা গ্রহণ করে ভারসাম্যতা, ঠিক নির্ভুল পথ।[১]

ইতিহাসের জাহিলী বস্তুবাদী ব্যাখ্যার একটা নিতান্তই পৌরাণিক কথা হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবণতা সূচিত হয়েছে কেবল তখন, যখন কৃষি ও চাষাবাদের সূচনা হয়েছে। আর এই মালিকত্বই হচ্ছে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার আসল

১. دراسات فى النفس الانسانيه দ্রষ্টব্য।

কারণ।......আসলে এটা একটা ভিত্তিহীন পৌরাণিক কল্প-কাহিনী মাত্র। জাহিলিয়াত মানব প্রকৃতি যথার্থভাবে জানতে ও অনুধাবন করতে পারেনি বলেই তা ঘটেছে।

ইতিহাসের এমন কোনো অধ্যায়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যখন এই ব্যক্তিগত মালিকানা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কেবল তাই বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার মৌল কারণ নয়, তা হতেও পারে না। যখন তা পড়েছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থায়, তখন সেটিকে কল্যাণের দিকে চালিত করলে তা হতো অতীব কল্যাণকর উপকরণ। কর্মতৎপরতা ও অগ্রগতি উন্নতি সাধিত হতো জীবনের সর্বক্ষেত্রে। অবশ্য তা তখন খারাপ দিকেও নিয়ে যাওয়া যেত আর তাই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে আজ তা ধ্বংস, বক্রতা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাই নিশ্চিত অনিবার্য হিসেবে সামন্তবাদ বা পুঁজিবাদের সৃষ্টি করেনি (পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে)। কামনা বাসনা লালসাই তার আসল উদ্ভাবক। এই কামনা-বাসনা লালসাই মানুষকে দাসানুদাস বানানোর জন্যে মালিকানাকে উপায় হিসেবে অবলম্বন করেছে। মানুষের ওপর নিজের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে, গৌরব-অহংকার করেছে। আর তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার মৌল কারণ। আর তা সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই।

পরে মার্কসীয় জাহিলিয়াত ব্যক্তিমালিকানা অধিকার চূড়ান্তভাবে হরণ করেছে, হরণ করেছে অত্যন্ত ভুলভাবে এই কথা মনে করে যে, বিপর্যয়ের কারণটা বুঝি ওখানেই লুকিয়ে রয়েছে। তা মানুষের নিজের মধ্যে নেই, যে মানুষ জাহিলিয়াতের ইউরোপে তখন বাস করত।...অতঃপর বিগত অর্ধ শতাব্দীরও বেশিকাল সময়ের এই অভিজ্ঞতার বাস্তব ফল কি পাওয়া গেছে, কি হয়েছে তার পরিণতি ?

ব্যক্তিমালিকানা হরণ করে মার্কসীয় জাহিলিয়াত কি কর্তৃত্ব লাভের স্বভাবগত কামনা-বাসনা-লালসাকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে ?

...আমরা বললে তো দোষ হয়। তাই এ বিষয়ে আমাদের কথা বলা উচিত নয়। এ বিষয়ে মার্কসীয় জাহিলিয়াতের বড় পাণ্ডা ক্রুশ্চেভই আসল কথা বলে দিয়েছেন। ক্রুশ্চেভের পূর্বসুরির মৃত্যুর পর সে তার সম্পর্কে মুখ খুলতে সাহস পেয়েছিল। অবশ্য তখন সে ক্ষমতাসীন ছিল বলে। বলেছিল— সে ছিল অপরাধী, রক্তপাতকারী, খুনী, ইতিহাসের বীভৎস চরিত্রের এক স্বৈরাচারী।

এই কথা বলা হচ্ছে এমন সময়, যখন ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে কোনো নাম চিহ্নও কোথাও নেই। সব কেড়ে কুড়ে নেওয়া হয়েছে।......কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে না হলো এই জাহিলী মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা পুরোপুরি রয়ে গেছে। তা বিলুপ্ত করার জন্যে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। সেদিকে

ভ্রুক্ষেপও করা হয়নি। আর এই বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতারই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে এই স্বৈরতন্ত্রীর বীভৎসতা সম্ভব হয়েছিল (এ বিষয়ে, 'রাজনীতিতে বিপর্যয়' অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি)। এই স্বৈরতন্ত্র মহান নেতা, বন্য অপরাধী, ব্যাপক রক্তপাতকারী দ্বারা অনুষ্ঠিত হোক কিংবা স্বয়ং এই নীতি ও আদর্শের দ্বারাই হোক, তাতে কার্যত তো কোনোই পার্থক্য সূচিত হয় না। কেননা সেখানে মানুষের গোটা সত্তাকেই তো অস্বীকার করা হয়েছে। তাকে করা হয়েছে লাঞ্ছিত, অবমানিত। বিনিময়ে দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে শুধু এক মুঠো খাবার। তাকে দাসানুদাস বানিয় দেওয়া হয়েছে অত্যাচারী নিরংকুশ রাষ্ট্রযন্ত্রের। তারই হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সমস্ত ক্ষমতা।

এ জাহিলিয়াত নানা বিঘ্নতা ও দোষ-ক্রটির সমন্বয়।

অর্থনৈতিক দিকটাকে মানুষের গোটা সত্তার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মানুষের আসল সত্তাকে করা হয়েছে অস্বীকৃত। মানবীয় সত্তা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভাবধারা সম্পন্নই নয়। তাতে রয়েছে আরও অনেক কল্যাণময়ী ভাবধারা। মানুষ তার দেহ, বিবেক ও রূপ এই সব কিছু নিয়েই তো মানুষ। তাতেই নিহিত রয়েছে এই সকল ভাবধারা সমন্বিতভাবে, মানুষ তার পূর্ণ গভীরতা নিয়ে এক মৌল সত্তা।

বিপর্যয়ের মৌল উৎস নিহিত রয়েছে মালিকানা লাভের উপায় ও পন্থায়। সবকিছুকে সীমাহীনভাবে 'মুবাহ' গণ্য করেই হোক কিংবা পুঁজিবাদ অনুসৃত ভিন্নতর পন্থায়ই হোক অথবা সকল পথ বাতিল করে দিয়েই হোক— যেমন হয়েছে সমাজতন্ত্রের, অন্তত নীতিগতভাবে হলেও। যদিও মানব প্রকৃতির বাস্তবতার চাপে পড়ে মার্কসীয় লেনিনীয় দর্শনের মৌল তত্ত্ব থেকে সরে এসে হলেও কিছুটা ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে, মজুরীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে— আর ক্রুশ্চেভের কথানুযায়ী চরম বাস্তব ব্যর্থতা স্বীকারের পর কৃষিক্ষেত্রে ভূমির সামষ্টিক মালিকানাও নিঃশেষ করে দিতে হবে,— তবু এই মালিকানার পন্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিপর্যয়ের আসল কারণ।

এই বিভ্রান্ত মানবতা যদি নির্ভুল সঠিক পথে ফিরে আসতে রাজি হয়, যদি সংশোধন বা চিকিৎসা করার ইচ্ছা হয় এই কঠিন রোগের, তাহলে উভয় রোগের চিকিৎসা এক সাথে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর যে মূল উৎস থেকে এই রোগ বিপর্যয় উৎসারিত, সেই মৌল উৎসের চিকিৎসা ও সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত রোগ দুটির চিকিৎসা কখনোই সফল হতে পারে না।

এজন্যে একদিকে মালিকানা লাভের উপায় ও পন্থার চিকিৎসার প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের সততা কখনোই হরণ করা যাবে না। আবার কোনোরূপ

সীমা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতই তাকে উন্মুক্তভাবে হলোতে দিতে সেই নির্বুদ্ধিতাও করা যেতে পারে না— যেমন করা হয়েছে পুঁজিবাদে।

অপরদিকে মানব জীবনে অর্থনৈতিক স্বভাবসম্মত যে স্থান, মর্যাদা ও গুরুত্ব, ঠিক ততটুকু স্বীকার করে জীবনটাকে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। আর তা যদি সত্যিই করা সম্ভব হয় তা হলে মানব জীবনে বস্তুগত ও অর্থনৈতিক কোনো নতুন বিপর্যয় কোনো দিনই দেখা দেবে না। অর্থনীতিকে তার আসল ও সঠিক স্থানে বসাতে হবে। তা হলে তা স্ফীত হয়ে বিপর্যয়ের কারণ ঘটাবে না। তারই পার্শ্বে তার সংরক্ষক-নিয়ন্ত্রক হিসেবে অত্যন্ত জাগ্রত ও তেজস্বী করে তুলতে হবে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে, তার নৈতিক চেতনাকে, হালাল হারাম বোধকে।

মূলত মানুষ এমনি এক সমন্বিত গুণাবলী সম্পন্ন বিশেষ সৃষ্টি। ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব মানুষের এই মৌল সত্তাকে অস্বীকার করেছে। তাই মানুষ মানবীয় মর্যাদা থেকে পশুর স্তরে নেমে গেছে। মানবীয় মহৎ গুণাবলী হারিয়ে হিংস্র পশুতে পরিণত হয়েছে।

সোজা কথা হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসতে হবে। সমগ্র জীবনকে পুনর্গঠিত করতে হবে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান— পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ভিত্তিতে।

সামাজিক বিপর্যয়

সমাজবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক।

আধুনিক জাহিলিয়াত যেমন রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তেমনি ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতাদর্শ নির্ধারণেও মারাত্মক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবায়নেও কোনো শৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষিত হয়নি। তার কারণ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ প্রকৃতপক্ষে পরস্পর গভীরভাবে জড়িত। একটিকে অন্যটি থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা যায় না।

পূর্বের আলোচনায় আমরা অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখে এসেছি। এক্ষণে সমাজের সাথে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ আলোচনা নিশ্চয়ই বস্তুবাদী জাহিলিয়াতের দৃষ্টিকোণ দিয়ে হবে না। বরং তার ভিত্তি হবে এই যে, অর্থনীতি এক দিক দিয়ে যেমন সমাজ গঠন করে, তেমিন অপরদিক দিয়ে রাজনীতি ও সমাজ গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এই সব কিছু মানব সত্তার বাহ্যিক প্রকাশ ও প্রপঞ্চ মাত্র। সুসংবদ্ধ সত্তারই বিভিন্ন দিক। আর সে সত্তা হচ্ছে মানুষ।[১]

ব্যক্তি ও সমাজ সমষ্টির সম্পর্কে সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে আধুনিক জাহিলিয়াত যে বিপর্যয় নিয়ে এসেছে সে দিকে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি— তা আসলে মূল মানুষ বা মনুষ্যত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা গ্রহণেরই ফলশ্রুতি। আর মানুষ বা মনুষ্যত্ব সম্পর্কে ধারণা গ্রহণে বর্তমান যুগের জাহিলিয়াত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। আর এ ভারসাম্য হারানোর একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান ও প্রদর্শিত পথ থেকে বিভ্রান্তি বা বিপথগামিতা।

ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে আধুনিক জাহিলিয়াতের ধারণা হচ্ছে ঃ

ব্যক্তির গুরুত্ব স্বীকার করে যে সমাজ সংস্থা গড়ে ওঠে, সেই সমাজের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তা ব্যক্তিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ব্যক্তির গুরুত্বে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করে এবং ব্যক্তির সত্তাকে সীমাহীনভাবে মহান পবিত্র জানিয়ে দেয়। জনমনে এই ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, তাকে কেউ স্পর্শও করতে পারে না। তার মনে যা-ই জাগে তা-ই সে করে। আর এই ইচ্ছার কোনো সীমা নেই। যে-কোন ভাবেই হোক, তার ইচ্ছাই কার্যকর হয়, সে যেমন চায় তেমনি চিন্তা-বিশ্বাস, চরিত্র ও

---

১. دراسات فى النفس الانسانية এর طبعية مزدوج অধ্যায় দ্রষ্টব্য

রীতিনীতি গ্রহণ করতে পারে। সমাজের কোনো অধিকার নেই তার পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার। সমাজ তার কোনো কাজকে বলতে পারবে না এটা ভুল কিংবা এটা ঠিক। সমাজ কি ? ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব বা মুরুব্বীগিরি করার তার কি অধিকার থাকতে পারে ?

এখানে ব্যক্তি 'খোদা' হয়ে বসেছে। আর এ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তিখোদা যা ইচ্ছা হয় তাই করে। এই সকল 'খোদা'র জন্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উদার, উন্মুক্ত এবং তাদের অনস্বীকার্য অধিকার।

পক্ষান্তরে সমাজের সর্বাধিক গুরুত্ব স্বীকার করে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তা সমাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে স্বাভাবিকতার সীমা লংঘন করে অনেক দূরে চলে যায়। এখানে সমাজ যেন এক পবিত্র দেবতা। ব্যক্তির জন্যে এখানে কোনো পবিত্রতা নেই, গুরুত্ব নেই, নেই কোনো অধিকার ও মর্যাদা। কোনো জিনিসের মালিক হওয়ারও তার অধিকার নেই। তার নিজের চিন্তা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও রীতিনীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করার অধিকারও স্বীকৃত নয়, কোনো ব্যক্তি সমাজ সমষ্টির কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন তুলতে বা আপত্তি জানাতে পারে না। তার কোনো কাজকে মন্দ তো বলতেই পারে না, পারে না ভালো ও সঠিক বলতেও। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যক্তি কি, কে ব্যক্তি?... তার কি অধিকার থাকতে পারে সমাজের ওপর কোনোরূপ মাতব্বরী করার ?

এখানে সমাজ যেন এক মহাদেবতা। ফলে যা-ই ইচ্ছা তা-ই করারই তার অধিকার রয়েছে এবং করেও। আর ব্যক্তি নিতান্তই দাসানুদাস।

উক্ত দুই প্রকারের সমাজের প্রতিটিই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে দাবি করছে।

কিন্তু তা যে নিতান্তই ভুল, ভুল বিজ্ঞানের ভিত্তি, আর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, উক্ত দুটি সমাজ ব্যবস্থাই পরস্পর বিরোধী। একটির বিপরীতমুখী অপরটি। এ দুটি ব্যবস্থার মধ্যে কোনো মিলমিশ— কোন সন্ধি-সমঝোতা কখনোই হতে পারে না। তাহলে একই সময় এ দুটিই কি করে সঠিক ও যথার্থ হতে পারে;— হয় এর যে-কোনো একটা কিংবা এর দুটিই অবশ্যই ভুল হবে।...আর এ-ই হচ্ছে আসল সত্য কথা।

ব্যক্তির পবিত্রতার পৌরাণিক ধারণা গড়ে উঠেছে সেই বিবর্তন ও অগ্রগতি থেকে, যা ইউরোপ রেঁনেসার সময় থেকে অর্জন করেছে।

মধ্যযুগের জাহিলিয়াতে ইউরোপীয় জনগণ কঠিন চাপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, সে চাপ ছিল অত্যন্ত খারাপ ধরনের, যা প্রত্যেক মানব সত্তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে

দিচ্ছিল। জনগণ জুলুম-নিপীড়নের তলায় পড়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল। একদিকে জনগণের কাঁধের ওপর গীর্জা ও ধর্মীয় লোকদের কর্তৃত্ব-আধিপত্যের জোয়ার চেপে বসেছিল। তখন সাধারণ মানুষের সরাসরিভাবে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো অধিকার ছিল না। পাদ্রী-পুরোহিতদের মধ্যস্থতা ছিল একান্তই অপরিহার্য। এই পাদ্রী-পুরোরিতদের সুপারিশ ছাড়া কারোর ক্ষমা পাওয়াও সম্ভব ছিল না। কেউ যদি আল্লাহ্র কাছে স্বীয় গুনাহ-খাতার স্বীকারোক্তি করতে প্রস্তুত হয়, তারলে খোদ পাদ্রীর সম্মুখে নিজের গুনাহকে স্বীকার করাই ছিল তার জন্যে একমাত্র উপায়। মোটকথা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে কোনোরূপ মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবতেও পারত না।

অপরদিকে রাজন্যবর্গ ও লর্ডদের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য জনগণের মাথার ওপর সওয়ার হয়ে বসেছিল। এই রাজন্যবর্গই ছিল সমাজের সব চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লোক। আর তাদের সমস্ত চাপ ছিল জনসাধারণের ওপর। অথচ সেই জনগণের না ছিল কোনো অধিকার, না মর্যাদা, তবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে কত ছিল তা হিসেব করেও শেষ করা যায় না।

এই সমাজে ব্যক্তির কোনো গুরুত্ব নেই। প্রকৃতপক্ষে সে কোনো কিছুরই মালিক নয়, সামন্তই হচ্ছে সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক ও মুখতার। ব্যক্তি সাধারণভাবে সরাসরি কোনো পারস্পরিক কার্যক্রম গ্রহণ করারও অধিকারী নয়। রাষ্ট্রের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনেরও কোনো অধিকার নেই তার। রাষ্ট্র তো তাকে চিনে-ই না, চিনলেও তা চিনে সামন্তের মাধ্যমে, সেই তাকে অগ্রসর করতে পারে, পারে পিছনে ফেলে রাখতেও। পারে সমাজে তার জন্যে একটা মর্যাদা গড়ে তুলতে, পারে তার অস্তিত্বকেই বিলীন করে দিতে। এ কারণেই সামন্ত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মাঝখানে সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক যেমন পাদ্রী ও পুরোহিতরা ব্যক্তি ও খোদার মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপনে একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখানে ব্যক্তির কোনো রাজনৈতিক অধিকারই নেই, জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, নিরাপত্তা নেই কোনোরূপ সুবিচার পাওয়ার ... মোটকথা কোনো ধরনের কোনো নিরাপত্তা পাওয়ারও তার অধিকার নেই।

উপরন্তু মূল সমান্ত ব্যবস্থাই তার জাহিলিয়াতের রূপ পরিগ্রহ করেছিল ইউরোপে। তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল ছিল না। সামন্ত ব্যবস্থার সব কিছু কেবলমাত্র সামন্তকে কেন্দ্র করেই। সামন্ত ব্যক্তিই সেখানকার সর্বেসর্বা। এই ব্যবস্থায় সমস্ত গুরুত্ব ছিল সামন্তবাদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর। ব্যক্তির কোনো স্বাতন্ত্র্যই স্বীকৃত ছিল না তথায়। এই সমাজের সাংগঠনিক অবস্থা ছিল স্থায়ী, স্থবির। কোনোরূপ পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই উঠত না সাধারণভাবে। চাষের জমি-

কেন্দ্রিক জীবন সেখানে ছিল সম্পূর্ণ স্থির, নিস্তব্ধ, গতিহীন, পুঁতিগন্ধময়। শত শত বছর অতীত হয়ে যেত, কিন্তু তথায় জীবন যাত্রায় এক বিন্দু পরিবর্তনও আসত না। ব্যক্তি আসত ব্যক্তি চলে যেতে। মনে হত, কেউ আসেও নি, কেউ যায়ও নি। ফলে ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সচেতন হতে পারত না, তার যে কোনো অস্তিত্ব আছে, সে বেঁচে আছে, তা বুঝবারও কোনো কারণ ঘটত না। তা চালু করার রীতি নিয়মের বন্ধনে জনগণকে আষ্ট্রেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলত। সে রীতি নিয়মের বন্ধনে বাঁধা হলে তাদের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠবে এমন কোনো বিশ্বাসও তাদের ছিল না। রীতি-নিয়ম তাদের হেঁচ্‌ড়িয়ে টেনে নিয়ে চলত। ঠিক যেমন কলুর বলদ নিজেরই চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে বেড়ানোর কাজে চব্বিশ ঘন্টা বন্দী হয়ে থাকে।

ইউরোপের ক্রুসেড যুদ্ধ এবং মাগরিব ও আন্দালুসিয়া (স্পেন)-এর জ্ঞান কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে যখন ইউরোপীয়রা মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেল, ঠিক তখনই ইউরোপের নিষ্প্রাণ তুহিন হিমদেহে নব জীবনের সঞ্চার হয়েছিল। জনগণের কাঁধে আবহমান কাল থেকে চেপে থাকা সমস্ত দুর্বহ বোঝা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছিল। সর্বপ্রথম তারা গীর্জার জগদ্দল পাথরকেই সরিয়ে নামিয়ে দূরে নিক্ষেপ করল। আর সেই সাথে নেমে গেল পাদ্রী পুরোহিতদের গোলামী লাঞ্ছিত জোয়াল।

তখন তারা গীর্জার দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল প্রকৃতি পূজার আর এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে। প্রকৃতি হয়ে পড়েছিল তাদের জবরদস্ত দেবতা, তারই নামে— তারই দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষের ওপর দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন ও কর্তৃত্ব চালায়। এই নুতন দাসত্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উপাসক ও উপাস্য— দাস ও মনিব পরস্পরের সাথে সরাসরি কোনোরূপ মাধ্যম ছাড়াই মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল।

আমরা এখানে ইতিহাসের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করছি মাত্র। ইতিহাসের ঘটনাবলীর 'সাফাই' পেশ করার উদ্দেশ্যে নয়। গীর্জার দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পর প্রকৃতি পূজার অর্থহীন শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পড়ার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি পেশ করারও কোনো উদ্দেশ্যই আমাদের নেই। পলায়ন ও বিভ্রান্তি নিতান্তই মানসিক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। এর পক্ষে কোনো যুক্তিই পেশ করা যায় না। অবশ্য গীর্জার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাব প্রতিপত্তি দূর করা ও তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কালে জনগণের জন্যে একটা বিরাট ও সুবর্ণ সুযোগ ছিল মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত কবুল করার। খুব সহজেই তা তারা পারত। কিন্তু তা না করে তারা নতুন কিছু দেবতা উপাস্য বানিয়ে নিল, যা ক্ষয়িষ্ণু, বিলীয়মান, সত্তাহীন এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা সেই গুলোরই উপাসনা-আরাধনা আর দাসত্ব করতে শুরু করেছিল।

অতঃপর তারা সামন্তবাদী ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণীর প্রভুত্ব কর্তৃত্বের বোঝাও দূরে নিক্ষেপ করার ও তার শৃঙ্খল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগও পেয়ে গেল।

ফরাসী বিপ্লব ছিল এই পরিবর্তন সৃষ্টি প্রধান হোতা। তা জমির মালিকানা ও সামন্ত সমাজের অভিজাত শ্রেণীর শৃঙ্খল চূর্ণবিচূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন করে দিল ইউরোপীয় বা ফ্রান্সের নিজস্ব পদ্ধতিতে। কেননা তা-ই বিপুল জনতাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করে রেখেছিল।

অতঃপর ব্যক্তি কিছুটা চেতনা লাভ করতে পারল। সচেতন হলো তার স্বাতন্ত্র সম্পর্কে। কিন্তু এই জাহিলিয়াতই তাকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত হতে দিল না। ফলে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনাটা আল্লাহ্‌র হেদায়েত লাভ করতে অক্ষম থেকে গেল। পাদ্রী পুরোহিতদের মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই তারা করেনি। তারা একতরফাভাবে গীর্জা ও গীর্জার খোদা উভয় থেকেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

তারা সমাজের পুরাতন পচা-দুর্গন্ধময় রীতি নিয়মকে ছাটাই বাছাই করে দূরে নিক্ষেপ করে উত্তম ও পবিত্র আদর্শ রীতিনীতি গ্রহণ করার এবং এই পথে এক আদর্শবিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলতে আদৌ ইচ্ছা করেনি, সেজন্যে কোনো চেষ্টাও চালায়নি। তারা বরং রীতিনীতি ঐতিহ্য নামে চরিত্র সমষ্টির যা কিছু পেয়েছে, সবকিছুই নষ্ট ও অকেজো মনে করে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

এটা ছিল রীতিমত একটা পাগলামী। এই ভাঙ্গাচোড়ায় ব্যক্তি কোনো বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিতে পারেনি। মাথার উপরের সব বোঝা থেকেই নিষ্কৃতি পাওয়ার নামে তারা ভালো মন্দ নির্বিশেষে সব কিছুই দূরে নিক্ষেপ করে দিল।

অতঃপর এলো শিল্প বিপ্লবের যুগ। তা সমাজ সংস্থার গোটা প্রাসাদের অবশিষ্ট ভিত্তিটিকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল।

শিল্প বিপ্লব সমাজ সংস্থায় পূর্ণমাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে এলো। সবকিছুতেই পরিবর্তন। সমাজকে নবতর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে শুরু করে দিল।... মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়ে তোলায় শ্রমিক কর্মচারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শ্রমিক কর্মচারীরা গ্রাম থেকে ব্যক্তিগতভাবেই ছুটে চলে এসেছিল কল-কারখানায় কাজ করার— শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করার— উদ্দেশ্যে। তারা পরস্পরে পরিচিত ছিল না, ছিল না তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক, কোনো যোগাযোগ। শহর-নগর শিল্প-কেন্দ্রে এসেও তারা বিচ্ছিন্ন ভাবেই বসবাস ও জীবন যাপন করতে লাগল। কেবল শ্রম-কেন্দ্রসমূহেই তারা পরস্পরের সাক্ষাৎ পেত, পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেত। কিন্তু গ্রামে কৃষক ও ভাইদের

পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এখানে তা গড়ে উঠল না। গ্রামে জনগণ স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের পরিচিত ও সম্পর্কশীল হয়ে থাকত। নৈকট্য-নিকটবর্তিতা, আত্মীয়তা ও পাশাপাশি কাছাকাছি বসবাসের কারণে একটা স্থায়ী মিলমিশ ও সম্পর্ক সম্বন্ধ গড়ে উঠত। এমন সব রীতিনীতি ঐতিহ্যও সেখানে চালু হয়ে থাকত, যা অন্তরের দিক দিয়ে অভিন্ন সত্তায় পরিণত করে দিত। চিন্তা-ভাবনায় ও রীতিনীতি রেওয়াজে তারা পরস্পর সুপরিচিত হয়ে থাকত।

কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের পর তারা গ্রামঞ্চল ত্যাগ করে কল-কারখানার দেশে এসে বিচ্ছিন্ন একাকী পরিবার পরিজনবিহীন অবস্থায় পড়ে গেল। প্রথম পর্যায়ে যে সব শ্রমিক গ্রাম ত্যাগ করে শহরাঞ্চলে যেতে পেরেছিল, তাদের সঙ্গে তাদের পরিবার পরিজন না থাকায় তারা নিশ্চিত জীবন যাপন করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা শূন্য গর্ভ পরিবেশে দিন কাটাতে লাগল। এদের অধিকাংশই ছিল যুবক, অবিবাহিত। বৈবাহিক সম্বন্ধে তারা তখনও বন্দী হয়নি। কোনো রূপ বৈবাহিক দায়িত্বও তাদের স্কন্ধে পড়েনি।

এভাবে শহরাঞ্চলে এসে প্রত্যেক শ্রমিকই তার একাকীত্বে নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে চেতনা লাভ করেছিল। সামাজিক সম্পর্কশীলতা সম্পর্কে এখানে তাহা কোনো চেতনা বা অনুভূতিই পায়নি।

এই অবিবাহিত যুবক শ্রমিকদের সাথে কাজে যোগ দিয়েছিল অসংখ্য মেয়েলোকও। তারাও এই একাকীত্বের দুর্বহ চাপে জর্জরিত হচ্ছিল। এই সব মেয়েরা ইতিপূর্বে যথেষ্ট উপেক্ষা ভোগ করে এসেছে। তাদের অস্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছুর সাথে পরিচিত হওয়ার কোনো সুযোগই পায়নি। নিছক অধীন অনুসারী ব্যক্তিজীবন ছিল তাদের। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও চিন্তাগতভাবে তারা একটা ভিন্ন ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। তারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারাদি নিয়ে ও নিজস্বভাবে চিন্তা করার অধিকার বা সুযোগ পায়নি। তাদের জন্যে যা কিছু ভাবনা চিন্তার ব্যাপার ছিল, তা করতে তাদের পিতামাতা, বড় ভাই-বোন বা তাদের স্বামীরা, তারা সমাজ নিয়েও মাথা ঘামাত না। বৃহত্তর সমাজের সাথে তাদের কি সম্পর্ক? সমাজের প্রতি তাদের কি কর্তব্য দায়িত্ব বা সমাজের ওপরই বা তাদের কি অধিকার ? এ সব জটিল বিষয়ে তারা কখনোই চিন্তা করেনি, চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি। যদিও কখনও কিছু চিন্তা করতেও, তবে তা করত তাদের স্বামীর চিন্তাধারা অনুযায়ী। কেননা স্বামীই তাদের কাছে সমস্ত তৈরি করা দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে আসত। সে সব জিনিস প্রস্তুত করতে স্ত্রীলোকের কিছুই করতে হতো না। তাছাড়া পূর্বর্তী সমাজে নারী স্বতন্ত্রভাবে কোনো কিছুর মালিক হতো না, কোনো কিছুতে নিজস্বভাবে কোনো

হস্তক্ষেপও করত না। পুরুষই হত সব কিছুর মালিক। যা চাইত স্বামী তাই করত। চলতি প্রথা অনুযায়ী চলতো নারীর জীবন। আর চলতি নিয়মের বাধ্যবাধকতা পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ওপরই আরোপ হতো অনেক বেশি। পুরুষ হতো সম্পূর্ণ স্বাধীন। নারী না বুঝে শুনেই অন্ধভাবে সামাজিক নিয়ম নীতি মেনে চলত। আর নিতান্ত ভাগ্যলিপি মনে করেই যেমন তেমন ভাবে জীবনটা অতিবাহিত করে দিত।

কিন্তু এই নারী যখন সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় শ্রম করতে শুরু করেছিল, তখন তার মনে মগজে বিরাট বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তন সূচিত হলো।

এক্ষণে তার হাতে অর্থ এসে গেল। স্বোপাজির্ত অর্থ সম্পদের সে হলো মালিক। এ মালিকানা প্রত্যক্ষ, পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত। যা ইচ্ছায় আসে তাই করতে সে হলো পূর্ণ মাত্রায় সক্ষম।

এখন সমাজ সমষ্টির সাথে তার কার্যক্রমের সম্পর্ক স্থাপিত হলো একান্তই ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষভাবে। শিল্প কারখানার অভ্যন্তরে, ব্যবসায় কেন্দ্রে ও রাস্তাঘাটে— সর্বত্রই সে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

পুরুষদের সাথেও এই স্বাধীনা নারীর কার্যক্রম সম্পর্ক সরাসরিভাবেই স্থাপিত হলো। যদিও এ সম্পর্কে তারা পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল না। অত্যন্ত তাতে নিতান্তই অধীন অনুসারী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন হয়ে দেখা দিল না। তারা স্বাতন্ত্র্য সত্তা লাভ করে পুরুষদের সমান কাতারে এসে কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো।

এইসব ক্ষেত্রের কোনো স্থানেই তারা নিজেদেরকে অস্তিত্বহীন মনে করল না। তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পুরাপুরিভাবে বিকশিত ও অনস্বীকার্য হয়ে উঠল।

অল্প বয়সের বালকরাও এই অবস্থার মধ্যেই এসে গেল। তারাও ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করল। এই বাচ্চা বয়সের লোকেরাও হয়ে ওঠল এক একজন ব্যক্তি। তারা তাদের বাচ্চা বয়স থেকেই মাথার ঘাম ফেলে স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে লাগল। যদিও তাদের উপার্জনের পরিমাণ হতো খুবই সামান্য। এই যুবক, নারী ও বালক-বালিকা সকলেই স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা লাভ করেছিল। প্রত্যেকেই এক একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু এই ব্যক্তিবাদ ভয়ংকরভাবে বিপথগামী হয়ে গেল। ডেকে আনল মারাত্মক ধরনের পরিণতি।

এটাও কোনো স্বাভাবিক ও নিশ্চিত অনিবার্য ব্যাপার ছিল না। এই স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিসত্তাগুলোর বিভ্রান্ত-বিপথগামী হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল না। তারা তো সুস্থ মানব সমাজেরই এক-একটি অংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বিপথগামী হয়ে পড়ল। কেননা তার জন্মই হয়েছে জাহিলিয়াতের অন্ধকারে, যা

আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে। তা ছাড়া বহু যুগ ও শতাব্দী কাল ধরে সামন্তবাদী ব্যবস্থা যে ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলেছিল, হঠাৎ করে তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অত্যন্ত রুঢ়, ভারসাম্যহীন হয়ে।

এ সব লোক তাদের মুক্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার একাকীত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অসমান পথে। তারা এমন পথের সাক্ষাৎ পেল না, যা তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অনুভূতিসহ একটা ভারসাম্য দিতে পারত তাদের ন্যায্য অধিকার, অনুসরণ এবং স্বাধীনতা ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা পালনসহ।

পরবর্তীতে এই নতুন শহর-নগরের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে এমন একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত হল, যার সাথে দ্বীন-ধর্ম-নৈতিকাত ও ঐতিহ্য বলতে কিছুই থাকল না। তারা হলো এই সব কিছু থেকে মুক্ত ও সম্পর্কহীন। যেহেতু তারা গ্রামাঞ্চলের রুগ্ন শুষ্ক বিচ্ছিন্ন জীবন ধারা থেকে সহসাই মুক্ত হয়ে নাগরিকত্বের উন্মুক্ত ও বাধা বন্ধনহীন জীবন ধারার চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের মধ্যে এসে পড়েছিল। আর তাতে দ্বীন-ধর্ম থেকে ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্নতা হতে হতে তা একটা স্থায়ী অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে তারা মানুষ সম্পর্কে একটা নবতর ব্যাখ্যাও লাভ করল, যার দৃষ্টিতে মানুষ মানুষ থাকল না, পশু হয়ে গেল। ডারউইনই এই ভ্রান্ত ধারণা জনগণের মনে বদ্ধমূল করিয়ে দিয়েছিল। এখানে তারা ফ্রয়ডের কাছ থেকে যৌন সম্পর্কের নবতর ব্যাখ্যাও জানতে পারল, তারা ছিল প্রবল শৃঙ্খলমুক্ত যৌবন শক্তির অধিকারী। যৌবনের নবজোয়ার বাঁধভাঙ্গা, দুকুল ছাপিয়ে দেওয়া জোয়ারের উন্মত্ততা সকলের মনে ও দেহে মহাউল্লাসেরও সৃষ্টি করেছিল। তাদের কেউ পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না যদিও পারিবারিক বন্ধনে তাদেরকে পাপ পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে পারত। ফলে এই স্বতন্ত্র স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাগুলো অবাধ-অনিয়ন্ত্রিত যৌন চর্চায় মশগুল হয়ে গেল। শহর নগরে গড়ে উঠল যৌন ব্যবসার বড় বড় আড্ডা।

ওদিকে নারীরাও ক্রমাগতভাবে পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রেরে অধিকারী হয়েছিল। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য তাদেরকে চরম বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার গড্ডালিকা প্রবাহে নিক্ষেপ করল। এক্ষণে তারা সত্তা-স্বাতন্ত্র্যহীন অবস্থা থেকেও মুক্ত। সকল ব্যাপারেই তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত। এই রূপ অবস্থায়ই তারা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র নিয়ে সকল বাধা বন্ধনকেই ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়ার সংগ্রামে নেমে গেল।

সে বন্ধন ভালো ছিল কি মন্দ ছিল, তার কোনো বিচার বিবেচনাই তারা করেনি। তারা সেই সাথে ধর্ম, নৈতিকতা ও ঐতিহ্যও ধ্বংস করে দিতে লেগে গেল। কেননা সে সবগুলোই তাদের বর্তমান মুক্ত স্বাধীন জীবনের পথে প্রবল বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে এজন্যে যে, পুরুষরা সেগুলোকে তাদের স্বাধীনতা

সংগ্রামের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছিল, যেন নারীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে না পারে। যদিও পুরুষরা নিজেরা সকল প্রকারের ধর্ম ও নৈতিকতার বন্ধন থেকে আগেই সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বসেছিল।

পরে পুরুষ যখন স্ত্রীলোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করাও ত্যাগ করল, মেয়েরা বাধ্য হলো কর্মক্ষেত্রে বের হয়ে আসতে, তখন তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নৈতিকতাকে এমন একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখতে পেল,যা তাদের স্বাধীন উপার্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, পুরুষরা জাহিলী ধারণানুযায়ী আদতেই পশুত্ব গ্রহণ করেছিল। তারা তাদের কাছে থেকেই শ্রমোপার্জন করছিল। কিন্তু তারা মেয়েদেরকে কাজ করার সুযোগ দিতে রাজি হতো তখন, যখন তারা এই পুরুষদের সেই দাবি পুরণে প্রস্তুত হতো, যে দাবি পুরুষ পশু নারী পশুর কাছে করে থাকে।— তাছাড়া তারা নিজেরাও পুরুষদের সাথে পূর্ণ সাম্য ও সমকক্ষতারও দাবি করে আসছিল। সে সমকক্ষতার দাবি প্রথমে ছিল শুধু মজুরীর ব্যাপারে। পরে তা এলো সর্ববিষয়ে, সর্বক্ষেত্রে। আর এই সমকক্ষতাই এই নারী ও পুরুষ সকলকেই চরম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার রসাতলে ভসিয়ে নিয়ে গেল।

এই নারী ও পুরুষের বর্তমান মনোভাবের পিছনে কাজ করছিল সেই ষড়যন্ত্রকারী ইহুদীর মতাদর্শ, যার চরম লক্ষ্য ছিল উম্মী জনসাধারণকে চরমভাবে ধ্বংস করা। সে ছিল কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা, ফ্রয়ড ও দরখায়েম-এর চিন্তাধারা। আর তা হচ্ছে এই যে, নৈতিকতা নিছক একটা প্রতিবন্ধকতা মাত্র। আসলে তার কোনো অর্থ নেই, তাৎপর্য নেই। যৌনতা তো মানুষের অস্তিত্বের সাথে অংগীভূত, তাকে কোনো ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাই হচ্ছে অবাধ যৌনতার একমাত্র পথ।[১]

অতঃপর সব বাঁধাবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। রসাতলে ভেসে গেল সব নারী পুরুষ। গোটা সমাজ পড়ে গেল পংকিলতার সীমাহীন সুগভীর আবর্তে।

এর ফলে সমাজের বন্ধনও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। পারিবারিক বন্ধন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। এখানে যৌন সম্পর্কই হলো মানুষে মানুষে নারী ও পুরুষের একমাত্র সম্পর্ক। নৈতিকতার কথা বাদ দিলেও এই যৌনতার সম্পর্ক নারী ও পুরুষকে প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁধে একত্র করে রাখতে পারল না। থাকল না কোনো সম্মিলিত ও অভিন্ন নিয়ম নীতি, ঐতিহ্য। মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়া দৈহিক সম্পর্কই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পরই তা ছিন্ন হয়ে যেত লাগল। আর দৈহিক কামনার তাগিদে পুরুষের জন্যে নিত্যনতুন নারী এবং নারীর জন্যে নিত্য নতুন পুরুষের প্রয়োজন দেখা দিল।

---

১. التطور والثبات فى حياة البشرية দ্রষ্টব্য।

নৈতিকতার দিকে দৃষ্টি না দিয়েও প্রেম-ভালোবাসা ও মানসিক বৃত্তিসমূহ রোমান্টিক ব্যাপার রূপে গণ্য হলো। লালসার রোগ— বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব বা স্থিতি নেই। বাস্তবে থাকল শুধু পাশবিক দৈহিক সম্পর্ক। আর দেহ একটা যৌন কামনা-লালসা সর্বস্ব হয়ে থাকল।

ডারউইনী জাহিলিয়াতই তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে দিল। ফ্রয়ডের দ্বারা তারই সম্প্রসারণ সম্পন্ন হল। আর তাদের ছাত্ররা ও সমর্থকরা জীবনের সর্বত্রই এই ধারণাকে ছড়িয়ে দিল।

পুরুষ ও নারীর গোটা সত্তাই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেল। ফলে এই নারী ও পুরুষ সে রকম নারী ও পুরুষ থাকল না, যে রকম মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

পুরুষরা তাদের সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধ হারিয়ে ফেলল। তাদের মনে পরিবারের প্রতি থাকল না কোনো আগ্রহ, আকর্ষণ। অবশিষ্ট হয়ে থাকল শুধু যৌন সংসর্গ। অতঃপর তারা মানুষ না থেকে উৎপাদনের একটা যন্ত্র বা বিরাট যন্ত্রের নিষ্প্রাণ অংশে পরিণত হল। চিন্তা করার অনুভূতি লাভের শক্তিও হারিয়ে ফেলল। প্রতি মুহূর্তে তাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকল উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন। মানুষের সাথে নিছক মানবিক সম্পর্ক বলতেও কিছু থাকল না। বস্তুগত উৎপাদন তাদের সাথে জীবন্ত সত্তাকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ফেলে দেয়। তার মধ্যকার প্রাণ স্পন্দনকে স্তব্ধ করে দেয়। কেননা যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাই এমন। তারা যখন এই উৎপাদনের কাজ থেকে অবসর পেত, তখন তাদের দেহে ও মনে জাগ্রত হিংসা পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ছাড়া আর কোনো কাজ— কোনো ব্যস্ততাই থাকল না। ফলে তাদের সমগ্র জীবনের একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত হলো এই দুটি কাজ ঃ একটি, যান্ত্রিক উৎপাদন আর দ্বিতীয়টি, পাশবিক লালসার চরিতার্থ।

এদিকে নারীদের অবস্থাও ভিন্নতর কিছু থাকল না। তারাও ভেতরের দিক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ডঃ চিন্‌তে শাতী মিসরের 'আল-আহ্‌রাম' পত্রিকায় 'তৃতীয় লিংগের আত্মপ্রকাশ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখেছেন।

আমি এক সপ্তাহকাল ধরে পাঠাগারে পুরাতন আরবী পত্র-পত্রিকা পড়ায় ব্যস্ত ছিলাম। এই শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের পর রোববারের ছুটিতে আমি আমার এক বান্ধবীর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করলাম। আমার এ বান্ধবী 'ফীনা' নগরীর উপকণ্ঠে মহিলা ডাক্তার হিসেবে কাজ করছিল। আমি মনে করেছিলাম, রোববার তো দেখা-সাক্ষাতের উপযুক্ত দিন। কিন্তু আমার বিস্ময়ের কোনো সীমা থাকল না এই দেখে যে, আমার সে বান্ধব, যখন আমার জন্যে দরজা খুলে দিল, তখন তার হাতে ছিল

আলু। সে আলুর খোসা ছড়াতে ব্যস্ত ছিল। সে আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। আমরা সেখানে বসলাম। আমার বান্ধবী আমার বিস্ময়ের ভাব বুঝতে পেরে বললেঃ এখন মহিলা ডাক্তার রোববারের ছুটির দিনে রান্নাঘরে ঢুকে আছে এই দেখে বোধ হয় তুমি খুবই বিস্মিত হয়ে পড়েছ ? আমি হাসতে হাসতে বললামঃ হ্যাঁ, তবে রোববারের দিনে ব্যস্ত থাকাটা তো বুঝলাম, কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি এই দেখে যে, তুমি তোমার শ্রমসাধ্য পেশার কাজ করেও এই রান্নাঘরে আসতে পেরেছ !

সে বললঃ কথাটি যদি উল্টিয়ে দিতে, তাহলে সম্ভবত সঠিক কথা হতো। কেননা রোববারে কাজ করাটাই আমাদের সমাজে আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু কি করা যাবে। রোববারটাতেই তো অবসর পাওয়া যায়। তারপর রান্নাঘরের কাজ! আসলে আমার ন্যায় অন্যান্য জাতীয় খিদমতের কাজে নিয়োজিত মহিলারা যে মানসিক অস্থিরতার শিকার হয়েছে, রান্নাঘরে প্রবেশ করা হচ্ছে তারই চিকিৎসা ব্যবস্থা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই মানসিক অস্থিরতার প্রকৃত কারণ কি ? অথচ সামষ্টিক জীবন পুরোপুরি পাশ্চাত্যের নারীর মন-মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল!

বলতে লাগলঃ আধুনিক প্রাচ্য নারীর নতুন দায়িত্বের সাথে এই মানসিক অস্থিরতার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এ তো আসন্ন মানসিক বিপ্লবের প্রতিধ্বনি মাত্র। সমাজ বিজ্ঞানী, ফিজিয়লজিস্ট ও জীবতত্ত্ববিদরা বলছেন, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। কেননা পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ঘরের বাইরের জীবনে অংশ গ্রহণকারী মেয়েদের সন্তানাদি খুব কমই হয়। আগে তো মনে করতাম যে, বাইরে যাতায়াতকারী মেয়েরা গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও স্তন দানের ঝামেলায় বুঝি পড়তে চায় না। কেননা এসব ঝামেলায় তাদের কর্মজীবন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু পরে খুব চিন্তা ভাবনা করে পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখলে জানা গেল, সন্তান সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় মেয়েদের কোনো দায়িত্ব নেই। জন্মহার হ্রাস পাওয়ার কারণ হচ্ছে বন্ধ্যাত্ব। তাও আবার নারীর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো ক্রটির কারণে হয় না। আসল কথা হচ্ছে, ঘরের বাইরে কর্মব্যস্ত মহিলার ব্যক্তিসত্তা মা হওয়ার যোগ্যতা পরিহার করে চলেছে এবং বস্তুগত মানসিক ও স্নায়ুবিক দিক দিয়ে মাতৃসুলভ ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের সাথে একত্র হওয়াও নারীর মা হওয়ার যোগ্যতাকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করে দিচ্ছে।

জীববিজ্ঞানীরা এ পর্যায়ে সুপরিচিত প্রাকৃতিক আইনের বিশেষ মতাদর্শের উল্লেখ করেছে। আর তা হচ্ছে, কাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে। তার অর্থ হচ্ছে, নারীর মাতৃত্বের কাজ, যা স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব হিসেবে মা হওয়ার মধ্যে সৃষ্টি

করা হয়েছিল, এখনকার নারীদের মাতৃত্বসুলভ কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং পুরুষদের সংস্পর্শে ঢুকে পড়ার কারণে অনিবার্যভাবে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ আরও চিন্তা-গবেষণায় রত হলে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাদের আরও সম্মুখের দিকে নিয়ে গেল। এক্ষণে বিজ্ঞানীগণ খুবই নিশ্চিন্ততা সহকারে বলছে যে, পৃথিবীতে এক তৃতীয় লিঙ্গের আত্মপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে। তাতে মেয়েলোকদের মাত্র এমন কয়েকটি বিশেষত্ব অবশিষ্ট থাকবে, যা দীর্ঘ চর্চার কারণে মেয়েদের ব্যক্তিসত্তায় সুদৃঢ় হয়ে বসেছে।

এই মতের ওপর অনেক ধরনের আপত্তি ও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন এই উঠেছে যে, ঘরের বাইরে অবস্থানকারী বহু সংখ্যক মেয়েলোকই বন্ধ্যাত্বকে অপছন্দ করে। সন্তানের কামনা করে (এ সত্য হলে উক্ত মতো সত্য হতে পারে না)।

দ্বিতীয় আপত্তি এই তোলা হয়েছে যে, সন্তানসম্ভবা মেয়ে শ্রমিক কর্মচারীকে কাজে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। আর আইনসম্মতভাবেই তারা স্বীয় স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের অনুমতি পেয়ে থাকে। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, নারী তার জন্যে নির্দিষ্ট বিশেষ পরিবেশ থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছে খুব বেশি দিন হয়নি—এর মধ্যে বহু কয়েকটি বংশের সৃষ্টি হয়নি। অথচ নারীর মা হাওয়ার যোগ্যতা শত সহস্র বৎসর কাল ধরে রয়েছে।

প্রথম প্রশ্নের জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, সন্তান পেতে চায় এমন মেয়ে লোকের মনে সন্তান প্রসবজনিত কষ্টের ভীতিটাও সমানভাবে রয়েছে। তা ছাড়া বাচ্চা জন্ম ও লালন-পালন তার কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, নারীর সন্তান প্রসব ও লালন পালনের অনুমতিদান আইনের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। অনেক শিল্প-মালিকই কাজের জন্যে এমন মেয়েলোক বাছাই করে নেয়, যাদের সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে এই বলে, নারীর ঘরের বাইরে চলে যাওয়ার বয়স খুব বেশি দিন হয়নি একথা ঠিক; কিন্তু নারী পুরুষদের সমতা সমকক্ষতা ও সাদৃশ্য গ্রহণে মাত্রাহীন আগ্রহ প্রদর্শন করেছে, তাদের স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর দিন-রাত এই চিন্তাই সওয়ার হয়ে রয়েছে এবং তাদের মন-মগজে শক্ত হয়ে বসে আছে, এই কারণে জীবতাত্ত্বিক পরিবর্তনও খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

বর্তমানে এই বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়নকারীরা স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রকাশমান পরিবর্তনসমূহের গভীর পর্যবেক্ষণ করছে, এ বিষয়ে পরিসংখ্যানেরও যাচাই করা

হচ্ছে যে, শ্রমজীবী মেয়েলোকদের বন্ধাত্ব, স্তনে দুধ শুকিয়ে যাওয়া ও মা হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলার কারণসমূহ কি?

আলোচ্য সর্বগ্রাসী তুফানের মাঝে যে বালকরা নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি ও চেতনা লাভ করেছে, তারা আসলে মারাত্মক বিপর্যয় ও বিপথগামিতার মধ্যে পড়ে গেছে।

যে পরিবারে পুরুষ ও মেয়ে শিল্প কারখানা ও ব্যবসায় কেন্দ্রে কাজের জন্যে ঘরের বাইরে চলে যায়, সেই পরিবারের বাচ্চা-বালকদের জন্যে স্নেহ মততার আকর্ষণ বলতে কিছুই থাকতে পারে না। অথচ তা-ই ছিল এমন জিনিস যা তাদের শক্তভাবে বেঁধে রাখতে পারত, তাদের হৃদয়ে প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ-মমতার বীজ বপন করতে পারত। তাদের চিন্তা ও চেতনা ভারসাম্য রক্ষা করে উন্মোচিত হতে পারত। যৌনতার নিয়ম-কানুন তারা শিখতে পারত। বংশবৃদ্ধির লক্ষ্য যে যৌন সম্পর্ক, তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শেখা দরকার। যৌন লালসা চরিতার্থ করার নামই নয় যৌনতা। তার মাধ্যমেই মানবতার মর্যাদানুরূপ সম্পর্কসমূহ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

পরিবার থেকে মা'র সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষের মন-মানসিকতা অনুভূতির সম্পর্কও ছিন্ন হওয়া অবধারিত। তখন ঘরটা একটা হোটেলে পরিণত হয়। তাতে পুরুষ ও নারীর বসবাস করে বটে; কিন্তু পিতা ও মাতা হয় যেন দুইজন বেতনভুক্ত কর্মচারী। একজন পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে, অপরজন করে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন। সবকিছুই বাহ্যিক প্রদর্শন মাত্র, ঠিক যেমন বেতনভুক্ত কর্মচারীরা কাজ করে থাকে। এ দায়িত্ব পালনের সাথে মন ও অন্তরের কোনো সম্পর্ক থাকে না। এ কাজ স্থায়ীভাবে করে যাওয়ারও কোনো আনন্দ কেউ পায় না। এ যেন রুটিনবদ্ধ কাজ, জীবনের ওপর একটা বড় দুর্বহ বোঝা যেন।

এরই ফলে সন্তানের বিপথগামিতা অনিবার্য পরিণতি হয়ে দেখা দেয়। তারা ঘরে চাকর বা ধাত্রীর হাতে লালিত পালিত হোক কিংবা কোনো শিশু সদনে আরও বহু পরিত্যক্ত শিশুর সাথে একত্রে লালিত হোক, তাতে মূলগতভাবে কোনোই পার্থক্য হয় না। কেননা এরা সকলেই মা-বাবা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন— পিতামাতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকে বঞ্চিত।

আলেক্সিল ক্যারেল লিখেছেন ঃ

> আধুনিক যুগের সমাজ পরিবার লালন-পালনের কাজটিকে শিক্ষা-নিকেতনের হাতে সোপর্দ করে এক বিরাট ভুল করে বসে আছে। এক্ষণে মায়েরা তাদের বাচ্চাদের শিশুসদনে ফেলে চলে যাচ্ছে, যেন সহজেই তাদের কাজের ক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারে। অথবা কোনো সামাজিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিংবা শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে নিশ্চিন্ত মনে যোগাযোগ ও অংশ গ্রহণ করতে

পারে। ব্রীজ খেলা বা সিনেমা দেখার ব্যস্ততাও তো কম নয়। এমনিভাবে চরম আলস্যের মধ্য দিয়ে তাদের মহামূল্যবান সময় অতিবাহিত করে। পরিবারের একত্বতা খণ্ড খণ্ড করা ও বাচ্চাদের সাথে একসাথে বসা ও শিক্ষামূলক আলোচনায় সময় কাটানোর অবসরকে হারিয়ে ফেলার জন্যে তারাই দায়ী।

কুকুরের বাচ্চাগুলোকে সমবয়সী কুকুর বাচ্চাদের সাথে একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হলে এগুলোর ক্রমবৃদ্ধি অত দ্রুত হতে পারে না, যতটা হয় সেই বাচ্চাদের যারা মা-বাবার সাথে ঘুরে বেড়ায়। যেসব মানুষের বাচ্চারা তাদের সমবয়সীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, আর যেসব বাচ্চা বড়দের সাথে থাকে, এই দুই ধরনের বাচ্চাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। কেননা বাচ্চা ফিজিয়লজি; বিবেক-বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার দিক দিয়ে তা-ই শিখে, যা তাদের চতুষপার্শ্বে দেখতে ও শুনতে পায়। সমবয়সী বাচ্চাদের কাছ থেকেও অনেক শিখতে পারে। বিশেষ করে স্কুলে একাকী হলে বাচ্চা সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবে। একটি ব্যক্তির পরিপূর্ণ শক্তি লাভে তার জন্যে কিছুটা একাকীত্বেরও প্রয়োজন আছে। সেই সাথে প্রয়োজন পরিবারের সকলের সাথে একত্রিত হয়ে থাকার সুযোগ পাওয়া।'[১]

আমেরিকান দার্শনিক ওয়াল দেরবাস্ট লিখেছেন ঃ

"(আধুনিক সমাজে পুরুষ ও নারীর) বিয়ে প্রকৃত অর্থে কোনো বিয়ে নয়। কেননা তাদের মধ্যে বাপ-মার ভাবধারা সঞ্চারিত হওয়ার পরিবর্তে একটি যৌন সম্পর্ক মাত্র গড়ে ওঠে। ফলে জীবন রচনাকারী ভিত্তিসমূহ ধ্বসে যায়। দাম্পত্য সম্পর্ক হয়ে পড়ে অত্যন্ত দুর্বল। কেননা জীবন ও প্রজাতীয় সম্পর্ক না থাকার দরুন এই বিয়ে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ফলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কহীন একক সত্তায় পরিণত হয়, যেন তাদের মধ্যে প্রকৃতই কোনো সম্পর্ক নেই। প্রেম-ভালোবাসায় যে আত্মসম্ভ্রম থাকে, তা নিঃসম্পর্ক ঠাট্টা-বিদ্রূপের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।"[২]

এই দীর্ঘ সময় ব্যাপদেশে সৃষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তিদের আরও অধিক স্বাধীনতা দানের চেষ্টা করতে থাকে। পূর্বে তো সমস্ত কর্তত্ব আধিপত্য ছিল সামন্তদের হাতে। তারা যেভাবে ইচ্ছা জনগণের রক্ত শোষণ করত। গীর্জা ব্যবস্থাও এই সামন্তবাদী ব্যবস্থার সহায়ক ও সমর্থক ছিল। আর জনগণকে আধ্যাত্মিকভাবে নিজেদের কর্তৃত্বাধীন বানাবার জন্যে নিজস্ব কল্যাণ হিসেবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, যেন পাদ্রী পুরোহিতরা নিরংকুশ কর্তৃত্বের আসনে আসীন হয়ে থাকতে পারে; ডুবে থাকতে পারে প্রাচুর্যের স্তুপের মধ্যে।

---

১. The man is the unknown

১. দর্শনের পদ্ধতি।

পরে শহর-নগর যখন বিকাশ ও সম্প্রসারণ লাভ করতে থাকল তখন বেতনভূক কর্মচারী, কর্মকাণ্ডারী, কর্মাধ্যক্ষ ও ছোট ছোট পুঁজিপতি তথায় ভিড় জমাতে লাগল। তখন তারা লক্ষ্য করল যে, তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। জাতীয় পার্লামেন্টের ওপর সেই সামন্তাবাদীদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

কথা বলার, সভা-সম্মেলন-সমিতি গড়ার ও ব্যক্তিগত মতো প্রকাশ ও প্রচার করার অধিকার ও স্বাধীনতার প্রকৃতপক্ষেই কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ধীরে ধীরে সামন্তবাদীদের সাথে কঠিন দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।

এই দ্বন্দ্বে গণতন্ত্র প্রত্যেক দিন নবতর সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে ব্যক্তির জন্যে অধিকতর স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করতে থাকল।

দ্বন্দ্ব সংগ্রামের মার্কসীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে, তা সবই হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম। নতুন জেগে ওঠা বুর্জোয়া পুরানো সামন্তবাদী শ্রেণীর সাথে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত। ...এই তত্ত্বকে সঠিক ধরে নিলেও এটা অসম্ভব নয় যে, শহর নগরবাসী এই বুর্জোয়ারা একটাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগ্রাম মনে করেছিল। এ সংগ্রাম তাদের প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংগ্রামে লিপ্ত তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য। যেন সে মনে করতে পারে যে, সে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ। সে কারুরই অধীন নয়।

এই দ্বন্দ্বের ফলে সামন্তবাদীদের কাছ থেকে যতটা স্বাধীনতাই অর্জিত হতো, তার অর্থ এই দাঁড়াত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এক নবতর পর্যায়ে সম্প্রসারিত করে নিয়েছে অর্থাৎ সে নবতর পরিবেষ্টনে ব্যক্তিগতভাবে যা-ইচ্ছা করতে সক্ষম হয়েছে।

এই মুক্তি ও স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়নি। এটা কার্যত ছিল দ্বীন-ধর্ম, নৈতিকতা ও ঐতিহ্যিক রীতিনীতির সকল বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি ও নিষ্কৃতি। সেই সাথে পাচ্ছে আইনের নিরাপত্তা, প্রশাসনিক সহযোগিতা ও বিচার বিভাগীয় সমর্থন। আর এ সবই ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপোষক।

বুর্জোয়া শ্রেণী এমনিভাবেই সামন্তবাদীদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার রাজনৈতিক সংগ্রামে মুক্ত-স্বাধীন-নিরংকুশ ব্যক্তিসত্তার ওপরই নির্ভরশীল হয়েছিল, প্রতিটি মুহূর্ত তারা আরও অধিক স্বাধীনতা— আরও অধিক ক্ষমতা লাভের জন্যে সংগ্রামরত ছিল।

আর এই সময়ই মানুষ নিজেকে দেবতার স্থানে বসিয়ে দেয়। নিমগ্ন হয় সর্বাত্মক আত্মপূজায়। আল্লাহ্‌র দাসত্ব গ্রহণের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না।

ইতিমধ্যে পুঁজিবাদ এসে ময়দান দখল করে নিল। এই পুঁজিবাদও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে উঠল। তাতে রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তিই ধন-সম্পদের নিরংকুশ মালিকা হতে পারছে, মালিক হতে পারছে অর্থোৎপার্জনের সকল উপায়-উপকরণের। নিজের সম্পদের পরিমাণ যত ইচ্ছে বৃদ্ধি করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার স্বীকৃত। আর সেই সাথে সে জনশক্তিও বাড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পেল। নিয়োগ করল বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী।

পুঁজিপতিরা ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করল। তারা ব্যক্তি মানুষের অধিকারের পক্ষে অনেক সুন্দর সুন্দর মুখরোচক ও চিত্ত হরণকারী কথা বলতে শুরু করল। সকল প্রকার স্বাধীনতার অভিভাবক হয়ে বসল তারা। জীবনে প্রাপ্তব্য সকল পবিত্রতা ও মহানত্বকেও তারা প্রতিষ্ঠিত করল।

সমাজ যেন তার কার্যকলাপের জন্যে কোনোরূপ টু শব্দ করতে না পারে এবং তার কাজের পথে না পারে কোনোরূপ বাধা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে— এই অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এটা তাদের ঐকান্তিক দাবি।

তারা এই শ্লোগান ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল- তাকে কাজ করতে দাও, তাকে চলতে দাও Laissez Faire—Laissez passer— এই শ্লোগানের মধ্যেই একত্রীভূত হয়েছিল তাদের সমস্ত দাবি। তার অর্থ ছিল, ব্যক্তিকে সকল প্রকার বাধা-প্রকৃতিবদ্ধকতামুক্ত কাজ করার অধিকার দিতে, সুযোগ দিতে হবে।

এ ছিল সকল প্রকারের বাধা-বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভের আহ্বান।

কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির পবিত্রতা, মহানত্ব এবং ব্যক্তির অধিকার পর্যায়ে এই যে সুন্দর সুন্দর কথা বলা হচ্ছিল, এগুলো আল্লাহ্র জন্যে আল্লাহ্র বিধান মতো তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ছিল না। সবই ছিল শয়তানের জন্যে, শয়তানী উদ্দেশ্যে। সব কিছুরই মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদরূপী 'তাগুত'কে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, তার শক্তি ও দাপট ক্রমশ সমৃদ্ধ করে তোলার মতলবে। কেননা পুঁজি বাদ কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যা ইচ্ছা করতে পারছিল না। তা করা সম্ভব ছিল না। তা করা সম্ভব ছিল সকল বাধা-বন্ধনমুক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার উন্মুক্ত পরিবেশেই মাত্র।

পুঁজিবাদী তাগুতের সীমালংঘনমূলক স্বেচ্ছাচারী শক্তি-মর্যাদা অর্জনের পথে এছাড়া আর কোনো বাধা ছিল না। এ কারণে নিরুপায় হয়েই তা এই স্বাধীনতার ধ্বনি তুলেছিল, যেন গোটা সমাজই সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়। সমাজের ওপর যেন না থাকে কোনো ধর্মীয় অনুকরণ, কোনো নৈতিক বা ঐতিহ্যিক প্রতিবন্ধকতা।

সমাজের পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকা, পরিবার ও জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সকলেই যেন এই স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। কেননা পুঁজিবাদের সবচাইতে বড় চিন্তার বিষয় ছিল বেশি বেশি ও বড় পরিমাণে মুনাফা লুণ্ঠন করা আর তা সম্ভব ছিল যা-ইচ্ছা হয় তাই করার মাধ্যমে। এই পথে বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাদের অবাধ ও যথেচ্ছ মুনাফা লাভের পথ বিঘ্নিত হয়। বরং গোটা সামজের সর্ব প্রকারের বাধা-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াটাই তাদের বড় লাভ। কেননা তা হলেই তো জনগণের মধ্যে যৌন লালসাকে উচ্ছ্বসিত করে তোলার জন্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব। আর তা করতে পারলেই দ্বিগুণ-তিনগুণ-চারগুণ বেশি মুনাফা লুঠবার সুযোগ তারা পেতে পারে।

এভাবে পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি এক নতুন পূর্ণাঙ্গ দর্শন তৈরি করে নিল। সে দর্শনের শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, গ্রন্থকার, সাংবাদিক, লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠীও গড়ে তোলা হলো। সকলেরই সম্মিলিত আহ্বান ছিল নিরংকুশ ব্যক্তি স্বাধীনতার দিকে। আর এই পাগলপারা মুক্তি ও স্বাধীনতার সকল বাঁধা-বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার দিকে।

এই বিভ্রান্ত বিপথগামী দর্শনের ছত্রছায়ায় এক নতুন সমাজ গড়ে উঠল। এ সমাজ অত্যন্ত বিভৎস ও জঘন্য রূপ পরিগ্রহ করলে তখন বলা হল,সমাজ ব্যক্তির এই স্বাধীনতা হরণ করতে চায়। অতএব ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তার সর্বশক্তি নিয়ে তার এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো। সমাজকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তার সাথে শত্রুতার পূর্ণ মাত্রার প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

এই দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী কোথাও থামল না। থেমে একটু চিন্তা-বিবেচনা করারও প্রয়োজন মনে করল না। একটুও চিন্তা তারা করল না যে, এই যে সমাজটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে ব্যক্তি মানুষকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, এই সমাজটি আসলে কি ?... ব্যক্তি-ই বা কি ? ব্যক্তি ও সমাজ কি দুই, না ব্যক্তিগণেরই সামষ্টিক রূপ হচ্ছে সমাজ! মানুষ একই সময় একজন ব্যক্তি ও সমাজেরই অংশ নয় কি ?... সমাজের মধ্যে মানুষ নেই ? ব্যক্তিদের সমন্বয়েই কি সামজ গড়ে ওঠেনি ? সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা কি ব্যক্তির মানসিক ভাবধারার ঐকান্তিক দাবি নয় ? অন্যদের সাথে মিলিত একত্রিত হয়ে বসবাস করাই কি নয় ব্যক্তির মনের ঐকান্তিক দাবি ? মানুষ কি অন্য মানুষের প্রতি কোনো ঝোঁক— কোনো আকর্ষণ বোধ করে না ? কোনো প্রয়োজনের জন্যেই এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী নয় ?...তা হলে এই সমাজটিকে যখন ভেঙ্গে ফেলা হবে, তখন ব্যক্তি কোথায় থাকবে ? কি অবস্থা হবে তার ?... কোন বেষ্টনীর মধ্যে বাস করবে এই ব্যক্তি ?

আসলে এই দার্শনিক-চিন্তাবিদ-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-লেখক-শিল্পী গোষ্ঠী এক অন্ধ জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ্র পথ তারা চিনতে পারেনি, আল্লাহ্র নূর থেকে তারা বঞ্চিতই রয়ে গেছে। তারা জানতে পারেনি যে, পুঁজিবাদ আসলেই একটা মহাধ্বংসকারী তাগুত। এই তাগুতেই তাদের মনে এই সব ভ্রান্ত ভিত্তিহীন মতবাদ বদ্ধমূল করে দিচ্ছে। এর ফলে এই সমাজ ও সামাজিক বন্ধন যদি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে এই ব্যক্তিরা চরমভাবে অসহায় ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে। তখন কার্যত এই তাগুত ব্যক্তিকে পেয়ে বসবে, তাকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করবে। অন্যান্য মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী এই একক ব্যক্তিকে দাসানুদাস বানিয়ে নেওয়া তার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার হবে। কেননা সমাজ তো নেই, লোকগুলোর পরস্পরের কোনো সম্পর্ক বা বন্ধন বলতে কিছুই নেই। নেই তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি। এক্ষণে এই বিচ্ছিন্ন নিঃসম্পর্ক মানুষের পালনে পুঁজিতান্ত্রিক ও পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষক এই তাগুতের পক্ষে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করা কতই না সহজ হবে। তখন পুঁজিবাদের পতাকা উচ্চে তুলে ধরতে বাধ্য হবে এই ব্যক্তিরা। আর তাগুত তাদেরকে পশুপালের রাখালের মতো যে দিকে ইচ্ছা চালিয়ে নিয়ে যাবে লালসা-কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে।

একদিকে ব্যক্তিতন্ত্রের প্রতি এই চরম মাত্রায় পৌনপুনিক দাবি। আর অন্যদিকে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সামষ্টিকতার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা। দুই বিপরীতের পারস্পরিক ভয়াবহ সংঘর্ষের ব্যাপার।

সামষ্টিকতাবাদী মতবাদ ঘোষণা করছে, ব্যক্তির স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। স্বতন্ত্রভাবে তার কোনো তাৎপর্য বা মাহাত্মও নেই। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্ব, সমাজের মধ্যেই সে লালিত-পালিত, তার জীবন যাপন এই সমাজের মধ্যেই সম্ভব। সমাজকে তার নিশ্চিত-অনিবার্য গতিপথ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেজন্যে চেষ্টা করারও কোনো অধিকার নেই তার।

এদিকে দরখায়েম মানব জীবনের সামষ্টিক ব্যাখ্যা পেশ করছিল। আর কার্ল মার্কস ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যায় তারই সমর্থন যুগিয়েছিল। এদের বক্তব্য ছিল, অর্থনৈতিক ভিত্তিই সমাজ গড়ে তোলে। আর সমাজই ব্যক্তি সৃষ্টি করে।

দরখায়েম বলেছে ঃ

সামষ্টিক চেতনা থেকে উদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা নিশ্চিতরূপে সেই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, যা ব্যক্তির চেতনা থেকে বের হয়। বরং ব্যক্তির চেতনা অন্যান্য

ব্যক্তি থেকেও স্বতন্ত্র জাতীয়। সামষ্টিক বিবেক-বুদ্ধি ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধি থেকে ভিন্নতর, তার জন্যে বিশেষ নিয়ম-কানুন শুধু তারই জন্যে প্রযোজ্য।[১]

...অপরদিকে সামষ্টিক চিন্তাধারা ও কার্যক্রম বিভিন্ন পথে চলে। তা ব্যক্তিগণের চিন্তার বাইরে প্রাপ্ত সত্য। ব্যক্তিগণ প্রতি মুহূর্তে সেই সত্যের সম্মুখে মাথা নত করে থাকতে বাধ্য।[২]

সম্মিলিত কাজ থেকেই সামষ্টিক প্রপঞ্চের প্রকাশ ঘটে। তা ব্যক্তির চেতনার বাইরে পূর্ণত্ব পায়। কেননা তা বহু সংখ্যক ব্যক্তির মন-মানসিকতার ফল।[৩] এই সম্মিলিত কাজই কর্ম ও চিন্তার পথ নির্দিষ্ট করে। আর এই পথসমূহ আমাদের অস্তিত্বের বাইরে পাওয়া যায়। তা ব্যক্তির ইচ্ছা দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় না।[৪]

সামষ্টিক প্রপঞ্চের প্রাণ পর্যায়ের বিশেষত্ব যেহেতু বাইরে থেকে ব্যক্তিগণের মনের ওপর প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই প্রপঞ্চসমূহ ব্যক্তিগণের মনের উৎপন্ন নয়।[৫]

লক্ষণীয়, সামষ্টিক বাহ্যিক প্রপঞ্চ ব্যক্তিগণের আভ্যন্তরীণ চেতনার ওপর কিভাবে প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়ায়।[৬]

তবে মার্কস্, এঙ্গেলস্ এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আরও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। তা মানুষের অত্যন্ত জঘন্য কুৎসিত কিমাকার চিত্র অংকন করেছে।

বস্তুগত জীবনে উৎপাদন পদ্ধতিই সমস্ত সমাষ্টিক কার্যক্রমের, রাজনীতি ও জীবনের আধ্যাত্মিক রূপ গড়ে তোলে। (মার্কস)

উৎপাদন ও উৎপন্ন পণ্যাদির পারস্পরিক বিনিময়ই হচ্ছে সমস্ত সামষ্টিক ব্যবস্থার ভিত্তি। (এঙ্গেলস)

তাহলে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে মানুষের নিজস্ব সত্তা বলতে কিছুই নেই। নেই তার নিজস্ব কোনো চিন্তা-চেতনা, না ব্যক্তিগত কর্মের উদ্দীপক বা কারন।

---

১. সামষ্টিক বিদ্যার পদ্ধতিগত নিয়মঃ ডঃ মাহমুদ কাসেম অনূদিত। ডাঃ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নদভী দ্রষ্টব্য।

২. পূর্ব সূত্র।

৩. দরখায়েম এখানে স্বীকার করছে যে, সামষ্টিক প্রপঞ্চ বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিগত মন-মানসিকতা থেকে উৎসারিত হয়। অথচ একটু পরেই সে এই কথা ভুলে গিয়ে এর বিপরীত মতো প্রকাশ করেছে। কোনো ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার সম্পর্কিত মতবাদের জন্যে সে খ্যাতিমান হয়েছে।

৪. পৃ. ৫

৫. পৃ. ১৬৬

৬. পৃ. ৬৬

তা হচ্ছে নিছক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রচ্ছায়া, যা মানুষের নিজস্ব সত্তার বাইরে পাওয়া যায়।

> মানুষ যে সামষ্টিক উৎপাদনে অভ্যস্ত, তারাও পরস্পরে একটা সীমিত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে, সে সম্পর্ক গড়ে না তুলে তাদের কোনো উপায় নেই। কিন্তু সে সম্পর্ক তাদের ইচ্ছার অধীন নয়, তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। জনগণের চেতনা তাদের সত্তা নির্ধারণ করে না। তাদের সত্তাই নির্ধারণ করে তাদের স্বরূপ (মার্কস)

চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিবর্তন কিংবা মৌলিক আবর্তনসমূহ সম্পর্কে চিন্তাধারা ও আলোচনা-পর্যালোচনা করা জনগণের বিবেক-বুদ্ধির ব্যাপার নয়। কিংবা তারা যদি চিরন্তন সত্য ও ন্যায়পরতা সহকারেও চেষ্টা চালায় তবু তা কখনোই সফল হতে পারে না, কেবলমাত্র উৎপাদন উপায়-প্রক্রিয়া ও পণ্য বিনিময়ের পন্থাসমূহে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ চিন্তা-বিবেচনা করলেই বুঝতে পারা যেতে পারে।

কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় মুশকিল হলো, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মানুষ সম্পর্কে যখন কথা বলে, তখন ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলে না। তা সামষ্টিক কার্যক্রম নিয়েই ব্যস্ত। তার দৃষ্টিতে ব্যক্তির কোনো অস্তিত্বই স্বীকৃত নয়। আছে শুধু সামষ্টিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে।

মোট কথা, মার্কস ও এঙ্গেল্স-এর মতে ব্যক্তির কোনো অস্তিত্বই নেই। তাকে অবশ্যই কোনো-না-কোনো শ্রেণীর মধ্যে শামিল ও গণ্য হতে হবে। আর এই শ্রেণীর যা কল্যাণ তাকেই তার নিজের জন্যে কল্যাণরূপে গণ্য করতে হবে। আর এই শ্রেণীর প্রবণতা ও রীতিনীতি অনুযায়ী তার আচার-আচরণ ও চিন্তা-বিশ্বাসও গড়ে নিতে হবে। শ্রেণীর চরিত্র ও ঐতিহ্যই হবে তার চরিত্র ও ঐতিহ্য, জীবন সম্পর্কে শ্রেণীর দৃষ্টিকোণকেই পরম সত্য ও চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত জীবন চিন্তা করে, তাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তা বলে মনে করে, আর এই নিয়মে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে, তাহলে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তা একটি বড় সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে ইতিহাসের ঘটনাবলী যা কিছু বলে ও প্রচার করে, তা মানুষের গড়া কল্পকাহিনী মাত্র। (কিন্তু কেন ?...) বৈজ্ঞানিক অধ্যায় যে প্রকৃত ব্যাপার উপস্থাপিত করে এই ধরনের কোনো ব্যক্তি কখনোই পাওয়া যায়নি। অতীত ইতিহাসের সকল পর্যায়েই ব্যক্তি সব সময়ই শ্রেণীভুক্ত ছিল। অনাগত শ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে যার আগমনকে বস্তুগত ও অর্থনৈতিক বিপ্লবসমূহ অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছে— দেখা যাবে, ব্যক্তি একজন মানুষই বটে, যা আসন্ন নিশ্চিত অনিবার্যতার সুসংবাদ দেয়।

মনে হচ্ছে, মানুষ অর্থনৈতিক ও বস্তুগত নিশ্চিত অনিবার্য বিপ্লবসমূহের অধীন। এ কারণে ব্যক্তি সমাজের অধীন। আর সমাজ এসব বিবর্তন বিপ্লবের অধীন।

মানুষ ব্যক্তিতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিকতায় এসে এক নূতন খোদা বানিয়ে নিল। আর বস্তুগত অনিবার্যতা ও বাধ্যবাধকতাই তাদের 'খোদা' হলো।

সমাজতান্ত্রিকতাও একটি জাহিলী বিপর্যয়, তা চরমবাদিতায় পূর্ববর্তী জাহিলিয়াত থেকে কোনো অংশেই কম নয়, যে জাহিলিয়াতে সমাজের তুলনায় ব্যক্তির গুরুত্ব স্বীকৃত।

সমাজতান্ত্রিকতা হোক, কি ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, উভয়ই পূর্ববর্তী বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া মাত্র। উভয়ই চরমবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন।

ব্যক্তি যে সমাজেরই একটা অংশ, তা উভয় জাহিলিয়াতই বুঝতে পারেনি, বুঝতে অক্ষম। আসলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই সত্য। ব্যক্তিগণের সমষ্টিই তো সমাজ। ব্যক্তি না হলে সমাজ হবে কেমন করে?

মানব জীবনকে সমাজতান্ত্রিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে দিলে একটা বড় ভুল ও বিভ্রান্তি এই হয় যে, তাতে জীবনের একটিমাত্র দিকই লক্ষ্যভূত হয়। তা হচ্ছে, ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছা কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজ-আরোপিত নিয়ম-কানুন ও দায়-দায়িত্ব মেনে চলতে বাধ্য হয়।

এটা সত্য বটে! কিন্তু এ সত্য কি প্রমাণ করে?

দরখায়েম স্বীকার করেছে (যদিও স্বীকার করার পরই আবার তা অস্বীকার করেছে), সামষ্টিক প্রপঞ্চ প্রকাশমানতা বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির মন-মানসিকতারই ফলশ্রুতি। অন্য কথায়, ব্যক্তি কোনো-না-কোনোভাবে সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আর তার এই প্রতিনিধিত্ব সমাজের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

আর সমাজ যে কিছু ব্যাপার ও বিষয় ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেয়, তা যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তাহলে তার দুটি দিক:

হয় বিপুল সংখ্যক সৎ, নেককার ও চরিত্রবান ব্যক্তির মন মিলিত হয়ে কোনো কথা একজন বিপথগামী ব্যক্তির জন্যে বাধ্যাতামূলক করে দেয় এবং বলে— দেখো, কখনোই এই সীমালংঘন করতে পারবে না— এর বাইরে যেতে পারবে না।

অথবা কিছু সংখ্যক অসৎ, দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তির মন একত্রিত হয়ে সৎচরিত্রবান ব্যক্তিদেরকে নিজেদের কথা মানতে বাধ্য করে দেবে এবং বলবে, হয় আমাদের সাথে চলো, না হয় আমরা তোমাদেরকে পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবো।

উভয় অবস্থায়ই তা বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি মানুষের মনের সম্মিলন, একটি মতের ভিত্তিতে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ। এই সম্মিলন ও ঐক্যবদ্ধতার দরুন তার শক্তি বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা শেষ পর্যন্ত মনুষ্য প্রকৃতি থেকে তো বাইরে চলে যায় না। তাই ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ই মানুষ। আর এককভাবে ব্যক্তি বা এককভাবে সমাজ সমষ্টির মধ্যেই মানুষ হওয়ার গুণটি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না।

আর সামষ্টিক ব্যাখ্যা বা বস্তুগত ব্যাখ্যা উভয় দর্শনই বিষয়টিকে এমনভাবে সংমিশ্রিত করে দেয় যে, তাতে ব্যক্তিসত্তার বিশেষত্ব স্বতন্ত্র ও বিশেষত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় না। কেননা যেমন বলেছি উভয়ই জীবনের একটি মাত্র দিকের ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। আর তা হচ্ছে সকল অবস্থায়ই ব্যক্তি সমষ্টির অধীন হয়ে থাকে।

কিন্তু উক্ত দুটি দর্শনই জাহিলিয়াতের অন্ধত্বের মধ্যে পড়ে প্রকৃত বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। সেই বাস্তবতাকে, যেখানে ব্যক্তিরা তাদের সমষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে এবং তারা সমাজ-সমষ্টির সাথে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

যদি বলা হয়, সমাজও তো বিদ্রোহী ব্যক্তিগুলোকে নিষ্পেষিত ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তাহলে আমরা বলব, এটা মূল বিষয়ের কোনো প্রমাণ হলো না। এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হল, ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে এতদূর চলে যায় যে, তারা সমাজ-সমষ্টির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে।

তাছাড়া সমাজ-সমষ্টি প্রতিবারেই বিদ্রোহী ব্যক্তিদেরকে নিষ্পেষিত করতে পারে— এমন কথাও সত্য নয়। সত্য নয় ভালোর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মন্দের ক্ষেত্রেও। আসলে এটা একটা হিংস্র ধর্মীয় ধারণা মাত্র, যা প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে।

খারাপ ক্ষেত্রের একটা দৃষ্টান্ত এখানে তুলতে চাই। কেননা তা-ই এই হিংস্র জাহিলী ব্যাখ্যার বাস্তবতার অতীব নিকটবর্তী ব্যাপার।

স্ট্যালিনের নির্মমতার ইতিহাস সম্পর্কে কি বলতে চাও ?

ক্রুশ্চেভ তাকে কিভাবে চিত্রিত করছে ?

সে কি বলেনি যে, স্ট্যালিন হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ববাদের নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম দৃষ্টান্ত, সে গোটা সমাজকেই একান্তভাবে বাধ্য করেছিল তার দাসত্ব করার জন্যে, একথা কি সত্য নয় ?

তা কি করে সম্ভবপর হলো ?. . . ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যাদাতারা তার কি ব্যাখ্যা দিতে পারে ?

বিশ্বস্ত একনিষ্ঠ ক্রুশ্চেভ যেভাবে তাকে চিত্রিত করেছে, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আসলে সে সমাজ-সমষ্টির কল্যাণের প্রতিনিধিত্ব করেনি। পরন্তু সে (নীতিগতভাবে) শাসক শ্রেণীর অর্থাৎ প্রোলেটারিয়েট শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বও করেনি।

আসলে সে ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সে ছিল 'তাগুত', সীমালংঘনকারী, কোনোরূপ দয়া-মায়া বলতে কিছুই ছিল না। ইতিহাসের ব্যক্তিত্ববাদী ব্যাখ্যাকে যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করি তাহলে এই ব্যাপারটার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে?

আর ভালোর ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণ, পবিত্র আত্মা, দ্বীনের আহ্বানকারী ও সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিবর্গ তারা সমাজের তাগুতী ব্যবস্থার মধ্যে এককভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁরা সমাজের জন্যে সত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তারা সমাজের কল্যাণ, সত্যনীতি ও ন্যায়পরতা-সুবিচার কায়েমের জন্যে চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থা হিসেবেই প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে থাকেন। অতঃপর হয় তারা নিজেরাই এই সংগ্রামে বিজয় লাভ করেন প্রত্যক্ষভাবে এবং সে বিজয়কে তারা নিজেদের জীবনেই দেখতে পারেন অথবা তাঁদের উপস্থাপিত চিন্তাধারা ও নীতি আদর্শ কোনো-না-কোনো সময় অবশ্যই বিজয়ী হয়ে দাঁড়ায়...ইতিহাসের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাকে বাদ দিলে এসব বাস্তব ঘটনার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে?

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, মানবীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক দেওয়া উচিত নয়। উচিত নয় কেবলমাত্র সমাজ-সমষ্টির ভিত্তিতে। এই উভয়টিই জাহিলী ব্যাখ্যা, মূল বাস্তব ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র।

মানুষের সত্যিকার ব্যাখ্যা হতে পারে যদি ব্যক্তি ও সমষ্টি— উভয়ের ভিত্তিতে একসাথে অবিভাজ্যভাবে দেওয়া হয়। কেননা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে। বিচ্ছিন্ন ও নিছক এককভাবে কারোরই কিছু করার নেই।

কখনও ব্যক্তি প্রধান হয়ে দেখা দেয়, কখনও সমাজ প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে এমন সুস্পষ্ট সত্য বর্তমান যা এই জাহিলী মতবাদগুলোর জ্ঞানের আওতার মধ্যেই আসেনি, সে বিষয়ে তা সম্পূর্ণ অন্ধ। তা হচ্ছে, মানুষের উভয় দিক— ব্যক্তিগত দিক ও সমাজগত দিক– সম্মিলিতভাবে এক সাথে ও পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতা সহকারে কাজ করে প্রতি মুহূর্ত, ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়। কখনোই তার অন্যথা হয় না।...এ এক অনস্বীকার্য সত্য।

ব্যক্তি সমাজ-সমষ্টির মধ্য থেকে .... তারই সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে। আর সমাজ-সমষ্টি কাজ করে ব্যক্তিগণের বাস্তব অংশীদারিত্ব ও সাহায্য-

সহায়তা নিয়ে, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোনো অস্তিত্ব বা ভূমিকা নেই, থাকতে পারে না। তাই ইতিহাসের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা যেমন ভুল, তেমনি জাহিলী সামষ্টিক ব্যাখ্যাও। উভয়ই সমানভাবে চরম ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত।

আধুনিক জাহিলিয়াতের অধীন আজকের মানবতার বাস্তব অবস্থা হচ্ছে– খোদাদ্রোহিতা, সীমালংঘন ও নাফরমানীর কোনো-না-কোন কাজে— ইচ্ছায় হোক-অনিচ্ছায় হোক— জড়িয়ে পড়তে একান্তভাবে বাধ্য হচ্ছে।

হয় মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক আল্লাহ দ্রোহিতাকে গ্রহণ করবে আর তার পরিণতিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। আর না হয় মানুষ সমাজ-সমষ্টির আল্লাহ দ্রোহিতার আশ্রয় গ্রহণ করবে, আর তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের অধীনতা গ্রহণ করবে। ..... তাও তখন, যদি কোনো কিছু গ্রহণ করার তার স্বাধীনতা আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে। কেননা কোনো জাহিলিয়াতের অধীনেই মানুষ গ্রহণ বা বর্জনের কোনো স্বাধীনতাই পেতে পারে না। তাগুতী শক্তিই তাদের শাসক ও পরিচালক হয়ে বসে। সামষ্টিক অবস্থাই তাকে ক্ষমতাসীন করে দেয়।

আর মানুষের এই ধ্বংস ও বিপর্যস্ত অবস্থা আল্লাহ্‌কে পরিহার করে চলার অনিবার্য পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সারকথা হচ্ছে, মানুষের প্রকৃত সত্তাই আজ চরম ধ্বংসের মুখে এসে গেছে।

যে ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন, সে তো তার বিরাট অংশ থেকেই বিচ্ছিন্ন। এক্ষণে সে নিতান্তই এককভাবে নিজ সত্তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে লিপ্ত। পরিণতিস্বরূপ তার পাগল হয়ে যাওয়া, আত্মহত্যায় উদ্যোগী হওয়ার, ব্লাড প্রেসার বা স্নায়ুবিক অসুস্থতার রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ পরিণতি নিতান্তই অযৌক্তিক।

পক্ষান্তরে, যে সমাজ তার ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র মর্যাদা বিনষ্ট ও অধিকার হরণ করে, পরিণামে তা নিজেকেই ধ্বংস করে। এ সমাজে জনসংখ্যার আধিক্যেরও কোনো মূল্য হতে পারে না। কেননা এই সমাজের ওপর তাগুতী শক্তিই সর্বাত্মক শাসক হয়ে বসেছে। সে-ই হয়ে পড়েছে এই সমাজের একমাত্র চিন্তানায়ক, নিরংকুশ মাধ্যম। তার ক্ষমতা সীমাহীন, পরিমাণহীন। সে যখন মরে যায় কিংবা ক্ষমতাচ্যুত হয়, তখন তাকে বড় অপরাধী ও নির্মম পশুরূপে চিত্রিত করা হয়।

এই জাহিলিয়াত উদাত্ত কণ্ঠে নিজের সম্পর্কে দাবি করছে যে, তা বর্তমানে মানবীয় বিবর্তনের উন্নতির চরম উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। এখন তার জন্যে আল্লাহ্‌র বিধান— আদেশ-উপদেশের কোনো প্রয়োজন নেই।

নৈতিকতার বিপর্যয়

বর্তমান জাহিলিয়াতের সবচেয়ে বড় প্রতারণা হচ্ছে, লোকেরা মনে করছে, এই জাহিলিয়াত বুঝি নৈতিকতার বড় ধারক।

কেননা, এই পাশ্চাত্য সুসভ্য ব্যক্তি একজন অতিবড় চরিত্রবান। সে মিথ্যা বলে না, ধোঁকা দেয় না, প্রতারিত করে না কাউকেই। সে যখন কথা বলে, তখন সে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সহকারে বলে। তোমার সাথে আর্থিক লেনদেন করলে তা পূর্ণ আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা সহকারেই করে। তার কাজে-কর্মে সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। দেশের খেদমতে সে লেগে আছে অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে। ...সব ব্যাপারেই সে একজন আদর্শ ব্যক্তি।... প্রাচ্যেদেশীয় লোকদের মুখে এই ধরনের কথা বেশ শোনা যায়।

... কেউ যৌনতার কথা তুললে চট করে বলা হয়ঃ আরে রাখো তোমার যৌনতা, যৌনতার সাথে যে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক আছে, এই কথাই ওরা বিশ্বাস করে না, এই দিক দিয়ে ওদের বিচার করা চলে না।...অন্যান্য সবদিক দিয়েই তো ওরা আদর্শ।...হায়, আমরা যদি ওদের মতো হতে পারতাম;... ওদের চরিত্রের মতোও যদি হতো আমাদের চরিত্র, তাহলে তো আমরা বর্তে যেতাম!

আমরা এ পর্যায়ে আধুনিক জাহিলিয়াতে নৈতিকতার ইতিহাস আলোচনা করব। বিশ্লেষণ করে দেখব, ওরা ক্রমশ উন্নতির দিকে ছুটে চলছে, না ধ্বংসের দিকে হু হু করে নেমে যাচ্ছে। ...আমরা প্রকৃত ও বাস্তব ইতিহাসের আলোকে বিচার করে দেখব, পাশ্চাত্য জগতে নৈতিকতা বলতে কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা। এ ক্ষেত্রে আমরা কোনোরূপ কল্পনা, মিথ্যা দোষারোপ বা উড়া কথার প্রশ্রয় নেব না।

কিন্তু মূল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখের পূর্বে আমাদের বারবার বলা তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করা জরুরি মনে করি। তা হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণরূপে নৈতিকতাশূন্য ও চরিত্র বিবর্জিত একটি জাহিলিয়াতও ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, নৈতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা মানবীয় শক্তির সাধ্যায়ত্ত নয়। এমন করাও সম্ভব নয় যে, কোনোরূপ নৈতিকতাই পাওয়া যাবে না। কেননা মানবীয় মনস্তত্ত্ব সামষ্টিকভাবে অন্যায় ও পাপে নিমজ্জিত হতে পারে না। তা যত বিপর্যস্তই হোক না কেন, বিচ্ছিন্নভাবে ও এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু-না-কিছু ভালো ... কিছু না কিছু কল্যাণ অবশ্যই বর্তমান থাকবে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কল্যাণ— তা যে অবস্থায় বা যে-কোনো ক্ষেত্রেই থাক, জাহিলিয়াতকে মারাত্মক ধরনের বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করতে পারে না।

সেই সাথে এই বিপদগামিতার নিশ্চিত অনিবার্য কুফল থেকেও পারে না তাকে বাঁচাতে। জাহিলিয়াতের আরব সমাজেও নানা ধরনের ভালো ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ ছিল। তাদের মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা ও সম্মুখে এগিয়ে যাবার গুণের ধারক ছিল। তারা যে জিনিসের প্রতি বিশ্বাসী হতো যাকে তারা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করত; তার জন্যে জীবন প্রাণ উৎসর্গ করতেও তারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হতো না। তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মান-সম্মান ও মর্যাদা বোধ ছিল, ছিল আত্মসম্মান চেতনা ও জুলুমের প্রতি ঘৃণা।

কিন্তু এসব গুণ মিলিতভাবে তার জাহিলিয়াত হওয়াকে বন্ধ করতে পারেনি। তার অনিবার্য গুম্‌রাহীর পরিণাম থেকেও তাকে রক্ষা করা যায়নি। কেননা এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, ছিল না তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ কারণে উক্ত গুণাবলীও সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারেনি।

বীরত্ব, সাহসিকতা, অগ্রবর্তিতা ও জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করার প্রবণতা রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ ও গুমরাহীর কাজে পরস্পর সাহায্য করায় সীমিত থেকে নিরর্থক ও নিস্ফল হয়ে গেছে। তারা এক অপরের সাহায্যে এগিয়ে গেছে বটে; কিন্তু তা কোনো সত্যের জন্যে করছে না, বাতিলের জন্যে,— ন্যায় পথে না অন্যায় পথে, সে চিন্তা তাদের মনে কখনোই উদিত হয়নি। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলেই তারা রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু তার পরিণামে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প যেমন থাকত না, তেমনি বাতিলকে নির্মূল করার লক্ষ্যও থাকত না। ফলে বাতিল স্তরে স্তরে জমে উঠত, হতো পুঞ্জীভূত। বদান্যতা ও দানশীলতা নিছক অহংকার ও গৌরব প্রকাশের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। পশু যবাই করা হতো ও মেহমানদের জন্যে খাবার তৈরি করা হতো, তার মূলে এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকত যে, মেহমানরা— পথিকরা যেন তাদের অতিথিপরায়ণতার গল্প দেশে-দেশে ছড়িয়ে দেয়। পরিণামে কোনো মেহমান না-ই আসুক, আর তাদের অতিথি পরায়ণতার গল্প না-ই বলা হোক। যদি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুর্বল ও বঞ্চিতের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তাদের মধ্যে কার্পণ্য প্রবল হয়ে উঠত। তখন এক কানাকড়িও ব্যয় করতে তারা রাজি হতো না। আত্মসম্মানবোধও আত্মগৌরবে পরিণত হতো, সত্য অনুসরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

মোটকথা, সত্য অনুসরণ তাদের এই ধরনের কাজে মূল প্রেরণা— উৎস হতো না। আসলে তা হতো আল্লাহ্‌দ্রোহী আত্মগৌরব। যদিও এই আত্মগৌরবী আরবরা খুব ভালো করেই জানত যে, তারা যা কিছু করছে, তা নিতান্ত গুমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইউরোপীয় জাহিলিয়াতও ব্যক্তিগত কাজের পর্যায়ে বহু গুণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিল। সততা-সত্যবাদিতা, কাজে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা ও পারস্পরিক কাজে নির্মমতা-পরিচ্ছন্নতা ... সবই ছিল। কিন্তু তার কোনো একটিও আল্লাহ্‌র দেখানো পথের অনুসারী ছিল না বলে তার সহজ-সরল-ঋজু পথ থেকে তা ছিল বিভ্রান্ত। একটু পরেই যেমন দেখব, তা সবই ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের প্রবণতা-নিঃসৃত। তারা উক্ত পর্যায়ের যে কোনো গুণসম্পন্ন কাজ করত, তা করত এই উদ্দেশ্যে যে, তা সামষ্টিকভাবে তাদের জন্যে বৈষয়িক দিক দিয়ে খুবই সহায়ক ও স্বার্থ আদায়কারী ছিল, জীবনের গাড়ি ধাক্কা না দিয়েই চালানো যেমন অতীব সহজে ওসব নৈতিকতার বৈষয়িক কায়দা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে পাশ্চাত্যের এই সুসভ্য মানুষ সহসাই এসব নৈতিকতা পরিহার করতে একটুও কুণ্ঠিত হতো না। তখন তাদের দৃষ্টিতে এসব নৈতিকতা একটা অবাস্তব অ-অনুসরণীয় নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না।

না, খুব একটা তাড়াহুড়া না করেই এক্ষণে আমরা পাশ্চাত্য নৈতিকতা পর্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অধ্যায়নে আত্মনিয়োগ করছি ....

মৌলিকতার দিক দিয়ে পাশ্চাত্য নৈতিকতা সবই ছিল ধর্মীয় শিক্ষার ফলশ্রুতি। আর আসলেও নৈতিকতার উৎস ধর্ম ছাড়া আর কোথাও কিছু ছিল না। মানুষ সত্যের অনুসারী হয়েও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চরম বিপথগামিতার মধ্যে পড়ে যেত। ফলে পরিণামে নৈতিকতায়ও দেখা দিত সেই বিপর্যয় ও বিপথগামিতা। তবে নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই বিপথগামিতা খুব দ্রুত দেখা দিত না, দেখা দিত খুব ধীরে ধীরে এবং বেশ বিলম্বেই তা চরম সীমায় উপনীত হতো। এটা একটি শতাব্দী কালের মধ্যেও সংঘটিত হতো না, এজন্যে কয়েক শতাব্দী সময়ের প্রয়োজন হতো।

এই ক্রমিক ধারায় পাশ্চাত্য নৈতিকতার পতন ঘটার কারণে তার অবশিষ্ট নিদর্শন-দৃষ্টান্তসমূহ জনগণকে এই ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে যে, পাশ্চাত্য জাহিলিয়াতও বুঝি নৈতিকতার বড় ধারক, জাহিলিয়াতের প্রেমিকরাও এই ধোঁকার শিকার হয়েছে। মনে করেছে, বাহ্যত আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় দেখা দেয়নি। পরবর্তীকালে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই কারণে প্রথম পর্যায়ে জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, আকীদা-বিশ্বাসের সাথে বোধ হয় নৈতিকতার কোনো নিকট সম্পর্ক নেই এবং আকীদা-বিশ্বাসে বিপর্যয় যতই আসুক না কেন, তা সত্ত্বেও নৈতিক চরিত্র অবশ্যই রক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু আসলে এটা একটা মস্তবড় ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। আর তার কারণ হচ্ছে, পতনের দিকে যাওয়ার গতিতে পার্থক্য হওয়া। এই পার্থক্যেরও কারণ হচ্ছে,

মানুষের মন স্বভাবতঃই এবং ঐতিহ্যগতভাবে তার নৈতিকতার বন্ধনসমূহ শক্ত করে আঁকড়ে থাকে, সহজে তা ছাড়তে রাজি হয় না। তার আকীদার অংশ ঈমান হারিয়ে ফেললেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার মূল্যবোধটা রক্ষা পেয়ে থাকে। ইউরোপও তার বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও দীর্ঘকাল তৎলব্ধ মূল্যবোধটা হারায়নি। কেননা তা এমন একটা জিনিস যার কিছু না কিছু অবশ্যই রক্ষা পেয়ে যায়, অবশিষ্ট থাকতেই হয়। কিন্তু তার শেষ পরিণতি অভিন্ন ও তা নিশ্চিত, অনিবার্য। কেননা আকীদার বিপর্যয় অবশ্যই নৈতিকতার বিপর্যয় সৃষ্টি করবেই। আর নৈতিকতা আকীদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে একদিন না একদিন তা নিঃশেষ হয়ে যাবেই।

ইউরোপীয় নৈতিকায় ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছে। ঘটেছে খুব ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ আধুনিক জাহিলিয়াতের প্রকৃত নৈতিকতা থেকে বিপর্যস্ত হওয়ার পরও দীর্ঘকাল তার জের চলছিল। তারই ফলে পাশ্চাত্য জাহিলিয়াতকে নৈতিকাতার ধারক মনে করে অনেকেই ধোঁকার মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, ইউরোপীয় চরিত্রের সবকিছুই একদা একটা বড় সাহায্যকারীর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। তা এমন এক সাহায্যকারী, যার ছাড়া নৈতিকতার সাহায্যকার আর কিছু হতে পারে না; আর তা হচ্ছে তাদের ধর্ম।

ইউরোপীয় চরিত্রের দুটি উৎস ছিল। একটি ছিল খ্রিস্টধর্ম, আর অপরটি ছিল ইসলাম।

সকলেরই জানা, ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে গিয়েছিল কনস্ট্যান্টাইন। এই ধর্মমত ইউরোপীয় জীবনধারায় একটা নির্দিষ্ট নৈতিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল এবং তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জনগণের মনে বদ্ধমূল হয়ে থেকেছেও, যদিও স্বয়ং কনস্ট্যানটাইনের হাতেই খ্রিস্টধর্মে নানা প্রকারের বিকৃতি সংঘটিত হয়েছিল।[১] তা সত্ত্বেও এই ধর্মীয় চরিত্রটা নেতিবাচক রূপ পরিগ্রহ করেছিল, বাস্তব জীবনের সাথে তার কোনো সঙ্গতি ছিল না। হযরত ঈসা (আ) জনগণকে বলতেনঃ যে লোক তোমার ডান গালে একটা থাপ্পড় মরল, তার সম্মুখে তোমার বাম গালও পেতে দাও। তাঁর এ কথার আসল উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে লোকদের আত্মিক সংশোধন। তিনি তো আল্লাহ্র সত্য নবী ছিলেন, তিনি উক্তরূপ কথা বলে নিশ্চিয়ই জনগণের মনে যিল্লতী ও আত্মসম্মান হননের চিন্তা জাগাতে চান নি। কিন্তু মধ্যযুগে খ্রিস্টীয় নৈতিকতার সাধারণ রূপটা এই প্রকৃতিতেই লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা হযরত ঈসা মসীহ্র উদ্দেশ্য ছিল না, তাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর অনুসারীরা উক্তরূপ ধারণাই পোষণ করছিল তদানীন্তন রোমান সাম্রাজ্যের

১. অত্র গ্রন্থের 'ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে' অধ্যায়ে মার্কিন লেখক ড্রিপারের উক্তি দ্রষ্টব্য।

আভ্যন্তরীণ পরিবেশে। গোটা পরিবেশেই তো তখন বস্তুবাদী ভাবধারাপূর্ণ, বিপর্যস্ত ও জোর-জবরদস্তিতে ভারাক্রান্ত ছিল।

অতঃপর খ্রিস্টান জগত ইসলামী জগতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শুরু হয়ে যায় ক্রুশযুদ্ধ। এই সুযোগে খ্রিস্টানরা ক্রুশ ধারণ করে মুসলিম জাহানে প্রবেশ করে এবং কিছু কাল পর্যন্ত তথায় অবস্থান করে। তারা সিরীয় এলাকায় নিজস্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত করে।

খ্রিস্টানরা ইসলামী জীবনধারার সাথে পরিচিতি লাভ করে গ্রন্থাদির মাধ্যমেও। এই পরিচিতির ফলে তারা নানাভাবে উপকৃত হয়। তারা লাভ করে জীবনের জন্যে ইতিবাচক মতাদর্শ নৈতিকতার পূর্ণ সংরক্ষণ সহকারে।

তারা সেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহে বসবাসকারী মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিল। তারা লক্ষ্য করত, মুয়ায্যিনের আযান ধ্বনি শোনামাত্রই তারা তাদের দোকান-অফিস-ঘর সম্পূর্ণ বা প্রায় উন্মুক্ত রেখেই— তাতে মূল্যবান পণ্যদ্রব্য ভরা থাকা সত্ত্বেও নামাযের জন্যে চলে যেত। তথায় পাহারাদারীর কোনো ব্যবস্থাই রাখা হতো না। মসজিদের নামাযে হাযির হওয়ার জন্যে তারা বিন্দুমাত্র বিলম্বও সইত না। নামায সমাপ্ত করে তারা নিজ নিজ দোকান-অফিস-ঘরে ফিরে আসত, কিন্তু দেখত, সেখান থেকে কোনো সামান্য জিনিসও চুরি যায়নি। তার কারণ জনগণ ইসলামে ঈমানদার, সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী।

তারা দেখত, মুসলিম জনগণ গোষ্ঠীবদ্ধ, পরস্পর গভীর সম্পর্কে সম্পৃক্ত। তাদের সকলের মনে এক অভিন্ন 'উম্মত' হওয়ার চেতনা সক্রিয়। অন্তত বিপদকালে তো বটেই। তখন তারা পরস্পর সহযোগিতায় এগিয়ে যেত। পরস্পরের মধ্যে থাকত বন্ধুত্ব, প্রীতি, সহানুভূতি-সহৃদয়তা, সহমর্মিতা, পরস্পরের প্রতি তারা একনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ। অবশ্য শাসক শ্রেণীর সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়।

তারা মুসলিম কারিগরকে দেখত আদর্শ ব্যক্তিরূপে। যেমন দক্ষ, কর্মতৎপর, তেমনি বিশ্বস্ত। তার এই বিশ্বস্ততাই আসলে তার প্রথম ও বড় মূলধন। তার কর্মদক্ষতাই তার বাস্তব অগ্রগতি লাভের বড় হাতিয়ার। ফলে তাদের মধ্যে শিল্প-কর্ম সম্প্রসারিত ও উন্নত হচ্ছিল এবং উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এই ধরনের বহু প্রকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব তারা মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্য করত। এ পর্যায়ে বিশেষ উল্লেখ হচ্ছে ওয়াদা পূরণ। মুসলমানদের সাথে পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে খ্রিস্টানরা এই ওয়াদা পূরণের ব্যাপারটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে সালাহ্উদ্দীন আউয়ূবীর কাছ থেকে অনেক বাস্তব ঘটনার নিদর্শন ও প্রমাণ তারা পেয়েছে।

সামষ্টিকভাবে মুসলিম সমাজ এবং বিশেষ করে সামরিক ও আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতেই আধুনিক ইউরোপের সর্বক্ষেত্রেই পুনর্জাগরণ সূচিত হয়েছিল।

কিন্তু আমরা যেমন বিস্তারিতভাবে বলেছি— পরিবেশ পরিচিতির কারণে এই পুনর্জাগরণ আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তা পৌত্তলিকতার জঘন্য পংকিল মলিনতায় আপ্লুত হয়। তা-ও ছিল গ্রীক ও রোমান উত্তরাধিকার, যদিও তখন পর্যন্ত অন্তরের আকীদাটা যথার্থ ও জাজ্বল্যমানই ছিল।

ইউরোপীয় জনমনে নৈতিকতায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যে কারণের সঞ্চার হয়েছিল, তার উৎস ছিল হেলেনীয় সংস্কৃতি সঞ্জাত দর্শন। পূর্বোদ্ধৃত দুটি উৎসের পর এটা ছিল তাদের জন্যে তৃতীয় উৎস।... তা বলতে গেলে হাতীর দাঁতের বোর্জধারী সংস্কৃতি। তার নৈতিক নমুনাসমূহ ছিল শূন্যলোকে ঝুলন্ত।

এই সময় থেকেই পাশ্চাত্য জগতের লোকদের মধ্যে চারিত্রিক বিপর্যয় সূচিত হয়। কিন্তু নৈতিক বিপর্যয়টা খুব ধীরে ও ক্রমিক গতিতে সংঘটিত ও প্রকাশিত হয় বলে প্রকৃত অবস্থার প্রকাশ ঘটতে কয়েক শতাব্দী লেগে যায়।

পাশ্চাত্য নৈতিকতায় গ্রীক প্রভাবের দরুন এই ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, নৈতিক নিদর্শন হাতী-দাঁতের বুর্জে ও শূন্যলোকের বিশালতায় পাওয়া সম্ভব তখন, যখন বাস্তব জীবন প্রয়োজানুসারে নৈতিক বাঁধা-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে থাকবে।

চিন্তা ও কর্মের পার্থক্য আধুনিক জাহিলিয়াতে সৃষ্টি নিছক পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তারই ফলে আজ সমগ্র জগতে দ্বৈত নৈতিকতা— নৈতিকতার এই দ্বিমুখিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ববাসীর জীবনে চরিত্রের সর্বক্ষেত্রেই এই দ্বিমুখিতা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে লোকেরা নীতিগত নৈতিকতা সম্পর্কে বড় বড় কথা বলছে— অবাস্তব জগতে তার কথা বলে বলে সুখ লাভ করছে, কিন্তু জীবনের ঘটনাবলীতে তার বাস্তব প্রতিফলন একবিন্দুও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আসলে এক্ষেত্রে তাদের গতিবিধি সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী হচ্ছে।

ধারণ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিরাজমান এই জাহিলিয়াতের ছত্রছায়ায় 'ম্যাকিয়াভেলী'র জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তার স্বাভাবচরিত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবলভাবে পড়েছিল। ইউরোপের সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাবে যে, স্বার্থ হাসিলের জন্যে যত খারাপ পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, তাতে কোনো দোষ নেই।

এভাবে গোটা পাশ্চাত্য রাজনীতিতে ম্যাকিয়াভেলীর উক্ত কুৎসিৎ নীতি ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেল।

ম্যাকিয়াভেলী রাজনীতির প্রথম রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে মতাদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য। যা মতাদর্শ চিন্তা-বিশ্বাস, বাস্তবেও ঠিক তাই রক্ষা করে সেই অনুরূপ কাজ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

এই ইউরোপীয় রাজনীতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল এই মৌলনীতির ভিত্তিতে যে, উদ্দেশ্য উপায়কে বৈধ করে। উপায় ও পন্থা যতই জঘন্য ও কলুষমুক্ত হোক না কেন, তদ্দ্বারা যদি উদ্দেশ্য লাভ সম্ভব হয়, লক্ষ্য অর্জন সহজসাধ্য হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা শুধু নির্দোষই নয়, অতীব ভালো ও উত্তম।

এই ম্যাকিয়াভেলী চিন্তা ও দর্শন খুব স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় রাজনীতিকে গ্রাস করে ফেলল। এরই ফলে রাজা-বাদশাহ, অভিজাত শ্রেণী ও ধর্মগুরু লোকেরা নিজেদের দখলভুক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রক্ষার জন্যে যে কোনো নিকৃষ্টতম উপায়-উপকরণ ব্যবহার করতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হয়নি। তার পরে পুঁজিতন্ত্র তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, তৎপূর্ববর্তীদের কাছ থেকে উপায়-উপকরণসমূহ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, তার মাত্রা ও পরিধি অনেক গুণ বৃদ্ধিও করেছে। তাদের অবৈধ ও অবাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে উপায়-উকরণ গ্রহণের যত হীনতা ও নীচতাই অবলম্বন করতে হোক না কেন, তাতে তারা কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি। এমনকি আমেরিকান পুঁজিতন্ত্র নিজেদের হীনস্বার্থ রক্ষার জন্যে কেনেডিকে হত্যা করেছে; তাতে তাদের বিবেক কিছু মাত্র দংশিত হয়নি।

এসব তো তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। বাইরের জগতে তাদের ভূমিকা তার চাইতেও জঘন্য ও অধিক কুৎসিৎ। সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্য রক্ষা ও জনগণের তাজা-তপ্ত রক্ত শোষণের জন্যে নিকৃষ্টতম উপায় ও পন্থা অবলম্বন করেছে, তাতে তাদের কিছুমাত্র বিপর্যয়ের আশংকা বা খট্‌কাও মনে জাগেনি। কেননা তাদের মতে লক্ষ্য উপায়কে ভালো করে দেয়। কিন্তু সে লক্ষ্যটি ভালো কি মন্দ, উত্তম কি নিকৃষ্ট জঘন্য, সে বিচারের কোনো প্রয়োজনই তারা মনে করেনি। তাই বলতে হয়, ইউরোপীয় নৈতিকতায় পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা যদি কিছু থাকেও তবে তা কল্পনার জগতে, বাস্তবতার জগতে তার নাম চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইউরোপে রাজনীতি এভাবেই নৈতিক পবিত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আর তাদের সাংস্কৃতিক চৈন্তিক প্রভাবে পীড়ে বলতে লাগলঃ হ্যাঁ, ব্যাপার তাই। রাজনীতির সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত নয়।

এ ছিল ইউরোপের বিপথগামিতার সূচনা বিন্দু। তবু তখন পর্যন্ত সর্বাত্মক বিপর্যয় প্রচণ্ড হয়ে দেখা দেয়নি।

তার দরুন লোকেরা প্রতারিত হল। কেননা তখন পর্যন্ত লোকেরা আসল অবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারেনি, পরিণতি কত যে মারাত্মক, তা বোঝা তখন

তাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তারা বুঝতেই পারেনি যে নৈতিকতা যদি আকীদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা হলে না নৈতিক চরিত্র রক্ষা পেতে পারে, না কোনোরূপ প্রতিরোধ সহ্য করতে পারে।

আসল অবস্থা লোকেরা আঁচ করতে পারেনি এজন্যে যে, তারা বাহ্যিকভাবে দেখতে পাচ্ছিল যে, নৈতিকতার অনেক ভালো ভালো নিদর্শন তখন পর্যন্ত বাস্তবে অবশিষ্ট ছিল। তা তখনও পুরা মাত্রায় বিপর্যয়ের শিকার হয়নি। সেইখানে তাদের মনে এই ধারণাও জন্মিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, রাজনীতি নৈতিকতার অধীন নয়, আর সংঘটিত ঘটনাবলী চরিত্রকে কিছুমাত্র ধ্বংস করছে না, করবেও না। বর্তমান অবস্থাকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফল ধরে নিতে লাগল। তার ঘটনাবলীর সাথে নৈতিকতার প্রয়োগ হতে হবে, তা কোনো জরুরি কথা নয় বলেও নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিল।

কিন্তু আল্লাহ্‌র নিয়ম তো কখনোই বদলায় না। আকীদার সাথে চরিত্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র স্থায়ী নিয়মেই চরিত্র বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না। কেননা আকীদা হচ্ছে চরিত্রের স্বাভাবিক ও জীবনদায়ী উৎস। আকীদাই চরিত্রের একনিষ্ঠতা ও সততা নিয়ে আসে। তাই আকীদাভিত্তিক চরিত্র স্থায়ী হতে পারে। যে চরিত্র আকীদাভিত্তিক নয়, তা কোন সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে, তা টেরও পাওয়া যাবে না।

ইউরোপ ধর্মকে বাদ দিয়ে তার বদলে দর্শনকে গ্রহণ করল। সেই দর্শন থেকেই তারা নৈতিকতার নিয়ম-বিধান গ্রহণ করতে শুরু করে দিল। অথবা বলা যায়, ধর্মের প্রতি তাদের মনে জেগে উঠল ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আর তাকেই তারা দর্শনের পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর যারা চলতি নৈতিকতাকে আঁকড়ে ধরে থাকল, তারা নৈতিকতাকে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত করাকে পছন্দ করতে পারল না। এক্ষণে তারা 'বিবেক' আর 'কর্তব্য' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দগুলোর আশ্রয় নিতে লাগল। কিন্তু ধর্মীয় পরিভাষায় তার ব্যাখ্যা দিতে তারা অস্বীকার করে বসল।[১]

কিন্তু এ নৈতিকতা তার তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। আর মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন এ নৈতিকতা খুব বেশি দিন টিকেও থাকতে পারে না।

রাজনীতি নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে অর্থনীতিও নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল স্বাভাবিকভাবেই।

---

১. এই ধারণাটা প্রাচ্যের ইসলামী সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে। বলতে শুরু করেছে ঃ আমি মদ্য পান করি না। অমনি খুব তাড়াহুড়া করে বলবে, না, না, ধর্মের নিষেধের কারণে নয়, বরং শুধুমাত্র এজন্যে যে, আমি মদ্যপান পছন্দ করি না।

সত্যি কথা হচ্ছে, ইউরোপীয় অর্থ ব্যবস্থা প্রথম দিন থেকেই নৈতিকতা পরিপন্থী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ও গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বনের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যবাদের অধীন ভূমিদাস প্রথার ওপর নির্ভর করে সামন্তবাদী অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা ছিল চরম জঘন্য, হীন ও নির্মম ব্যবস্থা। সম্রাট কনস্ট্যানটাইন গোটা সাম্রাজ্যের ওপর যে ক্ষয়িষ্ণু খ্রিস্ট ধর্মমত চাপিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে গীর্জা চরম স্বেচ্ছাচারিতার একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করেছিল। গোটা জনগণের ওপর, তথা খ্রিস্টীয় গীর্জা গোটা অর্থ ব্যবস্থাকে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার নিয়মাবলীর অধীন ও তার অনুসারী বানাতে বিন্দুমাত্র সক্ষম হয়নি। বরং খোদ্ গীর্জাই কিছুকালের মধ্যে এক সামন্তবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে সামন্তরা জনগণের ওপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাত, গীর্জা ও তার মালিকানাধীন সমস্ত এলাকায় অনুরূপ নিপীড়ন ও নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছিল ধর্মের নামে।

তা সত্ত্বেও পূর্বে সামন্তবাদী অর্থনীতিতে নৈতিক বিপর্যয়টা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রিস্টীয় গীর্জা তা পরিবর্তন করতে একবিন্দু সক্ষম হয়নি। ধর্মীয় শিক্ষায় যত বিবৃতি ও বিপথগামিতাই পৌছে গিয়ে থাক না-কেন, সুদী কারবার ব্যবসায় ও লেনদেনকে একটা ঘৃণ্য জঘন্য ব্যাপার রূপে চিহ্নিত করতে ও বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়নি। যদিও মানুষ কোনোদিনই ইচ্ছা করে বা সাগ্রহে এই কারবারে জড়িত হতে রাজি হয় না। তারা তা বরদাশ্ত করে কেবলমাত্র বাধ্য হয়ে।

পরে যখন পুঁজিতান্ত্রিক শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হলো, তখন জনগণ একদিকে আকীদা-বিশ্বাস থেকে, আর অপরদিকে নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে সরে গেল। ফলে পুঁজিতন্ত্রের বল্গাহারা অশ্ব অন্ধভাবে ছুটতে লাগল। নৈতিকতার প্রাথমিক নিয়ম-নীতিও এই পাগলা ঘোড়াকে বাঁধতে পারল না।

সুদ— সুদী কায়-কারবার— কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মে এবং তার পূর্বে ইহুদী ধর্মের সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু পুঁজিতন্ত্র তো প্রথম দিনই এই সুদের ওপর ভিত্তি রেখে অগ্রসর হতে লাগল। তাতে যত জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনা হওয়া অনিবার্য ছিল, তা সবই হতে লাগল। শ্রমিকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা সম্পদ অপহরণ করে নিতে লাগল এবং কোনো কষ্ট স্বীকার করা ছাড়াই মানুষের উপার্জনের অংশ কেড়ে নিয়ে নির্লজ্জ ও নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকল। পুঁজিপতিরা নিঝঞ্ঝাট জীবন যাপনে মগ্ন, আর বসে-বসেই বিপুল অর্থ উপার্জিত হয়ে তাদের মুঠির মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকল অতীব সহজে ও কোনোরূপ পরিশ্রম ব্যতীতই।

তা শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম প্রয়োজন পরিমাণের ব্যবস্থা করে দিয়েও তাদেরকে প্রাণান্তকর খাটুনি খাটতে বাধ্য করে বিপুল পরিমাণ মুনাফা লুঠতে

থাকল। শেষ পর্যন্ত এমন কঠিন সময়ও দেখা দিল, যখন তারা পেট ভরা খাবার পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেল।

শোষণ চলল বালক বয়সের শ্রমিকদের ওপর। তারা দীর্ঘ সময় ধরে চরম কষ্টদায়ক শ্রম করতে বাধ্য হচ্ছিল। বিনিময়ে তারা পেত মাত্র এক-দুই টাকা, যা দিয়ে তাদের পেট ভরে খাবার খাওয়াও চলত না।

শ্রমিকরা তখন মজুরী বৃদ্ধি ও শ্রমের উন্নত শর্তের দাবি পেশ করল, তখন তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে নারী শ্রমিকদের দাঁড় করাল। উদ্দেশ্য ছিল তাদের দাবিকে দুর্বল করা এবং সাহস-হিম্মতকে ক্ষীণ করে দেওয়া।

পরে নারী শ্রমিকদের উৎসর্গ করা হলো পুরুষদের লালসা-কামনার দাউ দাউ করা আগুনের মুখে। এক মুঠি খাবারের বিনিময়ে তাদের ইজ্জত-আব্রু বিক্রয় করতে তাদেরকে বাধ্য করা হলো।

এ ছিল নৈতিকতার জন্যে মারাত্মক অবস্থা। নৈতিকতা ধ্বংস করে পুঁজিবাদী খেল-তামাসা, আনন্দ-স্ফূর্তি, বিচিত্র স্বাদ-আস্বাদন, রূপ-সুধা পান, অলংকার, সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক বিলাস দ্রব্যাদি, ফ্যাশন ও পোশাক-পরিচ্ছদ ও নিত্য নতুন উদ্ভাবিত ও উৎপন্ন লোভনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করে বিপুল পরিমাণ মুনাফ লুণ্ঠনই ছিল চরম উদ্দেশ্য।

ঔপনিবেশিক এলাকা থেকে কাঁচামাল লুটে নিয়ে পুঁজিবাদের জন্যে অকল্পনীয় পরিমাণের মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ করে দেওয়া এবং তার আসল মালিকদেরকে দারিদ্র্য, পশ্চাদপদতা, মূর্খতা-অজ্ঞতা, রোগ ও অক্ষমতার অভিশাপের তলায় চেপে রাখাও ছিল তাদের ইচ্ছা। তাদের চরিত্রকে নষ্ট করে এই পথে পুঁজিবাদী মুনাফা বেশি থেকে বেশি অর্জনের পথ উন্মুক্ত করাও লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সকল প্রকারের পাপ-পংকিলতার ব্যাপক প্রচার ও মন-বিবেককে কম-সে-কম মূল্যে ক্রয় করার মূলে পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করাও সাম্রাজ্যবাদকে অধিকতর শক্তিশালী করে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিল চরম লক্ষ্য।

নৈতিকতা অবলম্বন ও নৈতিক মৌল নীতিসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাতে আত্মনিয়োগকারী লোকদিগকে পুঁজিবাদীরা নির্লজ্জভাবে অপমানিত করতে শুরু করে দিয়েছিল।

এই সময় নবতর বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ আবিষ্কৃত হতে লাগল। তা প্রচার করতে শুরু করল, অর্থনীতির একটা নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে। সে নিয়ম-কানুনগুলো ছিল নিশ্চিত অনিবার্য। নৈতিক চরিত্রের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। শুধু তা-ই নয়, সাধারণ জনগণের সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই।

এভাবে অর্থনীতি নৈতিক চরিত্র থেকে সম্পর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। লোকেরা কাঁধ উচিয়ে-নাচিয়ে বলতে লাগল, এটাকেই বলে অর্থনীতি! তা নৈতিকতার কাছে পরাজয় মানে না বলেই তা টিকে থাকতে পারে!

রাজনীতি ও অর্থনীতির পর যৌনতাও নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তা মানুষের পাশবিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হলো, সমস্ত কাজের যৌনতা ভিত্তি ব্যাখ্যা এবং বিকৃত-বিপর্যস্ত জাহিলিয়াত সৃষ্ট শিল্প বিল্পব মানুষকে পাগলের ন্যায় যৌন চর্চার অগ্নিকুণ্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল।

প্রথম দিকে তো লোকেরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এটা নিঃসন্দেহে নৈতিকতার চরম বিপর্যয়। কিন্তু ক্রমশ লোকেরা এই সত্যকে ভুলে গেল কিংবা বলা যায়, শয়তানেরাই তাদেরকে তা ভুলিয়ে দিল।

মার্ক্‌স, এঙ্গেল্‌স্‌, ফ্রয়েড, দরখায়েম... এরাই পরস্পরের কানে কানে এই চাকচিক্যময় লোভনীয় আকর্ষণীয় কথা পৌছিয়ে দিল... দিল একটা মস্তবড় ধোঁকা।[১]

মার্কস তাঁর ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বললেনঃ "যৌন পবিত্রতা গ্রামীন সামন্তবাদী সমাজের অবশিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বটে। তার যা কিছু মূল্য, তা সেই সময়কার অর্থনৈতিক স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।"

মার্কসের এই কথা সম্পূর্ণ ভুল, বরং একটা মস্তবড় প্রতারণা।

কেননা যৌন পবিত্রতার একটা নিজস্ব শাশ্বত মূল্য ও মর্যাদা-মহিমা রয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি থেকে আলাদাভাবেও মানুষের উচিত তা রক্ষা করা এবং কোনোভাবে ব্যাহত বিঘ্নিত বা ক্ষুণ্ন হতে না দেওয়া। কেননা যে মানুষ নিজেকে পশু মনে করে না, পশু থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করে, এই চারিত্রিক গুণটি তার জন্যে অপরিহার্য।

ফ্রয়েড বলেছেন, যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করা ছাড়া মানুষ স্বীয় অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিকশিত ও বাস্তবায়িত করতে পারে না। ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজ বা ঐতিহ্য– এই সব বাঁধা প্রতিবন্ধকতাই বাতিল, মূল্যহীন। তা সবই মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তিসামর্থ্যকে বিনষ্ট ও ব্যাহত করে দেয়। এসব বাঁধাকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

দরখায়েম বলেছেন, নৈতিকতা বিশারদরা মানুষের নিজের ওপর কর্তব্যসমূহকে নৈতিকতার ভিত্তি বানায়। ধর্মের ব্যাপারও তাই। কেননা লোকেরা মনে করে, ধর্ম সে সব চিন্তা ভাবনার ফসল, যা প্রকৃতিগত শক্তি সৃষ্টি করে কিংবা কতিপয় বিরল

---

১. التطور والثبات فى حياة البشرية। গ্রন্থের 'তিন ইহুদী' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বরেণ্য ব্যক্তিত্বের মনে আসে। (রাসূল ও নবীগণকে বোঝাতে চেয়েছে) কিন্তু এ পদ্ধতিটিকে সামষ্টিক প্রপঞ্চের ওপর আরোপ করা সম্ভব নয়। তবে এসব প্রপঞ্চের প্রকৃতিই বদলে দেওয়া হলে ভিন্ন কথা।[১]

তিনি আরও বলেছেন ঃ পূর্বোক্ত মতকে ভিত্তি করে এখানে একথা বলা সম্ভব যে, আইনগত বা নৈতিক নিয়ম-কানুন বলতে কিছুই কোথাও নেই, এই ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, এই কারণে যেসব নৈতিক নিয়ম-কানুনের কোনো অস্তিত্বই নেই তা-ই নীতি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হবে— এটা সম্ভব নয়।[২]

বলেছেন ঃ এই পর্যায়েরই কথা কোনো কোনো মনীষী মানুষের স্বভাবগত ধর্মীয় স্নেহ-বাৎসল্য আছে বলে মনে করেছে। আর এই শেষ মতটি যৌন চেতনা, পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ এবং সন্তানের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য প্রভৃতিতে সংমিশ্রিত। আবার অনেকে এই ধর্ম, বিয়ে, পরিবার প্রভৃতিরও উদ্ভব হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবেই দিতে চেয়েছে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলছে যে, এই সব ভাবধারা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বর্তমান নেই।[৩]

এ অধ্যায়ের পরবর্তী আলোচনায় দুই লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কে সৃষ্ট বিপর্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখানে আমরা শুধু ঐতিহাসিক ধারা ও ঘটনার যাচাই পেশ করব।

উপরে উদ্ধৃত ও আলোচিত খারাপ ও ভুল মতবাদের প্রভাবে জনগণ যৌনতার গভীর গহ্বরে ডুবে গেল। পরে তারা যে নৈতিকতার দিক দিয়ে চরম বিভ্রান্তি-বিপথগামিতার ফাঁদে আটকে গেছে, সে কথা তারা বেমালুম ভুলে বসেছে। তখন তারা খুব আনন্দ ও সন্তুষ্টি সহকারে বলতে লাগল, যৌনতা নিছক একটা দৈহিক কার্যক্রমের ব্যাপার মাত্র। তার সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন করে পূর্বে বলেছিল, রাজনীতি তো রাজনীতি, তার সাথে নৈতিকতার কি সম্পর্ক থাকতে পারে। আর যখন তারা এই কথা মুখে বলছিল, ঠিক সেই সময়েই তারা ভিতরের দিকে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে পরিবর্তন করে দিতে কিংবা নিজেদের ওপর থেকে বিপর্যয় বা বিপর্যয়ের বোঝা দূরে নিক্ষেপ করে দিতে পারবে বলে মনে মনে ধারণা করছিল।

এমনিভাবেই যৌনতা নৈতিকতা থেকে অথবা নৈতিকতা যৌনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। যেমন করে ইতিপূর্বে রাজনীতি ও অর্থনীতি নৈতিকতা থেকে

---

১. قواعد المنهج فى على الاجتماع ص ١٦٥
২. ঐ, পৃ. ৯-৬০।
৩. পূর্ব সূত্রঃ পৃঃ ১৭৩।

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আর নৈতিকতা তার আসল উৎস ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর চরিত্রের শেষ খুটিটিও ধুলিসাৎ হয়ে গেল।

নৈতিক পতন স্বভাবতই খুব ধীরে ধীরে ও ক্রমশ সংঘটিত হয়, আর নৈতিকতার পুঁজি সংগ্রহেও শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যায়। এই কারণে রাজনীতি, অর্থনীতি ও যৌনতার নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নৈতিকতার কিছু-না-কিছু পুঁজি অবশিষ্ট থেকে গেছে, যা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয়নি বা নিঃশেষ হয়েও যায়নি। তাই দেখে লোকেরা জাহিলিয়াতের মধ্যে অবস্থান অবস্থায়ও মনে করছে যে, নৈতিক চরিত্র আকীদা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তা জীবিত ও সক্রিয় থাকতে পারে। এ দিকে শয়তানেরাও লোকদের মনে-মগজে নানা মতাদর্শ বদ্ধমূল করে দিয়েছে।

এই কারণে তারা মনে করছে যে, রাজনীতি অর্থনীতি ও যৌনতার সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক আসলেই নেই। বরং রাজনীতি, অর্থনীতি ও যৌনতা নিছক অনৈতিক মূল্যমানের অধীন। রাজনীতি, অর্থনীতি ও যৌনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও নৈতিকতা যথারীতি বেঁচে আছে এবং সক্রিয়ভাবেই বর্তমান রয়েছে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে যা কিছু ঘটেছে তাকে বিপর্যয় না বলাই বরং ভালো। তার পরিবর্তে তাকে আমাদের বলা উচিত প্রগতি ও নিশ্চিত অনিবার্য প্রয়োজন। আর এই প্রগতি ও নিশ্চিত প্রয়োজন উভয়ই বড় শক্তি। তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না, তা আপত্তির ব্যাপারই নয়। অন্যান্য জিনিসের ন্যায় তাকে কোনো মানদণ্ডে ফেলে যাচাই ওজন করা যায় না। ওটা নিজেই একটা মানদণ্ড, তার বাইরের কোনো জিনিসের সাথে তার কোনো তুলনা করা চলে না। করলে তা দেবতাদের প্রতি প্রশ্ন তোলার মতো হবে। কিন্তু দেবতারা কখন কি করে, তার ওপর কার প্রশ্ন করার অধিকার থাকতে পারে ?... অতএব তার কাছে নতি স্বীকার করেই তা অকপটে মেনে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। না, কুণ্ঠিত মনে নয়, বরং সানন্দ চিত্তেই তা গ্রহণ করা উচিত। নৈতিকতা যথারীতি পতন মুখীই থাকল। আর নৈতিকতার পতন যখন শুরু হয়, তখন তা আর থামে না, যতক্ষণ না মানুষ যিল্লতির গভীর গহ্বরে পৌঁছে যায়।

ইউরোপে তখন পর্যন্ত প্রকৃত নৈতিকতার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু শুভ মানবীয় চরিত্র সত্যতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দৃঢ় চিত্ততা, নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সাংগঠনিক যোগ্যতা, উৎপাদনে দৃষ্টিপ্রখরতা, সতর্কতা এবং পরিণতির জন্যে ধৈর্য সহিষ্ণুতা এবং জীবনকে সুন্দর নিখুঁত করে গড়ে তোলার জন্যে অবিশ্রান্ত তৎপরতা ও চেষ্টা সাধনা— এই এবং এই ধরনের গুণাবলী ইউরোপ থেকে এখনও চিরবিদায় গ্রহণ করেনি।

আসলে এই সব পূর্বে অর্জিত নৈতিকতার অবশিষ্টাংশ। তা নিশ্চয়ই ইউরোপ তার সাহায্যকারী বন্ধুর কাছ থেকেই পেয়েছিল। তা খ্রিস্ট ধর্মই হোক কিংবা হোক দ্বীন-ইসলাম। অবশ্য সে নৈতিকতায় যুক্ত হয়েছে প্রাচীন রোমান ভাবধারা। তা রোমান বস্তু জগত ও বস্তুগত উৎপাদনের কাছে দক্ষতার সাথে কর্মব্যস্ত, সব কিছুকেই তারা সাংগঠনিকভাবে ও উত্তম-সুন্দর-নিখুঁতরূপে গড়ে তোলার দিকে তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ।

কিন্তু সেই রোমান ভাবধারাই এই অবশিষ্ট নৈতিকতাটুকুকেও মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

ইতিপূর্বে হেলেনীয় (গ্রীক) ভাবধারা যেমন করে নৈতিকতার অবশিষ্টকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল এবং আদর্শ বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এটাকে সঠিক প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, নৈতিকতার আদর্শ থেকে ত্যাজী বুর্জোয়ায় রসাস্বাদন করায় কোনো দোষ নেই। বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রতিফলন হোক, আর না-ই হোক। আর এ থেকেই রাজনীতির জগতে ম্যাকিয়াভেলীর দর্শন প্রচলিত হয়েছিল, অনুরূপভাবে রোমান ভাবধারাও পাশ্চাত্য নৈতিকতার অবশিষ্টাংশের ওপর দ্বিমুখী আক্রমণ করে বসেছিল।

রোমান ভাবধারা একদিকে ছিল মুনাফা সন্ধানী আর অপরদিক দিয়ে আত্মম্ভরী ও আত্মগৌরবী।

প্রাচীন রোমান জাহিলিয়াতে এ দুটি বিপর্যয় থেকেই আধুনিক জাহিলিয়াতের অবশিষ্ট নৈতিকতায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। ফলে গোটা নৈতিকতাই হয়ে গেছে মুনাফাবাদী, সুবিধাবাদী। প্রতিষ্ঠিত হলো আত্ম-অহংকারিতা।

হ্যাঁ, সততা, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, বিশ্বস্ততা ও দৃঢ় মন-মানসিকতা এসবই নৈতিক গুণবিশিষ্ট, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানদণ্ড বিভিন্ন। কোনো একটিও একক অবস্থায় মাত্রই নয়।

এই সমস্ত চরিত্রবিশিষ্ট মনুষ্যত্বের মান অনুযায়ীও হতে পারে, যেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর ধর্মের উৎস যে চরিত্রকে সব সময় সঞ্জীবিত রাখে, তাও এই মানবীয় চরিত্রই।

জাতীয় মান অনুযায়ীও চরিত্র গড়ে ওঠতে পারে। যে চরিত্র জাতীয়তার সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে যার মধ্যে মানুষ জীবন যাপন করে। পরে যখন তা জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ সীমার– তা যত প্রশস্তই হোক— বাইরে চলে যায়, চলে যায় সর্বাত্মক মানবীয় বেষ্টনীরও বাইরে, তখন তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে। আর অবশিষ্ট থাকে শুধু দাম্ভিকতা। আর তা চৌর্যবৃত্তি, ছিনতাই, ধোঁকা-প্রতারণা ও

অপহরণ সর্বপ্রকারের হীন অপরাধেই জড়িত হয়ে পড়ে ও করে যেতে থাকে। করে যেতে থাকে নির্ভীক, নির্লজ্জভাবে। সে কি করছে, না করছে, তার কোনো হিসেব-নিকেশই থাকে না। সে জন্যে তাদের মনে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধও জাগে না। কেননা তা আসলে কোনো প্রকৃত মানবিকতাকে কেন্দ্র করে দাঁড়ায় না। পরে জাতীয়তার মান অনুযায়ী হয়েও তা এমন কোনো ভিত্তির ওপর স্থির হয় না, যার দরুন মনে করা যাবে যে, তা সাধারণভাবেই মূল্যমানসমৃদ্ধ, তা অবশ্যই মেনে চলা উচিত। ...তা হয় না, সে নৈতিকতা থেকে নৈতিকতাবাদী অন্য কোনো লোকই কোনো নৈতিকতারই শিক্ষা বা প্রেরণা পেতে পারে না। অতঃপর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, যতটা ফায়দা পাওয়া যাবে বলে মনে করা যাবে, ঠিক ততটাই চরিত্র রক্ষা করে চলা হবে। এই ফায়দা লাভের সম্ভাবনার বাইরে নৈতিকতার আর কোনো মূল্য বা অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পাশ্চাত্যের অবশিষ্ট নৈতিকতা শুধু এতটুকুই। তা রোমান জাহিলিয়াতের উভয় বিপর্যয়ের আঘাতে চরমভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে রয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে পতনের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে।

ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদের যখন খ্রিস্টানপন্থীদের সাথে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান চলছি— বিশেষ করে মুসলিম সেনাধ্যক্ষ সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর সময়ে— তখন মুসলমানরা নিজেদের ওয়াদা পূরণ করতে, কৃত কোনো চুক্তি ভঙ্গ করতেই তাঁরা অস্বীকার করত, এমন কি চরম প্রয়োজন পরিবেষ্টিত অবস্থাও। ওপরন্তু সে চুক্তি ভঙ্গ করতেই যখন ফায়দা ও লাভ পরিলক্ষিত হতো, তখনও তারা প্রকৃত নৈতিকতার উচ্চতর নিদর্শন তুলে ধরতেন। কেননা তাঁদের এ চরিত্র ছিল তার প্রকৃত ও আসল রূপে, এবং তা আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ দ্বীন-ইসলাম থেকেই সরাসরিভাবে গৃহীত ছিল। এ পর্যায়ে কুরআনের বিধান হচ্ছে ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاۤءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَاۤئِنِيْنَ -

> তুমি যদি কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের কোনো আশংকা বোধ করো— ভয় পাও— তাহলে (তাদের সাথে কৃত চুক্তি) তাদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করে দিয়ে সমান অবস্থানে দাঁড়িয়ে যাও। কেননা আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের আদৌ ভালোবাসেন না। (সূরা আনফাল ঃ ৫৮)

তার অর্থ বিশ্বসঘাতকতার ভয় থাকলেও চুক্তি বিরোধী কাজ করে বিশ্বাস ভঙ্গ করা বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে চুক্তি বিরোধী কাজ করাও ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা তা করলে শত্রুপক্ষ ঘোষণা করবে যে, মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতার ভয়

থাকলেও চুক্তি বিরোধী কাজ করে বিশ্বাস ভঙ্গ করা বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে চুক্তি বিরোধী কাজ করাও ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা তা করলে শত্রুপক্ষ ঘোষণা করবে যে, মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। তা কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয় বরং উক্তরূপ অবস্থায় মুসলমানদেরই প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করে দেওয়া উচিত যে, না, কোনো চুক্তিই নেই। শত্রুপক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। এখন উভয় পক্ষের সম্পর্কের একটি মাত্র দিক এবং তা হচ্ছে যুদ্ধ। তাহলে ধোঁকাবাজির কোনো অভিযোগ উঠবে না। ...আসলে ইসলামের দুশমনরা তো ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসেরও শত্রু। এ জন্যে মুসলমানদেরকে বড় বেশি মূল্য দিতে হয়।

খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে কৃত সব চুক্তি যখন ভঙ্গ করছিল এবং সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি করে মুসলমান পুরুষ-নারী-শিশুকে নির্মম জঘন্য হিংস্রভাবে হত্যা করছিল হাজার হজার সংখ্যায়, তখনকার এই বীভৎস কার্যকলাপ কেবল ইউরোপীয় মন-মানসিকতাই হয়ত বরদাশ্‌ত করে নিতে পেরেছে। মুসলিমদের কাছে মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, পবিত্র, হারাম ও নিরাপত্তাপূর্ণ। হাজার হাজার মুসলিম তথায় প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের হাতে না ছিল কোনো অস্ত্র, না ছিল আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো প্রস্তুতি। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও খ্রিস্টানরা মসজিদে প্রবেশ করে মুসলমানদের হত্যা করেছে। তাতে এত বেশি রক্তপাত করেছে যে, আক্রমণকারীদের ঘোড়ার পা গোড়ালী পর্যন্ত রক্তে ডুবে গেছে। কিন্তু পরবর্তীতে অবস্থার মোড় যখন ঘুরে গিয়ে মুসলমানরাই খ্রিস্টানদের ওপর বিজয়ী হয়ে উঠলেন, তখন তাঁরা কোনোরূপ হিংস্রতারই প্রশ্রয় দিলেন না, তাঁরা বিজিত সেই রক্তপাতকারী খ্রিস্টানদের সাথে ঠিক মানবীয় মান অনুযায়ী আচরণ গ্রহণ করলেন। অথচ এরাই ছিল একটু পূর্বে মুসলমানদের সাথে চরম অমানুষিক শত্রুতাকারী। মুসলমানরা যখন তাদের সাথে অতীব উন্নতমানের নৈতিকতার নিদর্শন কায়েম করেছিলেন, যা একান্তই মানবতাভিত্তিক। কেননা তাঁরা তো আল্লাহ্‌র ওহী ভিত্তিক চরিত্রের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা জীবন যাপন করত আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান অনুযায়ী।

কিন্তু ইউরোপীয় জাহিলিয়াত আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিপদগামী, বিকৃত ও বিপর্যস্ত। তাই তারা কোনো দিনই তাদের সমস্ত ইতিহাসের কোনো একটি অধ্যায়েও সেই মানের আচরণ গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা তাদের চরিত্রে সেই উন্নত মৌল উৎস থেকে গৃহীত ও তা থেকে শক্তি সমর্থন গ্রহণকারী ছিল না। বিকৃত বিপর্যস্ত জাহিলিয়াতের ভাবধারা তাদের রক্ত মাংসে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, এই জাহিলিয়াতের প্রভাবই তাদের ওপর ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রতিফলিত হচ্ছিল।

আর তা শক্তি ও প্রেরণা গ্রহণ করছিল গ্রীক জাহিলিয়াত ও রোমান জাহিলিয়াত থেকে। এ দুটি ছিল তাদের ওপর অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তারকারী।

প্রাচীন রোমান ভাবধারা প্রখ্যাত রোমান আইনে পুরামাত্রায়ই প্রতিফলিত ছিল। সে আইন ন্যায়পরতা ও সুবিচার কেবলমাত্র রোমানদেরই প্রাপ্য, সেখানে সুবিচার পাওয়ার কোনো অধিকার রোমান ছাড়া অন্যদের জন্যে ছিল না। আসলে তা-ই হচ্ছে আমিত্ব ভাবধারা, যা আধুনিক জাহিলিয়াতের অধীন ইউরোপীয় নৈতিক চরিত্রের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে চরিত্র কেবলমাত্র জাতীয়তার চতুঃসীমার মধ্যেই আচরিত হতো। তার বাইরে তা যেমন কিছুমাত্র অবলম্বিত ও আচরিত হতো না, তেমন তা রক্ষিতও হতো না। সব চারিত্রিক রীতিনীতি তলায় হারিয়ে যেত। তবে একটি মাত্র অবস্থায় তা হয়ত পরিলক্ষিত হতো। তা হলো স্বার্থ ও বৈষয়িক মুনাফা লাভের সযোগ-সুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থের কারণে জাতীয়তার সীমার বাইরেও হয়ত ভালো ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোটা লক্ষ্য করা যেত।

রাজনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চরিত্র কি, তা দুনিয়ার কারোরই অজানা নয়। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আর যে-মুহূর্তে জাতীয় স্বার্থে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়ে গেল, অমনি সে সব চুক্তিই বাতিল হয়ে গেল। এরূপ অবিশ্বাসসুলভ আচরণ গ্রহণের পরও তাদের মধ্যে কোনো লজ্জা-শরমের উদ্রেক হতে দেখা যায়নি। মনে হয়, যেন কিছুই হয়নি। কেননা গ্রীক জাহিলিয়াতের দৃষ্টিতে মতাদর্শ ও বাস্তব কাজের অভিন্ন বা পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র জরুরি নয়।

তাদের এরূপ চরিত্র কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই যে দেখা গেছে, তা নয়; জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদের অনুরূপ চরিত্র দেখা গেছে। মুসলমানগণ যত দেশই দখল করেছিলেন, যেখানকার অধিবাসীরা ভিন্ন আকীদায় বিশ্বাসী ছিল, তা সত্ত্বেও তাদের পূর্ণ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অধীন সে অমুসলিমদের আকীদা পূর্ণ মাত্রায় সংরক্ষিত হয়েছে। কোনো অমুসলিমের ধর্ম পালনে একবিন্দু ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়নি। তাদেরকে মুসলিম বানাবার জন্যে কখনোই কোনো অবৈধ কৌশল অবলম্বন করা হয়নি। কেননা মহান আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীন-ইসলামের মাধ্যমে তাদেরকে এই নীতিই শিক্ষা দিয়েছেন।

কিন্তু পাশ্চাত্য চরিত্রের নিদর্শনাবলী আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পেশ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলিশ জাহাজ কোম্পানীসমূহে আফ্রিকারই মুসলমানরা কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী তাদের মুসলিম থাকাকে বরদাশ্ত করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কোম্পানী মুসলমান কর্মচারীদের বেতনের একটি অংশ মদের বোতল হিসেবে দিতে শুরু করল। মজুরী ও বেতনদান পর্যায়ে এটা ছিল একটি ভিন্ন প্রকৃতির পারিশ্রমিক দান।

মুসলমানদের ঈমান হচ্ছে, মদ্যপান ও মদ্য ব্যবসায় উভয়ই সম্পূর্ণ হারাম। এই কারণে তারা মদের বোতল ভেঙ্গে ফেলতে ও অবশিষ্ট নগদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা জীবিকা চালাতে বাধ্য ছিল।

জনৈক আইনবিদ এই অসহায় মুসলিমদের উপদেশ দিল যে, মদের বোতলকে বেতনের মধ্যে গণ্য করতে অস্বীকার করা হোক। তা সত্ত্বেও কোম্পানী যদি এইভাবেই বেতন দেওয়ার নীতিতে অবিচল থাকে তা হলে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। কিন্তু কোম্পানী টের পেয়ে আগে-ভাগেই এসব মুসলমান কর্মচারীদের চাকুরী খতম করে দিল।

এ-ই হচ্ছে পাশ্চাত্য চরিত্রের অতীব উন্নতমানের প্রদর্শনীঃ ফ্রান্সের লোক অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক চতুর— সচেতন ও সভ্য। প্যারিসের অধিবাসীরা যদি খুবই বিনয়, প্রাণোচ্ছলতা ও শালীনতা সহকারে আপনাকে সম্ভাষণ জানায় এবং আপনার প্রতি খুব বেশি সহৃদয়তা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তা হলে আপনাকে বুঝতে হবে, এসবের আসল অর্থ, আপনি যেন ফ্রান্সে সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করেন।

কিন্তু আপনি যদি অর্থ ব্যয় করতে অসমর্থ হন, তাহলে কি হবে ? ..শুনুন! একজন মিসরীয় যুবক আমাকে বলেছে— সে কিছুকাল ফ্রান্সে অতিবাহিত করেছে। কিন্তু সে মদ্যপানে ও অবাঞ্ছিত স্থানসমূহে যেত অভ্যস্ত ছিল না। এমন কি হোটেলে কতৃপক্ষ যদি তার কক্ষে যৌনস্পৃহা চরিতার্থ করার 'সামগ্রী' পৌছাত, তা হালেও সে তা গ্রহণ করতে এবং তা দিয়ে 'স্বাদ' আস্বাদন করতে রাজি হতো না। এই কারণে হোটেল পরিচালকরা তার সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য অনেক বেশি করে ধার্য করতে শুরু করল। এ ছাড়াও তাকে নানাভাবে ও উপায়ে উত্যক্ত করতে লাগল। উদ্দেশ্য ছিল, সে যেন হোটেল ত্যাগ করে চলে যায়।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রমণিত যে, জাতীয়তার সীমার বাইরে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের যে অন্যান্য বিশ্বস্ততা সহকারে আচরণ করা হয়, তার মূলে কোনো ঈমানদারী নিহিত নেই, আছে মুনাফা লাভের অত্যধিক লোভ।

কেননা ধোঁকাবাজি করলে তো বাজারই নষ্ট হয়ে যাবে। এ কথা তারা ভালো বুঝে। মুনাফার পরিমাণ কম হোক, এটা তারা চায় না। তার অর্থ বিপুল পরিমাণ মুনাফা লাভের লোভই পারস্পরিক কার্যকলাপ ও লেনদেন ইত্যাদিতে ঈমানদারী দেখাতে তারা বাধ্য হয়। নৈতিকতার এই মুনাফাভিত্তিক ব্যাখ্যা কেবলমাত্র বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য ও লেন-দেনের ক্ষেত্রেই নয়, ক্রমশ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে— নিজেদের দেশের ও স্বজাতীয় জনগণের সাথেও পারস্পরিক কার্যাবলীর মূল প্রেরণা ঠিক তাই হয়ে ওঠে। তার অর্থ, নৈতিকতা প্রথম মানবীয় মান থেকে বিচ্যুত হয়ে জাতীয়

মানদণ্ডে উত্তরিত হলো। ...পরে তা জাতীয়তার মান থেকে বিচ্যুত হয়ে পারস্পরিক লেন-দেনের মুনাফায় পরিণত হলো।

জাতীয় সংগঠনে সততা খুবই কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। আপনি সত্য বললে অন্যদের প্রতিও আশা করতে পারেন যে, তারাও সত্য বলবে, এ কারণে নয় যে, সত্য বলা মূলতই কোনো ভালো কাজ। বরং এ জন্যে যে, সত্য বলে আপনি নিজেও লাভবান হবেন, অন্যরাও লাভবান হবে। সত্য বলে তো আপনি অনেক শ্রম, বিপুল ধন-সম্পদ ও সময় বাঁচাতে পারেন। আর এসব শক্তিকে আপনি আরও অধিক উপার্জনের লাগাতে পারেন।

কিন্তু সততা ও সত্যবাদিতা দিয়ে যদি কিছুই উপার্জন করা না গেল কিংবা সত্যবাদিতা রক্ষা করতে গেলে যদি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় আর্থিক ও অন্যান্যভাবে, তা হলে সে সত্যবাদিতার কি মূল্য থাকতে পারে ? কোন আকর্ষণে বা প্রেরণায় মানুষ সত্য বলবে ?

আর একজন মিসরীয় আমাকে বলেছে, সে আমেরিকায় বহুদিন অবস্থান করেছে।

বলেছে, আমি এক রবিবাসরীয় স্কুলে একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে ইংরেজী ভাষা শিখছিলাম। যখন আমাদের মধ্যে পরিচিতি ঘনীভূত হলো এবং শিক্ষয়িত্রী জানতে পারল যে, আমি একজন দ্বীন-অনুসরণকারী মুসলমান, তখন সে বলতে লাগল, আমি ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু কথা জানি যে, সেই ইসলামের কারণে লোকেরা তোমার প্রতি ঘৃণাবোধ করবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলল, তোমাদের নবী মুহাম্মাদ একবার মদ্য পান করল, নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এমনভাবে যে, নিজেকে সে সামলিয়ে রাখতে পারল না। ফলে সে পড়ে গেল। এই সময় একটি শুকুর এসে তাকে কামড়ায় (নাউজুবিল্লাহ)। এই কারণে সে শুকর ও মদ্যপান হারাম করে দিয়েছে।

আমি বললাম, এখন তো আপনি প্রকৃত সত্য কথা জেনে গেছেন। এখনও কি আপনি ছাত্র-ছাত্রীদের এসব মিথ্যা কথা পড়াবেন ?

সে বললে, সেটা একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আসলে এসব কথা শিক্ষাদানের জন্যেই তো আমাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে। আর এই আয় দিয়েই তো আমার খাওয়া-পরা চলে।

নৈতিকতা যেহেতু তার আসল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং গ্রীক ও রোমান জাহিলিয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নবতর জাহিলিয়াতে এসে তার সমস্ত সঞ্চয় সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, তাই এক্ষণে কোনোরূপ আঘাত বরদাশ্‌ত করা সে নৈতিকতার পক্ষে সম্ভব থাকেনি।

পাশ্চাত্য নৈতিকতার দ্বারা দুনিয়ার মানুষ নানাভাবে প্রতারিত হচ্ছে। কেননা তারা দেখতে পায়, রাজনীতি, অর্থনীতি ও যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয়

সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নৈতিকতা স্বস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লোকেরা এই নৈতিকতায় নিহিত মুনাফা লোভ ও আত্মঅহংকারকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। বলতে গেলে তা তাদের অগোচরেই রয়ে গেছে। তাই তারা মনে করে নিয়েছে যে, নৈতিকতা তার মূল ধর্মীয় উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েও বাস্তব জগতে জীবন্ত ও সক্রিয় হয়ে থাকতে পারে। আর যে সব ব্যাপার নৈতিকতা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে, তা মূলতই তার সাথে সম্পর্কিত ছিল না। সেগুলো এমনিভাবে চিরকাল থেকে যাবে। রাজনীতি অর্থনীতি ও যৌনতা যতই বিপর্যস্ত হোক-না-কেন অথবা বলা যায়, যতই বিবর্তিত কিংবা স্বতঃসিদ্ধের অধীন হয়ে থাক-না-কেন আর বস্তুবাদী ও মুনাফা লোভ সংক্রান্ত ভাবধারা জনগণকে যতই আয়ত্তাধীন করে নিক-না-কেন।

আসলে সমস্ত বিপদ নিহিত— প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে নৈতিকতার ধীর গতিতে ও ক্রমশ অধপতনগামী হওয়ার মধ্যে। তারই কারণে লোকেরা মনে করে বসে যে, না, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোনো পতন বা অধোগতিই হচ্ছে না।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর বিগত বছরগুলোতে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কথা প্রমাণিত হচ্ছে।

এ পর্যায়ে আমরা যে সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব, তা ফ্রান্স থেকেই শুরু করছি। ফ্রান্সে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিপর্যয় এমনভাবে সংক্রমিত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল কোনো পাকা অস্থির ভিতরকার মজ্জা খেয়ে ফেলছে। শেষ পর্যন্ত যখন যুদ্ধ হল, তখন সমগ্র ফ্রান্স যৌনতার পংকিলতার গহ্বরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। তারই ফলে ফ্রান্স মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধের পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হলো। ফ্রান্সের কাছে অস্ত্র ছিল না, সে কারণে এই পরাজয় বরণ করা হয়নি। বরং অত্যাধুনিক ও মারত্মক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র তো ফ্রান্সের কাছেই ছিল। ম্যাজিনো লাইনের দুর্গ অবরোধ একটি বিখ্যাত ব্যাপার ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের জনগণের মধ্যে যুদ্ধ করার উদ্বোধনী শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তার এমন কোনো মর্যাদাও ছিল না, যা রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার তাগিদ তাদের মনে জেগে উঠবে; বরং ফ্রান্স থর থর করে কাঁপছিল এই ভয়ে যে, জার্মানীর বোমা বর্ষণের ফলে প্যারিসের নৈশ ক্লাব ও নৃত্যালয়সমূহ ধ্বংস হয়ে না যায়! এই কারণেই দুই সপ্তাহ সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই ফ্রান্স পরাজয় বরণ ও অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য হলো। তখন লোকেরা বলতে লাগল, এ তো অবস্থার অনিবার্য পরিণতি। এর সাথে নৈতিকতার দূরতম সম্পর্কও নেই।

অতঃপর আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ জর্জ কেনেডী ১৯৬২ সনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে বলেছিল, আমেরিকার ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন, কেননা নব্য যুবকরা যৌন-চর্চার, পংকিলতায় এত বেশি নিমজ্জিত যে, তারা নিজেদের দায়িত্বের বোঝা বহন করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার জন্যে আসা

প্রতি সাতজন যুবকের মধ্যে ছয় জনই ব্যর্থকাম হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। কেননা যৌন লালসা-কামনা তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থাকে সাংঘাতিকভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে।

এতদাপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ ও নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রণালয় তার ৩৩ জন কর্মচারীকে বহিষ্কৃত করেছে শুধু এজন্যে যে, তারা যৌনতার ক্ষেত্রে চরমভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। আর এই কারণে সরকারী গোপনীয়তার সংরক্ষণের দিক দিয়ে তারা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল না।

ইংল্যাণ্ডেরও দৃষ্টান্ত দেখুন! ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী প্রুফুমো একটি বেশ্যার সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার কারণে সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত গোপন তত্ত্বকে বিপদাপন্ন করে দিয়েছিল।

রাশিয়ার কথা.......?

ক্রুশ্চেভও কেনেডীর মতোই ১৯৬২ সনে বিবৃতি দিয়ে বলেছিল, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ বিপদান্ন। কেননা রাশিয়ার যুবকদের ভবিষ্যতের ওপর কোনো আস্থা স্থাপন করা যায় না। আর তার কারণ হচ্ছে, তারা যৌন স্বাদ-আস্বাদনে গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে আছে।

পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের অবস্থাও ভিন্নতর কিছু নয়। যদিও দেশগুলো অধিকতর উন্নত এবং আধুনিক জাহিলিয়াতের দিক দিয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অগ্রসর।

এ সব দেশের যুবকরা বিভ্রান্ত, দিশেহারা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন। চরস ও আফিম পান করে বুঁদ হয়ে থাকাই অভ্যাস। পাগলামী করেই নিজেদের সকল শক্তি ক্ষয় করছে। লুটপাট, নরহত্যা ও নারীহরণকারী দলে সংগঠিত। এসব দেশে সরকার ও সমাজ-বিদ্যায় পারদর্শীদের উদ্বেগের শেষ নেই।

এই সবকিছু কেবলমাত্র যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার কারণেই। আর এ পর্যন্তই সমস্যা সীমিত নয়। শংকট যেন নিম্নমুখী পিচ্ছিল পথে তরতর করে নেমে যাচ্ছে।

আমেরিকায় বড় বড় সুসভ্য (?) লোকদের সমিতি সংগঠন রয়েছে। আইনজীবী, চিকিৎসাবিদ, লেখক ও আইন পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এসব সমিতিতে শামিল রয়েছে। এসব সমিতি কি কাজে লিপ্ত?

লোকদেরকে ব্যভিচার কাজে সহযোগিতা করাই এ সব সমিতির কাজ! কেননা ক্যাথলিকপন্থী রাজ্যগুলোতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক সংঘটিত হতে পারে না, যতক্ষণ না উভয়ের মধ্যের কোনো একজন ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, কেবল তখনই অপর জন তালাক চাইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে যে তালাক চাইবে-স্বামী বা স্ত্রী— সে এসব সমিতির সহযোগিতা গ্রহণ করে। এসব সমিতি কোনো না কোনোভাবে স্বামী বা স্ত্রীকে ব্যভিচারের কাজে লিপ্ত করে। আর সেই অবস্থায় তার কাছ থেকে তালাক লওয়ার সমস্ত জরুরী কাগজপত্র তৈরি করে দেয় এবং এ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট ফি আদায় করে নেয়।

এই আমেরিকাতেই যুবতী মেয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থাকারী বহু সংগঠন কাজ করছে। এ সব দলের লোকেরা মেয়েদের ধরে নিয়ে ইউরোপের অপরাপর দেশে ক্রয়-ইচ্ছুক ধনশালী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। সেখানে তারা ক্রয়কারীদের লালসার অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়। ওসব সংগঠন এভাবে বিপুল অর্থ লাভ করে থাকে।

এসব সংগঠনই আবার গণতান্ত্রিক নির্বাচনসমূহে বিরোধী পক্ষের লোকদেরকে প্রকাশ্যভাবে হুমকি দেয়। প্রয়োজন হলে হত্যা কাণ্ড ঘটাতেও পিছ-পা হয় না। এ কাজের বিনিময়েও তারা বিরাট অংক অর্জন করে থাকে।

অধঃপতনের সীমা এখানে এসেই শেষ হয়ে যায়নি..........।

ইউরোপের নতুন বংশের যুবকরা যৌনতার ক্ষেত্রে পরম উদারনৈতিকতার নীতি গ্রহণ করেও অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। লুটপাট, ছিনতাই ও নারী হরণের কাজে লিপ্ত অসংখ্য সমিতি সংগঠিত হয়ে আছে ও অবাধে কাজ করে যাচ্ছে।

বালকদল চলমান রেলগাড়ীর দরজা-জানালার ওপর পাথর নিক্ষেপ করে। আরও রয়েছে চরস, ভাঙ ও আফিম সংগ্রহকারীদের দল। যানবাহনে চড়ে তার ভাড়া না দেওয়ার কাজেও তারা কম পটু নয়।

এক কথায়, খারাবীর যত নিকৃষ্টতম ব্যাপার মানুষ কল্পনা করতে পারে, তা আজকের সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের সর্বত্র ব্যাপক হয়ে রয়েছে।

তবু বলতে হয়, বিপর্যয় গোটা নৈতিকতাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারেনি। ...এখনও কিছু না কিছু ভালো দিক অবশিষ্ট আছে ...এসবের ওপর নির্ভর করে— আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে— সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার পূর্বে ইউরোপ নবতর জাহিলিয়াতের অধীন আরও দু-একটি বংশ-কাল হয়ত অতিবাহিত করতে পারবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ইউরোপ কোন দিকে যাচ্ছে! ...উন্নতির দিকে, না অধঃপাতের দিকে ? ...মঙ্গলের দিকে, না চরম ধ্বংসের দিকে ?......

প্রথম দিকে তো লোকেরা এসব আগত বিপদকে তেমন আমল দেয়নি। এ সব গুরুত্ব স্বীকার করতেই রাজি হয়নি। হাসি-ঠাট্টা করতে করতে নিজেদের মাথা

বালুর স্তুপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বড় গলায় বলেছে, দুনিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে।

আর এদিকে বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞানসংস্কৃতির প্রদর্শকরা ও উন্নতির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ লোকেরা বলতে শুরু করেছে ঃ

পূর্ববর্তী বংশের তুলনায় এখনকার নতুন বংশ অনেকটা উত্তম। এখনকার বংশ সাহসী, খোলা মনের ধারক, প্রগতিশীল এবং সমসাময়িক বিবেকের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলছে। এ উন্নয়নশীল বংশের লোকদের প্রসঙ্গে পশ্চাতবর্তী বংশের বুদ্ধি বিবেক দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যেতে পারে না। আমাদের নৈতিকতার জীবনের নবতর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কিন্তু নতুন বংশ নিজেদের নিত্য নতুন পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিজেরাই নিজেদের চরিত্র রচনা করে চলেছে। যারা তা দেখে চিৎকার করছে, ভয়-ভীতির কথা বলছে, তারা নিজেদের নিষ্ক্রিয়তা, স্থবিরতা ও পশ্চাদপদতার কারণে অবস্থাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।

কিন্তু এর পরও আধুনিক সভ্যতার হর্তাকর্তা ইউরোপ-আমেরিকা থেকেই সংবাদ পাওয়া গেছে ঃ

ইউরোপ-আমেরিকা সে সব গোলামের মুখে যেন লাগাম লাগিয়ে দেয়, যারা বিবেক-বুদ্ধি, সংস্কৃতি ও উন্নতির মান সম্পর্কে বড় গলায় বলে বেড়ায় ঃ ওসব দেশে নব্য যুবকদের চারিত্রিক বিপর্যয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে বেশ কতগুলো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে পূর্ণ নির্ভরতা ও সত্যবাদিতার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে যে, অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। নব্য বংশের ছেলে-মেয়েরা বিপর্যয় ও অধঃপতনের করাল গ্রাসের মুখে পড়ে গেছে। ভবিষ্যতে তারা জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারবে— তাদের প্রতি সে ভরসা কিছুতেই করা যায় না। পাশ্চাত্যে জগত আজ ব্যাপক ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

অ-মানবীয় চিন্তা বাদ দিলেও (অমানবীয় এ জন্যে যে, তাতে মানবতার সম্মুখবর্তী বিপদ সম্পর্কে চিন্তাই করা হয়নি, কেবল জাতীয়তার গতির মধ্যে থেকেই চিন্তা করা হয়েছে)– নবতর জাহিলিয়াতের নৈতিক বিপর্যয়ের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিলেও— আমরা বলব, নৈতিকতার এতটা অধঃপতন গোটা মানবতারই সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগাম নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমগ্র মানবতার ধ্বংস এজন্যে যে, পাশ্চাত্যের আধুনিক জাহিলিয়াতের তথাকথিত নৈতিকতা সংক্রামক ব্যাধির মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা নৈতিকতা যখন তার আসল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আল্লাহ্র প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের সাথে যখন তার কোনোই সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকল না এবং আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃতি যখন নৈতিকতার ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তখন

না নৈতিকতা টিকতে পারল, না বেঁচে থাকতে পারল, না এরূপ অবস্থায় তার পক্ষে বেঁচে থাকা কোনোক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে।

ইউরোপীয় চরিত্রের যে ইমারতটি কয়েক শতাব্দী কাল ধরে নির্মিতি হয়েছিল, তা মাত্র বিগত দুটি শতাব্দীতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

বর্তমানের নবতর জাহিলিয়াতের দুই চারটি সৌন্দর্য বা ভালো দিক তার জীবনের শেষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সহায়ক হয়ে আছে মাত্র... এই দু-চারটি সৌন্দর্যও ক্রমশঃ বিলীয়মান। নতুন বংশ পূর্বের বংশাবলীর তুলনায় অনেক বেশি বিপর্যস্ত। এ বংশের চারিত্রিক বন্ধনহীনতা অনেক বেশি উদারনৈতিক। তার অর্থ, বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যৎ অধিক ভয়াবহ হয়ে দেখা দেবে। নৈতিকতার গাড়ি অধঃপতনের নিম্নগামী সড়কে দ্রুতগতিতে রসাতলের দিকে চলে যাবে।

ইতিমধ্যেই তার লক্ষসমূহ প্রকটতর হয়ে উঠেছে... এখন যদি বলাও হয় যে, অমুক অমুক ব্যাপারের সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, তবু তাতে কোনো লাভ নেই।

রাজনীতি নৈতিকতাবিহীন হয়ে গেছে, অর্থনীতির কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট নেই নৈতিকতার সাথে। আর যৌনতা যে নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যাপার, তা আদৌ স্বীকৃতই হচ্ছে না। নৈতিকতার দেউলিয়াত্বের এ ছিল সূচনা কাল।

অতঃপর নৈতিকতার বাহনটি যে ক্রমাগতভাবে ও দ্রুততা সহকারে অধঃপতনের দিকে নেমে গেছে... তার পতনমুখী গতি যে তীব্র থেকেও তীব্রতর হচ্ছে, তাকে ঠেকাবার আর কেউ কোথাও নেই।

আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী হওয়া আধুনিক জাহিলিয়াতের চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাওয়ার এটাই হচ্ছে আসল কারণ।

মনুষ্যত্বের দেহ কাঠামোতে লেগে থাকা খুন অস্থিমজ্জা সবই খেয়ে ফেলেছে নীরবে, সকল লোক চক্ষুর অন্তরালে— বাইরে থেকে দেহকে সুস্থ-সবলই দেখাচ্ছিল, ভেতরে ঘুন ধরেছে, তা বোঝার কোনো উপায়ই ছিল না— গোটা দেহকে খেয়ে জীর্ণশীর্ণ করে দিয়েছে, এক ফোঁটা রক্তও অবশিষ্ট নেই। ফলে গোটা দেহই এখন ধুলিসাৎ হওয়ার উপক্রম।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জাহিলিয়াত বিশ্বজনতার মনে এই প্রত্যয় সঞ্চার করতে চায় যে, জাহিলিয়াতে সৌন্দর্য মাহাত্ম্যের কোনো শেষ নেই, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষয়... এক শ্রেণীর বোকা লোক বুঝে শুনে কিংবা না বুঝে শুনেই তা বিশ্বাসও করে যাচ্ছে।

যৌন সম্পর্কে বিপর্যয়

এ পর্যায়ে আমরা 'যৌন সম্পর্কে সৃষ্ট বিপর্যয়' সম্পর্কে নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। এখন আমরা 'যৌন সম্পর্কে বিপর্যয়' বিষয়ে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র ও মানুষের সামষ্টি জীবনে সৃষ্ট চরম গণ্ডগোলের দৃষ্টিতে আলোচনা করব। নৈতিকতার দৃষ্টিতে যৌন সম্পর্কে সৃষ্ট বিপর্যয় এতই প্রকট যে, সে বিষয়ে অধিক আরও কিছু আলোচনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।

বস্তুত যৌন সম্পর্কে সৃষ্ট বিপর্যয় যে প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতারই বিপর্যয়, এই তত্ত্ব গোপন রাখার জন্যে আধুনিক জাহিলিয়াত ফ্রয়েড, মার্কস ও দরখায়েম উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক (?) মতাদর্শ ও ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যাকে সামনে তুলে ধরেছে। লোকদেরকে এই ভুল বোঝাতে চেষ্টা চালিয়েছে যে, যৌনতা মূলত একটা জীবতাত্ত্বিক বা জৈবিক কার্যক্রম মাত্র। নৈতিকতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

সেই সাথে গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন ও সাংবাদিকতা প্রভৃতি সকল প্রচার মাধ্যমই একযোগে গোটা জীবনে যৌনতার কুৎসিৎ অশ্লীল চিত্র তুলে ধরেছিল এবং লোকদের মনে বদ্ধমূল করতে চেয়েছিল যে, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক একান্তভাবে স্বাভাবিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাতে কোনোরূপ বিকৃতি বা বিপর্যয়ের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এই ধরনের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও এই সত্য মধ্যাহ্নের সূর্যের মতোই দেদীপ্যামান হয়ে আছে যে, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা নৈতিক বিপর্যয়েরই ব্যাপার।

ইহুদী পণ্ডিতবর্গের প্রোটকলে লিখিত রয়েছে ঃ

সর্বত্র আমাদের নিজেদের কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈতিক চরিত্রে ব্যাপক ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ফ্রয়েড আমাদের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই যৌনতাকে সকলের সম্মুখে নিয়ে আসার কাজে প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে থাকবে। ফলে যুবকদের সম্মুখে 'পবিত্র জিনিস' বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং নিজেদের যৌন লালসা-কামনা চরিতার্থ করাই হবে তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় চিন্তা-ভাবনা। আর তার ফলেই চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাবে।

উক্ত প্রোটকল-এ একথাও বলা হয়েছে যে, আমরা ডারউইন, মার্কস্ ও নিটশের চিন্তাধারাকে ব্যাকপভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত করার কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাদের চিন্তাধারা অ-ইহুদী জনগণের চরিত্রকে যে মারাত্মকভাবে ধ্বংস করে, তা আমাদের কাছে দিবালোকের মতোই প্রকট।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকেও এই কথাই জানা যায় যে, যৌন বিপর্যয় মূলত নৈতিক চরিত্রেরই বিপর্যয় ও ধ্বংস।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিষয়ে আমরা এখানে মৌলিকভাবে আলোচনা করে এটা দেখাবার প্রয়োজন মনে করছি না যে, তা নৈতিক বিপর্যয়ের ব্যাপার। কেননা লোকেরা জাহিলী ধারণার বশবর্তী হয়ে নৈতিক চরিত্র ও জীবনের মাঝখানে পার্থক্যের দুর্লংঘ্য সুউচ্চ প্রাচীর দাঁড় করে দিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ দুটির মধ্যে আদৌ কোনো পার্থক্য নেই।

বস্তুত নৈতিক চরিত্র জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো জিনিস নয়। চরিত্র নয় এমন মতাদর্শমূলক মৌলনীতি, যা যত্র তত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাওয়া যেতে পারে। বাস্তব জীবনের আইন-কানুন ভিন্নতার জন্যে ভিন্নতর কোনো আইন নেই। জীবন সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ, সক্রিয় ও গতিবান হয়ে চলবে, সেই সাথে তাতে নৈতিক বিপর্যয়ও থাকবে, এটা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

সত্যিকথা, নৈতিক বিপর্যয় জীবনের বিপর্যয়েরই অনিবার্য ফলশ্রুতি, তা অবিচ্ছিন্নও। সেই সাথে জীবনের বিকৃতি ও বিপর্যয়ের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নৈতিক বিপর্যয়ের। মূলত দুটিই অভিন্ন ও এক। এক ও অভিন্ন আইনের অধীন এই দুটিই। মানুষের পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও মানবীয় প্রকৃতিই জীবন ও চরিত্র উভয়েরই উৎস।

এখানে আমরা যখন— লিঙ্গদ্বয়ের সম্পর্কে বিশৃঙ্খল পর্যায়ে— বাস্তব জীবনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে অধ্যয়ন করছি, তখন শেষ পর্যন্ত এই কথার তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করতে হবে যে, নৈতিকতার বিপর্যয় বলতে আসলে কি বোঝায় ?

মানব জীবনের অন্যান্য সব জিনিসের মতই দুই লিঙ্গের— নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কেও চরম বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে, যদিও তাতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে এবং খুবই ধীরে ও ক্রমিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছে।

মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপের খ্রিস্টীয় বিকৃতি ভাবধারাই বিজয়ী ও কর্তৃত্বশালী হয়েছিল। ইউরোপীয় গীর্জাসমূহেই জনগণের ওপর এই কর্তৃত্ব চালিয়েছে। সন্দেহ নেই, হযরত ঈসা (আ)-ও এক ধরনের বৈরাগ্যবাদের আহ্বান জানিয়েছেন। দৈহিক কামনা-বাসনা-লালসারও ঊর্ধ্বে ওঠার জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যদিও তা

সর্বকালেই নবীর ও প্রত্যেক দ্বীনের দাওয়াতের অংশ ছিল। কিন্তু হযরত ঈসার শিক্ষাসমূহে বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপন সংক্রান্ত হেদায়েত অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। কেননা খ্রিস্টধর্মকে তদানীন্তন ইহুদীদের নৈতিক দেউলিয়াত্ব থেকে দূরে রাখা ও রোমান জগতের বস্তুবাদী আল্লাহ্‌দ্রোহিতা ও সীমালংঘনকারী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হয়েছে। এই কারণে ইন্‌জীল গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

তোমাদের চোখ পাপ করলে সে চোখকে উপড়িয়ে ফেল। কেননা দেহের একটি অঙ্গ থেকে বঞ্চিত হওয়া গোটা দেহের জাহান্নামের ঈন্ধন হওয়া থেকে উত্তম।[১]

এ ধরণের কথার ভিত্তিতেই গীর্জাকেন্দ্রিক নৈতিকতা গড়ে উঠেছে এবং এরই ফলে বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। ফলকথা, বৈরাগ্যবাদ তাদের নিজেদের মনগড়াভাবে রচিত। কুরআন মজীদ এই কথাই বলেছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ -

আর বৈরাগ্যবাদ... তা ওরা নিজেরাই মনগড়াভাবে বানিয়ে নিয়েছে। আমরা তা কস্মিনকালেও তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেইনি। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

তদের সাধারণ ধারণা ছিল, যৌনতা স্বতঃই অপবিত্র ও মলিনতা মাত্র। আর মেয়েলোক একটা শয়তানী সৃষ্টি, অত্যন্ত পুঁতিগন্ধময়। তা থেকে দূরে সরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিয়ে জনগণের জন্যে একটি স্বাভাবিক ও পাশবিক প্রয়োজন মাত্র। কিন্তু অতীব পুণ্যময় ও সৌভাগ্যশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে বিয়ে করবে না এবং তার অনেক উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করবে।

মোটকথা, একদিকে রোমান সাম্রাজ্যে ব্যাপক বীভৎস চরিত্রতা ও নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা চলছিল, আর অপরদিকে ছিল বিশ্বব্যাপী বৈরাগ্যবাদ বন ও গ্রামীণ এলাকায়। শহর-নগরেও বিপর্যয় থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তা-ই আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

'উইরোপীয় চরিত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে ল্যকি বলেছেন ঃ

মধ্যযুগের লোক দুই প্রান্তিক সীমায় অবস্থান করছিল। একদিকে ছিল চরম বৈরাগ্যবাদ, আর অপরদিকে ছিল চরমবাদী পাপ নাফরমানীর কার্যকলাপ। যে জনবসতিতে বড় বড় বৈরাগ্যবাদী পরহিযগার, মুত্তাকী বিপুল সংখ্যক লোকের বসতি, তাতেই ছিল পাপ ও কুসংস্কারের ব্যাপক বিস্তৃতি। আর এই উভয় অবস্থাই মানবীয় মর্যাদার শত্রু।[২]

---

১. ইনজীল-মথি, ৫ অধ্যায়, ২৪ স্তোত্র।

২. 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারিয়েছে'ঃ লেখক আবুল হাসান আলী নদভী।

উক্ত লেখক বৈরাগ্যবাদের অধীন যৌনতার চিন্তা ও তার বিভিন্ন সম্পর্কের পরিবেশের প্রতি মানব মনে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের চিত্র এভাবে অংকিত করেছে ঃ

ওরা (সেখানকার পুরুষরা) স্ত্রীলোকের ছায়া থেকেও পালিয়ে বেড়াত। তাদের নিকটে যেতে ও তাদের সাথে একত্রিত হওয়াকেও তারা পাপ মনে করত। তারা এ বিশ্বাসও পোষণ করত যে, ওরা যদি মা, স্ত্রী ও বোনও হয় আর পথে-ঘাটে ওদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা ঘটে, তা হলে তাদের সব নেক আমল ও তাদের আত্মিক আধ্যাত্মিক উন্নতি বরবাদ হয়ে যাবে।

মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর 'পর্দা' নামক বইতে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের কিছু কিছু কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

ওদের প্রাথমিক ও মৌলিক মতাদর্শ এই ছিল যে, নারী হচ্ছে পাপের জননী ও খারাবির মৌল উৎস। সব কদর্যতার মূল। পুরুষের জন্যে গুনাহ্ নাফরমানীর উদ্বোধন ও জাহান্নামের দুয়ার। মানুষের সমস্ত দুঃখ বিপদের সূচনা তো নারী থেকেই হয়েছে। তার নারী হওয়াই তার লজ্জাজনক হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। তার রূপ ও সৌন্দর্যের জন্যে তার লজ্জিত হওয়া উচিত। কেননা সে তো শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তার তো উচিত চিরদিনের জন্যে স্থায়ীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকা। কেননা দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর ওপর সে-ই তো বিপদ টেনে এনেছে।

প্রাথমিক কালের প্রথম পর্যায়ে খ্রিস্টান পাদ্রী ও বড় নেতাদের মধ্যে একজন ছিল 'টরটুলীয়ান' (Tortulian)। সে নারী সম্পর্কে খ্রিস্টীয় ধারণা এ ভাষায় পেশ করেছেঃ

নারী হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে শয়তানের প্রবেশ লাভের প্রধান ফটক। সে-ই তো পুরুষকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কাছে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্র আইন লংঘনকারী তো সে। আল্লাহ্র প্রতিকৃতি অর্থাৎ পুরুষকে সেই তো বিকৃত করেছে।

খ্রিস্টধর্মের আর একজন বড় ওলী হচ্ছে ক্রাইসোস্টেম (Chrysostem)। সে নারী জাতি সম্পর্কে বলেছে ঃ

সে এক অনিবার্য পাপ। প্রকৃতিগতভাবেই শয়তানের প্ররোচনার এক আকর্ষণীয় মহাবিপদ। পরিবার ও ঘরের জন্যে আচ্ছন্ন হয়ে আসা বিপদের ঘনঘটা। এক মহাধ্বংসকারী প্রেয়সীয়তা। এক সুসজ্জিত মুসীবত।

নারীদের সম্পর্কে তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মতাদর্শের সারকথা হচ্ছে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক স্বতঃই ও মূলতই একটা মহা অপবিত্রতা। অতএব তা

পরিহার করা ও এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। তার সাথে সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে হোক কিংবা শরীয়তসম্মত রক্ত সম্পর্কের কারণে— সবদিক দিয়েই সে বর্জনীয়।[১]

এ সবই হচ্ছে বিকৃত ও বিপথগামী জাহিলিয়াত কর্তৃক উদ্ভাবিত ধারণা বা মত। তাদের ধর্ম এরূপ ধারণা তাদর দেয়নি, এরূপ মত পোষণের কোনো আদেশও করেনি। কোনো নবী-রাসূল এ ধরনের কথা বলতে পারেন না, এরূপ মত রাখার নির্দেশও দিতে পারেন না। আসলে তা চূড়ান্ত পরিণতিতে রুক্ষ্ম জাহিলি প্রতিক্রিয়া মাত্র।

এ প্রতিক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে প্রকাশমান হওয়ার মূলে নানা কারণ রয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার একটি কারণ হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের বিকৃতি ও বিপর্যয়। গীর্জার লোকেরা নিজেরাই তার শিকার হয়েছিল। সেই যৌন বিকৃতিও একটা কারণ, যা পাদ্রী পুরুষ ও পাদ্রী মেয়েদের গ্রাস করে ফেলেছিল। গীর্জার ইমারতটাই তার দরুন কম্পমান হয়ে উঠেছিল। আর বৈরাগ্যবাদের সমস্ত মূল্যমান ধূলায় মিশে গিয়েছিল। লোকেরা যখন এই অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিম পবিত্রতা দেখতে পেল, তখন তারাও যৌন লালসা চরিতার্থ করার নানা উপায় সন্ধান ও অবলম্বন করতে শুরু করেছিল।

মানুষকে পশু বা জন্তু বলে ব্যাখ্যা করার পরিণতি এটা। আর ফ্রয়েড কর্মের যৌন ব্যাখ্যা দিয়ে তারই সমর্থন যুগিয়েছে। আর এই ব্যাখ্যাই সহসা গোটা মানব জীবনকে চরম বিকৃতি ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিল।

শিল্প-বিপ্লবও ছিল এই জাহিলি প্রতিক্রিয়ার একটা মৌলিক কারণ। তাই পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নব্য যুবকদেরকে গ্রাম এলাকা থেকে শহর-অঞ্চলে এনে ফেলেছিল। এখানে নৈতিক বন্ধন ছিল সম্পূর্ণ শিথিল। এ যুবকরা তথায় পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি স্থাপন ও রক্ষা করতে পারার মত আয় করতেও পারেনি। এই কারণে তারা তা বাদ দিয়ে সস্তা ও সহজ উপায়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করার চরিত্র বিধ্বংসী পথ অবলম্বন করল।

আর ঠিক এই সময়ই মেয়েদেরকেও কর্মক্ষেত্রে হাযির করা হলো এবং একমুঠি খাবারের বিনিময়ে নৈতিক চরিত্রহীনতার কাজ করতে তাদের বাধ্য করা হলো।

সাথে সাথে নারীদের সাম্যের মন্ত্রেও দীক্ষিত করা হয়েছিল। নির্লজ্জতা ও পাপাচারও এই সাম্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এসব কারণ মানবজীবনকে এক সর্বাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিতে শুরু করেছিল। ঠিক এই সময়ই বিশ্ব ইহুদীবাদ এই জীবনধারাকে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার কাজে প্রয়োগ করল। মার্কস, ফ্রয়েড ও দরখায়েম নৈতিক-চরিত্রকে

১. পর্দাঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে করে চরমভাবে লাঞ্ছিত করল। নারীদের আহ্বান জানাল যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলতে। তাদের বোঝাল, তারা এ কাজ করলেই পুরুষের পাশে থাকতে পারবে সমান অধিকার নিয়ে।

এসবই ছিল চরম বিপর্যয়ের দিকে অত্যন্ত শক্ত রূঢ় ধাক্কা। এসবই বিশ্ব ইহুদীবাদ কর্তৃক উদ্ভাবিত। তা মতাদর্শের জগতে হোক, কি হোক বাস্তব জগতে — এই কারণেই মার্ক্স, ফ্রয়েড ও দরখায়েম প্রমুখ বিজ্ঞানী-দার্শনিক বলে খ্যাতি অর্জনকারী ব্যক্তি-চরিত্রের গোটা ব্যাপারটাকে লজ্জাষ্করভাবে অপমানিত করেছে, তাকে করেছে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ। আর সেই সাথে নারীদেরকে আহ্বান জানিয়েছে তারা যেন চারদিক থেকে ও সকল পথে বেরিয়ে এসে যৌন কাজে-কর্মে বেশি বেশি অংশ গ্রহণ করে। তাহলেই তারা খুব সহজেই পুরুষদের নিকটবর্তী ও সমমর্যাদার হয়ে যেতে পারবে।

অতঃপর সিনেমা আবিষ্কৃত হয়। মূলত তাও একটি ইহুদী শিল্প। তারই উত্তরসূরি হচ্ছে রেডিও, টেলিভিশন। এসব কয়টিই মানুষের নৈতিক বাঁধনকে ঢিলা করে দেয় এবং বেশি বেশি যৌন স্বাদ আস্বাদনের জন্যে মানুষকে পাগল বানায়।

সাজঘর, রূপচর্চার কেন্দ্র এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সামাজিক-সামষ্টিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহও ইহুদীদেরই উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত। আর এসব ক্ষেত্রে চলে যৌন আস্বাদন ও ব্যভিচারের বীভৎস লীলাখেলা।

হ্যাঁ, ইহুদীরা উপরোক্ত অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যমসমূহ তাদের চরিত্র-বিধ্বংসী মতবাদ চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রচার কাজে পুরামাত্রায় ব্যবহার করেছে। তারাই ছিল এসবের একমাত্র কর্তৃত্বশালী। সেই সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা— যা একান্তই ইহুদী উদ্ভাবিত— তারাই চালু করেছিল, তা যুবকদিগকে তাদের যৌবনের স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী সৎভাবে বিয়ে করার ও সংসার পরিচালনা করার কোনো সুযোগই দিচ্ছিল না। বরং অবিবাহিত যুবকদিগকে সর্বপ্রকারের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও পাপ পথে আকৃষ্ট করছিল। সে সমাজে যৌন-স্বাদ আস্বাদনের জন্যে নারী লাভ ছিল অত্যন্ত সহজসাধ্য। মেয়েরা তো কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের পাশেই অবস্থান নিয়েছিল এবং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছিল।

সাথে সাথে সাংবাদিকতা, রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশন মেয়েদেরকে হাস্য-লাস্য-নৃত্য, মান-অভিমান ও অনুরাগ-বিরাগের সকল পন্থা ও প্রক্রিয়া শিখিয়ে যুবকদের যৌনতার আকর্ষণে আকৃষ্ট করার যোগ্য বানিয়ে দিচ্ছিল।

সরকারী ও বেসরকারীভাবে দেহ ব্যবসায়ের বড় বড় আড্ডা গড়ে উঠছিল। চিত্ত বিনোদনের ও নারী-পুরুষের মিলন কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সেসব স্থানে দালালরা কু-কর্মের জন্যে লোক সংগ্রহ করত।

এসব পাপাচার ব্যাপকভাবে প্রসারিত হওয়ার পর লোকদের মনে এই চিন্তা জাগিয়ে দেওয়া হলো যে, কেবলমাত্র ভোগ-সম্ভোগ ও স্বাদ-আস্বাদনকেই বলা হয় জীবন। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজে পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ভোগ-সম্ভোগে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু মানুষের এই জীবন, ফিরিয়ে পাওয়া না-পাওয়ার এক মহামূল্য সম্পদ। কাজেই তাকে যত বেশি ভোগপূর্ণ করা সম্ভব কারুর পক্ষে, তা তার অবশ্যই করা উচিত। এক্ষেত্রে কোনো বাধা-নিষেধের কাছে পরাজয় বরণ করা উচিত হতে পারে না।

আসলে এই সবকিছুই বিকৃত-বিপর্যস্ত জাহিলিয়াতেরই কারসাজি। আর আধুনিক জাহিলিয়াত তারই ফসল। ফলে গোটা সমাজ নানাভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ল। সমাজের কঠিনতম বন্ধনসমূহও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর তথায় চরম মাত্রার উচ্ছৃঙ্খলা ও চারিত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাকে প্রতিরোধ করার কোথাও কিছু থাকল না।

নারী হলো এই সমাজে মুক্ত বিহঙ্গ। অন্যান্য মানুষও ধর্ম-নৈতিকতা ও চারিত্রিক ঐতিহ্যের বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে গেল। বন্ধনমুক্ত যৌন স্বাদ আস্বাদই তাদের স্বীকৃত ধর্ম হয়ে দাঁড়াল। রাষ্ট্র সরকার সেজন্যে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যেতে লাগল। সর্বপ্রকারের প্রচার-যন্ত্র ও মাধ্যমসমূহ ব্যাপকভাবে এই সব বিষয়েরই প্রচারণা চালাতে পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে গেল।

ড্রল ডিউরাস্ট তার 'দর্শনের বৈচিত্র্য' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

> আমরা আবার ঠিক সেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছি, যার সম্মুখীন হয়েছিল সক্রেটিস। আসমানী কড়া শাসনের যোগ্য স্বভাবগত চরিত্র আমরা কোথায় পাব। তার প্রভাব বর্তমানে মানুষের জীবন থেকে বিলীন হয়ে গেছে। আর নৈতিক বিকৃতি, অধঃপতন বিপর্যয় আমাদের সামাজিক সামষ্টিক মূলধনকে ধ্বংস করে যাচ্ছে। (প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬)
>
> জন্ম নিয়ন্ত্রণের ঔষধ ও প্রক্রিয়াসমূহও আমাদের নৈতিক বিপর্যয়ের একটা বড় কারণ। অতীতে নৈতিক বিধান যৌন সম্পর্ককে বিবাহের শর্তাধীন করে দিয়েছিল। কেননা বিবাহই হচ্ছে সম্ভাব্য একমাত্র উপায়, যার দরুন পিতাকে তার সন্তানের জন্যে দায়ী বানানো যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে যৌন সম্পর্ক ও বংশ বিস্তারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এরই ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সকল সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়ে যেতে শুরু করেছে। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০)

নাগরিক জীবন বিয়ে-শাদীর পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়ে দিয়ে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অসংখ্য উপায় ও পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তখন যৌন বয়ঃপ্রাপ্ততাও ছিল বিলম্বিতা। সামন্তবাদী অর্থ ব্যবস্থায় যৌন-লালসা দমন

করা যুক্তিসম্মত ব্যাপার মনে হতো। কিন্তু এক্ষণে শিল্পভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় তা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা শিল্প ব্যবস্থা লোকদিগকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করার সুযোগ হতে দেয় না। ফলে লোকদের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা জাগে, কিন্তু আত্মসংযমের যোগ্যতা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এখন অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সতীত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা একটা ঠাট্টা ও বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। লজ্জা-শরমের নামচিহ্ন কোথাও থাকল না। পুরুষরা নিজেদের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে গৌরব বোধ করত। নারীকুল নির্লজ্জতায় পুরুষের সমকক্ষতার দাবি করছিল। বিয়ের পূর্বেই যৌন সঙ্গম একটি সর্বজনজ্ঞান রীতি হয়ে দাঁড়াল।

> এতদিন সামন্তবাদী ব্যবস্থার নৈতিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। একালের শিল্পস্তরে এ নৈতিকতার কোনোই মূল্য নেই।[১] (পৃ.১২৬-১২৭)

বিবাহিত জীবনের এই বিলম্বের দরুন সমাজের ক্ষেত্রে কি কি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তা অনুমান করা কঠিন। তবে বিবাহিত জীবনের অস্বাভাবিক বিলম্ব সামাজিক বিপর্যয়ের মূলগত ও অধিক গুরুতর কারণ, সন্দেহ নেই। তাছাড়া বিবাহিত জীবনের পরবর্তীকালে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও বাধা-বন্ধনহীনতা বিবাহের পূর্বেই এই অভ্যাস হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা এই চাকচিক্যময় শিল্প যুগে কখনও কখনও জীবন ও সামাজিকতার কারণের সন্ধান করি এবং কখনও এই চিন্তা করে পড়ে থাকি যে, এটা এমন একটা জগৎ, যেখান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনোই উপায় নেই। আধুনিক কালের সমস্ত চিন্তাবিদও এই মতোই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমেরিকার অর্ধমিলিয়ন মেয়ে নিজেদেরকে চরম যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার ও বন্ধনহীনতায় উৎসর্গ করে দিয়েছে। ক্লাব ও যৌন বই পত্র দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত লোকদিকে যৌন উত্তেজনায় অন্ধ বানিয়ে দেবার কাজে সতত নিয়োজিত। সেই সাথে শিল্প যুগের আইনহীনতার শিকারও তারাই হয়েছে।

ছবির অপর দিকটিও কম দুঃখজনক নয়। কেননা যারই বিবাহিত জীবন গ্রহণে বিলম্ব হবে, সেই বাজারের মেয়েদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। আর এই সময়ে নিজে দের যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যে সাজসজ্জার নিত্য নতুন সরঞ্জাম শিক্ষা

---

১. এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার আলোকে। অর্থনৈতিক বিপ্লবকে তিনি নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন অথচ এই মূল সত্যতার দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে যে, যে সমাজতন্ত্র লোকদের জীবিকাদানকারী এবং যা মানুষকে পুঁজিবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছে, তা যুবকদেরকে যথাসময় বিয়ে করার দিকে উদ্বুদ্ধ করেনি। অথচ ওর দাবি হল তা মানুষের স্কন্ধ থেকে অর্থনৈতিক বোঝা তুলে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা অর্থনৈতিক বিপ্লব নয়, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে চিরদিনের জন্যে ধ্বংস করার একটা ষড়যন্ত্র মাত্র।

প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সুসংগঠিতভাবে পাওয়া শুরু হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে, যৌন আগ্রহ সৃষ্টি ও তাকে চরিতার্থ করার কাজে সাহায্যকারী উপায় ও পন্থা হিসেবে যা কিছু সম্ভব, মানুষের সাধ্যানুযায়ী তা সবই উদ্ভাবিত হয়েছে। (পৃ. ১২৭-১২৮)

স্পষ্ট ধারণা করা যাচ্ছে, ধর্মবিশ্বাসের ওপর ডারউইনের আক্রমণমূলক চিন্তাধারার কারণেই যৌন স্বাদ আস্বাদনের প্রবণতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। যুবকরা যখন দেখল যে, ধর্ম তাদের যৌন স্বাদ আস্বাদন প্রবণতার বিরোধী, তখন তারা ধর্মকেও অকেজো ও হীন-নগণ্য প্রমাণ করার শত-সহস্র কার্যকারণ সন্ধান করে নিল। (পৃ. ১৩৪)

কেননা বর্তমান যুগে বিবাহ তার যথার্থ বিশেষত্বসহ বেঁচে নেই। তা এখন নিছক একটা যৌন সম্পর্ক মাত্র হয়ে রয়েছে। এই কারণে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তিই ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে; এক্ষণে পারিবারিক ও বিবাহিত জীবনে জীবনের লক্ষণসমূহ নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের অপরিচিতি ও দূরত্ব লালিত-পালিত হয়ে উঠছে। বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটছে। পুরুষের স্বভাবগত লালসা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কেননা তা চরিতার্থ করতে তার স্ত্রী অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। (পৃ. ২২৫)

আসুন একালের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের কাছে আমাদের কার্যকলাপের ফলাফলটা জিজ্ঞেস করলে কি জবাব পাওয়া যায়, তা আবার দেখি। একথা তো স্পষ্ট যে, তা নিশ্চয়ই আমাদের মনোবাঞ্ছা অনুরূপ হবে না। কেননা আমরা তো বিচিত্র ধরনের পরিবর্তন ও রদবদলের শিকার, তার পরিণতি নিশ্চিত ও অপরিহার্য।

অভ্যাস, প্রচলন ও বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার এই সীমাহীন বন্যা প্রবাহের পরিণতি কি আর হতে পারে, যখন পারিবারিক জীবন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। একজন স্ত্রী গ্রহণের রীতি সকল গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তখন তো যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে বংশধারা রক্ষার লক্ষ্য চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হয়ে পড়বে। যদিও এই ধরনের স্বাধীনমুক্ত সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি বেশির ভাগ পুরুষই করবে, তবু নারীরা নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের পরিবর্তে সেই পদ্ধতিকে এক মহা সুযোগ মনে করে দুই হাতে আঁকড়ে ধরবে ও বুকে জড়িয়ে রাখবে।

দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। নারী ও পুরুষ বিয়ের পূর্বেই যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। তালাকের ব্যাপকতা দেখা দেবে।

অতঃপর বিবাহ-ব্যবস্থাকে পুনরায় গড়ে তোলা হবে, যাতে থাকে অনেক বেশি সহজতা ও সুযোগ-সুবিধা। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হবে। সন্তান লাল-পালনের জন্যে ঘরের পরিবেশের পরিবর্তে সরকার চালিত শিশু পালন কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। (পৃ. ২৩৫-২৩৬)

এ সব উদ্ধৃতি পাশ্চাত্যের একজন গ্রন্থকারের বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অংকিত ঘৃণ্যতম চিত্র সম্মুখে প্রকট হয়ে ওঠার পর আর কি বলার থাকতে পারে ?

গ্রন্থকার যে সব দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করেছেন, তা সেগুলোই, যা বাস্তবিকপক্ষেই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে মানুষের মন ও সমাজের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। আধুনিক জাহিলিয়াত সম্পর্কে চক্ষু উন্মীলিত করার জন্যে তা-ই যথেষ্ট। এ সব দোষ গোটা মানবতাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে এনে উপস্থিত করে দিয়েছে। কেবল নৈতিক চরিত্রই নয়, মানবীয় মন ও সমাজের কোনো একটি দিকও চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়নি। লেখক এই বইখানি ১৯২৯ সনে লিখেছিলেন। আর আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের (শেষ প্রান্তে) পৌঁছে গেছি। এ হচ্ছে মহাজাহিলিয়াতের শতাব্দী। আমরা লক্ষ্য করছি, গ্রন্থকার যা কিছু বলেছেন, এতদিনে তা সবই সংঘটিত হয়ে গেছে, পৃথিবীর সকল দেশে তা ছড়িয়ে পড়েছে। জাহিলিয়াত নিজেও যদি তা খতম করতে চায়, তবু তা খতম করার কোনো সাধ্য তার নেই। কেননা লাগাম তার হাত থেকে ছুটে গেছে। এই ব্যাপক বিপর্যয়ের ওপর তার কর্তৃত্বও এখন নেই।

কিন্তু উপরোদ্ধৃত উদ্ধৃতিসমূহ বিপর্যয়ের সর্ব ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করেনি কিংবা তাতে তার বিস্তৃত রূপও বিধৃত নয়। এই বিষয়ে এ গ্রন্থকার 'বস্তুবাদ ও ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছ 'যৌন সমস্যা' শীর্ষক অধ্যায়ে। আলোচ্য বিষয়ের আমি অপর এক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি 'বির্তন ও স্থিতি' নামের গ্রন্থে। কাজেই এখানে সেসব পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। এখানে এই পাগলা জাহিলিয়াতের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র অংকিত করাই যথেষ্ট হবে। জাহিলিয়াত যখন যৌন-সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতে মানুষের সম্পর্ক 'মনুষ্যত্ব' থেকে ছিন্ন করে পশুত্ব বা পাশবিকতার সাথে যুক্ত করে দিয়েছে, তখন তার পরিণতি কতটা সাংঘাতিক হতে পারে, তা এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রকট হয়ে উঠবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানবীয় প্রকৃতিকে একটি মানদণ্ড ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সমন্বিত সত্তা করে সৃষ্টি করেছেন। তা জীবনীশক্তিকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি তার পরিমাণও সুনির্দিষ্ট করে। তাই যখনই তার মানদণ্ডত্ব শেষ হয়ে যাবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে তার নিয়ম-শৃঙ্খলা, তখন তা আর কল্যাণময় থাকবে না, মানুষ নিজে বা তার সমাজ তা থেকে একবিন্দু কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। যে সৌভাগ্য অর্জন তাদের লক্ষ্য, তা পাওয়া থেকেও তাদের বঞ্চিতই থাকতে হবে।

প্রকৃতির বিরোধিতা করেও কোনো লাভ হবে না। কেননা সকল বাতিল দলীলের ওপর প্রকৃতি দলীলই বিজয়ী হয়ে থাকে। তা রোধ করার সাধ্য কারোরই নেই। এখানে ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার কোনো যুক্তি চলতে পারবে না।

পূর্ববর্তী ভয়াবহ জাহিলিয়াতের বন্ধন থেকে মানুষ যখন মুক্তি পেল ও নফসের কামনা-লালসার সামগ্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, থাকল না কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা, তখন বাস্তব ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল ?... এক্ষণে এই বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা করতে হচ্ছে।

...যৌন লালসা চরিতার্থ করে লোকেরা কি পরম পরিতৃপ্তি লাভে ধন্য হয়েছে? স্বাধীনতা ও বন্ধনমুক্তি আন্দোলনের নেতারা বলত, যে কোনো প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও বিধি-নিষেধই মানুষের মনে সেই প্রচণ্ড যৌন-লালসা ও ক্ষুধা জাগিয়ে দেয়, যা কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না। তখন মানুষ স্থায়ীভাবে যৌন কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়, যার দুরুন স্নায়ুমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, সমস্ত শক্তি-ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, যুক্তিসঙ্গত সীমালংঘন করে বেশি দিন যৌন পরিতৃপ্তি থেকে বিরত থাকলে সে অবস্থার সৃষ্টি হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তার স্বভাবসম্মত কোনো কারণ নেই। কিন্তু এর বিপরীত সীমা ও বাধা-বন্ধনহীন যৌন লালসা চরিতার্থ করার পরিণতি কি হতে পারে।

সকলেরই জানা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সর্বত্র যৌন সামগ্রীকে সর্বসাধারণের জন্যে সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। সরকার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না কিংবা নানাভাবে সেকাজকে অধিকতর উৎসাহিত করে যাচ্ছে। এই বিধি-নিষেধ, ভয়-ভীতি ও শাস্তি-দণ্ড বিমুক্ত যৌন স্বাদ আস্বাধনের সুযোগ কি এ ব্যাপারে মানুষকে কিছুমাত্র পরিতৃপ্ত করেছে ?

নিরংকুশ পরিতৃপ্তি পেয়েও যৌন-ক্ষুধা কি তার তীব্রতা কমাতে পেরেছে এক বিন্দু ?

এ কালের লোকেরাই বা কেন যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারাদি নিয়ে এত জটিল সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে ?

চারদিকে কত ফিল্ম, কত বই-পত্র... কত গল্প-উপন্যাস... কত নগ্ন নির্লজ্জ ছবি ও চিত্র, রেডিও-টেলিভিশনে যৌন লালসাপংকিল কত অনুষ্ঠান, ... কত গান, কত বাজনা ও বাদ্য, ...নগ্নদের কত সভা-সমাবেশ, কত অর্ধনগ্ন বা প্রায় নগ্ন নারী-পুরুষের মিলিত নৃত্য সমাবেশ... উভয় লিঙ্গের মিলিত যৌবন জোয়ারের কত না প্রবাহ ......

আর এ সব ক্ষেত্রে কত শত-সহস্রবার যৌন সঙ্গম ও মিলন সংঘটিত হচ্ছে, অবাধে ও অতীব সহজে ....

কিন্তু দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা যৌন-লালসার এ আগুন কেন নিভছে না ?

না, না, আমরা চরিত্রের প্রশ্ন তুলছি না! আমরা মানসিক শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতির কথাই বলছি, যা প্রতিটি মানব মনের প্রচুরভাবে থাকা একান্তই অপরিহার্য। কেননা মানুষকে তো এই দুনিয়ায় এক বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হবে, সে দায়িত্ব জন্তু-জানোয়ারের জন্যে নয়। মানুষ তো ভিন্নতর, তার দায়িত্বও স্বতন্ত্র প্রকৃতির! আমরা অবশ্য মানবীয় মূল্যমানের কথা বলছি। কেননা তা-ই তো মানুষের অন্তরকে গঠন করে। সুউচ্চ সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তা হচ্ছে অপরিহার্য জীবন মান। তা মানুষকে সার্বিকভাবে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নেয়।

এ হেন পাশবিক যৌন ক্ষুধা পরিতৃপ্তি লাভের সর্বপ্রকারের সুযোগ সুবিধা পেয়েও যে পরিতৃপ্ত হচ্ছে না, তার পরিণতি কি হতে পারে ?

বর্তমানে মানুষের মনে এক স্থায়ী অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা বাসা বেধেঁছে। স্নায়ুবিক চাপ মানুষকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে, এ যে চরম মাত্রার পাগলামী। এ যে ধ্বংস .... আত্মহত্যা ... যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও বাধা-বন্ধনহীনতার এক বিশেষ অবদান, বিশ্বমানবতা আজ পর্যন্ত তার এই ফলই তো পেয়েছে;... নয় কি ?

হ্যাঁ, পারিবারিক জীবনের প্রশ্ন উঠেছে।

সীমা ও বাধাবন্ধন মুক্ত যৌন লালসা প্ররিতৃপ্তির এই নিরংকুশ প্রবাহ থেকে পরিবার কি লাভ করেছে ?

না, পরিবারিক জীবনে কোনো শান্তি নেই, নেই কোনো স্বস্তি স্থিতি, স্বামীতে-স্ত্রীতে নেই সত্যিকার কোনো সম্পর্কের বন্ধন, নেই পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা। কেননা যে কচি শিশু সন্তান এই বন্ধনকে অত্যন্ত গভীর ও হৃদয়াসীন বানিয়ে দেয়, সেই শিশুই তো এখন অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় সে বন্ধন কি করে সুদৃঢ় হতে পারে, হৃদয়ের সাথে সে সম্পর্ক কি করে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে ?

এক্ষণে তো পারিবারিক জীবনটা ঠিক পশুকুলের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন অনেক পশুও তো রয়েছে, যারা উভয় মিলে একত্রে বসবাস করে জীবন কাল ব্যাপী। কিন্তু মানুষ তা থেকেও আজ নির্মমভাবে বঞ্চিত।

কিন্তু কেন ? ওয়াল ডেভরাস্টের মতে তার কারণ হচ্ছে নারী-পুরুষের এই অবাধ যৌন চর্চা।

একালের যুবক-যুবতীরা নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে, ঘরে বাইরে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে, পথে-ঘাটে, রাজপথে, পাঠাগার-লাইব্রেরী ও ক্লাস কক্ষে, শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে, বনে-জঙ্গলে ও সমুদ্রতীরে সাময়িক বা স্থায়ী ক্যাম্পসমূহে রাত ও দিনে যুবক-যুবতীরা অবাধ মেলা-মেশার বিপুল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে।

অবশ্য তার স্বপক্ষে যুক্তি স্বরূপ বলা হয়, এসব মিলনকেন্দ্র জরুরী হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্যে। এখানেই প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এমন কি যুবক-যুবতীরা পরস্পরের সাথে যৌন মিলন ঘটিয়ে মেজাজ প্রকৃতি ও যৌন ক্ষমতার সামঞ্জস্যও খুঁজে নিতে পারছে। এরূপ অভিজ্ঞতা ভিন্ন মিলিত দাম্পত্য জীবন শুরু করা হলে নাকি অনভিজ্ঞতার দরুন তা ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু পরে এ লক্ষ্য আর সম্মুখে থাকে না। তখন উপলক্ষটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। শুধু অভিজ্ঞতাই অর্জিত হয়। আর সেই উপলক্ষই চরম লক্ষ্যে পরিণত হয়। তখন এ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে কেবল একজন হলেই চলে না, বহুজনের সাথে মিলিত হয়েই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। শেষ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতা অর্জনই অভ্যাসে পরিণত হয়। বিয়ের স্থায়ী বন্ধন কারুর সাথে কখনোই গড়ে ওঠে না।

হ্যাঁ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে নিজের জীবনসঙ্গী সংগ্রহ করে নেওয়া হয়ত যুবক-যুবতীর পক্ষে সম্ভবপর হয়। পরস্পরের মিলিত হয়ে ঘর বাঁধে খুব কচিৎ সংখ্যক নারী-পুরুষ। কিন্তু সে ঘরের আয়ু বড় জোর কয়েক মাস। কিংবা কতিপয় বছরেই শেষ হয়ে যায়।

অতঃপর সে সম্পর্কের অবসান ঘটে। কেননা সেটা তো মানবীয় সম্পর্ক নয়, যা স্থায়িত্ব পেতে পারে। এ হচ্ছে নিছক পাশবিক যৌন সম্পর্ক মাত্র। এ হচ্ছে যৌন উত্তেজনায় উত্তেজিত ও উত্তপ্ত দুটি দেহের মিলন ঘটিত সম্পর্ক। এই যৌন সম্পর্কই ছিল বন্ধুত্বের ভিত্তি। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে যদি পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্মে তবেই তাদের অনুভূতির ওপর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তা তো এখানে হতে পারছে না।

এরূপ অবস্থায় বিবাহ একটা বন্ধন বা জেলখানার রূপ পরিগ্রহ করে, সেখানে গতিশীলতা বলতে— জীবনের স্পন্দন বলতে কিছুই থাকে না।

এই পুরুষ ও নারী স্বামীত্ব-স্ত্রীত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সেই প্রাথমিক বন্ধুতে ফিরে যায়। তখন কেউ কারোর স্বামী নয়, কেউ স্ত্রী নয় কারুর, দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব, তার একজন পুরুষ, আর অপরজন স্ত্রী। এ-ই তাদের চূড়ান্ত পরিচয়। নারী তো নিজের হাস্যে-লাস্যে চিরদিন ভরপুর হয়ে থাকে। পুরুষও থাকে সব সময় নারীদের জন্যে আকর্ষণীয় হয়ে। তখন নুতন করে 'বন্ধুত্বের' সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কও ঠিক ততদিনই স্থায়ী হয়, যতদিন তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক রক্ষার ক্ষমতা স্থায়ী থাকে।

এ ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সরূপ বদলে গিয়ে বন্ধু ও বান্ধবীতে পরিণত হয়। তখন তারা স্বামী-স্ত্রী নয়, প্রেমিক-প্রেমিকা মাত্র।......অথবা এক সময় দুজন এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যে, পারস্পরিক পরিচিতিরও কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

আমেরিকায় এই কলংকময় যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, সরকারী আইনের সাহায্যও তার অনুকূলে রয়েছে বলে তা যেমন অবাধ, তেমনি নির্ভীক, সকল প্রচার-মাধ্যমের উপায়-উপকরণ লোকদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ও সেজন্যে একান্তভাবে নিয়োজিত হয়েছে। এটিকে রীতিমত একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনে পরিণত করা হয়েছে। লেখকগণ তাদের প্রকাশ ক্ষমতা ও বর্ণনা বিশ্লেষণের প্রতিভা এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছে পুরামাত্রায়। ফলে এখানে ব্যাপকভাবে তালাক সংঘটিত হচ্ছে। আমেরিকান ক্যাথলিক রাজ্যসমূহে তালাক নিষিদ্ধ হলেও অ-ক্যাথলিক রাজ্যসমূহে প্রত্যেক একশত দম্পতির মধ্যে চল্লিশটিতেই তালাক সংঘটিত হচ্ছে। এই হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তার অর্থ কি দাঁড়ায় ? ....দাম্পত্য জীবন সেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাই নয় কি ?

আর এই তালাক সংঘটিত দম্পতির সন্তানদের অবস্থা কি ? অত্যন্ত মর্মান্তিক; এই সন্তানরা হয় হতচ্ছাড়া। তারা তাদের স্বাভাবিক লালনকেন্দ্র থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে যে, পারিবারিক বন্ধন বা পিতামাতার স্নেহের সম্পর্ক বলতে কোথাও কিছু পায় না। সবকিছু থেকেই তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে চিরদিনের জন্যে। তখন এসব আশ্রয়হীন সন্তানদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে কি ব্যবস্থা হতে পারে, কোথায় সেই সামাজিক নিরাপত্তা ? ...কোথায় মানসিক শান্তি ও স্বস্তি ?

এসব ছাড়াও সন্তানরা আর এক কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। আর তা হচ্ছে, এসব ছেলেমেয়ে যেহেতু সীমালংঘনমূলক যৌন উত্তেজনাপূর্ণ পংকিল সমাজ পরিবেশে পড়ে যায়, এই কারণে তাদের মধ্যেও তাদের প্রকৃত যৌবনের উন্মেষের পূর্বেই তারা যৌনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তাদের ঘর বাঁধার সামর্থ্যও হয় না, হয় না পারিবারিক জীবন যাপনের কোনো অভিজ্ঞতা। স্থায়ী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা তাদের পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হয় না। তারা পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যৌন সংস্পর্শে এসে নিতান্তই পাপ পংকিল জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা রোধ করতে পারে এমন নিয়ম-কানুন বা আইন-শাসনও কোথাও নেই। ... ... শেষ পর্যন্ত তারা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়।

এই ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা সেই সব দেশেই প্রবল আকার ধারণ করেছে, যেসব দেশে যৌন সম্পর্ককে বাধা বন্ধনমুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই পর্যন্ত

যে মারাত্মক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমেরিকার যৌন জীবন সম্পর্কে 'কান্‌রী'-র ভাষণ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। কিন্তু তাতে শুধু পরিসংখ্যানেরই উল্লেখ হয়েছে। এ অবস্থায় প্রকৃত কারণ কি, তা যেমন তাতে উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি অবস্থার প্রতিকারের উপায় বা পন্থাও বলা হয়নি।

যেসব দেশে যৌন মিলনকে সর্বপ্রকার বাধা বন্ধনমুক্ত ও উদার করে দেওয়া হয়েছে এবং তা সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে পড়েছে, যে সমাজে মেয়েরা পুরাপুরিভাবে নগ্ন হয়ে ঘরে ও সমাজে পূর্ণ যৌনতার প্রতীক হয়ে বসেছে, সেই সব সমাজের বিস্তারিত কলম-চিত্র আমার লিখিত অন্যান্য গ্রন্থাদিতে অংকিত করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ না করে একটি মহাসত্য উদ্ভাসিত করে তুলতে চাই।

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা এবং আধুনিক জাহিলিয়াত উদ্ভাবিত যৌন উদারতার সাথে সেই সত্যের সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পরিসংখ্যানের আলোকে সে সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

এই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা উদারতার সৃষ্টি নৈতিক পতনের দরুনই বর্তমানে বিশ্ব জাতিসমূহ অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে টিকে থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক্ষণে নৈতিক বিপর্যয় সরকারের প্রশাসন যন্ত্রকে প্রভাবিত করেছে। অবস্থার পতন এতদূর হয়েছে যে, শুধু যৌন স্বাদ আস্বাদনের লোভে পড়ে রাষ্ট্রের সামরিক গোপন তথ্য শত্রু পক্ষের গোয়েন্দাদের কাছে বিক্রয় করে দিতেও কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করা হচ্ছে না। ইংল্যাণ্ডের প্রফোমো ও আমেরিকার রাজনৈতিক কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গের চারিত্রিক ভূমিকা বিশ্ব সমক্ষে প্রতিভাত।

একালে আমেরিকা ও রাশিয়া দুটি প্রধান পরাশক্তি। কোনো একটিও নিজ নিজ দেশের যুবকদের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে তাদের ওপর একবিন্দু আস্থা রাখতে পারেনি। ভবিষ্যতে নিজেদের দেশকেও যে তারা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে, তার ওপর একবিন্দু বিশ্বাস স্থাপন করা যাচ্ছে না।

এ হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ ...... প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ।

এটা সংকীর্ণ অর্থে নিছক চারিত্রিক সমস্যাই নয়। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে গোটা মানবতার ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বন্ধনহীনতা যৌন উদারতাই সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে টুকরা টুকরা করেছে, ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে। মানুষকে বানিয়ে দিয়েছে একেবারে

পশু! পশুদের মধ্যে যেমন যৌনতার ব্যাপারে কোনো নিয়ম-নীতির বাধা নেই, এদের সমাজেও আজ অনুরূপ অবস্থা ... ... হয়ত বা তার চাইতেও মারাত্মক।

আমার লিখিত 'বিবর্তন ও স্থিতি' নামের গ্রন্থে আমি বলেছি, এই যৌন বাধা-বন্ধনহীনতা ও তার নিশ্চিত অনিবার্য পরিণতি কেবলমাত্র বর্তমান জাহিলিয়াতেরই কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়। পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত যখন যেখানেই যে-জাহিলিয়াতই বর্তমান ছিল বা আছে, সেইসব জাহিলিয়াতে এই অবস্থায়ই দেখা দিয়েছে অনিবার্যভাবে। গ্রীক জাহিলিয়াত, রোমান জাহিলিয়াত, পারসিক জাহিলিয়াত— এই সব কয়টি অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। সে সব ক্ষেত্রে যা সাধারণ অবস্থা ছিল বর্তমান নব্য জাহিলিয়াতেও ঠিক সেই অবস্থায়ই বিরাজিত। তা গোটা মানবীয় সত্তাকেই ধ্বংসের মুখে পৌছিয়ে দিয়েছে।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকৃতব্য যে, ধ্বংসকারিতার দিক দিয়ে আধুনিক জাহিলিয়াতের শক্তি ক্ষমতা অবদান অন্যান্য জাহিলিয়াতের তুলায় অধিক বীভৎস, কঠিন ও জঘন্য। কেননা তা পূর্বের জাহিলিয়াতগুলোর ন্যায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় না, তাকে সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক সহযোগিতাও দিয়ে যাচ্ছে, যার কোনো লক্ষণ পূর্বে কখনোই দেখা যায়নি।

হ্যাঁ, বিপর্যয় ও বিপথগামিতাকে যেসব মতবাদ ও ধর্মবিশ্বাস সমর্থন দেয় এবং নৈতিকতার বন্ধন ঢিলা করণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে তা অবশ্য পূর্বের প্রতিটি জাহিলিয়াতেই ছিল। কিন্তু তাকে কখনোই বৈজ্ঞানিক পোশাক পরাতে কোনোটিই চেষ্টা করেনি। এ দিক দিয়ে আধুনিক জাহিলিয়াত অনন্য ভূমিকা পালন করছে। এখন ধ্বংসকে বিজ্ঞানের ভূষণে সজ্জিত করে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করে দেওয়া হচ্ছে।

সেই সাথে রয়েছে সব আধুনিক প্রচার মাধ্যম— সাংবাদিকতা, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, ভি. সি. আর, ইদ্যাদি নিত্য নব আবিষ্কৃত উপায়-উপকরণ, এগুলো পূর্বে কোথাও ছিল না। বর্তমানে বিশ্ব ইহুদীবাদ রয়েছে এসব ধ্বংসাত্মক উপায়-উপকরণের পেছনে। তা এই বিপর্যয়কে 'সাবাস' দিচ্ছে। উম্মী লোকদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার দুটি হাত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা বিষয়টিকে নৈতিক চরিত্রের সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করতে কখনোই চাইনি। লোকেরা যে মনে করে, চরিত্র 'জীবন' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটা জিনিস, তা আমরা কখনোই সত্য বলে গ্রহণ করতে রাজি হইনি।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের যে বাস্তব সত্য আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করছি, তা হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় মানুষের মন সমাজ ও জীবনের চূড়ান্ত ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর নৈতিক বিপর্যয় মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাস্তব জীবনকে গ্রাস করে ফেলে।

বাস্তব জীবনের বিপর্যয় মূলত নৈতিক চরিত্রেরই বিপর্যয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও যৌন যে কোনো পর্যায়েরই বিপর্যয় হোক— মূলত তা মানব প্রকৃতিরই বিপর্যয়। কেননা নৈতিকতা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কহীন কোনো মতাদর্শমূলক ব্যাপার নয়। বস্তুত নৈতিকতা হচ্ছে প্রকৃতির স্থায়ী অপরিবর্তনীয় মৌল নীতি। প্রকৃত মানব জীবনেই তা সতত কার্যকর।

হ্যাঁ, বর্তমান কালের নবতর জাহিলিয়াত জ্ঞান-বিজ্ঞানে ধন্য, সমুদ্ভাসিত, আলোকোজ্জ্বল। অথচ প্রকৃতির বুকে নিহিত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে তা-ই হচ্ছে সবচাইতে বেশি অজ্ঞ ও মূর্খ। যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী মানুষের চরিত্র গড়ে তোলে, সে সম্পর্কেও তা কিছুই জানে না।

শিল্পকলায় বিপর্যয়

শিল্পকলা জীবনেরই একটি রূপ। তার অধিক কিছুই নয় তা।

বাস্তবতাবাদী চিন্তাবিদগণ মনে করে, জীবনের জন্যে শিল্প। শিল্পের জন্যে শিল্প— এর কোনো অর্থ নেই।

তাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, ইতিহাসের যে অধ্যায়েই শিল্প অস্তিত্ব লাভ করে এবং যখন ধারণা জন্মে যে, শিল্পের জন্যেই শিল্প অস্তিত্ব লাভ করে থাকবে, ঠিক তখনই শিল্পে জনগণের জীবনই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কেননা লোকেরাই যদি সে শিল্পের প্রতি কোনো কারণে আগ্রহী না হতো, তাহলে তা অস্তিত্বই লাভ করতে পারত না। লোকদের মধ্যে তা পরিব্যাপ্তও হয়ে পড়ত না। কাজেই 'শিল্পের জন্যে শিল্প'। দৃষ্টান্তস্বরূপ রোমান্টিসিজম-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে রয়েছে জীবনের কঠোর কঠিন বাস্তবতা থেকে পলায়নি ভাবধারা ও কল্পনা বিলাস। আর তা এজন্যে যে, 'তা শিল্পের জন্যে শিল্প' ধারণা বা মতের ফলশ্রুতি। তার আর একটি কারণ হচ্ছে, তখন জনগণ বাস্তবিকই জীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে পলায়োনি মনোভাবসম্পন্ন ও কল্পনাবিলাসীই ছিল।

এই কারণেই আমরা মনে করি, শিল্প, সাহিত্য ও কলা জীবনেরই একটা রূপ। তাতে জীবন থেকে পলায়োনি ভাবধারারই প্রতিফলন ঘটুক না কেন।

এই প্রাথমিক কথাগুলো বক্ষমাণ আলোচনায় খুব সামান্যই কাজে আসবে। তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্র।[১] কিন্তু এখানে এ বিষয়ের আলোচনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটি জাহিলিয়াতের সমাজে লালিত-পালিত ও ক্রমবর্ধিত জাহিলী শিল্প যে কুসংস্কার ও কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছে, তা জানতে পারা।

কেননা শিল্প মূলত জীবনেরই দর্পণ ... ... প্রতিবিম্ব। এই কারণে জীবন যতটা বিপর্যয়ের শিকার হবে, শিল্প সাহিত্যেও ঠিক ততটাই বিকৃতি ও বিপর্যয় সংঘটিত ও রূপায়িত হয়ে উঠবে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে পৌত্তলিক ভাবধারা সম্পন্ন শিল্প। এই ধরনের শিল্প কেবলমাত্র পৌত্তলিক পরিবেশের মধ্যেই লালিত-পালিত ও বিকশিত হতে পারে। আর এই শিল্পের সাহায্যে যে মানুষ

১. আমার লিখিত 'ইসলামী শিল্প পদ্ধতি' নামের গ্রন্থে শিল্পকে দৃঢ় ও বিপথগামী— এই ভাবে ভাগ করে তার তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে মাত্র কয়েকটি মৌল নীতির উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

গড়ে উঠবে তা অবশ্যই পৌত্তলিক হবে। বরং পৌত্তলিক হওয়াই হবে তার বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়, চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সন্দেহ নেই, এসব শিল্পে মানবীয় ভাবধারায়ও প্রকট ও উদ্ভাসিত থাকবে, সে ভাবধারা যেমন গভীর সূক্ষ্ম হবে, তেমনি হবে উচ্চতর মানসম্পন্ন। তাতে মানব মনের গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ প্রতিফলিত হবে, তার মনের দরদ, ভালোবাসা , সংবেদশীলতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং তার আনন্দ ও দুঃখ এসবেরও পূর্ণ প্রতি ফলন ঘটবে। মানবীয় চেতনা ও বিশেষত্বকে উচ্চতর জগতে উন্নীত করে দেবে।

এসব উচ্চতর মহিমামণ্ডিত শৈল্পিক নিদর্শনসমূহ দেখে লোকেরা মনে করে, শিল্পকে অবশ্যই পৌত্তলিক ভাবধারা সম্পন্নই হতে হবে। কেননা পৌত্তলিকতাই কোনো শিল্পকে সুন্দরতর ও মহিমামণ্ডিত করে তুলতে পারে। কিন্তু এই শিল্পরীতি যে বিপর্যস্ত, সেদিকে খুব কম সংখ্যক লোকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

এসব শিল্পের বিপর্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে তার উচ্চতর মানের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারটি ঠিক জাহিলিয়াতের মতোই। কেননা জাহিলিয়াত পুরোপুরি ভাবে 'মন্দ' হবে, তাতে একবিন্দু 'ভালো'র অস্তিত্বও থাকবে না। তা কখনোই হতে পারে না। আসলে মানব মন সম্পূর্ণরূপে 'খারাপ' হতেই পারে না। তার অস্তিত্বের কোনো-না-কোনো কোণে কোনো-না-কোনো সত্য ও ভালো অবশ্যই লুকিয়ে থাকবে। অবশ্য এটা ঠিক যে, তা থাকে অসংবদ্ধ ও ক্ষীণ-দুর্বল। তা না থাকার মতোই। আর তা কোনোরূপ শক্তিসম্পন্ন নয় বলেই তা থেকেও মানুষকে জাহিলিয়াতের ধ্বংসকারিতা থেকে রক্ষা করতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, এই 'ভালো' বা সত্যটুকুও জাহিলিয়াতের ধ্বংসকারিতার প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং সহায়তাকারীই হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষকে ক্রমাগতভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

ইতিহাসের সকল অধ্যায়েই পাশ্চাত্য শিল্পের একটি বিশেষত্ব প্রকট হয়ে থাকতে দেখা গেছে। হয় তা বহু সংখ্যক খোদায় বিশ্বাসী হবে, না হয় মানুষ ও খোদাগণের মধ্যকার কঠিন দ্বন্দ্বের প্রকাশ ক্ষেত্র হবে।...... এই বিষয়ে আমি এখনও ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণ করিনি বলে এখনই এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। আমি চাই, অন্য কেউ এ বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণা করুক। এই পৌত্তলিকতাবাদী শিল্পালয়ে পাশ্চাত্যের শিল্পীগণ যতটা শ্রম ও সাধনা করেছে, তারা যদি আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যকার যথার্থ সম্পর্কের প্রকাশ মাধ্যম বানাবার জন্যে তার শতাংশের একাংশেও করে, তাহলে শিল্প তখন কি রূপ পরিগ্রহ করবে, তা উক্ত কারণে এখনই বলা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।[১]

---

১. ভারতীয় শিল্প খোদায় মানুষের লীন হওয়ার ভাবধারা পূর্ণ। অথবা পরমাত্মায় লীন হওয়ার ভাবধারা। পরমাত্মা বলতে তারা আল্লাহ্‌কেই বুঝিয়েছে। অন্য কোনো শিল্পে আমি এই ভাবধারা দেখিনি। এ বিষয়ে কারুর গভীর সূক্ষ্ম অধ্যয়ন ও গবেষণা করা উচিত।

আর বিশেষভাবে এই বিশেষত্বের কারণেই পাশ্চাত্য শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেননা তাতে দেবতাদের ও মানুষের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছে। আর শিল্পও যে আকীদা বিশ্বাসে ধীরে ধীরে ও স্তরে স্তরে সংঘটিত বিপর্যয়সমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তা তো অনস্বীকার্য।

ইউরোপীয় ইতিহাসে গ্রীক শিল্প-সাহিত্যে দেবতা ও মানুষের পারস্পরিক কঠিন দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছিল। সমস্ত প্রখ্যাত গ্রীক নাটকেও এই বিশ্বাসের ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, করতে চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত। ফলে সে ভাগ্য ও দেবতাদের সাথে দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এসব যুদ্ধে মানুষ সব সময়ই সত্যপন্থী ও দেবতারা বাতিল পন্থী প্রমাণিত হয়। এই দেবতারা অবৈধ উপায়ে মানুষের শাসক হয়ে বসতে সচেষ্ট থাকে। শাসক হওয়ার এই লালসার পেছনে কোনো যুক্তি নেই, নেই বোধগম্য কোনো কারণ। এই ট্রাজেডি, পরিণতি হয় তখন— যখন সত্যপন্থী বীর— মানুষ, ভাগ্য ও দেবতারদের কাছে পরাজিত হয়। আর অত্যাচারী দেবতা তার প্রতি একবিন্দু দয়াও প্রদর্শন করে না; বরং সে যে দেবতাদের বিরুদ্ধে নিজের সত্তাকে— নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজেরই দেবতা নিজ সত্তা ও নিজের ইতিহাসের স্রষ্টা বানাতে চায়, এই পাপের জন্যে তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করে।

এই ট্রাজেডির শেষে মনে হয়, মানুষ সৎপন্থী মজলুম। আর দেবতারা সব অন্যায়কারী, পাপিষ্ঠ, অত্যাচারী। একদিকে এই প্রবল জালিম ও অপর দিকে মজলুম সত্যপন্থীর মধ্যে সন্ধি সমঝোতার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই জাহিলী ধারণার ছত্রছায়ায় শিল্পগত অনন্যতা ও চাকচিক্য উদ্ভূত হয়েছে, যা মানব মনের গভীরতম কন্দরে পৌঁছে যায়। আবার কখনও কখনও মানুষকে দিকচক্রাবালের উচ্চতায় নিয়ে যায়। কিন্তু দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধজনিত বিষাক্ত পরিবেশ এই শিল্পগত সৌন্দর্যকে ম্লান ও মূল্যহীন বানিয়ে দেয়।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হিসেবে তার কারণ দর্শানো যায় এভাবে যে, এই বিপর্যয় মূলত মানুষের শৈশবকালীন বিপর্যয়। গ্রীক যুগে তারই প্রতিকৃতি গোচরীভূত হয়।

বালক তার ওপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে স্বীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কেননা সে মনে করে, এই নিয়ন্ত্রণ তাকে অসহায় করে রেখেছে। তখন সে নিজেকে বড় প্রমাণ করার জন্যে নিজের বয়সের যারা বড় তাদের অমান্যতা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্ধত হয়। এই বিকৃতি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন বালক মনে করে যে, বড়রা তার ব্যক্তিত্বকে চূর্ণ করতে সচেষ্ট। সে যতই বিদ্রোহ করতে বদ্ধপরিকর হয়, বড়রা তার নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশুনা ততবেশি করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত

তার মনে বড়দের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা জেগে ওঠে এবং বড়দের ওপর দিয়ে সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়।

এ এক কঠিন বিপজ্জক বিপর্যয়। বিশ্লেষণমুখী মনস্তত্ত্ব এই বিষয়ে দৃঢ় জ্ঞান পেয়েছে।

ঠিক এই বিপর্যয়ই সংঘটিত হয়ছিল গ্রীক জাহিলিয়াতে। যদিও সে জাহিলিয়াত রূপায়িত হওয়া শিল্পে কিছু কিছু অতীব উত্তম নিদর্শনও ছিল। কিন্তু তাও বিপর্যয়ের প্রচ্ছায়া থেকে কিছু মাত্র মুক্ত ছিল না। কেবলমাত্র প্রোমিথিউস-এর কাহিনীতেই এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন নেই। তা ছাড়া গ্রীক নাটকসমূহে যত কাহিনীই রয়েছে, তার সবই এই ধরণের।

সে যাই হোক, মানবতার বাল্যকালে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তা বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা একে তো সব বালকের মধ্যেই এরূপ অনুভূতি থাকেনা। বরং বাচ্চারাও বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসার আচরণই করে থাকে। তাছাড়া বাচ্চারা যদি কখনও বড়দের দেওয়া বাধা ও মন্দ চলাকে খারাপ মনে করেও, তবু ঘৃণা ও প্রতিহিংসা জাগিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা হয় তখন, যখন বিপর্যয় ও বিপথগামিতা প্রকট হয়ে উঠে। বড়দের শাসনকে খারাপ লাগার কারণ হচ্ছে মানব মন সমালোচনাকে সব সময় অপছন্দ করেই এবং প্রশংসা শুনলে স্বাভাবিকভাবেই খুশী হয়ে ওঠে। এটা বালক বয়সের প্রকৃতি। অবশ্য সেই সাথে বালকরা এ-ও চায় যে, আত্মবিশ্বাসের বলেও বড়দের সাহায্যের মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই সে বড় হয়ে উঠুক। এটাও প্রকৃতিগত ভাবধারা বটে।

গ্রীক জাহিলিয়াতের এটাই ছিল বিপর্যয় ও বিকৃতি। আর তা গ্রীকদের শিল্পে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত। কেননা শিল্প তো মনের প্রকৃতি যেমন, তেমনি তা জীবেনরও প্রতিচ্ছবি।

জীবন ও শিল্পে গ্রীক জাহিলিয়াতের এটি হচ্ছে প্রথম নিদর্শন। আর দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে দেহপূজা। সুন্দর দেহকে উপাস্য বানিয়ে তার বন্দেগী করা। লোকেরা মনে করে, এটাও একটা শিল্প। এর আকর্ষণে মানুষ সে দিকে এগিয়ে গেছে। লোকেরা মনে করে, ওটা কোনো যৌন লালসা নয়। তা এমন একটা শিল্প যা কোনো মানুষের দেহে প্রতীকী হয়ে উঠলেও নিছক সৌন্দর্যের কারণেই তা শিল্প হিসেবে গণ্য।

জাহিলিয়াতসমূহে এই ধরনের এমন এমন ধারণা রয়েছে, যা সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাঁচাই করলে টিকতে পারে না।

গ্রীক জীবনের বাস্তবতা হচ্ছে সৌন্দর্যকে নিছক সৌন্দর্য হিসেবে পূজা করা হলেও তা-ই দেহের যৌন লালসা মাত্র। আর এই সৌন্দর্য পূজার ফলশ্রুতি গোটা

সমাজ চরিত্রহীনতার শিকার হয়ে পড়েছিল। আর সমগ্র গ্রীক সভ্যতা ধ্বংসের মুখে এসে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। গ্রীকদের প্রেম-ভালোবাসা ও রূপ যৌন সংক্রান্ত কিংবদন্তীসমূহে এই ধরনের চরিত্রহীনতা ভরপুর হয়ে রয়েছে, যাতে মানুষ ও দেবতা সকলেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে আছে।

আসলে সৌন্দর্যপূজার আড়ালে দৈহিক ও যৌন লালসাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রাচীণ গ্রীক জাহিলিয়াতে এই দুটি জাহিলী বিপর্যয় দীর্ঘ হতেও দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেছে চতুর্দিকে। পাশ্চাত্য শিল্প পূনর্জাগরণের সময় থেকে বর্তমানে যুগ পর্যন্ত সেই ছায়াতেই আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর পর কিছুকালের জন্যে শিল্পে আল্লাহ্ মুখী হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে পশ্চিমা গির্জা আল্লাহ্র যে আকৃতি বানিয়েছিল সে-ই আল্লাহ্মুখী হয়েছিল। আর তাতেই গ্রীক ও রোমান জাহিলিয়াতদ্বয় দেবতার দেহ নির্মাণ এবং অনুভব ও স্পর্শযোগ্য প্রতিমূর্তিরূপে তার পূজার ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিল। বহু কতগুলো প্রতিকৃতিতে এই পূজার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে।[১]

পরে এই যুগের অবসানে হেলেনীয় সভ্যতা নতুন করে চিন্তা ও শিল্পগত ঝোঁক প্রবণতায় বিজয়ী হয়ে পড়ে। লোকেরা আবার সেই গ্রীক মূর্তি পূজার দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল। খ্রিস্টান মানুষেরা আবার রীতিমত মূর্তিপূজা করতে শুরু করে দিল, তারা হয়ে গেল পূর্ণ মাত্রায় মূর্তিপূজারী।

ইউরোপে এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি খ্রিস্টীয় ও হেলনীয় উভয় ভাবধারায় সমন্বিত ছিল একই সময়। আকীদার দিক দিয়ে ছিল খ্রিস্টান আর চিন্তা ও শিল্পে ছিল হেলেনীয়। উত্তরকালে ক্রমিক নিয়মে সর্বক্ষেত্রেই ও পুরামাত্রায়ই মূর্তি পূজারী হয়ে গেছে।

এক সময় ইউরোপীয়রা প্রকৃতিরও পূজা করেছে। তখন তারা গির্জা ও তার 'খোদা' থেকে পালাচ্ছিল। কেননা এই গির্জা ও তার খোদা জনগণকে দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছিল।

এই সময়টা ইউরোপীয় ইতিহাসে রোমান্টিকতার আন্দোলনের যুগ ছিল। তাতেও দেবতা স্বীকৃত ছিল শিল্পক্ষেত্রে। যদিও তা 'খোদা' সম্পর্কিত বিকৃত ধারণার

---

১. উল্লেখ্য এই যে, মধ্যযুগে মুসলমানদের সাথে খ্রীস্টানদের যোগাযোগ হওয়ার পর ইউরোপের মূর্তি ধ্বংসের আন্দোলন শুরু হয়, যা ইতিহাস খ্যাত ব্যাপার। লিউ তৃতীয় The Iconoelast ছিল তার নেতা অষ্টম শতাব্দীতে। ১২০ বছর পর্যন্ত এ আন্দোলন চলে। ইউরোপীয় গির্জার ইতিহাসে তা বিশেষভাবে উল্লিখিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আল্লাহ্র মূর্তি নির্মাণের স্পৃহা খতম করতে পারেনি।

ভিত্তিতে। কেননা রোমান্টিকতায় প্রকৃতির প্রতি শুধু আকর্ষণ ছিল না, তার পূজাও করা হতো, আর তার থেকেই বিপথগামিতা সূচিত হয়েছিল।

প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানুষের মৌল চেতনা। তা স্বাভাবের গভীরে প্রোথিত। মানুষ এমন স্বভাবে সৃষ্ট যে, তারা স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতি ও গোটা সৃষ্টলোকের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। সৌন্দর্যে প্রচ্ছন্ন আনন্দ ও সুখ মানুষের প্রকৃতি নিহিত। সে সৌন্দর্যের যত দিক ও তার প্রকারই থাক-না-কেন।

কাজেই সৌন্দর্যে অবিভূত হওয়াটা বিপর্যয় নয়। সৌন্দর্যপ্রিয়তা তো মানব প্রকৃতি নিহিত ব্যাপার। তা না থাকলে মানবীয় সত্তায়ই ত্রুটি রয়েছে মনে করতে হয়। সুস্থ প্রকৃতি থেকেও তা একটি বিকৃতি।

কিন্তু সৌন্দর্য পূজা— তা যে রূপে ও যে ধরনেরই হোক— একটি পৌত্তলিক বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। সুস্থ মানব প্রকৃতি তা কখনোই মেনে নিতে পারে না। কেননা তাতে সৌন্দর্যের আকৃষ্ট হয়ে তার পূজা করা ও সৌন্দর্যকে প্রতিকৃতিতে রূপায়িত করে তার দাসত্ব করা— এই দুটির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

এই পৌত্তলিকতাকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করার জন্যে যে সুন্দরতম বাক্য আবৃত্তি করা হয় তা হচ্ছে, 'সৌন্দর্য আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত এলাকা' (channel) সৌন্দর্য আল্লাহ্‌র প্রতিকৃতি, আমরা তো আল্লাহ্‌র পূজা করি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইত্যাদি .... এই সব বাক্য নিশ্চয়ই রোমান্টিকতায় ভরপুর। কিন্তু এসব বাক্য পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত ভাবধারাকে গোপন করতে পারে না। এই ভাবধারার ধারক তো প্রকৃত মূর্তিপূজার প্রবর্তক। কেননা তা রূহ-এর সাহায্যে আল্লাহ্‌কে পেতে পারে না। 'রূহ' তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মুখাপেক্ষী নয়।

উক্ত তাৎপর্যের দিক দিয়ে রোমান্টিকতা একটি বিকৃত বিপর্যস্ত পৌত্তলিক আন্দোলন। অবশ্য বাস্তববাদীদের দৃষ্টি ভিন্নতর। তা জীবনের বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলেনি। তা ছিল জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর আন্দোলনের প্রতীক।[১]

ইউরোপ বিকৃত বিপর্যস্ত রোমান্টিকতা থেকে এক নতুন শিল্পগত জাহিলিয়াতের দিকে চলে গেল।[২] আর তাই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতার বিকৃতি। এখানে 'খোদা' পরিবর্তিত হয়ে গেল। পরিবর্তিত হলো তার পূজা উপাসনা।

---

১. পূর্বেই বলে এসেছি, রোমান্টিকতার আন্দোলনে জীবন থেকে বিকৃতি ছিল না। বরং সেই সময়ের লোকেরাই ছিল পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তখন লোকেরা সামন্তবাদ ও গির্জার অত্যাচার থেকে বাঁচার পথ খুঁজছিল। তখন পাশ্চাত্যের যে অবস্থাই ছিল, তা ছিল অপরিবর্তনীয়। লোকেরা তাই গির্জার খোদা ত্যাগ করে প্রকৃতিপূজায় বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আসলে তা ছিল পৌত্তলিকতা, যার দরুন লোকেরা আল্লাহ্‌র ইবাদত ত্যাগ করে একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের ইবাদত বা পূজা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

২. মানদণ্ড সংক্রান্ত বিভ্রান্তি। চলতি অধ্যায়ে সেই বিষয়টি আলোচিত হয়। ইউরোপীয় শিল্পগত মানদণ্ড নয়। কেননা তার প্রকৃতিতে কি বিভ্রান্তি আছে তা অনুভূত নয়।

এ পর্যায়ে প্রকৃতি পূজা প্রত্যাহৃত হলো। কেননা ততক্ষণে তাতে নিহিত সমস্ত রহস্য যথারীতি উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। ইউরোপ যেমন ধারণা করে মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তার ওপর কর্তৃত্বশালী হয়ে বসেছিল, তখন তার সমস্ত উষ্ণতাই ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে গিয়েছিল। তখন মানুষ শিল্প বিপ্লবের ছত্রছায়ায় এক নতুন পূজার দিকে চলে গেল। তাতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি উৎকর্ষ এবং মানবীয় শক্তির ছত্রছায়ায় এক 'নতুন খোদা' বানিয়ে নেওয়া হলো। সে নতুন খোদা হলো স্বয়ং মানুষ।

এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হলো যখন মানুষ নিজেদের গলদেশ থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের রজ্জু খুলে ফেলল। যা তারা জাহিলিয়াতের অক্ষমতা ও মুর্খতার যুগে নিজের গলায় পরে নিয়েছিল। এখন তো মানুষ নিজেই নিজের খোদা হয়ে বসল।

এরপর পাশ্চাত্য শিল্প নতুন এক খোদার সন্ধান আবার শুরু করে দিল। তখন সে প্রকৃতিগত পরিবর্তে মানুষের দিকেই আকৃষ্ট হয়ে গেল। আমরা আবারও বলব, মানুষের নিজের প্রতি গুরুত্বারোপ স্বতঃই কোনো বিকৃতি বা বিপর্যয় নয়। না শিল্পে, না জীবনের বাস্তবতায়। মানুষ নিজের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে, এটা তো প্রকৃতিগত স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। মানুষ নিজ জীবনের ছবি ও ভাবধারায় প্রভাবিত হবে, তার সমস্যাবলী, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, তার চেষ্টা-সাধনা, কষ্ট স্বীকার ও পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার জন্যে তার সংগ্রাম— এই সবকিছুই তার কাছে গুরুত্ব পাবে, এটা তো কোনো জাহিলিয়াত নয়।

আসলে জাহিলিয়াত হলো মানুষের দাসত্ব করা, মানুষের নিজের পূজা নিজে করা। এই কালেই পাশ্চাত্য শিল্পে মানুষের প্রতি গুরুত্বারোপ 'দেবতা'র জন্যে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই শুধু শিল্পক্ষেত্র থেকেই আল্লাহ্‌কে বিতাড়িত করা হয়নি, ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও সুদৃঢ় চিন্তাকে শিল্পক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তার প্রতি চরম ঠাট্টা ও বিদ্রূপকে উদ্দেশ্যমূলক ও সচেতনভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য দান ও ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বিকৃত ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই ছিল না যে, তারা ধর্মীয় আদর্শ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে বলেই তা করা হচ্ছে এবং শিল্পী সেই ব্যক্তির প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে তাকে প্রকৃত ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, তাকে তার পরিচ্ছন্ন ও অনাবিল ভাবধারায় সুদৃঢ় করে জনগণের হৃদয়ে ও অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়াও তার লক্ষ্য ছিল না। ধর্মীয় ব্যক্তিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তাদেরকে প্রকৃত সহীহ্ ধর্মের দিকে তার গুরুত্ব, পরিচ্ছন্নতা-নির্মলতা ও পবিত্রতার দিকে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মৌল ও সহীহ্

ধারণাকে বিদ্রূপ করা ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান গ্রহণের সরলতাকে হাসি ঠাট্টা করে মূল্যহীন বানিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের শিল্পের আসল উদ্দেশ্য।

অতঃপর সারা দুনিয়ায় নাস্তিকতাবাদী সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ে। সে সাহিত্য ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি নির্লজ্জ গালাগালে সমৃদ্ধ। আল্লাহ্‌র ইবাদতকে কঠিন বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করা হয়েছে তাতে। আর তাকেই তারা নাম দিয়েছিল 'স্বাধীন বিমুক্ত চিন্তা' বা 'মুক্ত বুদ্ধি'। অন্য কিছু নয়। ঠিক সেই সময়ই অপর দুটি জাহিলী ভাবধারা ও প্রবাহ শিল্পকে বিকৃত করে দিচ্ছিল, তা ছিল বিপর্যয়ের পথে রূঢ় বাস্তববাদী।

তাতে মানুষকে নিতান্ত পশু প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। আর আচার-আচরণে মানুষকে বানানো হয়েছে যৌনতাবাদী।

মানুষকে পশু সাব্যস্ত করার ব্যাখ্যায় এক ধরনের বাস্তববাদী শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এই শিল্পের কর্তারা তার নামকরণ করেছে 'প্রাকৃতিক' বা 'প্রকৃতিবাদী'। তাতে মানুষকে নিতান্তই নিম্ন শ্রেণীর হীন ভাবধারার সমষ্টি করে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো সীমাকেও রক্ষা করা হয়নি। সে অনুযায়ী মানুষ স্বভাবতই নিম্ন শ্রেণীর, হীন নীচ চরিত্রের, দ্বিমুখী, প্রতারক, সুবিধাবাদী, সুযোগ-সন্ধানী— তার কোনো নীতি বা আদর্শ নেই, নেই কোনো চরিত্র। মানুষ নিজেকে চরিত্রবান প্রকাশ করতেই অভ্যস্ত। তার নীতি হচ্ছে মুনাফিকী, তাও আবার সমাজ সমষ্টির জন্যে, (অবশ্য ওদের সকলে মধ্য থেকে এমন কেউই বের হয়ে আসেনি একথা বলার জন্যে যে, সমাজবদ্ধ মানুষ কেন বাহ্যত নৈতিক চরিত্রবান ও নীতিবাদী হওয়ার কথা প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয় ? তাকে সত্য ধরে নিলেও প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি মানব প্রকৃতিরই একটি বিশেষত্ব নয় ?)

মানুষকে যৌনতার আবেগ সম্পন্ন প্রমাণ করার ব্যাখ্যায় এক স্বয়ংসম্পন্ন ও পূর্ণাঙ্গ শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। তা হচ্ছে উন্মুক্ত বা খোলা সাহিত্য। নগ্ন চিত্রসমূহ, উলঙ্গ দৃশ্যাবলীতে ভরা সিনেমা, নগ্ন যৌন কাহিনী, যৌন উত্তেজক গান— সঙ্গীত। মানবদেহের গোপন স্থানসমূহ ন্যাংটা করে দেখানো ... ইত্যাদি...।

এই শিল্পই প্রচলিত হয়ে পড়েছিল সর্বত্র। কিংবা এই শিল্পকে নানা কৌশলে প্রচলিত করা হয়েছিল। যেন ইতিহাসে এমন কথা আর কখনোই বলা হয়নি এমনভাবে, আর তার অন্তরালে বসে বিশ্ব ইহুদীবাদ 'উম্মী' লোকদের গোটা সত্তাটিকেই ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করে চলছিল।

কিন্তু এ সব বিপর্যয় কোনো সীমায় এসে থেমে যায়নি।

শিল্প অনিবার্যভাবেই ধারণা ও আচার-আচরণে সকল প্রকারের বিপর্যয়কে

মেনে নেয় ও অনুসরণ করে। কেননা তার অবস্থা যা-ই হোক, তা-যে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি, তাতে কোনো সংশয় নেই।

মানবীয় মনের জন্যে মানবীয় ধারণায় 'আংশিকতা' স্বভাবগত হয়ে পড়েছে। শিল্পের ওপরও তার ছায়া বিস্তার করেছে।

অবচেতন (unconscious) সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতবাদ হচ্ছে, তা আয়ত্তকারী বিবেক মানুষের প্রকৃতি পরিচিতি নয়। সাহিত্য ও শিল্পে তা বিমূর্ততাকে সঞ্চারিত করেছে, গড়ে উঠেছে বিমূর্ত শিল্প। সেই আধুনিক শিল্পে অন্যান্য নতুন ধারাও আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সব কিছুরই ভিত্তি হচ্ছে এই ধারণা যে, সচেতন বিবেক মানব সত্তার একটা মিথ্যা অংশ মাত্র। তা মানুষের নিগূঢ় মৌল অন্তর্নিহিত মহাসত্যের প্রতিনিধিত্বকারী নয়। তা শুধু সেই প্রচ্ছন্ন বিবেকেরই প্রকাশ মাত্র। তা ঘোলানো, অসংবদ্ধ, অবিন্যস্ত, যা মানুষের গভীরতায় সংগৃহীত।

আর এটাই হচ্ছে সেই বিপর্যয়, যার বাতিল হওয়া অনস্বীকার্য, সুস্পষ্ট। তাহলে বিবেকের প্রচ্ছন্ন ও সচেতন উভয়েরই সমন্বয়ে মানব সত্তা গড়ে ওঠার পথে মানুষের কোন যুক্তিটা বাঁধ সাধতে পারে ?

মানুষ প্রথম যেদিন নিজেকে চিনতে চেষ্টা করেছে, সেই দিনই এই প্রাথমিক ও সহজ সরল মহা সত্যকে চিনতে পেরেছে। ফ্রয়েডের দর্শনের কোনো নাম চিহ্নও তখন ছিল না। ফ্রয়েডের এ দর্শন একটা বিস্ময় নিয়ে এসেছে। অথচ মানুষ জানে, তার কিছু কিছু চিন্তা সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত। সেই সাথে রয়েছে কতগুলো যুক্তিহীন ভাবধারা, চিন্তা-ভাবনা, যা মনের যুক্তিবাদের ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত নয়। আর এ দুটি নিয়েই মানুষের সত্তা সমন্বিত।

বিকৃত ব্যক্তিবাদ এমন শিল্প রচনা করেছে, যা সমাজবদ্ধতাকে ভেঙ্গে ফেলতে ও পরাজিত করতে সচেষ্ট, তার সূচনাতে রয়েছে অস্তিত্ববাদ। তা ব্যক্তির পূজার প্রবর্তক। ব্যক্তি একাই হচ্ছে তার সম্মুখবর্তী সব ব্যাপারেই চূড়ন্ত সিদ্ধান্তকারী, নির্দেশদাতা। সে ব্যক্তি সমাজের কেউ নয়। সমাজ তার ওপর কর্তৃত্বশালী হতে পারে না। তার চরিত্র, আদত অভ্যাস ও অন্যান্য কর্মতৎপরতায় সমাজ তাকে পথ-নির্দেশ করতে বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

এই ব্যক্তিবাদী মতাদর্শ পোষণকারী নির্বোধরা এতটুকুও বুঝে না যে, সমাজই যদি ধ্বংস হয়ে গেল, তা হলে তখন ব্যক্তি তার যাবতীয় মাহাত্ম্য-মহানত্ব ও পবিত্রতা লয়ে কোথায় দাঁড়াবে ? আর সেখানে শুধু ব্যক্তি থাকবে, প্রত্যেকেই নিজ ইচ্ছামত হুকুম চালাবে। থাকবে না কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা, কোনো রীতি-প্রচলন, সর্বজিনিসের জন্যে কোনো স্থায়ী মানদণ্ড— এটা কি সম্ভব ?... এটা কি কোনো ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে ?

ক্রমবিকাশবাদ একটা দিশেহারা মতবাদ। সে মতে বিশ্বলোক স্বতঃই অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার পরিচালক স্রষ্টাও যেন নেই, তেমনি নেই জন্ম ও জীবনের কোনো লক্ষ্য। ব্যক্তিত্ববাদী মতাদর্শের একটি শাখা হিসেবেই তা গড়ে উঠেছে। তা আসলে ধ্বংসের প্রতিনিধি।

ইচ্ছা করলে প্রশ্ন করা যেতে পারে, ধ্বংসের মধ্যে অস্তিত্ব বা সত্তা কি করে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে?

প্রধান অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদ দার্শনিক 'আল্‌বীর কামু'কে জিজ্ঞেস করো। সে তো বিশ্বলোকের সম্মুখে মানুষের বিস্ময় ও হতবাক হওয়ার কথা বলিষ্ঠভাবে প্রচার করে। এই মহাবিশ্বের বুকে মানুষ কিভাবে নিজেকে অত্যন্ত হীন ও নগণ্য গণ্য করে এবং মানুষ কি সাংঘাতিক উৎকণ্ঠা ও মানসিক অস্থিরতার শিকারে পরিণত হয়েছে— সে অনুভব করে যে, কোনো যৌক্তিকতা ও উচ্চতর পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার ফলে তার অস্তিত্ব হয়নি এই চিন্তায় মানুষ ধ্বংস ও গুমরাহীর শিকার হয়ে যায়। এই কথা তো সেই দার্শনিকই প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

অতঃপর শিল্পক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে। তা হলে, অতঃপর মানুষ আর 'উপাস্য' বা মা'বুদ থাকল না। সেখানে একজন নতুন উপাস্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

মানুষের পূজা-উপাসনা বাতিল বা পরিত্যাক্ত হয়ে গেল। তার পরিবর্তে নতুন উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হলো নিশ্চিত অনিবার্যতাকে।

শিল্প বাহ্যিকভাবে খোদায়ী প্রতিকৃতির উপাসনায় মশগুল থাকলেও এই নিশ্চিত অনিবার্যতার পূজা-উপাসনায় আত্মনিবেদিত হলো এবং তারই মাধ্যমে মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হতে লাগল।

এক্ষণে মানুষ স্বতঃই শিল্পের কোনো বিষয়বস্তু থাকল না এই নতুন মত ও পথে। এগুলো নিজস্বভাবে নাম ধারণ করেছে সামষ্টিক মতাদর্শ কিংবা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো নাম।[১] তবে মানুষ এখানে 'নতুন খোদার' নিছক বেষ্টনীভুক্ত হয়েই থাকল। এরই মাধ্যমে সামষ্টিক নিশ্চিত অনিবার্যতা কিংবা অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতা অথবা ঐতিহাসিক নিশ্চিত অনিবার্যতা অধ্যয়ন করা হয়।

এ শিল্পে মানুষের জীবন একট গৌণ জিনিস, মুখ্য নয়। তবে প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সামাজিক বা অর্থনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক বিবর্তন। তা-ই এই জীবনটাকে রূপায়িত করেছে। মানুষ নিষ্প্রাণ লাশ মাত্র। এইসব নিশ্চিত অনিবার্যতাই

১. অপরিহার্য সাহিত্য আধুনিক জাহিলিয়তের প্রচারিত বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে একটি বিশেষ মত। তা বাধ্যতামূলকভাবে মানবজীবনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেয় এবং তাকেই সামষ্টিক মূল্যমান সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা বলে নামকরণ করে।

তাকে নাড়ায়-চাড়ায়। তার প্রতি জোর প্রয়োগ করা হচ্ছে যেন তা তার নিশ্চিত অনিবার্য স্থানে থেকে রূপ ধারণ করে। তার কর্মতৎপরতায় তার নিজের কোনো ইচ্ছা প্রয়োগ তা স্বাধীনতার এখতিয়ার কিছুই নেই।

এসব নিশ্চিত অনিবার্যতাই নিয়তি বা নতুনতর মানদণ্ড। এরই ভিত্তিতে মানুষের জীবন চলবে ও যাঁচাই করা হবে। কিন্তু এবারে প্রাচীন গ্রীক মানদণ্ড গৃহীত হয়নি। কেননা তা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। তা অনুভবের আওতার মধ্যেও নেই। কিন্তু এখনকার মানদণ্ড তো অনুভবযোগ্য, দৃষ্টিগোচর, প্রকার ও পরিমাণে তার পরিমাপ করা যায়। তার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থও ধর্তব্য।

তা সত্ত্বেও মানুষ ও তার সত্তার মাঝখানে একটি দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ দাঁড়িয়ে যায়। যা মানুষ ও প্রাচীন গ্রীক মানদণ্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে যেত। তবে দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে নিশ্চিত-অনিবার্য দেবতাগণ যা করে তা সবই ঠিক। সে বিভ্রান্ত হয় না, হয় না দিশাহারা। আরও একটি পার্থক্য আছে, যা এর চাইতেও খারাপ।

তা হচ্ছে, এখন মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আর দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম করে না। সে নিজে তো বিলুপ্ত এই নিশ্চিত-অনিবার্যতার চাপে। এখানে মানব সত্তার কোনো স্থান নেই। তবু সে দ্বন্দ্ব করে নিতান্তই ভুল বলে।

জাহিলিয়াতের এই ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন সূত্রের ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় শিল্প গড়ে উঠেছে যোগ্য সৌন্দর্যমণ্ডিত মানবতাবাদ হিসেবে।

কিন্তু বিপর্যয়ের কারণে সে সৌন্দর্যসমূহ বিকৃত।

এখানে যা কিছু সৌন্দর্য তা শুধু টেক্‌নিকে প্রকাশ-কৌশলে। মানব মনের বিভিন্ন দিকের প্রতিকৃতি নির্মাণের সৌন্দর্য।

মানুষ যেন জীবনের সূক্ষাতিসূক্ষ্মতা গ্রহণ করে, সেই জন্যে। তখন তার কামনা হয়, এসব জাহিলিয়াতের বিপর্যয়সমূহ থেকে যদি তা রক্ষা পেতে পারত। কেননা তা তো সব সৌন্দর্যকেই বিকৃত ও বিনষ্ট করে দেয়।

সন্দেহ নেই, তার খুব সামান্য অংশই বিপর্যয়ের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পেরেছে। পূর্বেই যেমন বারবার বলেছি— মানব মন কখনোই অন্যায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় না, নিরংকুশ ভালোর দিকের প্রবণতাও তার মধ্যে থাকে না, তাই তা-ও সম্ভব হয় না।

এই বিরল স্বল্প সংখ্যকই হচ্ছে সুপরিচ্ছন্ন প্রকৃত শিল্প। শিল্পগত মানবতার পর্যায়ে গণ্য হওয়ার উপুক্ত সত্তা।

কিন্তু এদিক ও ওদিক থেকে আসা বিপর্যয় অধিকাংশ সৌন্দর্য চাকচিক্যকেই কলংকিত ও আবিলতাপূর্ণ করে দিয়েছে। ফলে তা এমন হয়ে গেল, যেন একখানি

সুন্দর মুখাবয়ব, যাকে আগুনের দগ্ধের দাগ বীভৎস করে দিয়েছে। তুমি অনুভব করো সে সুন্দর ছিল। কিন্তু তুমি তার চোহারা কলংকের চিহ্নগুলোও দেখতে পাচ্ছ।

আর যা অসুন্দর, অ-চাকচিক্যময়, পরিমাণের দিক দিয়ে সমকালীন পাশ্চাত্য শিল্পের বিরাট অংশই হচ্ছে তা (সকল প্রকারের শিল্পের)। তাতে আসল মূলধন সৌন্দর্য নয়। আসেলই তা বিপর্যয়ের শিকার।

এই পর্যায়ে রয়েছে সমগ্র যৌন সাহিত্য। তাতে মানুষের গোটা জীবনকে চিত্রিত করা হয়েছে এভাবে, যেন তা জ্বলতে থাকা সীমালংঘনকারী যৌন মুহূর্ত। তা কোনো শিল্পও নয়, নয় কোনো সৌন্দর্য। তাতে কোনো সত্যতাও নিহিত নেই। তা সেই ক্ষুধার্ত কুকুরবৎ, যার জিহ্বা সব সময়ই বাইরে ঝুলতে ও মুখ থেকে লালা ঝরতে থাকে। তাতে মানবীয় নিগূঢ় সত্য কিছু নেই।

তা যৌন লালসাপূর্ণ সাহিত্য। তাতে অন্তর্নিহিত বিবেক শক্তির নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকী চিত্রিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তা-ই হচ্ছে আসল মানুষ, মানুষের মৌল সত্য। .... আসলে তা কোনো শিল্প নয়, নয় সৌন্দর্য বা সত্যতা। অতএব মানুষকে কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই নিতান্তই নির্বোধ প্রমাণ করায় মানুষের নিগূঢ় সত্য নিহিত নয়, তা স্বীকৃতব্যও নয়। কেননা তা যুক্তিহীন বকবকানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সব বিকৃতি ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাশ্চাত্য শিল্প একটি সর্বাত্মক 'বুদ্ধিহীনতা' বা 'অযৌক্তিক' ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আর আধুনিক ইউরোপের তা-ই হচ্ছে কৃতিত্বের চরম মাত্রার উন্নতি। আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত মানবতার সব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ধ্বংস নৈরাশ্য ও হতাশাই নিয়ে এসেছে।

আল্লহ্র পথ অগ্রাহ্য করে বিশ্বমানবতা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সকল ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সকল পথেই চলে দেখেছে, কিন্তু তার মারাত্মক পদস্খলণ ঘটেছে। দুকদমও সঠিক পথে চলতে পারেনি।

মানুষ আল্লাহ্দ্রোহী বস্তুবাদের পরীক্ষা করেছে। অনুরূপভাবে পুঁজিবাদের পরীক্ষা করেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। হ্যাঁ, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। সীমালংঘনকারী ব্যক্তিতন্ত্রের এবং সর্বগ্রাসী সামষ্টিকতাবাদের পরীক্ষাও হয়ে গেছে।

কিন্তু এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশ্বমানবতাকে নিশ্চিন্ততা, মানসিক স্বস্তি ও শান্তি এবং দৃঢ় প্রত্যয় যুগিয়ে দিয়ে ধন্য করতে পারেনি।

আর এই কারণেই এসব পরীক্ষা-নীরিক্ষা যে মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা সম্পন্ন করেছে— শেষ পর্যন্ত তাকেই অস্বীকার করে বসেছে।

মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিকে অস্বীকার করে শেষে তারা আশ্রয় নিয়েছে অ-বুদ্ধি-বিবেক বা বুদ্ধি-বিবেকহীনতা— অযৌক্তিকতার।

হৃদয়াবেগ ও চেতনার সমগ্র দুনিয়া এখানে 'বুদ্ধিবত্তা' থেকে 'নির্বুদ্ধিবত্তা'র দিকে ছুটে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। অন্ধ নিরুদ্দেশ হৃদয়াবেগকে কোনো বুদ্ধির যুক্তি দিয়ে ঠেকানো গেল না। অন্তর্নিহিত নির্বুদ্ধিতাও তা রোধ করতে পারেনি। কেননা তাকে কোনো সুসংবদ্ধ চিন্তা-বিবেচনা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে না।

আর তা-ই হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান-আলোকোদ্ভাসিত জগতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা এক নবতর জাহিলিয়াত। তা কোনো দৃঢ় নিশ্চিত প্রত্যয়ের সন্ধান পায় নি। তাই তার পদচারণা ও গতি উৎকণ্ঠা, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্যতা, অস্থিরতা ও সন্দেহ-সংশয়ে জড়িত, কুণ্ঠিত ও দ্বিধান্বিত।

এ আলোচনা পাশ্চাত্য শিল্প সম্পর্কে বলতে গেলে একটি পৃষ্ঠাই মাত্র। অথচ তার চাকচিক্য চতুর্দিকের মানুষের চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছে।

গ্রীক জাহিলিয়াত থেকে শুরু করে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠাতুল্য বটে আমাদের এই আলোচনাটুকু।

এ জাহিলিয়াতের প্রতিটি জিনিসই চোখ ঝলসানো চাকচিক্যময় বটে। কিন্তু তা ধ্বংসমুখী। ধ্বংসমুখী এই জন্যে যে, তা নির্ভুল কল্যাণের পথ চিনে না।

এ বিদ্রোহী-সীমালংঘনকারী জাহিলিয়াতের ছত্রছায়ায় থেকে শিল্প নিজেকেও বাঁচাতে পারেনি। খুবই দ্রুত গতিতে তা বিকৃতি ও বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্নতার অতল গহ্বরে।

তবু মনে রাখতে হবে, শিল্প সর্বাবস্থায়ই জীবনের প্রতিকৃতি, জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। অন্যথায় তাকে কখনোই শিল্প বলে মনে করা যেতে পারে না।

সকল ক্ষেত্রেই বিপর্যয়

এ জাহিলিয়াতের সব কিছুই বিপর্যস্ত। বিপর্যয়ে পড়েনি এমন কোনো জিনিস আছে কি ? আমরা এ গ্রন্থের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মানুষের সকল দিক ও বিভাগ বা ক্ষেত্রেরই পর্যালোচনা করেছি, আতিপাঁতি করে অনুসন্ধান চালিয়েছি। মানুষের মনস্তত্ত্ব, সমাজ সমষ্টি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক জীবন, নৈতিকতা ও শিল্পকলা, ধারণা ও বাহ্যিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনে কোনো একটি জিনিসও, কোনো একটি দিক বা ক্ষেত্রও বিপর্যয়ের কঠিন আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি।

তবে বর্তমান জাহিলিয়াতের একটি মাত্র দিক এমন, যা নিয়ে মানুষ বলিষ্ঠভাবে গৌরব প্রকাশ করছে, মানুষের চোখ ঝল্‌সিয়ে দিচ্ছে।

তা হচ্ছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মানব জীবনে যে সুযোগ সুবিধা, সহজতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিপুলতার সৃষ্টি করেছে, তার জ্ঞান মানুষের সম্মুখে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেই সাথে গড়ে তুলেছে বড় বড় সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা। বিজ্ঞানই মানুষকে এসব করার জন্যে সক্ষম বানিয়ে দিয়েছে।

এই কারণেই মানুষ বর্তমান জাহিলিয়াতের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট। তার উদ্‌ঘাটিত উৎসসমূহ থেকে প্রতিনিয়ত সুখের সম্পদ দুই হাতে লুটে নিচ্ছে। এই কঠিন জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত থেকেও তারা এই কল্পনায় বিভোর যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি ও উন্নতি-উৎকর্ষ হবে, মানব জীবনও তারই সাথে সাথে উন্নতি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তাদের পদক্ষেপ সম্মুখের দিকে হবে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও যথার্থ।

কিন্তু এ যে ভীষণ ভুল ধারণা, নিতান্তই খামখেয়ালী। আর তা এই জাহিলিয়াতেই সৃষ্টি। ......ইতিহাসে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিধৃত।

প্রতিটি জাহিলিয়াতেরই একটা সভ্যতা সংস্কৃতি রয়েছে। মূলত বিকৃত ও বিপথগামী সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে লোকেরা মহাকল্যাণময়, বরকতে ভরপুর এবং এমন উন্নয়ন মনে করেছে, যার ঊর্ধ্বের কোনো উন্নয়নই কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র নিশ্চিত অনিবার্যতাই ফল হয়ে দাঁড়াল। সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি অথবা সেই জাহিলিয়াতই নির্মমভাবে বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে গেল। তা-ও এজন্যে যে, মূলত তা ছিল জাহিলিয়াত, বিপথগামিতাই তার আসল প্রকৃতি।

আর জ্ঞান-বিজ্ঞান ? ......তা নিশ্চিয়ই জাহিলিয়াতের ফলশ্রুতি বা অবদান নয়। জ্ঞান বিজ্ঞান তো ক্রমোন্নতিশীল, চির অগ্রসরমান। তা কখনোই কোথাও থেমে থাকে না। ব্যতিক্রমও ঘটে, তবে কচিৎ এবং বিরল। মানবতার অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহতভাবেই চলে এসেছে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান একটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ শক্তি। তা স্বতঃই কল্যাণময় নয়, নয় খারাবিতে ভরা। যে তার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়, তা তারই খিদমতে নিয়োজিত থাকে। তখন তার অগ্রগতি হতেই থাকে। কল্যাণের পথে সে অগ্রগতি হবে, না অকল্যাণ ও অন্যায়ের পথে, তা নির্ভর করে সেই মনিব বা চালকের ওপর, যার কর্তৃত্বাধীন হয়েছে সে জ্ঞান। তাহলে বিজ্ঞান ও জাহিলিয়াত কখনোই এক ও অভিন্ন জিনিস নয়। তা প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র, অন্যনিরপেক্ষ।

বিজ্ঞানের আসল উদ্বোধক হচ্ছে স্বয়ং মানুষের প্রকৃতি। আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রেমিক, শক্তি অর্জনের জন্যে প্রবল আগ্রহী। এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ওপর বেশি বেশি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্র পিপাসাই মানুষকে বিজ্ঞান জগতের অভিযাত্রী বানিয়েছে।

এ কারণেই তা মানব সত্তার ক্ষেত্রে ভাল বা মন্দ হওয়ার দিক থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে মানুষের বিবেক শক্তি, মন নয়। আর বিবেক মানব জীবনের মহাযাত্রায় সাধারণত কোথাওই থামেনা। মানুষের অগ্রগতির সাথে সাথে থাকে। এ কারণে বিজ্ঞান সব সময়ই অগ্রসর হতে থাকে, কোথাও থামতে রাজি হয় না। ব্যতিক্রম আছে অবশ্য। আর বিজ্ঞানের এই বিরামহীন অগ্রযাত্রা যেমন হেদায়েতের পথে, তেমনি গুমরাহীর পথেও সমানভাবে চলে।

ভালো বা মন্দ— হেদায়েত বা গুমরাহী নিহিত রয়েছে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর পন্থা ও পদ্ধতিতে। যে ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ভাল বা মন্দ— হেদায়েত বা গুমরাহী হওয়ার ওপর নির্ভর করে।

তাহলে নিশ্চিতভাবে মনে করতে হবে, বিজ্ঞান ও জাহিলিয়াত এ দুয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। দুটি দুই স্বতন্ত্র দিগন্তে অবস্থিত।

বিজ্ঞান এ জাহিলিয়াতের সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত নয়। এমন নয় যে, জাহিলিয়াত না হলে বিজ্ঞান হতো না, হতো না বিজ্ঞানের এতটা উন্নত, উৎকর্ষ। অতএব বিজ্ঞান নিতে হলে জাহিলিয়াতকেও নিতে হবে, নতুবা বিজ্ঞানকে পাওয়া যাবে না, এই কথা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। জাহিলিয়াত ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের গতি থেমেও যাবে না। তবে জাহিলিয়াত যদি অপসৃত হয় এবং তদস্থলে ইসলামী জীবন পদ্ধতি বাস্তবায়িত

হয়, তা হলেই বিজ্ঞানের প্রকৃত কল্যাণ পাওয়া সম্ভব হবে, বাঁচা সম্ভব হবে তার সব অকল্যাণ থেকে; এ কথায় কোনোই সন্দেহ নেই।

বিশ্বমানবতা আল্লাহ্‌র পদ্ধতির বাস্তব অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে লাভ করেছে। আল্লাহ্‌র পথে চলার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হওয়াও সম্ভবপর হয়েছে। এমন এক বিরাট বৈজ্ঞানিক আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, যার ফলে ইউরোপকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান পদ্ধতির সাথে পরিচিত করা সম্ভবপর হয়েছিল, ইউরোপীয় লোকেরা মাগরিব ও আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের কাছে থেকেই তা লাভ করেছিল। তার যে শুভ ফল পাওয়া গেছে এবং নিত্য বর্ধমান শুভ ফল পাওয়া যাচ্ছে, তার দরুনই ইউরোপ আজ এতটা অগ্রসর হতে পেরেছে এই ক্ষেত্রে।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞান আধুনিক পাশ্চাত্য জাহিলিয়াত সৃষ্ট বা উদ্ভাবিত নয়। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, আধুনিক জাহিলিয়াতই বরং বিজ্ঞানকে অন্যায় পাপ উৎস উদ্ভাবন ও ধ্বংসের পথে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে।

আসলে বিজ্ঞান মানবীয় চেষ্টা-সাধনা ও মেধারই ফলশ্রুতি। ইতিহাসের গভীরতর তলদেশে তার শিকড়সমূহ বিস্তীর্ণ ও সম্পৃক্ত। এক জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীর কাছে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হস্তান্তর করে আসছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে। শেষ পর্যন্ত তা এসে ইউরোপীদের হাতে পড়েছে। ইউরোপীয়রা তার সাহায্যে দুনিয়া জয়ের অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তারা পূর্বের মতই বিপথগামী ছিল বলে বিজ্ঞানকেও ভুল ও মারাত্মক পথে ব্যবহার করেছে। ফলে তারা মানুষের নৈতিকতা বিপর্যস্ত ও গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করেছে এই বিজ্ঞানেরই সাহায্যে।

এক্ষণে আমরা যদি বিজ্ঞানকে আধুনিক জাহিলিয়াতের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হই, তা হলে তখন এক অন্ধ জাহিলিয়াতই দাঁড়িয়ে থাকবে, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

সন্দেহ নেই, এই জাহিলিয়াতের যুগে ভালো বা শুভ ও কল্যাণ কিছু না কিছু এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

মানবতা সম্পর্কে কিছু চিন্তা গবেষণাও রয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিকতা, নৈতিক চরিত্র ও শিল্প পর্যায়ে কিছু না কিছু গবেষণা অবশ্যই হয়েছে। কিছু আংশিক ন্যায়পরতা, আংশিক মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য, কিছু কিছু আংশিক কল্যাণ উপার্জনও মানুষ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাহ্যত তা বিরাট— কেননা নব্যযুগে প্রতিটি জিনিসই তার বিরাটত্ব দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

কিন্তু জাহিলিয়াতের এই সব মূলধন ও কল্যাণের মানদণ্ড এই নয় যে, জাহিলিয়াত যেভাবে এসব কল্যাণকে বড় আকার দানকারী দর্পনের সাহায্যে বড় করে দেখিয়েছে, তা আসলেও বুঝি খুব বড় কিছু। দর্পণে প্রতিফলন দেখেই আপনি সন্তুষ্ট ও উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সত্যিকার নির্ভুল মানদণ্ড হচ্ছে এইসব কল্যাণের বিপরীতে খারাপ কতটা জুলুম-পীড়ন ও সীমালংঘনতা কতটা। কেননা একটুখানি সামান্য কল্যাণের বিনিময়ে এক বিরাট ও ভয়াবহ পাপ ও অন্যায় অশুভ শক্তি গোটা মানবতাকেই গিলে ফেলে দেবে— সর্বত্র তাই তো লক্ষ্য করা যাচ্ছে— তা তো কোনো ক্রমেই সমর্থনীয় হতে পারে না।

বিচ্ছিন্ন ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একটুখানি কল্যাণ যত বড়ই হোক, মানবতা বিধ্বংসী এই অন্যায় ও অশুভকে তার বিনিময়ে গ্রাহ্য করা যায় না।

এ পর্যায়ে আমাদের স্মরণ করতে হবে ঃ

পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র ও প্রোলেটারী স্বৈরতন্ত্র এবং তার অধীন মানবতার যে অপমান ও লাঞ্ছনা তা আমরা কি করে ভুলে যেতে পারি ?

রাজতান্ত্রিক বা ব্যক্তি-মালিকানা ব্যবস্থাধীন স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় প্রজা সাধারণকে যেভাবে দাসানুদাস বানানো হয়, আবার ব্যক্তি-মালিকানা হরণ করে জনগণকে যেভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়, তার কথা কি ভুলে যাওয়া কারোর পক্ষেই সম্ভব ?

ব্যক্তিতন্ত্র যে সামাজিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, আর সর্বাত্মক সামাজিকতাবাদ যেভাবে ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়— আর এই উভয় ক্ষেত্রে যে লজ্জাষ্করভাবে নৈতিকতাকে ক্রমাগতভাবে ধ্বংস করা হয়, কোনো সচেতন মানুষই কি তা ভুলে যেতে পারে ?

নারী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কে যে মারাত্মক বিপর্যয় এনে দিয়েছে, আর তদ্দরুণ মানুষের মনে ও সমাজে চূড়ান্ত মাত্রার অস্থিরতা, ভীতি বিহ্বলতা এবং পুরুষ নারী শিশুর জীবনে যে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করেছে, তা কি কোনো প্রকারেই উপেক্ষণীয় ?

শিল্পের ভুল ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যাখ্যা তো মানুষের মনে প্রত্যাঘাত করে ও তাকে ভেঙ্গে গুড়া গুড়া করে দেয়।

কোনো জিনিসই তো বিপর্যয়ের সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবনের হাত থেকে রেহাই পায়নি!

এই মারাত্মক অবস্থার বিপরীতে এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা কল্যাণ আকারে তাকে যত বড় করেই দেখানো হোক খুবই সামান্য ও নগণ্য প্রমাণিত হবে।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু ছিটেফোটা কল্যাণের আসল তত্ত্ব হল, তাগুতী শক্তি মানবতাকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে খুবই হালকা ও নগণ্য ধরনের 'ভালো' করে দেখায়, যেন তার নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব অপ্রতিরোধ্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর জনগণ কোনোরূপ উচ্চ-বাচ্য না করে তাগুতী শক্তির গোলামীর ফাঁদ নিজে দের গলায় পরতে প্রস্তুত হয়। অতঃপর বেঁচে থাকবে শুধু সেই তাগুতী শক্তিই। সকল ফায়দা, মধু ও কর্তৃত্ব সে একাই ভোগ করবে নির্বিঘ্নে , নির্ভয়ে, অবাধে।

এই সব সত্ত্বেও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত নবতর জাহিলিয়াত ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়ে আছে। মানুষ যতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাগুতী শক্তির দাসত্ব গ্রহণ করুক কিংবা গোলামীর রশিটা খুলে দূরে নিক্ষেপ করার জন্যে চেষ্টা ও সংগ্রাম করুক, জাহিলিয়াতের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না।

আল্লাহ্র বানানো 'তাকদীর' এবং তজ্জনিত 'বাধ্যবাধকতা'ও মানব জীবনে নিজস্ব ভূমিকা পালন করে থাকে। আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর এবং আল্লাহ্র চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যবাধকতার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, এ জাহিলিয়াত চিরস্থায়ী নয়, চিরদিন তা থাকবে না, থাকতে পারবে না। কোনো না কোনো একদিন তাকে অবশ্যই বিলীন হয়ে যেতে হবে। আর তা বিলীন হবে এই কারণে যে, তার মধ্যে বেশির ভাগ রয়েছে পাপ অন্যায় অশুভ ও অকল্যাণ। এই কথাই আল্লাহ্ বলেছেন এ আয়াতটিতে ঃ

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ - وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً -

পূর্বে অতীত হয়ে যাওয়া লোকদের ক্ষেত্রে এ হচ্ছে আল্লাহ্র নিয়ম। আর আল্লাহ্র নিয়মে তুমি কখনোই ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন পাবে না। (সূরা আহযাব ঃ ৬২)

কিন্তু আল্লাহ্র যে সুন্নত এই জাহিলিয়াতের চূড়ান্ত অবসানকে নিশ্চিত ও অনিবার্য করেছে, তা চায় না যে, এ জাহিলিয়াতের অবসানের পর স্বতঃই কল্যাণের শাসন কায়েম হয়ে যাবে। এ তো মানুষের ইচ্ছাধীন। তাগুতের অবসানের পর সে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্র হেদায়েতকে গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে অপর একটি

তাগুতকে নিজের ওপর তুলে নেবে, সুযোগ করে দেবে প্রতিষ্ঠিত হতে। পুঁজিবাদের তাগুত যেমন করে ধ্বংস হয়ে গেল, আর অমনি সমাজতান্ত্রিক তাগুত লোকদেরকে সহসাই গ্রাস করে ফেলল। এ পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নিয়ম স্থায়ীভাবে ঘোষিত হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْامَا بِاَنْفُسِهِمْ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নিজে থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থারই পরিবর্তন করে দেন না, যতক্ষণ না সেই জনগোষ্ঠী নিজেরাই তাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করবে। (সূরা-রা'আদ ঃ ১১)

এ কারণে একটি জাহিলিয়াতের অবসানের পূর্বেই গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে নেওয়া জনগণের কর্তব্য যে, অতঃপর তারা কোন পথে অগ্রসর হবে। বর্তমানের তাগুতের অবসানের পর নিজেদেরকে নতুন কোনো তাগুতের অধীন বানিয়ে দেবে কিংবা তাগুতের কর্তৃত্ব থেকে প্রকৃত মুক্তির পথ তারা খুঁজে নেবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কি এই অবস্থার প্রতিকার, রোগের চিকিৎসা, মুক্তির সেই পথ?

ইসলাম ছাড়া গতি নেই

প্রখ্যাত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছিলেন ঃ শ্বেত চর্মের ব্যক্তিদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এই কথাটি বলে কোনো অভিনব খবর পরিবেশন করেন নি। আসলে তাঁর এই প্রখ্যাত কথাটির মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীতে বিরাজমান প্রকৃত বাস্তাব ও সত্য কথাই প্রচার করেছেন। সমকালীন প্রখ্যাত দার্শনিক তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যে মহাসত্য দেখতে পেয়েছিলেন, তা-ই তিনি উক্ত বাক্যটির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন মাত্র। যদিও সাধারণ মানুষ এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্বদানের জন্যে বিপুল সংখ্যক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী দুনিয়ায় কর্মব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু উক্ত দার্শনিকের কথাটিতে পূর্ণ সত্য ধরা পড়েনি। তাতে অবশ্য অতীব আংশিক সত্যেরই স্বীকৃতি রয়েছে। পূর্ণ সত্য ধরা না পরার কারণ তিনি নিজেই তো আধুনিক জাহিলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করছেন। এই জাহিলিয়াতের ভাবধারা ও চিন্তা প্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। জাহিলিয়াত নিজেই যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা অনুভব করা তার পক্ষে অসম্ভব রয়ে গেছে।

আসল সত্য হচ্ছে, শ্বেতাংঙ্গদের সভ্যতা বিপথগামী এবং তা-ই ধ্বংসের মুখে এসে গেছে। অতঃপর চূড়ান্তভাবে তার অবসান অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাকে রক্ষা করা আর কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষ ভাগে যেমন বলেছি, বর্তমান জাহিলিয়াতের অবসানের পর অনিবার্য ও নিশ্চিতভাবেই কল্যাণময় ব্যবস্থা স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

কেননা যে কোনো জাহিলিয়াতের অবসানে জনগণের জন্যে একটি মহাসুযোগ এসে যায় মাত্র। তখন তারা ইচ্ছা করলে কল্যাণময় বিধানের ওপর তাদের জীবনকে পুনর্গঠিত করতে পারে। আর তাও সম্ভব হয় যদি তারা আল্লাহ্‌র দেখানো পথে ও পদ্ধতিতে এই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করে। যদি বিশ্বাস করে যে, এ ব্যবস্থাটি প্রকৃত সত্য এবং তা তাদের মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে। তবেই তা তাদের জন্যে মুক্তি ও নিষ্কৃতির পথ হতে পারে— যদি তারা নিজেরাই তা অন্তর দিয়ে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

কিন্তু এই সুযোগ ও অবকাশকে যদি তারা গুরুত্ব না দেয়, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি সঠিক পথে প্রাণপণ চেষ্টা না চালায়, তা হলে সে

কল্যাণময় বিধান কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। কেননা কোনো বিধানই স্বতঃই মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর তা প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক জাহিলিয়াত থেকে মুক্তি পেয়ে আর একটি জাহিলিয়াতের অধীনে চলে যেতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় এক তাগুতের গোলামীর পরিবর্তে আর এক তাগুতী শক্তির গোলামী করতে।

তবে এবারে বর্তমান জাহিলিয়াতের অবসানের পর বিশ্বমানবতা আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়েতের পথ গ্রহণ করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। কেননা এবারে বাছাই করে অন্য কিছু গ্রহণের আদৌ কোনো অবকাশ নেই।

এ জাহিলিয়াতের অধীন দুনিয়ার মানুষ সম্ভাব্য সব কটি ব্যবস্থা ও বিধানেরই বাস্তব পরীক্ষা শেষ করে ফেলেছে, লাভ করেছে সব কয়টি সম্পর্কে বাস্তাব অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিবাদ, সামষ্টিকবাদ, পুঁজিবাদ, কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র, ব্যক্তিমালিকানা, সমষ্টিক মালিকানা, রাজতন্ত্র ও অরাজতন্ত্র— মানুষের চিন্তায় আসতে পারে বা এসেছে এমন সব কয়টি ব্যবস্থারই বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্ণ মাত্রায় হয়ে গেছে। এখন এমন কিছুই অবশিষ্ট নেই, যার পরীক্ষা নতুন করে করার প্রয়োজন থাকতে পারে। সব কয়টি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার অধীন জীবন যাপন করে তার ভালো বা মন্দ সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে বুঝে নিয়েছে।

মানুষ খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিধেয় ও যৌন প্রভৃতি অনুভবযোগ্য সব কয়টি বস্তুরই পরীক্ষা করেছে, সব কয়টি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

মানুষের গড়া সব কয়টি 'খোদা'র প্রতিই ঈমান এনে মানুষ নিজেই নিজের খোদা হয়ে এবং সকল খোদাকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেও রূঢ় নাস্তিকতাবাদী জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু কি পেয়েছে মানুষ...?

প্রতিটি অভিজ্ঞতায়ই তার দিশাহারা অবস্থা, তার দুর্ভাগ্য, অস্থিরতা, সম্পর্কসমূহের তিক্ততা যা হয়েছে বা হতে পারে— অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ কারণে এক্ষেত্রে নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর কোনো অবকাশ-ই নেই, থাকতে পারে না।

এক্ষণে বিশ্বমানবতা এক চূড়ান্ত অবস্থা— চূড়ান্ত ফয়সালার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

হয় আল্লাহ্, না হয় চূড়ান্ত ধ্বংস, চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়া...হয় আল্লাহ্‌র দেখানো পথকেই শক্ত করে ধরতে হবে নতুবা পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যেতে হবে...।

তবে আমরা তো ভবিষ্যৎ জানি না, মানবতার ভবিষ্যৎ.....আগামীকাল... কি ঘটবে, তা নিশ্চিত অনিবার্য হিসেবে বলা তো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা তা 'গায়ব'। আর ঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -

বলো, হে নবী! আসমান জমিনে যারা রয়েছে তারা কেউই গায়ব জানে না, তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (সূরা নমল ঃ ৬৫)

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا-

মানুষ আগামীকাল কি অর্জন বা উপার্জন করবে, তা সে জানে না। (সূরা লোকমান ঃ ৩৪)

হ্যাঁ, আমরা গায়ব জানি না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা আল্লাহ্র প্রবর্তিত সুন্নাত— নিয়ম-নীতি অধ্যয়ন করতে অবশ্যই পারি, যে সুন্নাত সম্পর্কে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا -

অতীত হয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র একটা সুন্নাত কাজ করেছে, সে সুন্নাতে তুমি (ভবিষ্যতেও) কোনো পরিবর্তন (বা ব্যতিক্রম) পাবে না। (সূরা আহযাব ঃ ৬২)

আর আধুনিক জাহিলিয়াতের মধ্য দিয়ে মানুষ যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র সুন্নাত অকাট্যভাবে বলে দিচ্ছেঃ

হয় হেদায়েতের পথ গ্রহণ করো,

না হয়, চূড়ান্ত ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।

জাহিলিয়াত একের পর এক আসে। অবস্থান করে তার মধ্যে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কল্যাণের পরিমাণ অনুপাতে। অতঃপর অকল্যাণ ও অশুভ সীমালংঘন করে, সর্বাত্মকভাবে সবকিছু গ্রাস করে নেয়। তখন সেই পরিবেশ 'বিক্ষিপ্ত কল্যাণ' কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তার জন্যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে শ্বাস-প্রশ্বাস করা ও অন্ততঃ বেঁচে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

ব্যাপার যখন খারাবির এই শেষ সীমায় পৌঁছে যায় ঠিক তখনই আল্লাহ্ তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন 'পরিবর্তন' সূচিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্র এই হস্তক্ষেপ হয় মানুষের নিজের চেষ্টা সাধনা অনুপাতে। মানুষ নিজেরা যা করে, আল্লাহ্ সেই কাজ সফল বা কার্যকর করে দেন মাত্র। এ কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতটিতে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ـ

মানুষ নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করলে আল্লাহ্ নিজেই কারো অবস্থার পরিবর্তন নিশ্চয়ই করে দেন না। (সূরা রা'আদ ঃ ১১)

তবে আল্লাহ্র একটা চূড়ান্ত পর্যায়ের হস্তক্ষেপ রয়েছে। মানুষ যখন সীমালংঘন ও আল্লাহ্দ্রোহীতার চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন আল্লাহ্ ভূমি ধ্বস ঘটিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধ্বংস করে দেন। কিংবা অন্যভাবে সে সীমালংঘনতার অবসান ঘটনা।

আর মানুষ যদি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর বিধানকে অবলম্বন করে, তখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয়। তখন মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনের অধীনতা গ্রহণ করে।

বর্তমানে আমরা এমন দ্বারপথে উপনীত, যেখানে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার হস্তক্ষেপ সর্বাত্মকভাবে কার্যকর হতে পরে। কেননা বর্তমান দুনিয়ার ক্ষমতাসীন লোকেরা আল্লাহ্দ্রোহিতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কল্যাণের সবদিক ও বিভাগ এখন এমনভাবে বন্দীদশায় পড়ে গেছে যে, এই তাগুতের অধীন কোনো কিছু করা তার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। এক্ষণে জনগণের বাছাই করার কঠিন মুহূর্ত উপস্থিত।

হয় মানুষ চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক ধ্বংসের কবলে পড়বে, সত্য পথ পরিহার করে চলার বর্তমান অবস্থার মধ্যেই যদি তারা থেকে যায় এবং এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন না করে।

না হয় তাকে আল্লাহ্র দ্বীনের হেদায়েত পূর্ণ মাত্রায় অবলম্বন করতে হবে, তাতেই স্থির হতে হবে, পূর্ণ মানসিক শান্তি, স্বস্তি ও স্থায়িত্ব সেখান থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

আমরা অবশ্য মানুষের প্রতি ভালো ধারণাই পোষণ করি। আমাদের বিশ্বাস আছে আল্লাহ্র নির্ধারণ তাকদীর-এর ওপরও। আমরা মহান আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই এরূপ ধারণা থেকে যে, বিশ্বমানবতা ধ্বংসের পথটিকেই বাছাই করবে।

তাহলে অতঃপর একটি মাত্র পথ বা উপায়ই অবশিষ্ট থাকে। আর তা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ্ও তাই ঘোষণা করছেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণীয় হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯)

মানুষ বর্তমানে কঠিন জাহিলিয়াতের মধ্যে পড়ে চরম মাত্রার বিভ্রান্তির আবর্তে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। তার দুর্ভাগ্যের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য

অবস্থা এখন তার। তার মনে ভয়াবহ উৎকণ্ঠা, অশান্তি ও অস্থিরতা তাকে প্রকম্পিত করছে। তার জীবন, চিন্তা ও আচার আচরণ সভ্যতা সংস্কৃতি সবকিছুই ছিন্নভিন্ন ও টুকরা টুকরা হয়ে আছে। এই করুণ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে কেবলমাত্র ইসলাম। ইসলাম ছাড়া মানুষের বাঁচার আর কোনো পথ নেই।

এই কথা কেবল আজকেই যে সত্য ও প্রকট, তা নয়। ইতিহাসের সবকয়টি জাহিলিয়াতেও প্রকৃত মুক্তি কেবল ইসলামের দ্বারাই সম্ভব ছিল।

তবে আমরা এখানে ইসলাম বিস্মৃত বা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিনি। তা আমরা ব্যাপক ও সর্বাত্মক অর্থেই ব্যবহার করছি। আমরা সেই দ্বীন ইসলামের কথাই বলছি, যা নিয়ে এসেছিলেন— প্রচার করেছিলেন হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)।

এই দ্বীন ইসলাম সর্বশেষ পর্যায়ে এসে সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ এই ঘোষণাটি তার সর্বশেষ কালামের মাধ্যমে দিয়েছেন এই ভাষায়ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

আজকের দিনে আমি পূর্ণ পরিণত করে দিলাম তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে, সম্পূর্ণ ও নিঃশেষ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার এই নেয়ামতকে এবং তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই পছন্দ ও মনোনীত করে দিলাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

আল্লাহ্র এ ঘোষণানুযায়ী দ্বীন-ইসলামের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ রূপই পৃথিবীর সকল প্রকারের জাহিলিয়াত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়। বিশেষভাবে বর্তমান যুগের এই প্রতিষ্ঠিত জাহিলিয়াত থেকে মুক্তির উপায় এই ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নেই, থাকতে পারে না।

জাহিলিয়াত দুনিয়ায় যত বিপর্যয় ঘটিয়েছে, ইসলাম তার প্রতিটি জিনিসকেই যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত করে, যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে। ইসলামের এই পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপনের কাজ যেমন ধারণা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, তেমনি বাস্তব আচার-আচরণেও। যেমন রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে তেমনি নৈতিকতায়, শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, তেমনি দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। জীবনের কোনো একটি জিনিসও ইসলামের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার আওতাবহির্ভূত নয়।

আমরা এ পর্যায়ে এই সব বিষয় সংক্রান্ত ইসলামের মৌল আদর্শ, তাৎপর্য ও ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা পেশ করব। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা দেখব, আধুনিক জাহিলিয়াত মানুষের সত্তা ও জীবনকে সর্বাত্মকভাবে ধ্বংস করেছে, তার জীবনের সবদিকে অশান্তি অস্থিরতা ভাংচুর বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করেছে, কিন্তু দ্বীন-ইসলাম তথায় ব্যাপক পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপনের কাজ করছে। মিথ্যার স্থলে সত্যকে, অস্পষ্টতার বদলে স্পষ্টতা, বাকা-চোরা দুর্বল নীতির পরিবর্তে সুদৃঢ় সুষ্ঠু সরল ঋজুপথ প্রতিস্থাপিত করছে। ফলে সামষ্টিকভাবে মানবজীবন পুনর্গঠিত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠছে, সমগ্র ও শাখা-প্রশাখা, অংশ ও মূল সবকিছুই সঠিক নির্ভুল ও যথার্থভাবে প্রতিস্থাপিত হয়ে প্রকৃত মানবীয় জীবন হিসেবে গড়ে উঠছে।

এ জাহিলিয়াত আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণাকেও বিকৃত করেছে। এই বিশ্বলোক প্রাকৃতিক জগৎ, এখানে জীবন এবং মানুষ কোনো কিছু সম্পর্কেই নির্ভুল ধারণা দেয়নি, দিতে পারেনি। শুধু তা-ই নয় যা ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল, সঠিক, তাকেই বিস্মৃত ও অস্পষ্ট করে দিয়েছে এই জাহিলিয়াত।

এই সংক্রান্ত ধারণা বিকৃত হওয়ার কারণেই এসব ক্ষেত্রে মানুষের কর্মনীতি ও আচার-আচরণও বিকৃত হয়ে পড়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিকতা ও শিল্প-সংস্কৃতি কোনো ক্ষেত্রেই মানুষের আচরণ নির্ভুল থাকতে পারেনি।

কিন্তু এই সব সম্পর্কে সঠিক নির্ভুল ধারণা যখন মানব মনে দৃঢ় প্রতিস্থাপিত হবে, সঠিক ও নির্ভুল হবে, তখন এসব বিষয়ও নির্ভুল পথে চলতে থাকবে। থাকবে না কোনো বিকৃতি, ভুল ও বিভ্রান্তি। তার কারণ এই যে, মানুষের বাস্তব আচার-আচরণের মৌল প্রেরণায় উৎস হচ্ছে তার ধারণা ও বিশ্বাস। ধারণা-বিশ্বাস নির্ভুল হলে জীবন-চরণও নির্ভুল হবে, আর ধারণা-বিশ্বাস ভুল হলে জীবনাচরণও অনিবার্য ভাবে ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ হবে, তা থেকে রক্ষা নেই।

ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে মানবতা একবার জীবন, মানুষ, বিশ্বলোক ও বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা লাভ করেছিল। মুসলিম উম্মতের মাধ্যমেও সেই নির্ভুল ধারণা বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, যে মুসলিম উম্মত মুহাম্মাদ (স)-এর নেতৃত্বে গঠিত ও তাঁর কাছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়েছিল। এদের সম্পর্কেই বিশ্বমালিক আল্লাহ্ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

তোমরাই হচ্ছে সর্বোত্তম জনগোষ্ঠি, তোমাদেরকে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে। তোমরা সব ভালো কাজের আদেশ করো, সব মন্দ কাজের নিষেধ করো এবং সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

এ তো সেই সময়ের কথা, যখন বাস্তবিকই মুসলিম উম্মত সঠিকরূপে গড়ে উঠেছিল, তাদের জীবনের সব দিক সঠিকভাবে গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়েছিল। তা ছিল মানবতার ইতিহাসে এক সর্বাত্মক আন্দোলন। সে আন্দোলনের স্রোত প্রবাহে সব আবর্জনা ভেসে গিয়েছিল। সবকিছু হয়েছিল পরিচ্ছন্ন, পূত ও পবিত্র। এ আন্দোলন ছিল আল্লাহ্র হেদায়েত ভিত্তিক। দুনিয়ার সর্বত্র আল্লাহ্র বিধান ব্যাপকভাবে প্রচার করার মাধ্যমে জাহিলিয়াতের অবসান ঘটানো হয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মুসলিম উম্মত আল্লাহ্র পথ থেকে ক্রমশ ও ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে ও বিপথগামী হতে থাকে। যদিও তারা ছিল নীল আকাশের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, পৃথিবীর প্রতিটি দিক উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে দিচ্ছিল তারা। মানুষকে শিক্ষাদান করছিল আল্লাহ্র বিধান, তাদের পরিচালিত করছিল সঠিক, নির্ভুল ও ভারসাম্যপূর্ণ পথে। কিন্তু পরে তাদের নিজেদের ভেতরেই অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। ত্যাগ করে আন্দোলন। গতিশীলতা ও কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলে। আর ঠিক এই সময়েই তাদের ওপর চেপে বসে আধুনিক জাহিলিয়াত। তার বাড়াবাড়িপূর্ণ ও সীমালংঘনমূলক আচরণ তাদেরকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। আর শেষ পর্যন্ত তারা দ্বীন ইসলাম থেকেই বের হয়ে যায় এবং জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে থাকে।[১]

আজকের মুসলমানদের ব্যাপার যা-ই হোক, ইসলাম তো কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর হাতে বন্দী নয়, নয় একান্তভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীল। ইসলাম তো আল্লাহ্র 'নূর' এবং তা সব মানুষের জন্যে। প্রতিটি মানুষের জন্যেই তার দ্বার সদা উন্মুক্ত। আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا -

হে নবী, আপনাকে তো নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের জন্যে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শন করে পাঠিয়েছি। (সূরা সাবা ঃ ২৮)

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

হে নবী, আপনাকে সারাজাহানের জন্যে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭)

১. 'আমরা কি মুসলিম' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আধুনিক জাহিলিয়াত যত বিপর্যয়েরই সৃষ্টি করুক না কেন, ইসলাম তাকে সহীহ নির্ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত করে দেবে।

সব কয়টি জাহিলিয়াত সবচেয়ে বড় যে বিকৃতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এবং তদ্দরুন জনগণের আকীদা, ধারণা ও বাস্তব জীবনাচরণে যে বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে, আসল কারণ হচ্ছে মানুষের জীবনে মেনে এসেছে যে দুর্ভাগ্য, হতাশা, বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা, তার প্রকৃত ইলাহ সম্পর্কেই ভুল ধারণা। 'ইলাহ' সম্পর্কিত এই ভুল ধারণার কারণেই আল্লাহ্র ইবাদত থেকে মানুষের বিপথগামিতা ঘটেছে। জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমেই সেই ইবাদত বাস্তবায়িত হতে পারত। কিন্তু সেই পদ্ধতি থেকেও তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে।

এই মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকেই ইসলামের সূচনা। এখান থেকেই শুরু হয় ইসলামের সংশোধন, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপনের অভিযান।

বিশৃঙ্খলভাবে নয়, দুর্ঘটনা হিসেবেও নয়, বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে কুরআন সুদীর্ঘ তেরটি বছর শুধু এই একটি মাত্র ব্যাপারেই— যা মৌল ও আমল অতিবাহিত করেছে। এই পর্যায়ে তার যে একটি মাত্র কাজ ছিল, তা হচ্ছে আল্লাহ্ সম্পর্কে নির্ভুল বিশ্বাস সৃষ্টি, আকীদাকে যথার্থরূপে গড়ে তোলা।

তদানীন্তন আরব সমাজ গভীর পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত ছিল, কেবল এই কারণেও নয়। তা ছাড়াও আসল কারণ ছিল, যা সব কিছুরই পূর্বে সম্পাদিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা আকীদাকে কেন্দ্র করেই তো মানুষের গোটা জীবন গড়ে ওঠে সুবিন্যস্ত হয়। মানবমনে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাপারটি যথার্থভাবে শক্ত হয়ে গড়ে না উঠবে, মনে ও মগজে তা সুদৃঢ়ভাবে না বসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র জীবন প্রাসাদটি সঠিকরূপে গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। প্রাসাদ শক্ত ও স্থিতিশীলও হতে পারে না। সমগ্র জীবন প্রাসাদ তো এই ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠতে পারে।

আধুনিক জাহিলিয়াতের বাস্তবতায় আমরা এই মহাসত্যের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। কেবলমাত্র আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণাটি বিপর্যস্ত হওয়ার দরুন সমগ্র মানুষের গোটা জীবনটাই কি ভাবে বিপর্যয়ের গ্রাসে পড়ে গেল, তা আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারছি। এরই কারণে মানুষের জীবন পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। তাদের পক্ষে নির্ভুল হেদায়েতের দিকে ফিরে আসা আর সম্ভবপর হয়নি, কোনো স্থির আকীদাকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তার দরুন মনে-মগজে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও স্থিরতা লাভও তাদের ভাগ্যে জুটেনি।

ঠিক এই কারণেই মক্কায় অবতীর্ণ কুরআন কেবল আল্লাহ্ সম্পর্কিত সঠিক ধারণার কথা জনগণকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছে। প্রধানত এই আকীদা সঠিক করা ছাড়া মক্কায় কুরআনের আর কোনো লক্ষ্য বা কাজ ছিল না।

এই আকীদা নির্ভুল হওয়ার পর এরই ভিত্তিতে যখন একটি সমাজ গঠিত হলো, অতঃপর মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন কুরআন দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন ও বিধান নাযিল করার ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দানের কাজ শুরু করল। সে আইন বিধান ছিল ইবাদত সম্পর্কে, ছিল 'মুয়ামিলাত' (পারস্পরিক কার্যাদি) সম্পর্কে। মুসলিম উম্মতের ওপর ধার্য করা ফরযসমূহও তাতে বর্ণিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মতকে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর জন্যে করণীয় দায়িত্ব যথার্থরূপে পালনযোগ্য করে তৈরি করা। কিন্তু তাই বলে এ পর্যায়েও আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা ও আকীদার ব্যাপারটির প্রতি বিন্দুমাত্রও উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়নি। কেননা কুরআনের আইন বিধানকে বাস্তবভাবে মেনে চলা ও অনুসরণ করা সম্ভব হতে পারে, যদি আকীদা সঠিক থাকে। এ ব্যাপারটি সব সময়ই শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে লেগে রয়েছে। বরং তা-ই ছিল ভিত্তি, তার ওপর আইন-বিধান স্থাপিত হয়েছে জীবনের যাবতীয় আচরণে ও মুয়ামিলাতে।[১]

আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা ইসলাম সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করেছে। বলেছে, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই বিশ্বলোক ব্যবস্থাপক পরিচালক, তিনিই মৌলিকভাবে রিযিকদাতা, তিনিই সবকিছুর মালিক, তিনিই সার্বভৌম, আর তিনিই একমাত্র মা'বুদ।

অতীব সহজ পদ্ধতিতে, সরল ভাষায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে এসব জরুরি কথা।

বলেছে, তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ্ নয়, নেই। সমগ্র বিশ্বলোকেও তিনি ছাড়া ইলাহ্ অন্য কেউ নয়, আসমান লোকে ও জমিনে তিনিই একমাত্র ইলাহ্। তিনি ছাড়া স্রষ্টাও কেউ নেই, মালিকও কেউ নেই। বিশ্বব্যবস্থাপকও কেউ নেই। মালিকানা, রিযিকদান বা সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর শরীক কেউ নেই, তিনি লা-শরীক।

অতএব তিনি ছাড়া মা'বুদও নেই, থাকতে পারে না। সমগ্র বিশ্বলোকে তিনিই একমাত্র— একা তিনি-ই মা'বুদ।

এই সহজ সরল সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট আকীদার ওপরই গোটা দ্বীন-ইসলাম দাঁড়িয়েছে। আর এই দ্বীন নিয়েই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে মুসলিম উম্মত। শুরু থেকে এই মুসলিম উম্মতের ইতিহাসই হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস।

আল্লাহ্ মহান, পবিত্র তাঁর একার 'ইলাহ' হওয়ার অর্থ-ই হল, সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই বান্দা, তিনিই একমাত্র মা'বুদ। আসমান, জমিন এবং তাতে যারা এবং যা কিছুই আছে সবকিছুরই স্রষ্টা ও মা'বুদ তিনি ছাড়া কোথাও কেউ নেই।

---

১. সাইয়েদ কুতুব লিখিত 'ফী যিলালিল কুরআন' সূরা মায়িদা, সূরা আনআম ও সূরা আরাফ দ্রষ্টব্য।

সেই সাথে আরও একটি সহজ সরল সংক্ষিপ্ত বিষয় হচ্ছে, তিনি একাই যখন স্রষ্টা, একাই মালিক, রিযিকদাতা, সার্বভৌম, তখন সৃষ্টিলোকের কোনো জিনিসই তিনি ছাড়া আর কাকে মা'বুদ বানাতে পারে ? তাঁকে ছাড়া আর কার দাসত্ব করা সম্ভব মানুষের পক্ষে ?

কে আছে তেমন......... ?

কে, মানুষ ? মানুষ কি ? মানুষ কি এক আল্লাহ্‌রই একটি সৃষ্টি নয় ? আল্লাহ্-ই-তো তাকে শক্তি দিয়েছেন, স্থিতিশীল বানিয়েছেন। তারই কল্যাণে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন, কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে, সবকিছুকেই। মানুষই কি সৃষ্টি করেছে এই আসমান জমিন এবং তাতে যেখানে যা আছে, তা সব ? সমগ্র প্রাকৃতিক জগত নিরংকুশ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যে আইন ও নিয়ম-কানুন মেনে চলছে, তা কি মানুষ তৈরি করেছে ? ...জারী করেছে ? তা মানতে সবকিছুকে বাধ্য করেছে ? সে সব নিয়ম ও আইনে একবিন্দু পরিবর্তন করার কোনো শক্তি বা ক্ষমতা কি মানুষের আছে ? 'বস্তু' বা 'জড়' এর যা মৌলিক বিশেষত্ব, সেগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন কোনো বিশেষত্ব সৃষ্টি করে দেওয়া কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ? ...আছে মানুষের সাধ্য ? আল্লাহ্‌র কার্যকর করা এসব প্রাকৃতিক নিয়মকে বাদ দিয়ে ভিন্নতর কোনো নিয়মের ওপর বিশ্বলোককে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা কি মানুষের আছে ?........

না, তা নেই, তা আছে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র।

তাহলে সেই এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কে মা'বুদ হতে পারে ?

আল্লাহ্‌র মা'বুদ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক হওয়ার যোগ্যতা আর কা-র আছে ?... কারোর আছে কি ?

কে সে..... ?

নিশ্চিত অনিবার্যতার ?...... নিশ্চিত অনিবার্যতা কি ? কে নিশ্চিত অনিবার্য বানিয়েছে ?......তাকে সত্য মেনে নিলেও প্রশ্ন জাগে, তাকে এই নিশ্চিত অনিবার্যতার মর্যাদা কে দিয়েছে ?... তা কি সারা সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্‌র 'নির্ধারণ' নয় ? মানুষ ও সব জিনিস তা মেনে চলছে-মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে কেন ? ......তা নিশ্চিত অনিবার্য হয়ে থাকলে তা তো শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ্ তার 'নির্ধারণ' করেছেন। তা স্বতঃই তো আর নিশ্চিত অনিবার্য হতে পারেনি। আল্লাহ্ তাই চেয়েছেন বলেই তা হয়েছে। তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া মা'বুদ আর কে হতে পারে? আল্লাহ্‌র সাথে শরীক মা'বুদ কে হতে পারে ?

কে ? ....

একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া মানুষ আর কাকে মা'বুদ বানাবে, গোটা সৃষ্টিলোক তিনি ছাড়া আর কার দাসত্ব করবে ?

এই মা'বুদ হওয়ার অনিবার্য দাবি হচ্ছে, সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র সেই এক আল্লাহ্র জন্যেই নির্দিষ্ট হতে হবে। আর আইন-দর্শনের মৌল কথা হচ্ছে, সার্বভৌমের আদেশ-নিষেধই হচ্ছে আইন, অতএব আল্লাহ্র কাছ থেকেই যাবতীয় আইন-বিধান গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের ইতিহাসে সৃষ্ট প্রতিটি জাহিলিয়াতই এই বিষয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

এমনকি যে জাহিলিয়াত দাবি করত যে, তা আল্লাহ্কে জানে, চিনে, এমনকি, যে জাহিলিয়াত দাবি করত যে, আল্লাহ্র দাসত্ব বা ইবাদত করে, এমনকি, যে জাহিলিয়াত মনে করত যে, তা সত্যিকার ইবাদত করছে আল্লাহ্র জন্যে। ......এই সব কয়টি জাহিলিয়াতই এই সার্বভৌমত্ব ও আইনের উৎস পর্যায়ে বিরাট বিতর্কের অবতারণা করেছে। এই সব কয়টিরই ধারণা হচ্ছে আল্লাহ্র দাসত্ব করা— তাঁর মা'বুদ হওয়া এক কথা, আর সার্বভৌমত্ব কেবল এক আল্লাহ্র— এই স্বীকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আল্লাহ্র কাছ থেকেই আইন গ্রহণ এবং তাঁর কাছে ছাড়া আর কারোর কাছ থেকে আইন গ্রহণ না করার ব্যাপারটির সাথেও কেবল তাঁরই ইবাদত করার সাথে কিছুমাত্র সম্পৃক্ত নয়।

আসলে, وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ -

ওরা আল্লাহ্কে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি, দিতে পারেনি। (সূরা আন'আম ঃ ৯১)

তাদের ধারণানুযায়ী তারা ইবাদত তো করে এক আল্লাহ্র, তাহলে তারাই আবার জীবন বিধান গ্রহণ করে অন্য কারোর কাছ থেকে, তা কি করে সম্ভব হচ্ছে ? আল্লাহ্ যদি তাদের জন্যে আইন না-ই দেন, কিংবা তিনি যদি বলে দিয়ে থাকতেন যে, তোমারা নিজেরাই তোমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন বানিয়ে নাও, তাহলে না হয় একটা কথা হতে পারত।

না, তা নয়। আল্লাহ্ তো শুধু সৃষ্টি করেই শেষ করেন নি। তিনি তো মানুষের জন্যে আইনও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমার দেওয়া আইন তোমরা মেনে চলো। তাঁর ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

যারাই আমার নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

যে লোকেরাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৭)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

যে সব লোকই আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই জালেম। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৫)

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَآءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ -

এবং হে নবী! শাসন প্রশাসন চালাও লোকদের মধ্যে সেই বিধান অনুযায়ী যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং লোকদের কামনা-বাসনা ইচ্ছার অনুসরণ করো না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো— নিজেকে তাদের থেকে বাঁচাও, এই দিক দিয়ে যে, তারা তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র নাযিল করা কোনো কোনো আইনের ব্যাপারে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৯)

এতসব স্পষ্ট অকাট্য নির্দেশ ও ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানকে বাদ দিয়ে লোকেরা কি করে একান্ত নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে শাসন প্রশাসন (হুকুমত) চালাতে পারে, আইন জারী করতে পারে ? ....কার অধিকার আছে তা করার ?

কুরআন মজীদে এই ব্যাপারটিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই বারবার স্পষ্ট ভাষায় আইন প্রসঙ্গের প্রতিটি সূরা বা আয়াতে ঘোষণা দিয়েছে যে, আইন প্রণয়ন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকারের ব্যাপার। তিনিই ইলাহ এবং আইন কেবল তাঁরই চলবে, চলতে পারে। তিনি আইন দিয়েছেনও। আল্লাহ্‌কে একমাত্র 'ইলাহ' মানা হলে আইনও কেবল তাঁরই কাছ থেকে নিতে হবে। আর আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ যদি আর কেউ না হয়ে থাকে, তা হলে আইন-দাতাও কেবল তিনিই হবেন, অন্য কেউ হতে পারবে না। এ দুটি মর্যাদা একই সময় স্বীকৃতব্য। 'ইলাহ' একা তিনি, অতএব সার্বভৌম ও আইনদাতাও তিনি একাই। অতএব এ দুনিয়ায় আইনদাতা হিসেবে আল্লাহ্‌র সাথে কেউ-ই শরীকও হতে পারে না, 'ইলাহ' হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ-ই শরীক নেই। এর বিপরীত হলে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করা হবে। শরীককারী হবে মুশরিক। আর তার অনুসারী লোকেরাও মুশরিক রূপে গণ্য হবে।[১]

১. ফী যিলালিল কুরআন, ৬-৮ খণ্ড।

জাহিলিয়াতের একটি সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক পর্যায়ের গুমরাহী হচ্ছে 'শরীয়ত' (আইন)-কে আকীদা (ঈমান) থেকে বিচ্ছিন্ন করা— আল্লাহ্‌কে 'সার্বভৌম' রূপে না মেনে ভিন্ন এক সত্তাকে সার্বভৌম রূপে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা।

আর এরই ফলে মানব জীবন আল্লাহ্‌দ্রোহিতা ও সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপের দাপটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

বিগত শতাব্দীসমূহের বাস্তব অভিজ্ঞতার এটাই ফলশ্রুতি।

বস্তুত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ যখন মানুষের জন্যে আইন রচনা করে, তখন সে নিজেকে 'ইলাহ' বানিয়ে নেয়। নিজেকে 'ইলাহ' মনে না করলে তার পক্ষে কোনো জিনিস হালাল আর কোনো জিনিস হারাম ঘোষণা করা সম্ভব হতে পারে না। আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে কেউ 'ইলাহ' হবে— নিজেকে 'ইলাহ্' বানিয়ে নেবে, কার্যত সে-ই 'তাগুত' হয়ে বসবে। কুরআনের ভাষায় সে-ই তাগুত, যে আল্লাহ্‌র বিধানকে বাদ দিয়ে হুকুম চালায়। কুরআনে তাকে هَوَى বলা হয়েছে সর্বাবস্থায়ই। এই هَوَى ' ব্যক্তিগত মানসিক কামনা-বাসনা' এক ব্যক্তির হতে পারে, একটি শ্রেণীর হতে পারে, একটি জনসমষ্টির হতে পারে, হতে পারে ক্ষমতাসীন ও শাসক উম্মতের। আধুনিক জাহিলিয়াতের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি, মানুষ মানুষের ওপর শাসনকার্য চালাতে গিয়ে যে কিভাবে 'তাগুত' হয়ে বসেছে। আর মানুষ যখন আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তার দাসত্ব ও হুকুম পালনে রাজি হয়েছে, যখন তাকে আল্লাহ্ ছাড়া আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়াই আইন রচনার ও অর্ডার অর্ডিন্যান্স জারী করার অধিকার দিয়েছে, তখন সকল ব্যাপারেই মানুষের ইবাদতে পরিণত হয়েছে, মানুষের যিল্লাতীর আর কোনো সীমা পরিসীমা থাকেনি। তাগুতী শক্তি প্রবল বিক্রমে মানুষকে তারই মতো মানুষের দাসানুদাস হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছে।

এ পর্যায়েও এই অভিজ্ঞতা ছাড়া ভিন্নতর কোনো অভিজ্ঞতা হতে পারে না। এই অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে ধর্মহীন গণতন্ত্রে ও স্বৈরতন্ত্রে সমানভাবে।

ইসলাম আল্লাহ্ ও সার্বভৌম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপিত করেছে। সে ধারণা সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ নয়। তা বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক সমগ্র বিশ্বলোক, প্রাকৃতিক জগৎ, জীবন ও মানুষ সবকিছু পরিব্যাপ্ত।

প্রাকৃতিক জগৎ 'ইলাহ' নয়। নয় উদ্দেশ্যহীন ও ব্যবস্থাপকহীন কোনো সৃষ্টি। তা নিজের ইবাদত করে না। তা নিজের জন্যে নিজের থেকেই কোনো নিশ্চিত অপরিহার্যতা লাভ করেনি। তার অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের নিশ্চিত অনিবার্যতা একমাত্র আল্লাহ্ থেকেই পাওয়া গেছে।

আল্লাহ্-ই তা সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে সে স্বতঃই আল্লাহ্র বান্দা ও ইবাদতকারী। আল্লাহ্র বিধান মেনে ও অনুসরণ করেই তা চলছে। আল্লাহ্র জারীকৃত নিয়মই তার জন্যে প্রাকৃতিক নিয়ম।

এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ -

অতঃপর ভারসাম্যপূর্ণভাবে স্থিত হলেন আকাশমণ্ডলে, তখন তো ছিল ধুম্র। পরে তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, এসে যাও, ইচ্ছাপূর্ণক হোক বা বাধ্য হয়ে হোক। জবাবে দুটিই বলল, হ্যাঁ, আমরা এসে গেছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্যশীল হয়ে। (সূরা হা-মীম-আস্সিজদা ঃ ১১)

বস্তুত বিশ্বলোক তথা প্রাকৃতিক জগৎ নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি, তাৎপর্যহীনভাবেও নয়। তা সৃষ্টি করেছেন পরম সত্যতা সহকারে।

مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ - (الروم : ٨)

আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা পরম সত্যতা ছাড়া অন্য কোনোভাবে সৃষ্টি করেন নি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ - (الدُخان : ٣٨)

এবং আমরা আকাশ ও পৃথিবী এ দুইয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা তাৎপর্যহীনভাবে সৃষ্টি করিনি।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحَانَكَ - .... (ال عمران : ١٩٠ - ١٩١)

নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি ও রাত্র দিনের আবর্তনে সেই বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে বিশেষ নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে, যারা আল্লাহ্র যিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তা করে আকাশমণ্ডল

ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে। (প্রকৃত যথার্থতা অনুধাবন করে বলে ওঠে)— হে আমাদের রব্ব, তুমি এই সবকিছু নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি অতীব মহান, পবিত্র ....।

কোন পরম সত্যতা সহকারে এই বিশ্বলোক— আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী— সৃষ্টি করেছেন, তার পরিধি ও ব্যাপ্তি কতদূর, তা অনুধাবন করার বুদ্ধিশক্তি মানুষের নেই।

বিবেক-বুদ্ধিগত অনুভূতি শক্তি মানুষকে যেখানে পৌছাতে পারে না, সেখানে হেদায়েতপ্রাপ্ত রূহ্ মানুষকে পৌঁছিয়ে দেয়, পৌঁছিয়ে দেয় আল্লাহ্ পর্যন্ত। কেননা 'রূহ' ও বিশ্বলোক পারস্পরিকভাবে এই জীবন্ত চির সক্রিয় অনুভূতিতে সমানভাবে শরীক রয়েছে যে, উভয়ই আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে। উভয়ই স্বীয় স্রষ্টার দিকে উন্মুখ। উভয়ের অস্তিত্বের উৎস কেবলমাত্র আল্লাহ্— আল্লাহ্র মহান সত্তা। এই কারণে রূহ অনুধাবন করতে পারে, আল্লাহ্ কিভাবে বিশ্বলোককে 'পরম সত্যতা সহকারে' সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে এই পরম সত্যের গভীরতা ও বিশ্বলোকে এই সত্যের ব্যাপকতা বিশালতা কতটা, তা-ও।

অতঃপর মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পায়, বিশ্বলোকে বিশালতা-বিস্তীর্ণতা সম্পর্কে আরও অধিক ধারণা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান সেই মহান সত্য পরিব্যাপ্ত করতে অসমর্থ। কেননা মানুষের এ জ্ঞান বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কিত যে মহান বিরাট সত্যতার ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বলোক, জীবন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তা 'রূহ'-ই অনুধাবন করতে পারে, মানবীয় বিবেক নয়।

জীনব সৃষ্টিও উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক নয় ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ -

(المؤمنون : ١١٥)

তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, আমরা তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছি আর এই কারণে তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না ?

ইসলাম জীবন সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেনি, জীবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপেই সম্মুখে নিয়ে এসেছে। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, মানুষের জীবন পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ইহকাল ও পরকাল এই দুইটি ভাগকে নিয়েই। তা যেমন অভিনব, তেমনি তা উদ্দেশ্যপূর্ণ। সকল প্রকার বাতুলতা, অর্থহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও নিরর্থকতা থেকেই ইসলাম অতীব পবিত্র।

দুনিয়ার জীবনটাই তার একমাত্র জীবন নয়। এই জীবনে যা কিছু প্রকাশমান তা-ই চূড়ান্ত নয়, ঘটনাবলীর বিবর্তন তাতেই নয় শেষ। অন্যথায় তা বাতিল ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে যেত।

দুনিয়ার জীবনটা জীবনের প্রথম ভাগ— অগ্রবর্তী অংশ মাত্র। এই প্রাথমিক জীবন অংশের যাবতীয় কার্যকলাপের ওপর প্রবর্তিত হয় তা তার ফল। পরকালীন জীবনের পরিণতি ফলশ্রুতি, অতএব তা-ই প্রকৃত ও পরম সত্য জীবন।

اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ - (العنكبوت : ٦٤)

পরকালীন ঘর-ই হচ্ছে প্রকৃত জীবন লোকেরা যদি তা জানত!

দুনিয়ার জীবনের বিশেষত্ব দুটিঃ স্থান ও কাল। এ দুটির সমন্বয়ে বৈষয়িক জীবন পরীক্ষার পর্যায়। আর পরকালীন জীবনের স্থান ও কাল নির্দিষ্ট প্রতিফল পাওয়ার জন্যে।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا -

পৃথিবীর উপরভাগে যা কিছুই আছে তার সব কিছুই তার শোভা ও চাকচিক্যের অলংকাররূপে বানিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে তাদের পরীক্ষা করা এই দিক দিয়ে যে, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম আমলকারী কে। (সূরা কাহাফ ঃ ৭)

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ -

আমরা তোমাদের ভালো ও মন্দ দিয়ে পরীক্ষা করব, আমার দিকেই তো তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৫)

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا -

সেই আল্লাহ্ই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? (সূরা মুল্ক ঃ ২)

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -

এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী পরম সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। উদ্দেশ্যে এও যে, প্রত্যেককে তার উপার্জন অনুযায়ী কর্মফল দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। (সূরা জাছিয়াহ ঃ ২২)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাধ আস্বাদন করবে। আর তোমাদের কর্মফল পুরা মাত্রায় দেওয়া হবে কেয়ামতের দিন। (সূরা-আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

এই হচ্ছে জীবন সম্পর্কে ইসলামের দেওয়া পূর্ণাঙ্গ ধারণা। মানব মন এ সম্পূর্কে পূর্ণ মাত্রায় আশ্বস্ত। কেননা মানুষ যখন বুঝতে পারে যে, এই জীবনটাই সবকিছু নয়— এখানেই ভালো বা মন্দের চূড়ান্ত রূপ দেখা যাবে না, এর পরও আর একটি জীবন— জীবনেরই আর একটি পর্যায় রয়েছে, তখন সে একদিকে ইহকালীন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাদ-আনন্দে পাগলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে না— এই জীবনটাই যদি চূড়ান্ত ও সবকিছু হতো, তাহলে এখানের কোনো কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে মানুষ কিছুতেই রাজি হতো না, যা কিছু পাওয়া নেওয়া সম্ভব, তাই পেতে ও নিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করত। এ সুযোগ হারাতে কিছুতেই প্রস্তুত হতো না।

অপরদিকে মানুষ এই স্পষ্ট আকীদার ইসলামের কারণে দ্বিখণ্ড বিশিষ্ট জীবন দর্শনের দরুন নৈরাশ্য ও হতাশার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কেননা মানুষ যখন এই দুনিয়ার নিপীড়ন-বঞ্চনা ও বিপর্যয় দেখতে পায়, দুনিয়ার দুঃখ-দুর্দশা, অস্থিরতা ও আঘাবের স্বাদ গ্রহণ করে, মনে করে যে অবস্থার পরিবর্তন হওয়া এখন আর সম্ভব নয়, এই জুলুমের প্রতিকার যেমন কিছু করার নেই, না এই দুর্ভাগ্য দূর করার কোনো উপায় আছে, তখন মানুষ এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্যোগী না হয়ে নিরস্ত্র ও নিষ্ক্রিয়-নিশ্চেষ্ট হয়ে যায় এবং নৈরাশ্য ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। ইসলামের পরকাল বিশ্বাস মানুষকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করে।

এরূপ পরকাল বিশ্বাসের তৃতীয় কল্যাণময় দিক হচ্ছে মানুষের মন কখনোই ভেঙ্গে পড়ে না। ইনসাফ ও সুবিচার পাওয়ার ওপর তার ভরসা কখনোই নিঃশেষ হয়ে যায় না। তার আমল ও চরিত্রও বিনষ্ট হয় না। পরকাল বিশ্বাস না করলে নিজের ওপরই জুলুম করা হয়, জুলুম করে ও জুলুম সহ্য করে। লক্ষ্য হাসিলের জন্যে সকল পন্থা ও উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু সে উপায় ও পন্থা পবিত্র হয় না যেমন, তেমনি লক্ষ্যও হয় না সুস্থ, সঠিক।

চতুর্থ এই যে, পরকাল বিশ্বাসের দরুনই মানুষ আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌র সাথে পবিত্র-স্বচ্ছ সাক্ষাৎ লাভের আশায় নিজের সমস্ত আমল পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে নেয়।

এই কারণেই ইসলাম পরকালের উল্লেখ করেছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। কুরআন মজীদ পরকালীন সংঘটিতব্য দৃশ্যাবলী বার বার তুলে ধরেছে, পরকালীন জীবনের সাথে এই জীবনের গভীর সম্পর্কের কথা বলেছে, পরকালীন জীবনের কল্যাণ ইহজীবনে কল্যাণেরই ফলশ্রুতি বলেছে, পরকালে সঠিক ফল পাওয়ার জন্যে ইহজীবনের সঠিক আমলের শর্ত আরোপ করেছে। ইহজীবনের ভিত্তি নির্ভুল আদর্শের ওপর স্থাপনের তাগিদ করে।

বস্তুত ইসলাম মানুষকে এক অভিনব ও ভিন্নতর রূপরেখায় পেশ করে। মানুষ 'ইলাহ্' নয়, জন্তু-জানোয়ার ও শয়তানও নয়। মানুষ মানুষই, মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষ আল্লাহ্র সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টির ওপর মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা ও ইয্যত-সম্মান দিয়েছেন। তাকে নিজের খলীফা বানিয়েছেন।

জাহিলিয়াত মানুষ পর্যায়ে বড্ড দিশেহারা। কখনও তাকে 'ইলাহ্' বানিয়েছে, কখনও বানিয়েছে জন্তু-জানোয়ার। আবার কখনও তাকে নিশ্চিত বাধ্যবাধকতার ও অনিবার্যতার দেবতাগণের সম্মুখে নিকৃষ্ট-হীন-লাঞ্ছিত দাসানুদাস বানিয়ে রেখেছে।

কিন্তু ইসলাম মানুষকে সঠিক ও যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। তাতে যেমন বিকৃতি বা বিপথগামিতা নেই, প্রকৃত সত্য রাজপথ থেকে একবিন্দু বিচ্যুতিও নেই তাতে।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً -

স্মরণ করো, তোমার রব্ব্ যখন ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগকারী। (সূরা বাকারা ঃ ৩০)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ - فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ -

তোমার রব্ব যখন ফেরেশ্তাদের বললেন, আমি মাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করব। তবে যখন তাকে পুরোপুরি বানালাম এবং তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুঁকে দিলাম, তখন তারা সকলে তাঁর জন্যে সিজদায় পতিত হলো। (সূরা সোয়াদ ঃ ৭১-৭২)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا-

এবং নিশ্চয়ই আমরা আদম বংশ সম্মানিত বানিয়েছি এবং তাদের বহন করে নিয়ে গেছি স্থল ও জলভাগে। আর তাদের পবিত্র জিনিস পত্রগুলো রিয্ক্ হিসেবে দিয়েছি ও তাদের উন্নত মর্যাদাবান বানিয়েছি আমার অনেক সৃষ্টির ওপর। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -

এবং তিনিই তোমাদের আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং খুবই উত্তম বানিয়েছেন তোমাদের আকার-আকৃতি। (সূরা তাগাবুন ঃ ৩)

ইসলাম মানুষকে মলিনতা পংকিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করেনি, যেমন করেছে জাহিলিয়াত। তবে মানুষের জন্মের মৌল উপাদানের নিকৃষ্টতার কথা বলেছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ -

আমরা মানুষকে পচা-গলা মাটির শুষ্ক গুড়া দিয়ে সৃষ্টি করেছি। (সূরা হিজর ঃ ২৬)

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ -

আমরা কি তোমাদেরকে মূল্য ও মর্যাদাহীন জলীয় পদার্থ থেকে সৃষ্টি করিনি? (সূরা মুরসালাত ঃ ২০)

মানুষের প্রথম সৃষ্টিকালীন ব্যবহৃত 'পচা-গলা মাটি' ও পরে 'অপবিত্র তরল পদার্থ'-এর মতো হীন ও সামান্য জিনিস আর কি হতে পারে ? ডারউইনও অবশ্য মানুষকে জন্তু জানোয়ারের বংশধর প্রমাণ করতে চেয়ে মানুষকে হীন নীচ বানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আল্লাহ্র ওহী কুরআন মানুষের প্রাথমিক সৃষ্টি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে যা বলেছে, তার লক্ষ্য এই নয় যে, মানুষের এই হীনতা নীচতাকে প্রকট করে দুনিয়ায় মানুষকে দিশাহারা জীবন যাপনে বাধ্য করা হবে— ডারউইন মানুষকে জন্তু জানোয়ারের বংশধর বলে তাকে দিশাহারাই বানিয়ে দিয়েছে। কুরআন তো সৃষ্টির পর্যায়সমূহের উল্লেখ করেছে এবং প্রথম পর্ব যদিও হীন ও নীচ; কিন্তু তার পরবর্তী সৃষ্টিকর্মের মহান সত্য ও গভীরে নিহিত তত্ত্বসমূহ মানুষকে বিশিষ্ট ও উন্নত সৃষ্টি প্রমাণ করেছে। কুরআনের ঘোষণায় মানুষকে অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তুলনাহীন, সুন্দর আকার-আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং আল্লাহ্র পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার কথা উদাত্তভাবে বলেছে। তাকে আল্লাহ্ অর্পিত মহান আমানতের ধারকও বলা হয়েছে।

কুরআনের বর্ণনার এই বিশ্লেষণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঘাটিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্র মহানত্ব, বিরাটত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানুষের উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া— বস্তুত এই দুটি সত্যই মানুষকে আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট রাখে, আল্লাহ্র খিলাফতের উচ্চ মর্যাদা অর্জনের যোগ্য বানিয়ে দেয় তাকে, সেই সাথে একথাও যে, মানুষ যেন অহংকার ও আত্মগৌরবে মত্ত হয়ে না যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মাটি— বস্তু ও রূহ্— এই দুই উপাদানের সমন্বয়। উভয় দিকের প্রকৃতি ও ভাবধারা মানব সত্তায় বিরাজমান। এ দুইয়ের সংমিশ্রণ মানুষের ক্ষেত্রে চিরন্তন, কখনোই শেষ হবে না, এ সংমিশ্রণ কখনোই ছিন্ন হয়ে যাবে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কেবলমাত্র মাটির সৃষ্টি নয়। তাই প্রস্তর ও জন্তুকুল মানুষ গণ্য হতে পারে না। মানুষ নিছক 'রূহ' সৃষ্টও নয়। ফলে সে ফেরেশতা গণ্য হবে না, হবে না 'ইলাহ্'।

মাটি-জড় পদার্থ ও রূহ এ দুইয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট হওয়ার কারণেই মানুষ এই সৃষ্টি লোকের অন্যান্য সব জিনিসের অপেক্ষা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসম্পন্ন।

এই বিশেষত্বের দরুন মানুষ যেমন ঊর্ধ্বপানে উন্নতি লাভের যোগ্যতার অধিকারী, তেমনি নিম্নের দিকে পতন গ্রহণের যোগ্যতাও তার আছে। বলা হয়েছেঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا -

শপথ মানুষের প্রাণের এবং সেই মহান সত্তার, যিনি তাকে ঠিকঠাক ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছেন, পরে তার দুষ্কৃতি ও পরহেযগারী উভয় ভাবাধারা তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখন সাফল্য পেয়েছে সে, যে তার নফস্‌কে পবিত্র পরিশুদ্ধ করেছে, আর ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে সে যে তাকে খারাপ ও ধ্বংস করেছে। (সূরা আস্-শামস ঃ ৭-১০)

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ -

এবং আমরা তাকে দুটি খাঁটি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ ঃ ১০)

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا -

আমরা মানুষকে পথ দেখিয়েছি— হয় শোকর আদায়ের, নয় কুফরের। (সূরা দাহর ঃ ৩)

মানুষের এই জড় উপাদান ও রূহ্-এর সংমিশ্রণজনিত বিশেষত্বেই নিহিত রয়েছে মানুষের পরীক্ষা গ্রহণ ও তার কর্মফল দেওয়ার নিগূঢ় তত্ত্ব। কেননা মানুষ হীনতার দিকেও যেতে পারে, যেতে পারে উচ্চতর মহানত্বের দিকেও। এই কারণেই তাকে এই দুনিয়ায় কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যেন পরকালে তার যাবতীয় কাজের হিসাবান্তে প্রতিফল দেওয়া যেতে পারে।

মানুষকে এছাড়াও উচ্চতর জগত থেকে আরও অতিরিক্ত কতগুলো বিশেষ বিশেষত্ব দান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। সেই সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালনোপযোগী উপায়-উপকরণও তাকে দেওয়া হয়েছে।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا -

এবং আমরা আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষাদান করেছি। (সূরা বাকারা ঃ ৩১)

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ -

এবং বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। (সূরা নহল ঃ ৭৮)

মানুষ এই সব উপায়-উপকরণের— যা মহান আল্লাহ্র বিশেষ দান— সাহায্যে পৃথিবী আবাদকরণ, পুনর্গঠনের কাজ করে এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করবে। আর যে আমানত বহনের দায়িত্ব কেউ-ই গ্রহণ করেনি, করেছে শুধু মানুষ, সেই একক দায়িত্ব যথাযথ পালনের ব্যবস্থা করবে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ -

আমরা উপস্থাপিত করেছি আমানত আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও পর্বতের কাছে, এ সবই সে আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং সে ব্যাপারে এসব ভয় পেয়েছে। পরে মানুষ তা বহন করতে স্বীকৃত হয়েছে ... ...। (সূরা আহযাব ঃ ৭২)

এই আয়াতসমূহে বলা স্পষ্ট কথাসমূহের অনিবার্য দাবি হচ্ছে মানুষকে এই পৃথিবীতে এক সক্রিয় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে, কোনো নির্বোধ অবিবেচক সত্তা হিসেবে কতগুলো অর্থহীন নিশ্চিত অনিবার্যতার নিয়মাধীন হয়ে থাকা তার জন্যে কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়। মানুষ এই সবের কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে, তা মানুষ সম্পর্কে অকল্পনীয়। বস্তু পৃথিবীতে আল্লাহ্র 'নির্ধারণ' মানুষের কাজ ও তৎপরতার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ মানুষের কাজকেই উপায় ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَابِاَنْفُسِهِمْ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তন করে দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করছে। (সূরা রা'আদ ঃ ১১)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ -

মানুষের পরস্পরকে পরস্পরের দ্বারা আল্লাহ্র প্রতিরোধ করার কাজটি সদা সক্রিয় না থাকলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)

আল্লাহ্ গোটা বিশ্বপ্রকৃতিকে মানুষের জন্যে কর্মে নিরত করে রেখেছেন। এই দৃষ্টিতে মানুষই হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আপেক্ষিক কার্যকারণ।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ -

এবং তোমাদের জন্যেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা যা আছে তার সব কিছুকেই জোরপূর্বক কর্মে নিরত করে রেখেছেন। (সূরা জাছিয়াহ ঃ ১৩)

ইসলামী মতাদর্শ মানুষকে এই উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। তাই মানুষ আল্লাহ্র শত্রু হয়ে বসবাস করে না, তাঁর বিরোধিতাও করেনা, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েও থাকে না। এটাই স্বাভাবিক, বরং এই উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে মানুষ আল্লাহ্কে অধিকতর ভয় করে এবং ভালোবাসেও বিপুলভাবে।

মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ্র এই তুলনাহীন দান ও অনুগ্রহ মানুষের কাছে শোকর ও গভীর পরিচিতির দাবি করে। তাই হয় মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য। কেননা মানুষ নিজেই নিজেকে এইসব মহাদানে ধন্য করেনি, করতে পারেনি। সে নিজেই নিজেকে আল্লাহ্র খলীফা বানায়নি। সে নিজেই নিজেকে সৃষ্টিও করেনি। আল্লাহ্ নিজেই যদি মানুষকে সৃষ্টি করার সংকল্প না করতেন, তাহলে তাতে আল্লাহ্র কিছুই আসত না, কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণও ছিল না। আল্লাহ্ মানুষকে যে সীমা-সংখ্যা ও পরিমাপহীন দান দিয়েছেন, তা না দিলে তা অর্জন করার কোনো শক্তি-সাধ্যই ছিল না মানুষের। এরূপ অবস্থায় এতসব দান-অনুগ্রহ পেয়ে মানুষের একমাত্র কর্তব্য হতে পারে মহান আল্লাহ্র অকৃত্রিম শোকর আদায় করা, তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া। আল্লাহ্র বিরোধিতা করা, তাঁর সাথে বিন্দুমাত্র শত্রুতা করা বা তাঁর সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া কখনোই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। গ্রীক জাহিলিয়াত এবং বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের ওপর মানুষ ও আল্লাহ্র পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ গভীর কালো ছায়া বিস্তার করেছে, ইসলামে আল্লাহ্ ও মানুষের পারস্পরিক ক্ষেত্রে তা যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি কল্পনারও অতীত।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক সুসংবদ্ধ সত্তা। তার জন্মগত প্রকৃতিও ঠিক তাই। অতএব মানুষ সংমিশ্রণের মৌল উপাদান 'মাটি' ও 'রূহ'— এই দুইয়ের মাঝে কখনোই বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে না, বিচ্ছিন্নতা ভিত্তিক কোনো মতবাদ গ্রহণযোগ্যও হতে পারে না। বিচ্ছিন্নভাবে শুধু দেহ কোনো কাজেরই নয়, নয় 'রূহ' এই দুনিয়ায় টিকে থাকার বা কোনো কাজ করার উপযোগী। অতএব মানুষের চেতনা ও বাস্তব কাজ, চিন্তা-বিশ্বাস আকীদা ও ব্যবহারিক আমল এই দুইয়ের মধ্যেও কোনো বিচ্ছিন্নতা পার্থক্য বা বৈপরিত্য স্বীকৃত নয়। মানুষের আমল ও চরিত্র হতে হবে পার্থক্যহীন। মানুষের আদর্শ হবে এক আর কাজ হবে ভিন্নতর, তাও বাঞ্ছনীয় নয়। তার আকীদার সাথে শরীয়ত অবিচ্ছেদ্য এবং তার দুনিয়া ও আখেরাত— ইহকাল ও পরকাল অভিন্ন।

এ এক সমন্বিত সত্তা, এক অভিন্ন মর্যাদার সৃষ্টি তার দেহ ও রূহ্— দেহসত্তা ও আত্ম-সত্তা একই মুহূর্তে অভিন্ন, পার্থক্যহীন। তার চেতনা ও বাহ্যিক আচার-

আচরণ মিলিত হয়েই এক অভিন্ন সত্তা গড়ে ওঠে। তা একই সময় চেতনাভিত্তিক আচরণ, চেতনাজনিত আচরণ, যা চেতনা, তা-ই তার আচরণ। আমল ও চরিত্র পরস্পর বৈপরিত্যহীন। তা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন কর্মীর চরিত্র বা চরিত্রমূলক কর্ম। মানুষের আকীদা ও শরীয়াত সমন্বিত হয়েই 'দ্বীন' এক অবিচ্ছিন্ন জীবন বিধান।

মানুষের ইহকাল ও পরকাল তার সুদীর্ঘ ও অশেষ জীবনের দুইটি পর্যায় অভিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক এ দুটির মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিভিন্নতার কোনো স্থান নেই।

মানুষ এক পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বিত সত্তা, বস্তুতপক্ষেও তার ভারসাম্যপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দেহ রূহ-এর ওপর বিজয়ী হবে না। বাস্তবে হবে না চিন্তার ওপর প্রভাবশালী, ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবধারা সামষ্টিকতার ভাবধারাকেও প্রভাবিত করবে না, তা বিপরীতটাও নয়। তার নেতিবাচক প্রবণতা ইতিবাচক প্রবণতাকে করবে না বিজিত, পরাজিত। তার দুনিয়া হবে না তার পরকাল বিনষ্টকারী। তাকে মাটির দিকে টেনে নিতে পারবে না, পারবে না ঊর্ধ্ব আকাশ পানে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে। উভয় দিকের তীব্র আকর্ষণ ঠিক তেমনি ভারসাম্যপূর্ণ করে রাখবে, যেমন মাধ্যাকর্ষণ ভারসাম্যপূর্ণ করে রেখেছে সূর্য ও পৃথিবীকে, পৃথিবী ও চন্দ্রকে।

আর এই মহান ভারসাম্যতাই ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়ে দেয় ব্যক্তিকে, সমষ্টিকে, ধারণা-বিশ্বাস আদর্শ ও বাস্তাব আচার-আচরণ ও বাস্তব কার্যাবলীকে। বস্তুত মানুষের হৃদয় মনে যখন এই সুস্পষ্ট উজ্জ্বল ও আলোকোজ্জ্বলকারী চিন্তা-বিশ্বাস-ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে বসবে, তখন তার গোটা জীবন ও পৃথিবীর বুকে সরল ঋজুপথে সুদৃঢ়-অবিচলভাবে চলবে অব্যাহতভাবে।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (স) এই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধানের ধারক ছিলেন। তাঁর মনে ও মগজে সুদৃঢ়ভাবে বসেছিল এই চিন্তা-বিশ্বাস এবং তিনি নিজের চেষ্টা ও প্রশিক্ষণে গড়ে তুলেছিলেন অনুরূপ ভারসাম্যপূর্ণ এক আদর্শ জনগোষ্ঠী— উম্মতে মুসলিমা। ফলে পৃথিবীতে এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলী সংঘটিত হতে থাকল, যার কোনো দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে পাওয়া যায় না।

আরবের ছিন্নভিন্ন ও জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত অসংখ্য গোত্র-কবীলা এই ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ গ্রহণ করে এক অভিন্ন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল আর তাই হচ্ছে উম্মতে মুসলিমার ইতিহাস।

আবহামান কাল থেকে চলে আসা জাহিলিয়াত প্রভাবিত মানুষ তাদের প্রাচনীতম প্রীতি আকর্ষণ ও ঝোঁক-প্রবণতা পরিহার করে। বদলে যায় তাদের আদত অভ্যাস, পরিচিতি ও জীবনাচরণ। তাদের বিকৃত কামনা-বাসনা, ঐতিহ্য-

সংস্কৃতি ও কিংবদন্তী সবকিছু হয়ে যায় আমূল পরিবর্তিত। তারা সমানভাবে দাঁড়িয়ে যায় আল্লাহ্র প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীম-এর ওপর। দুনিয়ায় জেগে ওঠে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নতুন প্রকৃতির ও নতুন স্বভাব চরিত্রের মানুষ। ইসলামই এই মানুষদের একমাত্র জীবনাদর্শ, ইসলামই তাদের নিয়ামক নিয়ন্ত্রক। এ যেন হঠাৎ করে জন্ম নেওয়া এক নতুন মানবগোষ্ঠী; মানব জন্ম সার্থক হয়ে উঠল।

এই মুসলিম উম্মাহ্ এক অভিনব পন্থা ও পদ্ধতিতে নিজেদের ও নিজেদের বাস্তব জীবন গড়ে তোলে। সে পন্থা ও পদ্ধতির কোনো নিদর্শন অতীতে ছিল না। কোনো অতীত ধারাবাহিকতারও উত্তরসূরী ছিল না তারা। সে পন্থা ও পদ্ধতি সেই পরিবেশ থেকে পাওয়া কোনো ভাবধারারও অনুসারী ছিল না। সে পরিবেশের অভ্যাস আজও আচার-আচরণ বা জাহিলি রীতিনীতিরও ছিল না কোনো প্রতিফলন। নিতান্ত প্রয়োজনের কারণেও তা হয়নি, যেমন পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের প্রয়োজন বা ঐতিহাসিক কার্যকারণ দেখা দিয়ে থাকে।

এই মুসলিম উম্মত সকল 'তাগুত'-এর গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিল। তা পরিবেশ বা পরিস্থিতিগত কোনো কারণে নয়। বৈষয়িক কারণে এক-একটা জনগোষ্ঠীর যেমন স্বাধীনতা লাভ হয়, এটা তেমনও নয়।

তা হলে এই বছরগুলোর মধ্যে কি পরিবর্তনটা সাধিত হলো?

ইসলাম ছাড়া আর কিছু কি তাদের এই নবতর জীবন গড়েছে?

ছিল কি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ?

ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু কি এই লোকগুলোকে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণাকে পরিচ্ছন্ন ও আবিলতা মুক্ত করেছিল? ...অথচ এই মানবতাই বর্তমান বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণা-বিশ্বাসে চরম দিশাহারা অবস্থায় পড়ে আছে, তা থেকে মুক্ত হয়নি।

মানুষের নিরংকুশ দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তিলাভের মূলে কি কারণ নিহিত ছিল? ...মানুষ তো অনৈসলামী পরিবেশে এই দাসত্বের নিগড়ে বন্দী হয়ে আছে, পরস্পর পরস্পরের দাসত্ব করে চলছে। মানুষ মানুষের অধীনতা করছে, মানুষ মানুষের জন্যে ইচ্ছামতো নিজেদের কামনা-বাসনা ও প্রয়োজন মতো আইন রচনা করছে, আর তা-ই অন্ধভাবে নির্বাক-নিশ্চুপ হয়ে মেনে চলেছে মানুষ। মানুষ মানুষেরই কাছে নিতান্ত অসহায় জীবন হয়ে আছে, বিনয়াবনত হয়ে সিজদায় ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে তাদেরই মতো অন্য মানুষের কাছে। মানুষ চালিত রাষ্ট্রে সরকারের দাপট— অত্যাচার-নিপীড়নে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। স্বৈরতান্ত্রিক অর্ডার-অর্ডিনেন্স মানুষকে দাসানুদাস বানিয়ে রাখছে। মূলধন তথা পুঁজিবাদী শোষণে

মানুষের কাছেই মানুষ অসহায়, রক্তশূন্য। তাদের ওপর সম্রাজ্যবাদী সম্প্রদারণবাদী শোষণ নির্যাতন চলছে সমানভাবে। কেউ তাদের এ মর্মান্তিক অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারছে না, এগিয়ে আসছে না মুক্তিদূত হিসেবে নবতর কোনো আদর্শ বা জীবন বিধান।

মানুষ ছিল তার চরম মাত্রার লালসার দাস। উম্মতে মুসলিমা এই দাসত্ব শৃঙ্খল থেকেও সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছিল। কিন্তু কে— কোন জিনিস তাদের মুক্তি দিয়েছিল ? ...অথচ মানুষ তো অনৈসলামী সমাজে চিরকালই লালসার নিকৃষ্ট দাস হয়ে জীবন যাপন করেছে চিরকাল এবং এখনও করছে ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে। আর আল্লাহ্‌র থেকে বিপথগামী হলেই লালসার দাস হওয়া মানুষের পক্ষে অনিবার্য পরিণতি। এই দাসত্বের তীব্রতা, গভীরতা ও ব্যাপকতা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে।

কেননা পরিবর্তনের কারণে মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির বুকে হঠাৎ করে যথার্থ মর্যাদা পেয়ে গেল ? অথচ ইসলামের পূর্বে এই মর্যাদা ছিল না। অনৈসলামী সমাজে মানুষকে তো কখনও দেবতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বাস্তবতার সাথে যার কোনো সম্পর্ক বা সামঞ্জস্যই নেই, যা একান্তই অন্তঃসারশূন্য, ধোঁকা মাত্র। কখনও মানুষকে এই বিশ্ব প্রকৃতির হীন নীচ লোগাম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কখনও নিশ্চিত অনিবার্যতা মানুষকে আরও অধিক মাত্রার মলিনতা ও পুঁতিগন্ধময় আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মানুষ এই সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অসহায়তা ও অক্ষমতা বাতিল সরকারের মানুষকে বরদাশ্‌ত করতে হয়েছে।

তা ছাড়া ইসলামের যুগে হঠাৎ করে মানুষের নৈতিক চরিত্রের কেননা জিনিস বিল্পবাত্মক পরবর্তন এনে দিল ? — সব অনৈতিকতার পবিত্রহীনতা থেকে মানুষ মুক্তি পেয়ে গেল ? অথচ অনৈসলামী সমাজে মানুষ চিরকাল পবিত্রহীন হয়ে থাকতেই বাধ্য হয়েছে। সেখানে কেবলমাত্র স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভই হয়ে রয়েছে মানুষের চরিত্রের ভিত্তিতে।

ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি অত্যন্ত পুরাতন। কোনো দিনই সঠিক ছিল না, ভারসাম্যহারাই ছিল সর্বত্র। কিন্তু ইসলামের সূচনাতেই হঠাৎ করে সব ঠিক হয়ে গেল। ব্যক্তি বুঝল সমাজ সমষ্টির গুরুত্ব, সমাজ সমষ্টি বুঝল ব্যক্তির গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা। কিন্তু গায়র ইসলামী সমাজে এই সম্পর্ক কখনও বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কখনও ডান দিকে। কখনও ব্যক্তি সমাজ কর্তৃক নিষ্পেষিত হয়েছে, কখনও সমাজ সমষ্টি হয়েছে ব্যক্তির দাপটে তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত।

নারী ও পুরুষের সম্পর্কেই বা এই পরিবর্তনটা হঠাৎ করে ঘটল কি করে ? অথচ অনৈসলামী সমাজে বিশ্বমানবতা এই সম্পর্কের ভুলের কারণে চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই সম্পর্ক একটা বাস্তবিক ব্যাপার হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। মানুষ তাতে কোনো শান্তি বা স্বস্তি— অন্তরের তৃপ্তি কখনোই পায়নি। ফলে মানুষের শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তখন কোন শক্তি শাসককে— সে ব্যক্তি হোক, শ্রেণী হোক, জাতি হোক স্বেচ্ছাচারিতার সাথে শাসনকার্য চালাতে নিষেধ করেছে ও তা থেকে বিরত রেখেছে? স্বেচ্ছাচারিতা ও সীমালংঘনমূলক আচরণ গ্রহণ করতে দেয়নি ? — অথচ ইসলাম ছাড়া যত সমাজই ছিল ও আছে, সর্বত্রই 'তাগুত' চরম স্বেচ্ছাচারিতা সহকারেই শাসনকার্য চালিয়েছে, কোনো শাসনতন্ত্র বা মানবতাবাদ তাকে তা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তা তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই হোক, কি কোনো নির্লজ্জ স্বৈরতন্ত্র।

তাহলে এই কয়টি বছরে কেমন করে সব ওলট-পালট হয়ে গেল ? ...তেমন কিছুই না। ... সবকিছুর মূলে একটি মাত্র কারণই ছিল এবং তা হচ্ছে মত-আদর্শ-আকীদা- চিন্তা ও বিশ্বাস নির্ভুল হওয়া, ঠিক হওয়াই তার একমাত্র কারণ। তা-ই যেমন মানুষের মন ও মগজকে ঠিক করেছে, তেমনি তা-ই মানুষের আচার-আচরণ, কর্মতৎপরতা— গোটা জীবনকেই সঠিক ও দৃঢ় ভিত্তিক করে দিয়েছিল।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজের সম্মুখে রেখেও সর্বপ্রকার চেষ্টা-যত্নের মাধ্যমে যে মুসলিম উম্মতকে গড়ে তুলেছিল, তা ছিল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা ওহীভিত্তিক। তাদের সবকিছুই ঠিক তাই, যা আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছিলেন।

লোকদের জিন্দেগীতে এক বিস্ময়কর দৃঢ়তা ও অবিচলতা এনে দিয়েছিল। হ্যাঁ, অস্বীকার করছি না, তখনও মানুষের মধ্যে স্বভাবগত দুর্বলতা ছিল। কেননা তাঁরা মানুষ, ফেরেশ্‌তা নয়। কিন্তু একটি আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে নিজেদেরকে গড়ে তোলার সর্বোচ্চ-সর্বশেষ চেষ্টা যা হতে পারে, তা তাঁরা করেছিলেন। তাঁরা পুরোপুরিভাবে ইসলামী আদর্শের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তখন মানুষের পরস্পরের মধ্যে এক বিস্ময়কর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই বলে মানবীয় দুর্বলতা থেকেও তাঁরা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এমন দাবি করা হচ্ছে না।

প্রতিটি মানুষই নিজেই নিজের জন্যে বেশি বেশি কল্যাণ চাইবে, এ তো স্বাভাবিক। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন ঃ

إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ -

মানুষ কল্যাণ, ধন-মালের লোভে অত্যন্ত শক্ত। (সূরা আল-আদিয়াত ঃ ৮)

এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনকার লোকেরা পরস্পরের জন্যে নিজেদের হৃদয়কে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন, নিষ্কলুষ, একনিষ্ঠ ও উদার আন্তরিক বানিয়েছিলেন। সে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এত উচ্চমানের ছিল, যার কোনো দৃষ্টান্তই ইতিহাসে পাওয়া যেতে পারে না।

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

যারাই তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদের অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, তাদের হৃদয়ে কোনো হিংসা বোধ করে না, যা সেই মুহাজিরদের দেওয়া হয় তার প্রতি এবং তাদেরকে তারা নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়, তারা নিজেরা অভুক্ত থাকলেও। (সূরা হাশার ঃ ৯)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ -

মুমিন লোকেরা পরস্পর ভাই (এছাড়া আর কিছু নয়)। (সূরা হুজরাত ঃ ১০)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ -

মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক-সাহয্যকারী। (সূরা তওবা ঃ ৭১)

এই মুসলিম উম্মত যে মানবিক চেতনা লাভ করেছিল, তা ছিল নির্বিশেষ সামষ্টিক মানবতা।

وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে এই অপরাধে অপরাধী বানাতে না পারে যে, তোমরা তাদের প্রতি সুবিচার করবে না। না, অবশ্যই সুবিচার করবে, তা-ই তাক্ওয়ার নিকটবর্তী নীতি। (সূরা মায়িদা ঃ ৮)

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ -

যে সব লোক দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃতও করেনি, আল্লাহ্ তাদের সাথে ভালো আচরণ গ্রহণ করতে ও তাদের প্রতি সুবিচার নীতি গ্রহণ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। (সূরা মুমতাহানা ঃ ৮)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا -

তোমাদেরকে মসজিদে হারাম— বায়তুল্লাহ্ থেকে বিরত রাখে বলে কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ যেন তোমাদেরকে এই অপরাধে অপরাধী হতে উদ্বুদ্ধ না করে যে, তোমরা সীমালংঘনমূলক কাজ করবে...

(সূরা-মায়াদা ঃ ২)

মুসলিম উম্মত এমন এক সমাজ গড়ে তুলেছিল, যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ছিল পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ছিল স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট এবং সকল বাড়াবাড়ি থেকে সুরক্ষিত। তার ভূমিকা ছিল ইতিবাচক ও সম্মানজনক। ইসলামী সমাজে ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পিত ছিল যে, তারা যেন সমাজ ও শাসক উভয়ের ওপর সমানভাবে শ্যেন্ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, ন্যায় কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার কর্তব্য যথারীতি পালন করে। পক্ষন্তরে সমাজ সমষ্টি পরস্পর সংযোজিত, সুসংবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগণকে সঠিক পথে পরিচালন, তাদের মন-মগজ ইসলামী আদর্শানুযায়ী গড়ে তোলা এবং আল্লাহ্র হারাম করা কাজসমূহ থেকে তাদের বিরত রাখার দায়িত্ব সমাজের ওপরই অর্পিত ছিল।

উম্মতে মুসলিমা এমন এক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যেখানে ব্যক্তিগত স্বত্ব গ্রহণ ও গনীমত প্রাপ্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত ছিল। ধনী ও গরীব প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই ছিল সামাজিক নিরাপত্তা। তারা এমন এক জনগোষ্ঠী ছিলেন, যাঁদের পরস্পর পরস্পরের জন্যে দায়িত্বশীল ছিলেন। কল্যাণময় কাজ— সামষ্টিক ধন-মালে সকলেই শরীক ছিলেন। অল্প সংখ্যক লোক জাতীয় সম্পদকে গ্রাস করে ফেলতে পারত না। কেননা ইসলামের বিধান হচ্ছে ঃ

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

ধন-সম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনী লোকদের করায়ত্ত হয়েই না থাকে।

(সূরা হাশর ঃ ৭)

সে সমাজে মৌলিক প্রয়োজন থেকে কেউ বঞ্চিত থাকত না। রাষ্ট্র, সরকার ও বায়তুলমাল সকল লোকের জন্যে দায়িত্বশীল ছিল।

উম্মতে মুসলিমা এমন এক নৈতিক চারিত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যা ছিল সমগ্র জীবন পরিব্যাপ্ত। জীবনের কোনো একটি দিকও তার বাইরে ছিল না। এখানকার রাজনীতি ছিল নৈতিক আদর্শ ভিত্তিক। মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি হোক, কি বৈদেশিক— মুসলিম ও তাদের শত্রুদের পারস্পরিক ব্যাপারই হোক, সব কিছুই এই নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত ছিল। ওয়াদা পূরণ করা হতো, চুক্তিসমূহকে যথাযথভাবে রক্ষা করা হতো। সমাজের পারস্পরিক

সম্পর্কও নৈতিকতার ওপর স্থাপিত ছিল। অর্থ ব্যবস্থাও নৈতিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় ধরনের লেনদেন নৈতিক বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হতো। নারী ও পুরুষ দুই লিঙ্গের সম্পর্কও নৈতিক চরিত্র ভিত্তিক ছিল। তাতে এমন এক পবিত্রতা কার্যকর ছিল, যার কোনো দৃষ্টান্তই ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঠিক এই কারণে উম্মতে মুসলিমার ভিত্তি এতই সুদৃঢ় হয়েছিল যে, এই সমাজ এক হাজার বছর পর্যন্ত টিকেছিল— ইসলামের দুশমনদের দ্বারা সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও নানা ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও।

এই ধরনের এক ইসলামী সমাজ কাঠামো শুধুমাত্র আরব উপদ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। মুসলিম উম্মতের লোকেরা দুনিয়ার যেখানে যেখানেই গেছে, আল্লাহ্র দ্বীনের সুসংবাদ সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তা দ্বীন-ইসলামেরই এক বিস্ময়কর অবদান বটে।

মুসলিম উম্মতের লোকেরা দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানেই তারা ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, ইসলামের সুবিচার নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা পৃথিবীর একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে অর্ধশতকালের মধ্যে। তাদের এই বিস্তৃতি এতই দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছিল যে, দুনিয়ার গবেষক মনীষীরা পর্যন্ত বিমূঢ়। দুনিয়ার কোনো আন্দোলনই এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে পেরেছে বলে ইতিহাসে কোনো প্রমাণই নেই।

এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীর অসংখ্য সম্প্রদায়, জাতি ও জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে ইসলামী আদর্শে এক অখণ্ড উম্মত হয়ে গড়ে উঠেছিল।

ইতিহাসে বহু সাম্রাজ্যবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। রোমান সম্রাজ্যবাদ, পারস্য সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ, চীনা সাম্রাজ্যবাদ, আর আধুনিক কালের বৃটিশ ও রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু তার কোনো একটির বিস্তৃতিও ইসলামের সাথে তুলনীয় নয়।

এসব সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিছুদিন পর তা শেষও হয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী সমষ্টি ও জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি উম্মত বনানো কোনো একটির পক্ষেই সম্ভব হয়নি। কেননা ওগুলো তো রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ছিল। কিন্তু ইসলামী রাজ্য রাজতান্ত্রিক ছিল না। সারা দুনিয়ার ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ এক অভিন্ন উম্মত হয়ে গড়ে উঠেছিল কোনো চাপ বা কোনো শাসকের দুঃশাসনের কারণে নয়। তার কারণ ছিল সহজ সরল।

ওসব সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার জাতিসমূহকে জোরপূর্বক অধীন বানায় এবং অধীনতা করতে বাধ্য করে। তখনই এসব জাতির লোকেরা অনুভব করতে থাকে যে, তারা পরাধীন, স্বাধীন নয়, অতএব তাদের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়। কেননা বিজয়ী জাতির ভাবধারা পরাধীন জাতির জনগণের জীবনকে পরিপ্লাবিত করে। তাই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হলে গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে হবে।

কিন্তু মুসলিম উম্মত সামাষ্টিকভাবেই আল্লাহ্‌র অধীন ও অনুগত থাকে। ফলে অধীন লোকেরা নিজেদেরকে পরাধীন মনে করে না, মনে করার কোনো কারণও থাকে না। তখন বিজয়ী বিজিত সব মানুষ মানবিক মর্যাদায় একাকার হয়ে থাকে, ফলে কোনো স্বাধীনতার আন্দোলনেরই প্রয়োজন হয় না। কেননা তারা নিজেদের জাতীয় আদর্শ ও রীতিনীতি অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারেই জীবন যাপন করার পূর্ণ সুযোগ পেয়ে থাকে,— যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইসলামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। এইসব লোক একই চেতনা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। সকলেরই আকীদা এক ও অভিন্ন। আর এই কারণে ইসলামের আদর্শে সকল মানুষ সংযুক্ত— আজও দুনিয়ার মুসলমান সেই একই সূত্রে গাঁথা। যদিও এই চেতনাকে শেষ করে মুসলিম উম্মতকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করার জন্যে শত-সহস্র ভাবে ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তা এখন পর্যন্ত টিকে আছে।

ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ছত্রছায়ায় এক সু-উচ্চ ও মহান ইসলামী সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যদিও ইসলামের পূর্বে আঁরবদের তেমন কোনো সভ্যতা ছিল না। কেননা আরবদের যাযাবর জীবন যাত্রা এবং তাদের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও জ্ঞানগত অবস্থান কোনো সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ দেয়নি।

এ কথা সত্য যে, এই উপদ্বীপে প্রাচীনকালীন সভ্যতা অনেক কয়টি অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং প্রতিবেশী রোমান ও পারস্য সভ্যতার সাথেও তাদের নৈকট্য ও নানাভাবে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাস যে বাস্তবতা দেখতে পেয়েছে, তা হচ্ছে মুসলমানরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির সভ্যতা সৃষ্টি করেছেন। তার সাথে পূর্ববর্তী আর উপদ্বীপ কেন্দ্রিক কোনো একটি সভ্যতার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। এমন কি তখনকার সমসাময়িক দুনিয়ার অপর কোনো সভ্যতার সাথেও নেই একবিন্দু মিল।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও ধরন তাঁরা অনেক কিছুই রোমান ও পারসিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেই সব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত ইসলামী আদর্শ ও নিয়ম নীতির ভিত্তিতে। এ-ও সত্য যে, পরবর্তীতে অন্যান্য বহু সভ্যতা থেকেও ইসলাম অনেক কিছুই গ্রহণ

করেছে। পরবর্তী সময় বিগত এক সহস্র বছরের মধ্যে ইসলামী সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকেও অনেক কিছু নিয়েছে, যদিও খোদ পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল স্থাপিত হয়েছিল ইসলামী সভ্যতারই প্রেরণায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে ইসলামী সভ্যতার প্রেরণারই ফসল, তা ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য। ব্রে ফো তাঁর Making of Humanity 'মানবতার নির্মাণ' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'ইউরোপীয় সভ্যতার উৎকর্ষের এমন কোনো দিক নেই, যার মূলে ইসলামী সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চিতরূপে অনুপস্থিত।'[১]

মুসলমানরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবল বন্যা প্রবাহের সৃষ্টি করেছিলেন, তা-ও ছিল ইতিহাসের এক তুলনাহীন আন্দোলন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম পূর্ব আরবরা জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তেমন কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। কেননা তারা সব সময় কথা বলার বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। তাদের সব চেষ্টা-যত্ন তাতেই নিয়োজিত ছিল। কাব্য রচনা তারই এক পর্যায়। কিন্তু মুসলিম উম্মতের অভ্যুদয়ে তাদের মধ্যে জ্ঞান-চর্চার প্রবণতা জেগে ওঠে এবং বিদ্যাশিক্ষার একটা আন্দোলন চারিদিকে তীব্র চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল। এর মূলেও ছিল ইসলাম।

ইসলামের তাগিদেই মুসলমানরা সমসাময়িক সকল জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে বৈষয়িক ব্যাপারাদি সম্পর্কে বিপুল জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক বিদ্যা, দর্শন, রোমানদের জ্ঞান এবং মিসরীয় ও ভারতীয় জ্ঞান থেকেও তাঁরা অনেক কিছুই পেয়েছিলেন। ভূগোল, খগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে তারা যেমন সূক্ষ্মতা অর্জন করেন, তেমনি ব্যাপকতা ও গভীরতা।

কিন্তু তাঁরা অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানটুকু নিয়েই ক্ষান্ত হননি। না পরিমাণে, না প্রকারে।

মুসলমানরা তখনকার জ্ঞানের চেহারাটাই বদলে দিয়েছিলেন। তাঁরাই ইসলামের তাগিদ ও প্রেরণায় বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। আর আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষের মূলে নিহিত রয়েছে মুসলমানদের কাছ থেকে গৃহীত এই পরীক্ষার পদ্ধতিই।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

আরব ইসলামী সভ্যতা আমাদেরকে যা কিছুই দিয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ছিল জ্ঞান ও বিজ্ঞান পর্যায়ের অবদান। যদিও ইউরোপীয় উৎকর্ষের কোনো

১. আল্লামা ইকবাল লিখিত 'ইসলামী সংস্কৃতির পুনর্গঠন'।

একটি দিকও এমন নেই, যার মূল খুঁজতে গেলে ইসলামী সংস্কৃতিরই সাক্ষাৎ মিলবে না নিশ্চিতভাবেই। তবে সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে স্পষ্ট ইসলামী প্রভাব সেই শক্তিতে দৃশ্যমান, যা আধুনিক দুনিয়াকে একটি বিশিষ্ট শক্তিতে ধন্য করেছে, যাতে নিহিত রয়েছে আধুনিক কালের তত্ত্ব। তা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা গবেষণার প্রাণশক্তি বা মৌল ভাবধারা।

আরব মুসলিমরা কোনো নবতর মতাদর্শের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের বিজ্ঞান কেবল এই দিক দিয়ে তাঁদের কাছে ঋণী নয়; বরং আমাদের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই আরবদের কাছে ঋণী। বরং বলা দরকার, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্তিত্বই মুসলিম আরবের সাথে সংশ্লিষ্ট, কেননা প্রাচীন দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তেমন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। গ্রীকদের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অংকশাস্ত্র যা ছিল তাও ছিল বাইরে থেকে পাওয়া, কিন্তু তা কোনো দিনই গ্রীক সংস্কৃতির অংশ হতে পারেনি।

গ্রীকরা বিভিন্ন চিন্তাকেন্দ্র (School of thought) গড়ে তুলেছিল। আইনসমূহকে সাধারণ রূপ দিয়েছে। নানা দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ নির্ধারণ করেছে। দায়িত্বজ্ঞান সম্ভূত আলোচনা-গবেষণা, ইতিবাচক জ্ঞান সংগ্রহ, জ্ঞানের বিস্তারিত পন্থা ও পদ্ধতির বিশ্লেষণ, সূক্ষ্মদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনমূলক প্রয়োগ এই সবের কোনো সামাঞ্জস্য ছিল না গ্রীকদের মেজাজ প্রকৃতির সাথে।

আমরা যাকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলি, তা ইউরোপে নবতর আলোচনার প্রেরণা, আয়ত্তকরণের নবতর পন্থা-অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূল্যমান এবং অংকশাস্ত্রের উন্নতি লাভের পর অস্তিত্ব লাভ করেছে এই প্রাণশক্তি ও এই বৈজ্ঞানিক পন্থা ও পদ্ধতি মুসলমানদের মাধ্যমে সেই ইউরোপে পৌঁছেছে।

আমেরিকান লেখক ড্রিপার তার 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থে লিখেছেনঃ মুসলিম বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বুদ্ধিগত ও চিন্তাগত পদ্ধতি উন্নতি উৎকর্ষের ধারক নয়। প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে মূল ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ অধ্যয়ন জরুরি। এই কারণে মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক।[১]

মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ্র ওহীর বাস্তব ব্যাখ্যা এ-ই ছিল যে, তারা যেন আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিশ্বলোকে বিস্তীর্ণ আল্লাহ্র আয়াতসমূহ নিয়ে ব্যাপক গভীর গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা চালায়। আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল, তারা যেন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে জীবন যাপন করে, কাল্পনিক জগতে বসবাস যেন তারা গ্রহণ না করে।

---

১. ইসলাম চিরন্তন ধর্ম ঃ ফরীদ অজদী।

আর বাস্তবিকই মুসলিমগণ আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণাকে সঠিক ও সুদৃঢ় করে নিয়ে এবং আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিকল আস্থা স্থাপন করেই দুনিয়ার বুকে বাস্তবতার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এ এমন এক দৃষ্টান্তহীন ঘটনা, যা দেখে ইতিহাসও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তা যেমন পরিমিতির দিক দিয়ে, তেমনি প্রকারের দিক দিয়েও।

কিন্তু এক্ষণে সেই মুসলিম উম্মত আল্লাহ্র পথ থেকে অনেকখানি বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

ক্রমশ এবং ধীরে ধীরে জাহিলিয়াতের মূর্খতা তাদের গ্রাস করেছে। প্রথমেই আকীদা-বিশ্বাস শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দ্বীনকে অন্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকা এই বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিল। বাস্তবতার সাথে তার কেননা সম্পর্ক থাকল না। আর এরই মধ্যে অবস্থার এই অধোগতিও ঘটে গেল যে, দ্বীন-ইসলাম ছাড়া ভিন্ন এক দ্বীন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটি আইন তাদের শাসন করতে লাগল। অতঃপর মুসলিম উম্মতের জন্যে আল্লাহ্র পথ বাস্তবভাবে অনুসরণীয় হয়ে থাকল না। শুধু তা-ই নয়, অতঃপর তারা উম্মতে মুসলিম গণ্য হওয়ার সব যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলল, যদিও তাদের মুসলমানী নাম এখনও রয়েছে। তারা নামাযও পড়ে, বেশির ভাগ লোক কখনও কখনও। আর রোযাও থাকে, অন্ততঃ ইফতার যে করে তাতে সন্দেহ নেই।

পতনের ধারা এ পর্যন্ত এসেও থেমে যায়নি। অতঃপর তারা তাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনন্যতাও সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। তারা মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এতই দুর্বল সাহসহীন হয়ে পড়ল যে, দ্বীন-ইসলাম পালন তাদের দ্বারা আর সম্ভব থাকল না।

দ্বীন-ইসলাম পালন না করলে চারিত্রিক অধঃপতন একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। তারা সত্য কথা বলা ত্যাগ করল, অন্তরের নিষ্ঠা কর্পূরের মত উবে গেল। পারস্পরিক লেনদেনে তারা সততা, ন্যায়পরতা বজায় রাখতে পারল না। মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক, তাও আর টিকে থাকল না।

অধোগতি এত তীব্র হয়ে দাঁড়াল যে, তারা যৌনতার কলুষিত আবর্তে গড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। ঠিক ইহুদীদের ন্যায় যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে গেল।

ফলে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেল।

বর্তমানে দ্বীন-ইসলাম এই মুসলমানদের থেকেই অনেক দূরে সরে গেছে। ইসলাম তো আল্লাহ্‌র শাশ্বত জীবন পথ। তা নাযিল হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি। ইসলামের ধারক বলে দাবিদার বা পরিচিত ব্যক্তিদের বিপথগামিতায় ইসলাম নিশ্চয়ই বিপথগামী হয়নি, হারায়নি তার একবিন্দু গুরুত্ব ও মূল্য।

বস্তুত ইসলাম মানবতার জন্যে চিরন্তন উদ্বোধক, নির্ভুল পথের পরিচালক ও চলার পথে তীব্র গতিদানকারী। ইসলাম মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে আসার জন্যে একমাত্র পথ। তাগুতী শক্তির গোলামী লাভ করে আল্লাহ্‌র দিকে আসার জন্যে ইসলাম ছাড়া ভিন্নতর কোনো পথই কোথাও নেই।

বর্তমান সর্বগ্রাসী জাহিলিয়াত বিশ্বমানবতাকে ধ্বংস করেছে, মানুষের জীবনে তা নিয়ে এসেছে এক ভয়াবহ বিদ্রোহাত্মক ও সীমালংঘনমূলক অবস্থা। তা থেকে প্রকৃত মুক্তিলাভ করতে হলে ইসলামী জীবনাদর্শ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা ছাড়া কোনোই উপায় নেই।

বর্তমান জাহিলিয়াতের সর্বাত্মক বিপর্যয় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে হলে ইসলামকেই গ্রহণ করতে হবে। জাহিলিয়াতের সংশোধনকারী বিপরীত শক্তিরূপে রয়েছে একমাত্র ইসলাম। আর সে জন্যে সর্বপ্রথম সকল জরুরি বিষয়ে ধারণাকে সঠিক ও সুদৃঢ় করতে হবে, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত বলে এসেছি। আর তা করতে পারলেই আমাদের জীবনাচরণ সঠিক ও যথার্থ হতে পারবে।

পথভ্রষ্ট বিশ্বমানবতা যখন আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখনই তার জীবন সঠিক ও সুদৃঢ় পথে চলতে শুরু করবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, শিল্প ও দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কে যে মারাত্মক বিপর্যয় এসেছে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কেবল তখনই সম্ভবপর হবে। পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন তার আসল রূপ পরিগ্রহ করতে পারবে।

বর্তমানে জাহিলিয়াত আল্লাহ্ ও মানবতার মধ্যে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর—একটি গাঢ় অন্তরাল সৃষ্টি করেছে।

বিবর্তনবাদ হচ্ছে একটি প্রধান আবরণ, যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। তথাকথিত উন্নতি মানুষকে তার দ্বীন থেকেও অনেক দূরে নিক্ষেপ করেছে। এই ধারণা সৃষ্টি করেছে মানুষের মনে যে, চৌদ্দশত বছর পূর্বে যা মানুষের জীবনে কল্যাণ নিয়ে এসেছিল, আজকের দিনে তা মানুষের কোনো কল্যাণই করতে পারে না। কেননা এই সময়ের মধ্যে মানুষের অবস্থার নাকি অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ নাকি বিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থার মধ্যে চলে গেছে। পুরাতন আদর্শ এখন নাকি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে।

আসলে উন্নতি ও বিবর্তনের এই ধারণাটিই মানুষের জীবনে মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। তা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে মানুষের ধারণায়, মন-মানকিতায়, চিন্তা ও বিশ্বাসে এবং বাস্তব জীবনাচরণে (এই কথার বিস্তারিত বিশ্লেষণ তো আমরা এই গ্রন্থের বিগত দুটি অধ্যায়ে দিয়ে এসেছি)। মানব জীবনের দূরতম কোনো ক্ষেত্রকেও— মানুষের মনকেও মারাত্মক বিপর্যয় থেকে তা রক্ষা পেতে দেয়নি।

এই বিবর্তনবাদ— এই উন্নতি অগ্রগতি সংক্রান্ত ধারণাই— গোটা মানবতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে।

অথচ কুরআনের ভাষায়ঃ 'ওরা মনে করে যে, ওরা সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে।' — না, তা সত্য নয়।

তবে আল্লাহ্র দেখানো পথ প্রথম দিন থেকেই জাহিলিয়াত থেকে মুক্তিদানকারী। ধ্বংস থেকে মানবতাকে বাঁচাতে পারে কেবল ইসলাম— আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ ও জীবন-বিধান।

মানুষ যদি এই জীবন বিধান অবলম্বন করে, তার হেদায়েত অনুসরণ করে চলে, তবেই আসন্ন ধ্বংস থেকে মানুষের রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

সেজন্যে মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র পতি সত্যিকারভাবে ঈমান গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত ও বন্দেগী করতে হবে। তাঁর সাথে কাউকেই একবিন্দু শরীক করা চলবে না। দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে থাকা তাগুতী শক্তিগুলোকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ সাহসিকতা সহকারে বিদ্রোহ করতে হবে। আল্লাহ্র শরীয়াতকে অমান্য করে আইন রচনার কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে আল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টতা দেখানো চলবে না। সার্বভৌমত্ব নিরংকুশভাবে আল্লাহ্র অধিকারের জিনিস, তাকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া চলবে না।

আর তা করতে পারলেই বর্তমানের সব বিপথগামিতা, বিপর্যয় এবং জুলুম বঞ্চনা দূর হয়ে যাবে। মানুষ নিষ্কৃতি পাবে সকল দুর্ভাগ্য ও অমানুষিক আযাব ও নিপীড়ন থেকে; শোষণ ও নির্যাতন থেকে। কেননা এ সব তো মানুষের জীবনকে গ্রাস করেছে তারা নির্ভুল্ আকীদা-বিশ্বাস যথার্থ ইবাদত থেকে বিপথগামী হয়েছে বলে, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে বলে। মানুষ পরস্পর পরস্পরকে মা'বুদ বানিয়েছে খোদাকে বাদ দিয়ে। এই কারণে এখন মানুষই মানুষের জন্যে আইন রচনা করে আর বোকা নির্বোধ অন্ধ মানুষেরা তাদেরই মতো মানুষদের রচিত আইনকে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে চলছে।

অথচ ইসলামই হচ্ছে প্রথম দিন থেকেই মানবতার সকল প্রকারের বিপথগামিতা থেকে মুক্তিদানকারী, সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালনাকারী।

তা আজও ঠিক তাই আছে, যা ছিল আজ থেকে তের-চৌদ্দশত বছর পূর্বে। তা সেকালে যেমন সত্য ও মিথ্যা— হক্ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী ছিল, আজও তা-ই আছে। আজও একমাত্র তা-ই আদর্শ মানুষ সৃষ্টিকারী। সকল প্রকারের বিপর্যয় বিপথগামিতা ও বিদ্রোহ সীমালংঘন থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলাম।

তবে সেজন্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে, মানুষকে তার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তা করতে পারলেই জীবনটা ভারসাম্যপূর্ণ হবে, সঠিক পথে দ্রুত অগ্রসরমান হবে।

এখানে অবশ্য ইসলামের তাৎপর্য বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। এখানে আবার নতুন করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিকতা, শিল্প, সংস্কৃতি ও দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কগত অবস্থার বিস্তারিত আদর্শ তুলে ধরার কোনো প্রয়োজনও দেখা দেয় না।

তা সত্ত্বেও আমরা এখানে ইসলামের কতগুলো বড় বড় দিক তুলে ধরেছি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে। তা হবে সম্যার সমাধানের কুঞ্চিকাতুল্য।

পূর্বে আমরা জীবনের বিভিন্ন দিকে জাহিলিয়াত যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেশ করে এসেছি। জাহিলিয়াত সম্পর্কে আমরা ঠিক ততটাই আলোচনার শামিল করেছি যতটা বিপথগামিতার তত্ত্ব রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণের জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে আমরা পেশ করেছি সেই প্রয়োজনের অনুপাতে যতটা দরকার মনে হয়েছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই কথা খুব একটা বিস্তারিত করে বলা হয়নি। বিপর্যয় ও বিপথগামিতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের পন্থা বাতলানোর যতটুকু দরকার বোধ হয়েছে ঠিক ততটাই আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, নৈতিকতা ও শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বইপত্র রয়েছে। বিশেষ বিষয়ে বিশেষ গ্রন্থ মওজুদ রয়েছে, বাজারে ক্রয় করার জন্যে পাওয়া যাচ্ছে। আর বাজার সকলেরই কাছে খোলা আছে, যে যত সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, অনায়াসেই করতে পারে।

মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখিত 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' নামে একখানি বই রয়েছে। আর আবদুল কাদের আওদা শহীদ লিখিত

'আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা' ও 'ইসলামে অর্থনীতি ও শাসননীতি' নামে দুখানি বই রয়েছে। এ ছাড়া ইসলামের অর্থনীতি পর্যায়ে মওলানা মওদূদী ও সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ লিখিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, যা এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।[১] এ ছাড়াও এইগ্রন্থকার লিখিত, 'স্থিতি ও বিবর্তন' 'মানবীয় মনস্তত্ত্ব অধ্যায়' 'ইসলামী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি' 'ইসলামী শিল্প নীতি' প্রভৃতি বই ইসলামের সামষ্টিক মনস্তাত্ত্বিক, প্রশিক্ষণমূলক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদির ওপর বিস্তারিত আলোকসম্পাত করেছে।

এই কারণে এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করার কোনোই প্রয়োজন নেই। শুধু সংক্ষেপে ও প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলাই যথেষ্ট।

রাজনীতিতে জাহিলিয়াত সৃষ্ট সমস্যা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র চালায় না, শাসনকার্য পরিচালনা করে না।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ যে বিস্তারিত বিধান নাযিল করেছেন, এখানে তার উল্লেখ না করেও আমরা বলব, প্রথম কথা, আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনকার্য না চালানোই এমন একটি পদক্ষেপ যা শুরুতেই বিপর্যয় ও বিপথগামিতা সূচিত করে। কেননা মানব রচিত আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চালানো ও শাসনকার্য পরিচালনের সোজা অর্থ, কিছু সংখ্যক মানুষের শাসন বিপুল জনতার ওপর কার্যকর করা। তারই ফলে মুষ্টিমেয় আইন রচনাকারী বা শাসক প্রশাসকের স্বার্থ বিপুল জনগণের কল্যাণ-ব্যবস্থার ওপর অগ্রাধিকার পেয়ে গেল। অল্প সংখ্যক মানুষ হলো বিপুল জনতার শাসক।

না, একথা যে কেবল আমরা বলছি আমাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে, তা নয়। জাহিলিয়াতের বড় বড় হোমড়া-চোমড়ারাই এই কথা বলেছে। এ সাক্ষ্য তাদের নিজেদেরই পরস্পর সম্পর্কে পরস্পরের। তাদের মধ্যকার জনৈক সাক্ষীর সাক্ষ্য!

রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের সমষ্টিগত মত হচ্ছে, মালিক শ্রেণীর লোকেরাই দেশের শাসক হবে, তারা এই শাসনকার্য চালাবে কেবলমাত্র নিজস্ব স্বার্থ ও কল্যাণের বিবেচনায়– এ তো একান্তই স্বাভাবিক কথা, আর তা অবশ্যই অন্যান্য সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের বিপরীত হবেই।

---

১. মওলানা মওদূদী লিখিত তিনটি প্রধান বইঃ ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি, সুদ ও ইসলাম, জমির মালিকানা এবং সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ লিখিত 'ইসলামের সামাজিক সুবিচার' উল্লেখ্য। (এই অনুবাদক লিখিত দুই তিনখানি বইও পঠনীয়ঃ (১) ইসলামের অর্থনীতি (২) ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন এবং (৩) ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার। এ ছাড়াও আছে (১) 'কমিউনিজম ও ইসলাম' (২) সমাজতন্ত্র ও ইসলাম এবং (৩) পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ।

যেমন পুঁজিবাদে মুষ্টিমেয় লোক ধন-মালের একচ্ছত্র মালিক। আবার তারাই দেশের সর্বাত্মক শাসক। তাদের এই শাসনকার্য নিশ্চয়ই পুঁজিবাদের অনুকূলে ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে সম্পন্ন করে। হবে শ্রমিক-কর্মচারী, শ্রমজীবী প্রভৃতি পর্যায়ের লোকদের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীই সবকিছুর ওপর কর্তা, তারাই আবার শাসকও। তাদের এ শাসনকার্য নিশ্চয়ই শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে চলবে এবং চলবে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে।

এদের প্রত্যেকেই নিজেদের জন্যে বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করে। আর অন্যান্য লোকদের মর্যাদা ও স্বার্থকে তারই বেদীমূলে বলিদান করে। আর এ কথায় এক বিন্দু সন্দেহ নেই যে, মানুষের শাসন কখনোই নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না, সকলেরই স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না।

সকলেরই জন্যে— সকলেরই নির্বিশেষ কল্যাণে শাসনকার্য পরিচালিত হতে পারে কেবলমাত্র তখন, যখন মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসনকার্য চালাবে। কেননা তখন এক শ্রেণীর লোকদের শাসন অন্যান্য বিপুল মানুষের ওপর কার্যকর হয় না। তা হয় একমাত্র আল্লাহ্‌র শাসন নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ওপর মানুষের জন্যে। আল্লাহ্ নিজে কোনো শ্রেণী নন, নেই তাঁর কোনো নিজস্ব শ্রেণী। তখন কিছু সংখ্যক লোক আইন রচনা করবে না অন্য বিপুল জনতার জন্যে। আল্লাহ্‌র কল্যাণ চিন্তায় কোনো শ্রেণীবিভেদ নেই, নেই কারুর প্রতি তাঁর এক বিন্দু বিদ্বেষ। কেননা তিনি সমস্ত মানুষের স্রষ্টা, সমানভাবে সমস্ত মানুষের ওপর তাঁর শাসন সম্পূর্ণরূপে সার্বজনীন; পক্ষপাতমুক্ত।

আল্লাহ্ যখন সমস্ত মানুষকে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করার আহ্‌বান জানিয়েছেন, ইলাহ্ ও সার্বভৌম কেবল তাঁকেই বানাতে বলেছেন, তখন তাঁর এই দাওয়াত হচ্ছে মান-সম্মান লাভ, শক্তি-সামর্থ্য লাভ ও মুক্তি লাভের আহ্‌বান, কেননা এই ঘরের কোনো কিছুই অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় কেবল মাত্র এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করা হলে।

কেননা আল্লাহ্ তো নিজের স্বার্থে মানুষকে তাঁর দাসত্ব কবুল করতে বলেন নি। মানুষের এই দাসত্বের কোনো প্রয়োজন তার নেই, তিনি নয় মানুষের দাসত্বের একান্ত মুখাপেক্ষী। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنَ -

না, আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রিয্ক পেতে চাই না, আশা করি না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে (কেননা আমার খাওয়ারই কোনো প্রয়োজন নেই)। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৭)

সত্যি কথা হচ্ছে সৃষ্টির কর্তব্য তার স্রষ্টার প্রতি, তার রিযিক্দাতার প্রতি অবিসংবাদিত। তিনিই তাদের একমাত্র মালিক, মালিক তাদের যাবতীয় ব্যাপারের, তাদের জীবনের ও মৃত্যুর। আর সে কর্তব্য হচ্ছে, কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের প্রতি তাঁর যে দয়া, অনুগ্রহ ও রহমত স্বরূপ এই কর্তব্য পালনে সেই বান্দাগণের কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, তাদের সার্বিক কল্যাণ কেবল এই ইবাদতেই নিহিত। অতএব মানুষ আল্লাহ্র দাসত্ব করবে এই হিসেবে যে, তিনিই তাদের স্রষ্টা, তিনিই তাদের একমাত্র রব্ব, তাদের একমাত্র ইলাহ্। তা হলেই আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত তাদের ইবাদত তাদের জন্যেই কল্যাণকর হবে। এতে আল্লাহ্র নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো প্রশ্ন নেই। কেননা তিনি এসব কিছুরই উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ -

যে লোকই জিহাদ করবে, সে জিহাদ করবে নিজের কল্যাণের জন্যে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সারেজাহানের প্রতি অমুখাপেক্ষী। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬)

অতএব আল্লাহ্ যখন সমস্ত মানুষের প্রতি আহ্বান জানালেন একমাত্র তাঁকেই ইলাহ্— সার্বভৌম শাসক ও আইন প্রণয়নকারীরূপে গ্রহণ করার জন্যে, তাদের নিজেদের কারুর তৈরি আইন দ্বারা শাসনকার্য না চালাতে, তখন তাদের কর্তব্য হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ্র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে শাসনকার্য সম্পন্ন করা— সর্বক্ষেত্রে ও সর্বব্যাপারে তাকেই আমল ও বিচারের একমাত্র ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা। তাই তিনি তাঁর রাসূলকেও বলেছেন ঃ

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ -

হে নবী, তুমি ঐ লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, তারা তোমাকে আল্লাহ্র তোমার প্রতি নাযিল করা কোনো কোনো বিধান সম্পর্কে বিপদে ফেলতে পারে। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৯)

আল্লাহ্ মানুষের কাছে যখন একনিষ্ঠ দাসত্বের দাবি করলেন, তখন তাদেরকে পরস্পরের দাসত্ব থেকে মুক্ত রাখবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাগুতী শক্তি যেন মানুষকে তার দাস বানিয়ে বসতে না পারে তার উপায় ও পন্থাও তিনি মানুষকে দেখিয়েছেন।

আধুনিক জাহিলিয়াতে তাগুত কিভাবে জনগণকে নিকৃষ্টতম দাসে পরিণত করেছে, তার বীভৎস নমুনা ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি, কেবল বর্তমানের জাহিলিয়াতই নয়, ইতিহাসে সৃষ্ট যে কোনো জাহিলিয়াতেই মানুষের সেই দুরবস্থা হওয়া একান্তই অনিবার্য।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করুক, কিন্তু মানুষ নিজেদের জন্যে যে বিধান ও ব্যবস্থা রচনা করে নেয়, তার ভিত্তিতে উক্ত স্বাধীনতা লাভ ও ভোগ করা কখনোই সম্ভব নয়। তাতে বরং অবস্থা এই হয়, মানুষের মধ্য থেকেই মুষ্টিমেয় কিছু লোক ওঠে সর্বাত্মক ক্ষমতা দখল করে বসে ও অন্যান্য কোটি কোটি মানুষকে নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত করে রাখে। তারা ক্ষমতা দখল করে জনগণের নামে, কিন্তু সে ক্ষমতার দ্বারা কেবল নিজেদেরই হীনস্বার্থ উদ্ধার করে, জনগণের স্বার্থ ও অধিকার সেখানে চরমভাবে পদদলিত, উপেক্ষিত ও ভূলুণ্ঠিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে চেয়েছিলেন সম্মান ও মর্যাদা। কিন্তু একই সম্মান ও মর্যাদা লাভ সম্ভব কেবলমাত্র তখন, যখন সমস্ত মানুষ সমানভাবে এক আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাসত্ব কবুল করবে। তাহলে তাদের মধ্য থেকে কেউ-ই তাগুত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না, বলতে পারবে নাঃ আমি জনগণের জন্যে আইন রচনা করছি, আমিই জনগণের ওপর একমাত্র কর্তৃত্বশালী। বলতে পারবে নাঃ সব মানুষ আমার অধীন, আমার ইচ্ছা ও কামনা বাসনার অধীন হয়ে থাকতে বাধ্য। আর আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করব, জনতা তা মেনে নেবে এবং তার বিরুদ্ধে 'টু' শব্দও করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তাদের বিজয় ও শক্তিমত্তাও চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ বিজয় ও শক্তিমত্তা লাভ করতে পারে কেবল তখন, যখন প্রতিটি মানুষ আইনের প্রকৃত মৌল উৎস স্বয়ং আল্লাহ্-এর সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং একবিন্দুও সে সম্পর্ক থেকে বাইরে থাকবে না। এইরূপ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বার প্রতিটি মানুষের জন্যে উন্মুক্ত। তবে তা সম্ভব হবে মানুষ তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌র নৈকট্য পেতে যত বেশি চেষ্টা করবে সেই অনুপাতে। আল্লাহ্ সেই নৈকট্যের কথা বলেছেন এই ভাষায় ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে বেশি সম্মানার্হ, যে লোক তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি মুত্তাকী– আল্লাহ্ ভীরু। (সূরা হুজরাত ঃ ১৩)

আল্লাহ্র কাছে এই মর্যাদা ও শক্তি কারোর হস্তস্থিত ধন-মাল বা শক্তি ক্ষমতার জোরে কখনোই পাওয়া যেতে পারে না।

বস্তুত ইসলামের এই বিধান ও ব্যবস্থা সর্বতোভাবে একক ও অনন্য, যার মধ্যে বাস করে মানুষ প্রকৃত মর্যাদা, সম্মান ও শক্তির অধিকারী হতে পারে, প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ কেবল এই জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেই পাওয়া সম্ভব। কেবল তখনই তারা নিজেদের মধ্য থেকে নেতা ও শাসক নির্বাচন করার স্বাধীন ও অবাধ সুযোগ পাবে। এ নির্বাচন হবে স্বাধীন বায়'আতের মাধ্যমে। এই স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে যাকেই তারা নির্বাচিত করবে, তার হাতে সমস্ত জাতীয় ব্যাপার সোপর্দ করতে পারবে নিশ্চিন্তে।

এই নির্বাচিত নেতা বা রাষ্ট্র পরিচালক নিজের জন্যে নিজের আইন তৈরি করবে না, তা করার কোনো অধিকারও থাকবে না তার। সে মানুষকে নিজের দাস বানিয়ে তাদের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হওয়ার কোনো অধিকার বা সুযোগ পাবে না। মানুষ তার ইচ্ছার দাসত্ব করতে, তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে না।

সে নেতৃত্ব দান ও শাসন কার্য পরিচালনা করবে আল্লাহ্র নাযিল করা বিধানের ভিত্তিতে। যে সব গুরুত্বপূর্ণ কাজে লোকদে কাছ থেকে বায়'আত গ্রহণ করা হবে, সে বায়'আত তার নিজের জন্যে হবে না, হবে আল্লাহ্র জন্যে। তার ক্ষমতা কাজ করবে শুধু আল্লাহ্র আইন জারী করার। আল্লাহ্র আইন তো তারই বানানো, তা বানানো নয় কোনো ব্যক্তির বা কোনো শ্রেণীর কিংবা কোনো জনগোষ্ঠীর। আর সে আইনে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বা ব্যক্তির কিংবা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, তা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যে মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যে রচিত হয়েছে।

এই নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান যে-ই হোক, সে সর্বসাধারণ মানুষের মধ্যকার একজন ব্যক্তি মাত্র, তার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে কোনো বিশেষত্ব নেই।

সে বিশেষ কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে না। বিশেষ কোনো শ্রেণীর লোকও তাকে নির্বাচিত করবে না। তাকে নির্বাচিত করার জন্যে বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর লোকেরাই উদ্যোগ-আয়োজন বা সহায়তা করবে না। কেননা বিশেষ কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর লোকদের কোনো স্বার্থ বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার মধ্যে নিহিত নেই। কোনো একজনকে মর্যাদাবান বানালে তাতে তাদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো লোককে কেউ মনে

করে সে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বিশেষ ও প্রকৃত যোগ্যতা তার আছে এবং ক্ষমতা লাভ করলে সে লোক সকলের প্রতিই ন্যায়পরতা ও সুবিচার রক্ষা করতে পারবে, সে বিশেষ কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করবে না— অন্যদের তুলনায় তাকে অগ্রাধিকার দেবে না, তাহলে ভিন্ন কথা (তখন সে তার পক্ষে মত প্রকাশ করতে থাকবে)।

কোনো বিশেষ শ্রেণীর লোকদের হাতে সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক শক্তি ও কর্তৃত্ব না যাওয়া পর্যন্ত তারা জনগণকে বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান বা ক্ষমতাশীন বানাতে পারবেই বা কি করে এবং কাউকে নির্বাচিত হওয়া থেকে বিরতই বা রাখতে পারবে কেমন করে ? কেননা ইসলামী সমাজে বিশেষ কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর লোকদের হাতে বিশেষ কোনো ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়া কখনোই সম্ভব হতে পারে না।

তবে ভুল করে এমন কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়, যে বাস্তবিকই রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য নয় এবং পরে জানা যাবে যে, লোকটি আসলে দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন ও অনভিজ্ঞ। কোনো বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট রায় দেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতাও তার নেই। এরূপ অবস্থায় সমস্ত দায়-দায়িত্ব সর্বসাধারণ মুসলমানকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা তারাই তো স্বাধীন মত জানিয়ে তাকে নির্বাচিত করেছে এবং তারা যখন ইচ্ছা করে, তাকে পদচ্যুতও করতে পারবে। তখন সমস্ত দায়িত্ব আবার মুসলিম জনগণের ওপরেই বর্তাবে। এ অধিকার তাদের রয়েছে, চিরকালই তা থাকবে। তারা নির্বাচিত ব্যক্তিকে বলবে, আমরাই তোমাকে নির্বাচিত করেছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হয়েছে যে, তুমি আসলে এই পদের দায়িত্ব বহনের বা এই আসনে আসীন হওয়ার যোগ্য নও। অতঃপর তাকে পদচ্যুত করে তারা আর একজনকে নির্বাচিত করে নেবে।

ইসলামের এই অকাট্য বিধানের আলোকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, ইসলামী সমাজে কেবল নীতিগতভাবেই নয়, প্রকৃত বাস্তবতার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকার স্বাধীনতা, ইজ্জত, মান-মর্যাদা ও সম্মান।

হ্যাঁ, কখনও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে যে, রাষ্ট্রপ্রধান আর তার সাথে সাথে জনগণও কোনো বিশেষ বিশেষ নাযিল হওয়া শরীয়তের মৌল নীতিতে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না, তখনও সে বা তারা যা ইচ্ছা হয়, তাই করতে পারবে না। এরূপ অবস্থার জন্যে শরীয়তে যে পন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা-ই অনুসরণ

করতে হবে। এখানে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব না। তবু সংক্ষেপে বলা যায়, এরূপ অবস্থায় সুন্নাত, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদের এই উপায়সমূহ অবলম্বন করে শূরার ভিত্তিতে এমনভাবে আইন রচনা করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ও পথ প্রদর্শনের সাহায্যে সম্মুখবর্তী বিষয়ে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা অবশ্যই শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকবে, তা লংঘিত হবে না।[১]

আল্লাহ্‌র পদ্ধতি অনুযায়ী রাজনীতির উপরোক্ত মৌল নীতিই মূলত মানুষের স্বাধীনতা ও সম্মান বিধানকারী। তা-ই মানুষকে তাগুতী শক্তির গ্রাস থেকে রক্ষা করে।

জনগণের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করবে, এমন কোনো শ্রেণী এই রাজনীতির অধীন থাকতে ও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের কাছ থেকে স্বাধীনভাবে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে, লোকদের মধ্য থেকে বিশেষ কোনো শ্রেণী তা আয়ত্ত করতে পারে না। আইন রচনার অধিকারও পায় না সমাজের বিশেষ কোনো শ্রেণীর লোকেরা।

সে হুকুম দেয়— শাসন কার্য পরিচালনা করে আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী। তার সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সীমিত থাকে আল্লাহ্‌র শরীয়ত জারী ও কার্য করার দায়িত্ব পালনের মধ্যে। নাযিল হওয়া শরীয়তের কোনো বিষয়ে যদি সে কোনো অকাট্য দলীল না পায়, তাহলে তখনও সে স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে না, সে সেই নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য হয়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তার হুকুম-আইন বা সিদ্ধান্তটা আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধানের সীমার মধ্যেই থাকে।

আল্লাহ্‌র পদ্ধতি অনুযায়ী রাজনীতির এগুলোই হচ্ছে সাধারণ নীতি। এইগুলো যেমন একক, তেমনি অনন্য। এইগুলোই মানুষের জন্যে প্রকৃত স্বাধীনতা, সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করে, কোনো তাগুতী শক্তি তার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের একবিন্দু সুযোগ পায় না।

---

১. 'মানবীয় জীবনে বিবর্তন ও স্থিতি' শীর্ষক গ্রন্থে আমি উল্লেখ করেছি সেই উপাদানসমূহের কথা, যা মানবীয় মনে ও জীবনে বিবর্তন ও পরিবর্তনের সৃষ্টি করে এবং যা তথায় স্থিতি নিয়ে আসে। ইসলাম আল্লাহ্‌র দ্বীন এই উভয় ধরনের উপাদান সমূহের মধ্যে কি ভাবে পূর্ণ মাত্রার সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে তাও বর্ণনা করেছি। তারই ফলে স্থিতিশীল বিষয়গুলো সম্পর্কে স্থায়ী বিস্তারিত বিধানকে, যা কোনো দিনই পরিবর্তন হয় না। কেননা সেই বিষয়গুলোই এমন, যা কোনোদিনই পরিবর্তিত হয় না। পক্ষান্তরে পরিবর্তনশীল ব্যাপারাদিতে একটি বিবর্তনশীল মৌলনীতির বেষ্টনী দেয়, যা সাধারণ ও স্থায়ী এবং পরবর্তীকালসমূহ তার পরিপক্কতা ও বিবর্তনের অনুপাত ও সমাজ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবর্তনশীল আইন তৈরির মাধ্যমে একটা স্থায়ী বেষ্টনী সৃষ্টি করে। এরই দরুন শরীয়ত স্থায়িত্ব পায় এবং ফিকাহ ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে মানুষের প্রয়োজন অনুপাতে। যেমন উমর ইবনে আবদুল আজীজ বলেছেন, যে রকম সমস্যা আসে, মানুষ সেই অনুযায়ী সমস্যার ফয়সালাও পেয়ে যায়।

সাধারণভাবে সমস্ত জাহিলিয়াত বিশেষভাবে আধুনিক জাহিলিয়াতের বাস্তবতার আলোকে উক্ত মৌলনীতিসমূহ চিন্তা-বিবেচনা করলেই আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ্ তা'আলা সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকারকে কেবলমাত্র নিজের জন্যে সংক্ষিত করে রাখার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও কারণ।

নির্বোধ লোকদের জাহিলিয়াত নিজেরই ধোঁকায় পড়ে গেছে এবং মানুষকেও কঠিন বিপদে ফেলে দিয়েছে এই কারণে যে, তা মনে করেছে, আল্লাহ্র কাছ থেকে জীবনের বিধান গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই, মানুষ তার মুখাপেক্ষীই নয়। এ জাহিলিয়াত তো আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে ঘৃণা বোধ করেছে এবং সার্বভৌমত্বের অধিকার ও কর্তৃত্ব আল্লাহ্র হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। আর তারই পরিণতিতে আজকের মানুষ চরম মাত্রার দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়ে গেছে। পুঁজি বাদী স্বৈরতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদী প্রোলেটারীয় স্বৈরতন্ত্রের অধীন মানুষের জীবন কি মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, তা দেখলেই আমরা সেই পরিণতির মর্মান্তিকতা অনুধাবন করতে পারি, এসব সমাজে মানুষ চরম মাত্রার লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করছে।

কেবলমাত্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বই বিশ্ব মানবতাকে এই আল্লাহ্দ্রোহী ও সীমালংঘনমূলক স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাদেরকে সেই রূপ স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দিতে পারে যেমন স্বাধীন হিসেবে তাদেরকে তাদের মায়েরা প্রসব করেছিল। তাতেই জনগণের যাবতীয় ব্যাপার তাদের হাতেই এসে যায়। আল্লাহ্র শরীয়তই তাদেরকে তা দেয়। কোনো সময় যদি কোনো বিদ্রোহী দল তাদেরকে অধীন বানিয়ে নিতে চায়, তা হলে তাদের প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তাদের সব সময়ই থাকে। কেননা তারা বিলীয়মান কোনো 'নিশ্চিত অনিবার্যতাকে' মেনে নিতে বাধ্য নয়। কোনো বিশেষ শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ ও সুবিধা তাদেরকে বাধ্য করতে পারে না ইতিহাসের কোনো নিশ্চিত অনিবার্য পর্যায়ের গ্রাসে পড়ে যেতে। হ্যাঁ, যদি কোথাও তাতে মানুষ পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তা পড়ে নিয়েছে শুধু এজন্যে যে, তারা তার প্রতিরোধ করে আল্লাহ্র শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করতে সাহস পায়নি, তার মোকাবিলায় তারা চরম দুর্বলতা দেখিয়েছে। তবে সব সময়ই তারা ফিরে আসতে পারে, তার উৎখাত সাধন করে আল্লাহ্র শরীয়ত বাস্তবায়িত করতে পারে, তাতে তাদের যত ত্যাগ স্বীকার করতে ও কুরবানী দিতে হোক-না-কেন এবং যত কঠিন বিপদের ঝুঁকিই তাদের মাথায় টেনে নিতে হোক-না-কেন। সে ত্যাগ ও কুরবানী হবে সেই তাগুতী দুঃশাসনের অধীনতার যিল্লতী ও অপমানের মূল্য দান যা তাদেরকে নিশ্চিত অনিবার্যতার দোহাই দিয়ে ভোগ করতে বাধ্য করছে, তা থেকে পালিয়ে যেতে পারছে না।

এ ছাড়া মানুষের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, নৈতিকতা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পদ্ধতির ছায়াতলে ইসলামী শরীয়ত তাদেরকে দেয় পরিপূর্ণ ন্যায়পরতা ও সুবিচার, নির্বিশেষে সমস্ত মানবতার জন্যে নির্ভেজাল কল্যাণ। তবে আমরা প্রথম দিক এই রাজনীতি সম্পর্কেই কথা বলছি, কেননা মানব জীবনে তা অত্যন্ত পূর্ণ, তা-ই তো সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এ পর্যায়ে আমাদের কথা হচ্ছে, মানুষকে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা পেতে হলে মানুষের নিজেদের আইন রচনার অধিকার অস্বীকার করতে হবে এবং নিজ স্বভাবে আইন রচনার কর্তৃত্বশালীকে পদচ্যুত করতে হবে। কেননা তা চিরদিনই অত্যাচারী। তা তারা দখল করে যখন আল্লাহ্‌র নাযিল করা দ্বীন-ইসলাম অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না।

আল্লাহ্‌র শরীয়ত মানুষের মর্যাদা, তার প্রতিভা, কর্মশীলতা, তাদের পরিপক্কতা ও অগ্রসরতাকে কখনোই খাটো করে দেখেনি। বরং এই সব কিছুই প্রকৃত উৎকর্ষ লাভ করে যখন তারা নিজেদের জন্যে আইন রচনার কাজকে হারাম মনে করে নেয়। তখনই তা একটি উপায় হয়ে দেখা দেয় সকল প্রকার সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম থেকে প্রকৃতভাবে মুক্ত করার জন্যে। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা বা উপায়ই নেই।

উপরে আলোচিত সত্যনিষ্ঠ কথাগুলো আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত এবং তা নিজের মনে-মগজে দৃঢ়ভাবে স্থিতিশীলও করে নেওয়া আবশ্যক। তা করতে পারলেই আমরা অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা ও নৈতিকতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিরাট অবদানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবো।

জাহিলিয়াতের সীমালংঘনমূলক পরিবেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুটি ব্যাপার চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

তার একটি দিক হচ্ছে নিরংকুশ ব্যক্তি-মালিকানা পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যারাই ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক, তারাই সেখানকার নিরংকুশ শাসক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ ধারক।

আল্লাহ্‌র পদ্ধতি একই সঙ্গে এই দুটি মারাত্মক ব্যাপারে প্রতিবিধান করে এবং তার ফলেই মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রথমত, ইসলাম এমন কোনো শ্রেণীকে ক্ষমতায় আসতে দেয় না— এসে থাকলেও ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়, যে স্বৈরতন্ত্র চালাতে চায়। সেখানে তার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে নিরংকুশ ও অবিসংবাদিত করে প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষকে সকল প্রকার সার্বভৌমত্ব বা নিরংকুশ ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ রহিত করে দেয়।

ইসলাম মালিকদের ক্ষেত্রে একটি পরম ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। পুঁজিবাদী জাহিলিয়াতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সীমাহীনভাবে নিরংকুশ করে দেয়। তারই ফলে মালিকবিহীন সর্বহারা লোকেরা— স্বল্প বিত্তের অধিকারীরা— সেই সম্পদ-মালিকদের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়।

আর সামষ্টিক জাহিলিয়াত— কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রে— এই ব্যক্তিগত মীলকানা বন্ধ করে অনুরূপভাবে মালিকানাহীন কোটি কোটি মানুষকে নিকৃষ্ট দাসানুদাসে পরিণত করে।[১]

ইসলাম ব্যক্তিগত 'মালিকানা' নিষিদ্ধ করেনি, তবে তাকে সীমাহীনভাবে নিরংকুশও করে দেয়নি। (ইসলামে ব্যক্তিগত মীলকানার অর্থ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র মালিকানাধীন আমানতদারীর খিলাফত। — অনুবাদক)

ইসলাম ব্যক্তিগত 'মালিকানা' বন্ধ বা নিষিদ্ধ করেনি এই জন্যে যে, তা করা হলে সমস্ত মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের করায়ত্ত হয়ে পড়বে। তখন রাষ্ট্র তাদেরকে দাসানুদাস বানিয়ে রাখবে একমুঠো খাবারের বিনিময়ে। রাষ্ট্রই হবে একমাত্র রিযিকদাতা।

ইসলাম তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যে, জনগণ হবে রাষ্ট্রপ্রধানের 'পাহারাদার'। তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখবে আল্লাহ্র শরীয়ত কার্যকর করার ব্যাপারে সে কি ভূমিকা পালন করছে। কোনো সময় যদি তা কার্যকর করণে ভুল করে, তা হলে তারাই তাকে সতর্ক করে দেবে, ভুল করা থেকে বিরত রাখবে। আর নিষেধ ও সতর্ককরণ সত্ত্বেও যদি শরীয়ত বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ-ই করে, তাহলে জনগণই তখন তাকে পদচ্যুত করবে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্য থেকে অবশ্যই এমন একটি গোষ্ঠী বের হবে, যারা প্রকৃত কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে থাকবে, ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪)

রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ -

যে লোক কোনো শরীয়ত-গর্হিত কাজ হতে দেখবে, সেটিকে তার নিজ হাত দ্বারা শক্তিবলে পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত। তা না পারলে মুখে তা

১. পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তনের কথা বলতে হবে। আর তা-ও যদি না পারে, তা হলে অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন কামনা করতে হবে। তবে এটা হলে দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ।

হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়ে প্রথম নীতি নির্ধারণী ভাষণে বলেছিলেন ঃ

اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ عَصَيْتُ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَلَا طَعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ -

আমাকে তোমরা মেনে চলবে যতক্ষণ আমি মেনে চলতে থাকব আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে। আর আমিই যদি আল্লাহ্ ও রাসূলকে অমান্য করি, তাহলে তোমাদের জন্যে আমার আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

কিন্তু এরূপ সমাজে পরিবেশ ও গণ-স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হতে পারে না, যদি সমাজের জনগণ এক মুঠি খাবারের জন্যে রাষ্ট্র-সরকারের গোলামী করতে বাধ্য হয়।

বস্তুত ইসলাম একটি বাস্তব জীবন বিধান। তা মানুষকে ফেরেশতা মনে করে না, মানুষই মনে করে এবং তারা সকলেই চির উন্নত মানের বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পন্ন হবেই— এমন একটা কথাও ধরে রাখেনি, ইসলাম মানবীয় সমস্ত তত্ত্ব লক্ষ্য করে সেই হিসেবেই আচরণ গ্রহণ করে। মানুষ কখনও দুর্বল হয়, কখনও হয় শক্তিসম্পন্ন, একথা ইসলাম কখনই ভুলে যায় না। এটাও অসম্ভব মনে করা না যে, মানুষ যেমন উন্নতমানের চরিত্র বিশিষ্ট হতে পারে, তেমনি নৈতিকতার নিম্নতম অংশেও তারা নেমে যেতে পারে। ইসলাম মানবীয় বাস্তবতার এই ভিত্তির ওপরই তার পূর্ণাঙ্গ বিধানকে কার্যকর করে, মানুষ যদি অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রী শাসকের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে ইসলাম তাকে সহযোগিতা দেয়, সমর্থন দেয় তাকে পদচ্যুত করার কাজে। ইসলাম চায় লোকদের রিযিকের উত্তম উৎপাদন, বন্টন ও পারস্পরিক বিনিময়ের কাজটা জনগণ নিজেদের হাতেই রাখুক এবং সব কিছুর ব্যবস্থাপনা সরাসরিভাবেই সম্পন্ন হোক, তার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যেন আদৌ কায়েম হতে না পারে। কেননা রাষ্ট্র-সরকার যেখানে জনগণের রিযিক পাওয়ার একমাত্র উৎস বা মাধ্যম হয়, সেখানে মানুষের স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকতে পারে না।

অপরদিকে ইসলাম বাস্তবতার দৃষ্টিতে ব্যক্তি-মালিকানার সীমিত অনুমতি দিয়েছে এই লক্ষ্যে, যেন কতিপয় মানুষ অন্য সমস্ত মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন চাপিয়ে দিতে না পারে।

এই কারণে অনুমতি দেওয়া ব্যক্তি মালিকানার ওপর এমন সব শর্ত ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, যা কারোর হাতে বিপুল পরিমাণ ধন-মাল পুঞ্জীভূত হতে

২০ --

বাধা দেয়, মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে সমস্ত জাতীয় সম্পদ করায়ত্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই শর্ত ও বিধি-নিষেধ পর্যায়ে প্রথম উল্লেখ হচ্ছে, প্রতিটি ব্যক্তিকে নিতান্ত হালাল ও পবিত্র উপায়ে তা অর্জন করতে হবে, হারাম উপায়ে নয়। প্রত্যেক সম্পদ-সম্পত্তির মালিকের জীবনাবসানে তা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বন্টন হবে। তাই মীরাস বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ-সম্পত্তির হালালভাবে অর্জিত মনে করে। এক বছরকাল মালিকানাধীন থাকার পর তার ও তার মুনাফার ওপর যাকাত ফরয হয়, এই যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদও হালাল। আর নিষেধের বড় দিক হচ্ছে সূদ ও পণ্য মওজুদকরণ। এসব ক্ষেত্রে যেখানেই বিপথগামিতা লক্ষ্য করা যাবে তাকে সংশোধন করার পূর্ণ কর্তৃত্ব ইসলাম দেয় রাষ্ট্র-শাসককে। তবে এই কর্তৃত্ব কার্যকর করতে গিয়েও ইসলামের দিক দিয়ে জীবনের যে ভিত্তি ও মূল তাকে কিছুতেই ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। ব্যক্তির জন্যে রিযিকের দুয়ার এমনভাবে উন্মুক্ত থাকবে যার ওপর সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা শরীয়তের সীমালংঘন না করছে।

সুদী ব্যবস্থা ও মওজুদদারী, একচেটিয়া কারবার পুঁজিবাদের একটা সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ বিশেষ। এর মধ্যে সেই পুঁজিপতিরা ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে নেয় এবং অন্য সমস্ত মানুষকে বঞ্চিত করে তাদের মৌল জীবন-জীবিকা থেকেও।

ইসলাম যে আল্লাহ্র বিধান ও সর্বাধিক কল্যাণকর, এই কথা প্রমাণের জন্যে যদি কোনো দলীলের বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহলে আমরা বলব উক্ত ব্যবস্থাই তার অকাট্য প্রমাণ। কেননা আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবকিছুই সীমালংঘনমূলক ও বিপর্যস্ত ব্যবস্থা। মানবতার জন্যে চরম অপমানকর। পৃথিবীর জাতি ও মানব গোষ্ঠীসমূহের ওপর বীভৎস সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার। ইসলাম যখন নাযিল হয়েছিল, তখন মানুষের কাছে পুঁজিবাদের এই বীভৎস রূপ স্পষ্ট ও প্রকট ছিল না। এই পুঁজিবাদের ভিত্তি যে সুদ ও ইজারাদারী ব্যবস্থা, তা-ও তখন কারুরই জানা ছিল না।

কিন্তু ইসলাম এই দুটোকেই সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলামের আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান হওয়ার কথা প্রমাণের জন্যে এই কথাটি যথেষ্ট। সাক্ষ্য-সাবুতের প্রয়োজন বোধ করলে যে-কেউ উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণকে বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে যে, ইসলাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ব্যবস্থা।

এখানে অবশ্য ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা বিস্তারিত করে পেশ করার অবকাশ নেই। পূর্বে যেমন বলেছি, এই নির্দিষ্ট ও বিশেষ বিষয়ে বহু কয়টি মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে, যা অধ্যয়ন করলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

তবু ইসলামী বিধানের অর্থনীতির মৌল ও প্রধান-প্রধান নীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করে দিচ্ছি ঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাধারণ মতাদর্শের ভিত্তিগত কথা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই পৃথিবীতে মানব প্রজাতিকে তাঁর খলীফা বানিয়েছেন। তাকে ধন-মালও দিয়েছেন, কিন্তু তার 'মালিক' সে নয়, এসব কিছুরই প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আর মানব সমাজ নির্বিশেষে আল্লাহ্র খলীফা। মানুষকে এই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হবে শরীয়তের বর্ণিত শর্তসমূহ অনুযায়ী। শরীয়তে এই শর্ত হয় মৌল সামগ্রিক নীতি হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে, না হয় বিস্তারিত খুঁটিনাটিসহ আইন দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের মৌল-নীতিই অনেক বেশি।

ব্যক্তি এই ধন-সম্পদে বেতনের শর্তে নিযুক্ত। ব্যক্তি এই মাল-সম্পদ নিয়ে যে চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করছে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রিত মালিকানার ভিত্তিতে, তার-ই কারণে উক্ত বেতন প্রাপ্তির অধিকার সে লাভ করে। সেই সাথে তাকে উত্তম নীতিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই অধিকার উত্তমভাবে ভোগ করার শর্ত হচ্ছে সে তা থেকে বেতন বাবদ গ্রহণ করতে পারবে তার যা প্রয়োজন। এই নির্ভুল হস্তক্ষেপের শর্ত ব্যক্তির ওপর যেমন, তেমনি সমাজ-সমষ্টির ওপরও। উভয়েরই কল্যাণ এরই ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ্র আরোপিত এসব শর্তে পরিপূরণ ব্যতীত কোনো কল্যাণই লাভ করা যেতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যদি ধন-সম্পত্তি হাতে পেয়ে নির্বুদ্ধিতা করে, খারাপভাবে ব্যয়-ব্যবহার করে, বেহুদা ব্যয় করে তাহলে তার এই ব্যয় অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তখন সে অধিকার সমাজ-সমষ্টির হাতে ফিরে আসবে। কেননা এটা তো পূর্বেই প্রমাণিত যে, মানব সমষ্টিই হচ্ছে আসলে পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা, কোনো ব্যক্তি হিসেবে তা নয়। সমাজ-সমষ্টির এই হস্তক্ষেপ অধিকার প্রয়োগে ব্যক্তি-মালিকানা ব্যবস্থা— ইসলামে যা এবং যতটুকু আছে— কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। কেননা এখানে কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, সমস্ত ব্যবস্থাতেই ব্যক্তিত্ব স্বীকারের সাথে সাথে সমষ্টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উত্তম ব্যয় ব্যবহার করার অধিকারের নিরাপত্তা বিধানকারী হচ্ছে এই শর্তসমূহ। এগুলোর কারণে সমষ্টির স্বার্থও— যা ব্যক্তিগণের হাতে রক্ষিত সম্পদের ওপর আরোপিত— রক্ষা পায়, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে, কেননা যাকাত ইত্যাদি তো সমষ্টির প্রয়োজন পূরণের জন্যে তা প্রয়োজন পরিমাণে গ্রহণ করা হয় ব্যক্তিগণের বিভিন্ন হাতে রক্ষিত সম্পদ থেকে। এরূপ অবস্থায়ও ব্যক্তির অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। তবে যে সব সম্পদ সম্পত্তিকে সাধারণ মালিকানায় রাখা হয়েছে সেগুলোর কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتَاكُمْ -

এবং দাও তাদের আল্লাহ্‌র সেই ধন-মাল থেকে, য তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا-

এবং তোমরা দিও না নির্বোধ লোকদেরকে তোমাদের ধন-মাল, যাকে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে জীবিকার বাহন বানিয়েছেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫)

সমাজের মধ্যে সম্পদ বন্টনের একটি স্থায়ী নিয়ম গ্রহণ করেছে ইসলাম। সে পর্যায়ের মৌল নীতি হচ্ছে ঃ

كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ -

যেন ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার কেবল ধনী লোকদের মধ্যেই আবর্তনশীল হয়ে না থাকে। (সূরা হাশর ঃ ৭)

এসব মৌল নীতির কারণে ধনীগণ ধন-সম্পদকে নিজেদের করায়ত্ত ও কুক্ষিগত করে রাখবে, তার কোনো অধিকারই নেই। বরং তাদের মালিকানা সম্পদ ও সম্পত্তিকে বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে বিতরিত ও বন্টিত হতে হবে। আর তাহলেই ধন-সম্পদ তার স্বাভাবিক ভূমিকা পলন করতে পারবে জাতির বিপুল সংখ্যক লোকদের মধ্যে।

এভাবেই সমাজের বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থ লোকেরা তাদের প্রাপ্য 'হক' সমাজের কাছ থেকে পেয়ে যাবে। ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজই এই হক যথারীতি আদায় করতে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। অভাবগ্রস্তদের মধ্যে তা নিয়মিতভাবে বণ্টন করে দেবে। আল্লাহ্‌র ঘোষণা ঃ

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ -

এবং তাদের ধন-মালে বঞ্চিত ও ভিক্ষুকদের 'হক' রয়েছে। (সূরা যারিয়াত ঃ ১৯)

এই 'হক' হচ্ছে যাকাত। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তা নিয়মিতভাবে আদায় করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে ধনী লোকদের ওপর এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা ইসলামী সমাজের ওপর। তা হিসাব করে দিতে ও আদায় করতে হয়, যখনই ধনীদের কাছে সঞ্চিত নগদ সম্পদ বা নতুন ফসল আসবে।

অর্থ-উপার্জনের জন্যেও বহু নিয়ম-নীতি নির্ধারিত হয়েছে। অর্থের পারস্পরিক লেন-দেনও নিশ্চয়ই সেই নিয়ম-নীতি অনুযায়ী সম্পাদিত হতে হবে। অতএব উপার্জন প্রক্রিয়া বা পারস্পরিক লেন-দেন পদ্ধতিতে এমন পন্থা কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না, যাতে ব্যক্তির বা সমাজের অন্যান্য লোকদের ক্ষতি হওয়ার বা শোষণের কোনো দিক থাকবে। এই কারণেই চুরি, ডাকাতি, লুটপাট, ছিনতাই, অপহরণ,

ধোঁকা, প্রতারণা— কম মাল দিয়ে বেশি মূল্য নেওয়া বা খারাপ মাল দিয়ে ভালো মালের মূল্য গ্রহণ এবং মওজুদদারী করে সমাজকে কষ্ট দেওয়া ও বিপুল মুনাফা লুণ্ঠনের কৌশল অবলম্বন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। অনুরূপভাবে সুদও হারাম। শুধু তা-ই নয়, তা হচ্ছে অর্থোপার্জনের নিকৃষ্ট ও বীভৎসতম উপায়। আল্লাহ্র নির্দেশঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ভয় করো আল্লাহ্কে এবং সুদের অবশিষ্ট অংশ পরিহার করো যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তা না করো, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হও। (সূরা বাকার ঃ ২৭৮-২৭৯)

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় পারস্পরিক নির্দোষ সহযোগিতার বিধান করা হয়েছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সময়মত ঋণ ফেরত দিতে না পারলে ঃ

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবের মধ্যে পড়ে তাহলে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে অবকাশ দেওয়া কর্তব্য। আর যদি দান-ই করে দাও, তাহলে তা-ও তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (সূরা বাকারা ঃ ২৮০)

এসব সাধারণ নিয়ম। এসব নিয়মের বেষ্টনীর মধ্যেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা পরিপক্ক প্রবৃদ্ধ, উন্নত ও অগ্রসর হয় কোনোরূপ বাধা-প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকেই। তবে বিপথগামিতা ও বিপর্যয় রোধ করার জন্যে এ নিয়মগুলো সদা সক্রিয়।[১]

এই পথ ও পন্থায়ই ইসলাম বিবর্তনের সকল স্তরেই যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে থাকে। এর দরুন মানুষের জুলুম ও শোষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং সে ব্যবস্থায় দুনিয়ার কোনো বিদ্রোহী সীমালংঘনকারী ব্যক্তির দাস হতে হয় না জনগণকে।

উপরে যেসব সাধারণ নিয়ম-নীতির উল্লেখ করা হয়েছে, তার সাথে অপর একটি মহাসত্য কথা যোগ করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়, যার দরুন অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১. 'স্থিতি ও পরিবর্তন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তা হচ্ছে, ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা মানুষকে কোনো প্রকারেই নিশ্চিত অনিবার্যতার দাস বানায় না, তা জড়বাদের নিশ্চিত অনিবার্যতা হোক, কি অর্থনৈতিক অথবা ঐতিহাসিক নিশ্চিত অনিবার্যতা।

ইসলামে মানুষই হচ্ছে তাদের সমাজ ও অর্থনীতির আসল হোতা। তথায় কোনো নিশ্চিত অনিবার্য স্তর নেই, যা মানুষের জীবনে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে দিতে পারে এবং একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীর ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নিশ্চিত অনিবার্যতার দরুন বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

তা হতে পারে কেবল বিপথগামী জাহিলিয়াতের স্থানে। কেননা তা আল্লাহ্ প্রদর্শিত পন্থার অনুসারী নয়।

কিন্তু ইসলামী পন্থায় মানুষ এক আল্লাহ্র বান্দা হয়, ইবাদত কেবল তাঁরই করে। কোনো প্রকারের নিশ্চিত অনিবার্যতার দাসত্ব করে না।

ইসলাম মুসলমানদের এই পতন যুগেও বিভ্রান্তি ও বিপর্যয় অনেকখানি প্রতিরোধ করেই বলেছে। ইউরোপের ভয়াবহ সামন্তবাদ ইসলাম অধ্যুষিত দুনিয়ায় স্বীয় বাধ্যবাধকতা মুসলমানদের ওপর এমনভাবে চাপাতে পারেনি, যতটা ইউরোপে চেপে বসেছিল।

ইসলামী আদর্শের মানুষই হচ্ছে আসল সক্রিয় শক্তি। সমগ্র বিশ্বলোক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য বিনিয়োগের ক্ষেত্র, তার ব্যবহারাধীন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ -

এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কর্মে নিরত রেখেছেন আকাশমণ্ডলে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে তা সবই। (সূরা জাছিয়াহ ঃ ১৩)

এভাবেই মানুষ তার আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণানুযায়ী তার অর্থ ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তোলে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ইচ্ছানুক্রমেই মানুষকে এরূপ করার সুযোগ দিয়েছেন। ফলে মানুষ কখনোই অর্থনৈতিক নিশ্চিত অনিবার্যতার অধীন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না। এমন কেউ কোথাও থাকবে না, যে মানুষকে বিনীত দাসানুদাস বানাতে পারে এবং তাকে বিনয়াবনত বানিয়ে তার ওপর কোনো নিশ্চিত অনিবার্যতা চাপিয়ে দিতে পারে।

ইসলাম যখন মানুষকে এই ইতিবাচক সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ দিয়েছে, তখন তা অবশ্যই তাকে সম্মানিত করবে ধারণা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং তার বাস্তব জীবনাচরণও যথার্থ ও নির্ভুল করে দেবে। তার ফলে গোটা মুসলিম সমাজ হবে জুলুম-শোষণ বিপর্যয় ও বিপথগামিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

দ্বীন-ইসলাম সামাজিক সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে প্রথম থেকেই ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পূর্ণ মাত্রার ভারসাম্য বাস্তবায়িত করেছে। সেই সাথে সমাজের পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক জটিল সমস্যাটিরও সুষ্ঠু সমাধান করেছে।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও সমষ্টি দুই সাংঘর্ষিক যুধ্যমান বাহিনী নয়। আর তা হওয়াও নিশ্চিয়ই বিন্দুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে খিলাফতের দায়িত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন, তা যেমন ব্যক্তির জন্যে তেমনি সমাজ সমষ্টির জন্যেও। মানুষ যখন একজন ব্যক্তি ঠিক সেই সময়ই সে সমাজেরই একজন। ব্যক্তি তার খিলাফতের মর্যাদা প্রয়োগ করবে সামষ্টিক খিলাফত রক্ষা করে, তকে লংঘন বা ক্ষুণ্ন করে নয়।

অতএব এই দুয়ের মধ্যে কোনো শত্রুতা বা হিংসা বিদ্বেষের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই দুটির একটির অপরটি ওপর প্রাধান্য পাওয়ার কথাও একেবারে অবাস্তব।

যে মতাদর্শ সমাজকে ব্যক্তির শত্রু হওয়ার ধারণা দেয়, তা নিশ্চয়ই ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে চায়। পক্ষান্তরে যে মতাদর্শ ব্যক্তিকে সমাজ সমষ্টির শত্রু হওয়ার প্ররোচনা দেয়, তা-ও ব্যক্তিকে সমাজ সমষ্টির অফুরন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ দুটি মতাদর্শই ভারসাম্যহীন, চরমবাদী ও বিপর্যস্ত।

ভারসাম্যপূর্ণ পথ হচ্ছে ব্যক্তি সমষ্টিরই একজন এবং সমাজ ব্যক্তিদেরই সমন্বয়ে গঠিত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির চিন্তা করাও সম্ভব নয়। এ দুইয়ের মাঝে নেই কোনো বিচ্ছিন্নতা বা পার্থক্য।

বিপর্য অবস্থায়ই কেবল বিদ্রোহী ও তাগুতী স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ সম্ভব। তার এই বিদ্রোহ যে ধরনেরই হোক-না-কেন। এ ব্যক্তিও হবে বিপর্যস্ত, চরিত্রহীন, লোভী। সে মনে করবে যে, সামাজিক নিয়মতন্ত্রের বাধাবন্ধন তাকে তার বিপথগামিতা ও বিপর্যয়মূলক কার্যকলাপ চালাবার স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। এই কারণে সে এই সমাজ-সমষ্টিকে ও তার নিয়ম-শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। অথবা সে চেষ্টা করবে সমাজের ওপর নিজের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে ও তাকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিচালিত করতে— তার মধ্যে নিহিত বিপদগামী ভাবধারা অনুপাতে। কিন্তু ইসলামী সমাজে তা সম্ভব নয়।

---

১. এখানে আমরা যৌন সম্পর্কের কথা তুলছি না, আলোচনা করছি না সমষ্টি সম্পর্কের পর্যায়ে। যৌন-সম্পর্ক যদিও তারই একটা অংশ কিন্তু তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এই কারণে এখানে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

অনুরূপভাবে সমাজও হতে পারে আল্লাহ্‌দ্রোহী, সীমালংঘনকারী। পরম ভারসাম্যপূর্ণ পথ থেকে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। সে সমাজ ব্যক্তিকে কখনোই কোনো সরল ঋজু আদর্শের পথে চালাতে পারে না, তাকে সে দিকে আহ্বান জানানো বা উৎসাহ দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তা ব্যক্তিগণকে ধ্বংসের দিকেই ঠেলে দেয়।

কিন্তু ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টি সমান মর্যাদা সহকারে অবস্থান করে। একদিকে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বকে বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভের সুযোগ দেয় এবং অন্যদিকে সমাজকে সুসংবদ্ধ ও স্বতন্ত্র করে গড়ে তোলে এবং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য পুরোপুরি রক্ষা করে।

ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই ও একই সময়ই ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং উভয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করে।

ইসলাম একদিকে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। আর সেই সাথে সুসংবদ্ধ সমাজও গড়ে তোলে। দুটোর ওপর সমান গুরুত্বই আরোপ করা হয়।

ইসলাম ব্যক্তিকে সরাসরি সম্বোধন করে, তাকে দেয় অনেকগুলো অধিকার এবং তার ওপর কিছু দায়িত্বও অর্পণ করে। ফলে তার ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

অনুরূপভাবে ইসলাম সমাজকেও স্বতন্ত্র ও প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করে। তার জন্যে বিশেষ বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করেছে, তার ওপরও অর্পিত হয়েছে অনেক দায়-দায়িত্ব। আর এ সবের মধ্য দিয়েই সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠে।

ইসলামে ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। মাধ্যম হিসেবে কাউকেই গ্রহণ করা হয় না, তার কোনো প্রয়োজনও নেই। ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সরাসরি সম্বোধন করে, তাঁর সাথে গোপনে কথা বলে, তাঁরই বন্দেগী করে, তাঁর নৈকট্য চায় ও অর্জন করে, এই সব কাজই সে করে এক স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা হিসেবে। সুনির্দিষ্ট ও বিশেষত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরূপে। ইসলাম তার মধ্যে এই চেতনা স্থায়ীভাবে জাগিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্ তাকে ব্যক্তি হিসেবেই গুরুত্ব দিয়েছেন পূর্ণ মাত্রায়। তিনি ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসেবেই সৃষ্টি করেন তার পিতা-মতার ঔরসে। আল্লাহ্ তাকে নিজ কুদরতেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তা হিসেবে বানিয়েছেন। তিনিই তাকে রিযিক দিয়ে বাঁচিয়েছেন একজন ব্যক্তি হিসেবে। যদিও তার রিযিক পাওয়ার যাবতীয় উপায়ের সাথে গোটা সমাজ জড়িত; জড়িত গোটা বিশ্ব প্রকৃতি। কিন্তু রিযিকটা তো এককভাবে ব্যক্তির জন্যে ব্যক্তি হিসেবেই। আল্লাহ্‌র কাছে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্যেই পরিমিত রিযিক লিখিত রয়েছে। যার জন্যে যে রিযিক যে পরিমাণে লিখিত আছে, তা তারই জন্যে, অন্য কেউ তা পেতে পারে না। ব্যক্তি

যখন আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করে, আল্লাহ্ তা শুনেন, কবুল করেন। তনি ব্যক্তির বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন পূরণ করে দেন। অবশ্য যদি তিনি চান। অথবা তার জন্যে পরকালে দেওয়ার সিদ্ধান্ত লিখে দেন। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ ব্যক্তির দো'আ কবুল করেন ব্যক্তি হিসেবেই, সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের সাথে একাকার নয়, তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি ব্যক্তি হিসেবেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযির হবে। বলেছেন ঃ

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا –

সমস্ত লোকই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হবে একান্তই ব্যক্তিগতভাবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৯৫)

আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাস. করবেন তার নিজের সম্পর্কে, তার ব্যক্তিগত কাজকর্ম সম্পর্কে। অন্য কারোর সম্পর্কে নয়।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ –

প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কার্যকলাপ দ্বারাই বন্দী। (সূরা মুদ্দস্সির ঃ ৩৮)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

কোনো বোঝা বহনকারীই অন্য কারোর বোঝা বহন করবে না।

(সূরা আনআম ঃ ১৬৪)

এইসব ব্যবস্থাপনার কারণেই ব্যক্তির মধ্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হওয়ার একটা চেতনা পূর্ণ মাত্রায় জেগে ওঠে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে।

ইসলাম ব্যক্তির ওপর ব্যক্তিগত পর্যায়ের বহু কাজের দায়িত্ব অর্পন করেছে, যেন ব্যক্তির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে ওঠে। প্রত্যেকেই এক একজন ব্যক্তি। ব্যক্তি হিসেবেই তার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র নিয়ম-নীতি ও শরীয়ত কে বাস্তবে কায়েম করবে। সে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও সেই দিকে আহ্বান জানাবে। সমাজের মধ্যে শরীয়ত পরিপন্থী কাজগুলোর মোকাবিলা ও প্রতিরোধ করার জন্যেও সে দায়িত্বশীল। সে কাজ তাকে করতে হবে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, তার ঈমানী বলিষ্ঠতা দিয়ে, এই দায়িত্ব পালনের পথে কোনো বাধা দেখা দিলে তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই সমষ্টিগতভাবে তার প্রতিরোধ করবে। তখন তা আর ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকবে না, তা সামষ্টিক দায়িত্বের ব্যাপার হয়ে যাবে। ইসলামেও সমষ্টির দায়িত্ব আল্লাহ্‌র শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ্‌র হেদায়েত মোতাবেক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা। ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা চালু করা। আদর্শ ও আদর্শানুসারী সমাজ গড়ে তোলা। সমাজের মধ্যে নৈতিক মূল্যমান প্রচার করা, সমাজকে সকল নৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা, তাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা, নৈতিকতার ব্যাপক ও সংকীর্ণ (কেবল যৌন পাপ)

অর্থ ইসলামে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। শাসক ও নেতাদের কার্যাবলীর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, যেন তারা আল্লাহ্র শরীয়ত থেকে বিপথগামী না হয়ে যায়। সত্য সুবিচার সমাজের সকলের জন্যে। এভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তি ইতিবাচকভাবে বাস্তব জীবনে— কেবল মতাদর্শ বা চিন্তার দিক দিয়েই নয়— স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রতিভাত হবে, ব্যক্তির লালন প্রশিক্ষণ এভাবেই হওয়া সম্ভব মনস্তাত্ত্বিকভাবে, নৈতিক ও সামষ্টিকভাবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের যোগ্য হতে পারে।

ইসলাম ব্যক্তিকে ধন-সম্পত্তির আমানতি মালিকানা দেয়। ফলে এই দিক দিয়েও ব্যক্তির মধ্যে স্বতন্ত্র স্বকীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই মালিকানা বাস্তবেই কারোর হোক, আর না-ই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। অধিকার তো স্বীকৃত, তা অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাও যথারীতি সকলের জন্যে উন্মুক্ত রয়েছে। এই অধিকার ও তা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা— উভয়ই বক্তির মধ্যে স্বকীয়তার গুণাবলী সৃষ্টি করে। সে একদিক দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মালিক। তা তার ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। আর সেখানেই অপর দিক দিয়ে তার জন্যে আল্লাহ্র নির্ধারিত রিযিক তার ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তোলে। সে তা নিজ হাতেই নাড়াচাড়া করে, তখন সে তার নিজের সত্তা স্বাতন্ত্র্যের চেতনা লাভ করে। আর তৃতীয় দিক দিয়ে রিযিক উপার্জনের উপায় উপকরণও তার নিজের হাতে থাকে বলে তার দ্বারা সে বিপথগামী শাসকদের বা সমাজের দিক থেকে কৃত বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচার-আচরণেরও মোকাবিলা করতে পারে।

আর ব্যক্তি-মালিকানা যদি বাস্তবতার মুখ না দেখে অধিকার ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তবু ইসলাম সে ব্যক্তিকে অসহায়ভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্যে কখনোই ছেড়ে দেয় না। তখন তার জন্যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বায়তুলমালের সরাসরি সাহায্য দান কাজ করতে শুরু করে। তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচায়। ইসলামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার তাৎপর্য হচ্ছে, তাকে কল্যাণকর ও মুনাফা দানকারী কোনো কাজের যোগ্য বানানো। তাকে উপার্জনশীল বানিয়ে দেওয়া রাষ্ট্র সরকারের কর্তব্য। কোনো ভালো কাজের প্রয়োজন পরিমাণ বেতনের বিনিময়ে লাগিয়ে দেওয়া। আর তার জন্যে উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা করা যদি সম্ভবই না হয়, অথবা সে নিজেই উপার্জন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, কাজকর্ম বা শ্রম-মেহনত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, স্বাস্থ্যহীনতা বা বার্ধক্যের কারণে কিংবা অল্প বয়স হওয়ার দরুন— এই সকল অবস্থায়ই সে তার প্রয়োজন পূরণ উপযোগী প্রাপ্য অবশ্যই পেতে থাকবে। আল্লাহ্-ই তা তার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটা কারুর কোনো অনুগ্রহ নয়, সে কারোর কাছ থেকে ভিক্ষা স্বরূপও কিছু গ্রহণ করবে না। কেননা মানুষ নিজে-

রাই নিজেদেরকে রিযিক দেয় না। রিযিক দেন একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলাই প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযিক ঠিক করে রেখেছেন্। পাওনাদাররা তা আল্লাহ্র নির্ধারণ অনুযায়ীই গ্রহণ করবে।

কোন সমাজ ব্যবস্থা যে শেষ পর্যায় পর্যন্ত যেতে পারে বলে ধারণা করা যায়, ইসলামের এই হচ্ছে সর্বশেষ চূড়ান্ত ব্যবস্থা। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্যে এর চাইতে উত্তম ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা দুনিয়ার অপর কোনো বিধান বা মতাদর্শই করতে পারেনি। ইসলাম এক্ষেত্রে একক ও অনন্য।

এরই পাশাপাশি ইসলাম সমাজ সমষ্টির স্বাতন্ত্র্যকেও সংরক্ষিত ও প্রকটতর করে তুলেছে।

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিভাত করার জন্যে যেমন ব্যক্তির ওপর কর্তব্যের ভার চাপিয়েছে, ঠিক তেমনি সমাজ-সমষ্টির ওপরও বহু দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এই সব দায়-দায়িত্ব যথাযথ পালনের মাধ্যমেই সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে ওঠে এবং সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজ সামষ্টিকভাবেই আল্লাহ্র শরীয়ত পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েমের জন্যে দায়ী। শুধু জারী করেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না, তা যথাযথভাবে পালিত ও অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা লক্ষ্য করা— না হতে থাকলে তা পালিত ও অনুসৃত করিয়ে দেওয়াও সমাজের দায়িত্ব।

এই সমাজই যাবতীয় সামষ্টিক ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে। সমাজের কাছ থেকেই আনুগত্যের 'বায়'আত' গ্রহণ করা হয়— ব্যক্তিগণের কাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে নয়। সমাজই তীক্ষ্ম সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখে রাষ্ট্রপ্রধান শাসনকার্যে শরীয়তকে পুরোপুরি অনুসরণ করছে কিনা। সমাজই তার কাছ থেকে জবাবদিহি গ্রহণ করে বাঁকা পথে চলতে শুরু করলে তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসে। সমাজই তাকে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

তোমাদের মধ্য থেকে এক লোকসমষ্টি অবশ্যই এমন দাঁড়াতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪)

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ -

তাদের সামষ্টিক কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। (সূরা শূরা ঃ ৩৮)

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ –

এবং সমাজের লোকদের সাথে সামষ্টিক ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করো। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৯)

কুরআন মুসলিম সমাজকে বারবার উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছে ঃ يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا – 'হে ঈমানদার লোকেরা' বলে।

يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى –

হে ঈমানদার লোকেরা, নরহত্যার ব্যাপারে কিসাস তোমাদের জন্যে ফরয করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮)

يٰـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً –

হে ঈমানদার লোকেরা; তোমরা ইসলামে পুরোপুরি দাখিল হয়ে যাও। (সূরা বাকারা ঃ ২০৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ –

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা পরস্পরের ধন-মাল বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৯)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا –

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করো। অতএব তোমরা বের হয়ে পড় দলে দলে বিভক্ত হয়ে, অথবা সকলেই এক সঙ্গে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৭১)

يٰـۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ –

হে ঈমানদার লোকেরা, জেনে রাখো, মদ্য, জুয়া, মূর্তি ও মূর্তি স্থাপনের প্রস্তরসমূহ বেদী এবং আদেশ বা নিষেধ আগাম জানার জন্যে রক্ষিত তীরসমূহ শয়তানের কাজের চরম অপবিত্রতা। অতএব তোমরা এর প্রত্যেকটি পরিহার করো। (সূরা মায়াদা ঃ ৯০)

এইসব ডাক ও আহ্বানে— যা বারবার করা হয়েছে— শামিল হয়েছে তাদের জন্যে দেওয়া আইন বিধান, যেন তারা সেই আইন বিধানসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করে। তাদের এই প্রেরণাও দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ, সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয়ে থাকে এবং প্রদত্ত আইন বিধান অনুযায়ী তারা নিজেরা যেন চলে,

তাদের বংশধরদেরও যেন তারই আলোকে প্রশিক্ষিত করে তৈরি করে। কেননা এরাই হচ্ছে সমাজ সংস্থার ব্যক্তি, এদের সমন্বয়েই সমাজ গঠিত। উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহে তাদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে, তারা যেন দলবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হয়েই এই নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পালন করে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّ قُوْا –

তোমরা সকলে মিলিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধরো এবং তোমরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেয়ো না, থেকো না। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

وَتَعَا وَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَاتَعَا وَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ....

এবং তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো পুণ্যময় ও আল্লাহ্ ভীরুতার ব্যাপারে এবং পরস্পরের সহযোগিতা করো না গুনাহ ও সীমালংঘণমূলক কাজে। (সূরা মায়িদা ঃ ২)

এসব আয়াতে যে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সবই সমষ্টিগতভাবে করণীয়। সেজন্যে ব্যক্তিগণের সমাজবদ্ধ হয়ে সামষ্টিক জীবন যাপন করা আবশ্যক এবং সে সমাজকে অবশ্যই সুসংবদ্ধ, পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও মিলে-মিশে একাকার হতে হবে। আর সেই সাথে এসব সামষ্টিক কার্যাবলীও আঞ্জাম দিতে হবে।

ইসলাম ব্যক্তি সমন্বয়ে সমাজ গঠন করে। উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে মুমিন সমাজকে ডাক দেওয়া হয়েছে তারই ওপর অর্পিত হয়েছে সেইসব কাজ করার, যেসব কাজের কথা উক্ত ডাক ও আহ্বানের পরই উল্লেখিত হয়েছে। আর সেসব কাজ কেবল মুমিন ব্যক্তিদের পক্ষে করাই সম্ভব। সম্ভব সেই সমাজের পক্ষে করা যার প্রতিটি ব্যক্তিই ঈমানদার স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তিগতভাবেই তারা প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কশীল, ব্যক্তিগতভাবেই উক্তরূপ সম্বোধন বা আহ্বান পাওয়ার উপযুক্ত। ইসলাম ঈমানদার ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত এই সমাজকে একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে গ্রহণ করেছে, তাকে এই কর্তৃত্বও দিয়েছে যে, সমাজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যদি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অহংবোধে বিভ্রান্ত হয় ও ইসলামের নির্ভুল ভারসাম্যপূর্ণ পথ ত্যাগ করে ভিন্নতর পথে চলতে শুরু করে তা হলে এই সমাজই তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে। এই সমাজই হবে তার পাহারাদার। সমাজই ব্যক্তিগণের কর্তব্য পথের নির্দেশ করবে। এই সমাজের হাতেই রয়েছে সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত, রাষ্ট্রপ্রধান ব্যক্তি হচ্ছে এই সমাজের প্রতীক, প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন। তাই এই সমাজ-সমষ্টিই ব্যক্তিকে বিভ্রান্তির পথে যেতে নিষেধ করবে, যাওয়া থেকে বিরত রাখবে এবং সঠিক নির্ভুল পথে চলতে বাধ্য করবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই ক্ষমতাবলেই সমাজ ব্যক্তিকে সীমালংঘনমূলক

কার্যক্রম থেকে বিরত রাখবে এই ইসলামী সমাজের মধ্য থেকেই। তা-ই সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র শরীয়তকে কার্যকর করবে, কোনোরূপ স্বেচ্ছাচারিতা করার কোনো অধিকার তাকে দেওয়া হয়নি। আর আল্লাহ্‌র শরীয়ত তো মানুষের জন্যেই নাযিল হয়েছে, নাযিল হয়েছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি সমানভাবে সকলের জন্যেই।

অনুরূপভাবে ইসলামী সমাজই ইসলাম অধ্যুষিত দেশ, সে দেশে কায়েম থাকা শরীয়ত এবং তার অধিবাসীগণকে সমর্থন দান ও সর্বতোভাবে রক্ষা করার জন্যে দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে এক সুসংবদ্ধ পরস্পর জড়িত ও সুবিন্যস্ত সংস্থা হিসেবেই।

আদর্শগত ও নীতিগতভাবে সমাজই হচ্ছে ধন-মালে ওপর প্রথম কর্তৃত্বশালী। কেননা ব্যক্তিকে ধন-মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ক্ষমতা তো সমাজ-সমষ্টির কাছ থেকেই পেতে হয়। আর বাস্তবতার দিক দিয়ে সমাজই হচ্ছে ব্যক্তির ধন-মালের ওপর প্রতিষ্ঠিত হস্তক্ষেপ ও ব্যয় ব্যবহারের অধিকারকে হরণ করে নেওয়ার অধিকারী— সাময়িকভাবে কিংবা স্থায়ীভাবে ও চিরতরে যদি ব্যক্তি তার আয়ত্তাধীন ধন-মালে উত্তম ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক হস্তক্ষেপ না করে বা করতে অক্ষম হয়। কুরআনের আয়াত তা-ই স্পষ্ট করে বলছে ঃ

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَا لَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوْ هُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْ هُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا -

> এবং তোমরা নির্বোধ লোকদেরকে তোমাদের সেই ধন-মাল দিও না যাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বেঁচে থাকার উপকরণ বানিয়েছেন এবং তাতে তাদের জন্যে রিযিক দেওয়ার ব্যবস্থা করো। তাদের পরিধেয় দাও এবং তাদের ভালো কথা বলো। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫)

ইসলামী আদর্শভিত্তিক সমাজের আর একটি দায়িত্ব হচ্ছে, সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেওয়ার পূর্বেই সমাজের দুর্বল অক্ষম ব্যক্তিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজে বহন করবে। কেননা সরকার তো হলো এই লোকদের সর্বশেষ আশ্রয়। এই সামষ্টিক নিরাপত্তা দান ব্যবস্থা প্রথমে পরিবার বেষ্টনীতে, পরে সামষ্টিক পর্যায় এবং শেষে গোটা মুসলিম উম্মতের সীমানার মধ্যে কার্যকর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইসলামে সামাজিক সামষ্টিক রূপের কার্যকরতা এমনিভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এভাবেই ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে ভারসাম্য রক্ষিত হওয়া সম্ভব হয়।

সত্যি কথা, জনগণের বাস্তব জীবনধারা ততটা সহজ নয়, যতটা সহজ হচ্ছে এই কথাগুলো লেখা। বাস্তবে যা ঘটে থাকে, তা হচ্ছে অনেক সময় ব্যক্তি সীমালংঘন করে যেমন, ঠিক তেমনই সীমালংঘনমূলক কার্যকলাপ করে সমাজ সমষ্টিও। কিন্তু

এ সত্যের চূড়ান্ত পরিণতি তো জনগণেই ঘটে। কোনো বিশেষ ব্যবস্থা বা নীতিকে সেজন্যে দায়ী করা চলে না। এটাই হচ্ছে অত্যন্ত তিক্ত সত্য।[১]

মানুষের মধ্যে যেমন বিপথগামী হওয়ার স্বাভাবিক ভাবধারা রয়েছে তেমনি স্বাভাবিক ভাবধারা রয়েছে সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ পথে চলারও। কিন্তু নীতি ও বাস্তবতা— এই উভয় দিক দিয়ে একসাথে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এ দুইয়ের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কেননা অবস্থার কারণে কোথাও জনগণের বিভ্রান্ত হওয়া এবং বিভ্রান্ত নীতি ও আদর্শ অবলম্বনের কারণে জনগণের বিভ্রান্ত হওয়া কখনোই এক কথা হতে পারে না, যেখানে অবলম্বিত নীতি ও আদর্শের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা রয়েছে, সেখানে মানুষ একান্তভাবে বাধ্য হয়েই বিভ্রান্ত হয় ও থাকে। সেই বিধান ও ব্যবস্থা সমূলে উল্টিয়ে বা পাল্টিয়ে না দেওয়া এবং তদস্থলে নবতর কোনো ব্যবস্থা কায়েম না করা পর্যন্ত জনগণ নিজেরা বিভ্রান্তি থেকে নিজদেরকে বাঁচাতে পারে না।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি সীমালংঘন করে এই নীতি ও ব্যবস্থার কারণেই। কারণটি এই ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। মানুষ তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না শত চেষ্টা করলেও। বাঁচাতে চাইলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই খতম করতে হবে সমূলে। এই ব্যবস্থার অধীন থেকে জনগণের ওপর কৃত অত্যাচার শোষণ প্রতিরোধ করাও তার অনিবার্য ক্ষতি থেকে নিজদিগকে বাঁচানো কখনোই সম্ভবপর হতে পারে না। পারে না সীমালংঘনকারী অত্যাচারী ব্যক্তিদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে।

সমাজতান্ত্রিক সমূহবাদী ব্যবস্থার ঠিক এই ব্যবস্থায় স্বভাবগত প্রকৃতির কারণে সমাজ সীমালংঘন করে, অত্যাচার নিপীড়ন চালায় নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের ওপর। ব্যক্তিরা এই ভয়াবহ দুর্বার সর্বধ্বংসী ব্যবস্থার ভারে নিষেধিত ও নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় পেতে পারে না। কেননা এই ব্যবস্থাই তার নিজস্ব নীতি ও আদর্শের চাপে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সহসাই ধ্বংস করে দেবে যে, তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। অথবা সত্যি কথা এই যে, রাষ্ট্রপ্রধানের মুখোমুখি যে-ই দাঁড়াবে, তাকেই নিমেষের মধ্যে খতম হয়ে যেতে হবে। কেননা সে-ই হচ্ছে প্রকাশ্য নির্লজ্জ নিরংকুশ কর্তৃত্বের মালিক, স্বৈরাচারী। রাষ্ট্রযন্ত্রটি তার হাতে নিষ্প্রাণ পতুল মাত্র। এই কারণেই সম্ভবত এই ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে 'প্রোলেটারিয়েটদের স্বৈরতন্ত্র'।

১. কথাটি সত্য বলে মেনে নিলেও প্রশ্ন জাগে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি স্বভাবতই নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টির জন্যে দায়ী নয়? এ ব্যবস্থায় কি গণতন্ত্র চলে?— অনুবাদক

কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিও যেমন নীতি ও ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত প্রকৃতির কারণে সীমালংঘন করে না, তেমনি সমাজ সমষ্টিও তা করে না ইসলামের কারণে; বরং এই সীমালংঘন— অত্যাচার-জুলুম-স্বেচ্ছাচারিতা-স্বৈরশাসন ইত্যাদি সবকিছুই ঘটে মানুষ বা সমাজ নিজেই যখন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়, ইসলাম অনুযায়ী কাজ করা ত্যাগ করে। এরূপ অবস্থায় এই বিপর্যয় ও বিপথগামিতার সমস্ত দায়িত্ব লোকদের নিজেদের ওপরই বর্তে এবং এই বিপর্যয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াও একান্তভাবে তাদের নিজেদেরই-চেষ্টা-সাধনা সংগ্রামের ওপর নির্ভর করে। তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরে আসাও তাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। যদি তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসে তা হলে তাদের সব ব্যাপার আবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য স্বীকার করো আল্লাহ্‌র, অনুসরণ করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে জেগে উঠা সামষ্টিক দায়িত্বশীলদেরও। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতপার্থক্যে লিপ্ত হও, তাহলে সেই বিষয়টি ফিরিয়ে দাও আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো আল্লাহ্ ও পাকালের প্রতি। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯)

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ ও রাসূলই হচ্ছেন ইসলামে আইন প্রণয়ণের কর্তৃত্বের অধিকারী। কাজেই সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ ও বিধান পাওয়ার জন্যে সেই আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং সরাসরিভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। তবে "সামষ্টিক কাজের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের শর্তভিত্তিক।" এই কারণেই মূল আয়াতে اَطِيْعُوْا —'আনুগত্য করো' কথাটি আল্লাহ্ ও রাসূলের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সামষ্টিক কাজের দায়িত্বশীলদের আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র ও রাসূলের আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে নতুন করে 'আনুগত্য করো' কথাটি বলা হয়নি। পরে বলা হয়েছে, কোনো বিষয়ে মুমিনদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তখন প্রত্যাবর্তন ও চূড়ান্ত নির্দেশ পাওয়ার কেন্দ্র হচ্ছে কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্ ও রাসূল। কেননা আইন প্রণয়নের একক ও নিঃশর্ত অধিকার ও কর্তৃত্ব হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের।

এইরূপ চিন্তা-বিশ্বাস ভিত্তিক সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজ কখনোই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সংঘর্ষকারী দুটি পক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে না, বরং এ দুটি শক্তিই পরস্পর সংযোজিত ওতপ্রোত, একটির মধ্যে অপরটি প্রবিষ্ট মূলতও তাই। ফলে এ দুটি শক্তি ইসলামী সমাজে পরস্পর সম্পূরক, পরস্পর সাহায্যকারী। অন্তত তাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের উভয়ের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। কাজ ও চিন্তা-বিশ্বাসের দুটি শক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কাজেই সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব হতে পারে না যেমন দুই শক্তির পরস্পরের মধ্যে, তেমনি একটি অপরটির ওপর সীমালংঘন করেও যেতে পারে না।

ইসলামী সমাজে পুরুষ, মেয়েলোক ও বালক শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাদের সঠিক কল্যাণময় প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ হওয়া একান্তই কাম্য। জাহিলিয়াতে তাদের প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শিত হয় এবং তাদের জীবনে যেভাবে বিপর্যয় ও বিপথগামিতা দেখা দেয় এবং যার ফলে তারা চরম কষ্টে ও পীড়নে পড়ে, হয়রান ও পেরেশান হয়ে পড়ে, ইসলামী সমাজে তা কখনোই ঘটে না।

ইসলামী সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেখানে সমস্ত ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে কর্মবন্টন চলে। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন লোক নিয়োগ করা হয়, বিভিন্ন দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা হয়।

পুরুষ সেখানে দায়িত্বশীল হয় আয়-উপার্জন ও উৎপাদন করার জন্যে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যেও এই পুরুষরাই প্রধানত দায়ী। আর মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই মানব বংশ উৎপাদনের কাজ সঠিক ও সুষ্ঠুরূপে করার জন্যে একান্তভাবে দায়িত্বশীল। এজন্যেই পরিবারের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্বও তার ওপর অর্পিত। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব পালনের স্বাভাবিক যোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই দিয়েছেন। এই কাজ নির্ভুল নিয়মে করা, কল্যাণময় ভাবে করা নারীদের পক্ষেই সম্ভব। তাহলে শিশুরাও পরিবারিক পরিবেশে, মায়ের ক্রোড়ে, মায়ের স্নেহ-যত্নে সুরক্ষিত থেকে লালিত-পালিত হওয়ার নির্ভরযোগ্য সুযোগ পাবে। বস্তুত এটাই তদের স্বাভাবিক লালনক্ষেত্র।

কর্মবন্টনের এই কাজটি কোনো দিক দিয়ে কারোর ওপর অযথা-অকারণ দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা করা হয়নি। এ ব্যাপারে কোনো অন্ধ বিদ্বেষও কাজ করেনি। পুরুষ ও নারীর স্বভাবগত গুণ বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা কর্মক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কর্মবন্টনের এই মহতি কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

নারী স্বাভাবিক জীবতাত্ত্বিক যোগ্যতার দিক দিয়ে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও স্তন দিয়ে সন্তান লালন-পালনের জন্যে একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিসত্তা। তাকে এই কাজের

অনুকূল ও সাহায্যকারী মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা দিয়েই তৈরি করা হয়েছে। নারীর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ভাবধারা হচ্ছে মাতৃত্বজনিত স্নেহ বাৎসল্য, সন্তানের জন্যে তীব্র মায়া ও আকর্ষণ। সন্তানের জন্যে যাই সর্বাধিক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে সক্ষম। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, মেয়েরা ঘরোয়া পরিবেশের বাইরে কোনো কাজের যোগ্যতা রাখে না, গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব প্রভৃতি স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য কোনো কাজ মেয়েরা করতেই পারে না— এমন কথাও বলা হচ্ছে না। তবে আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় অস্ট্রিয়ার মহিলা চিকিৎসাবিদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ করে দিয়েছি যে, মেয়েরা যখনই পুরুষদের সাথে তাদের সমস্ত কাজে ও দায়-দায়িত্বে 'সমান' হওয়ার চেষ্টা করেছে, তখনই তাদের জীবতাত্ত্বিক সত্তা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তখন তারা মাতৃত্বের সব স্বাভাবিক আয়োজন ব্যবস্থা ও দায়-দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। ফলে মেয়েলোক আর মেয়েলোক থাকতে পারে নি, আর তারা পুরুষও হয়ে যেতে পারেনি— কেননা পুরুষ হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় দৈহিক আঙ্গিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার কোনো কিছুই অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তখন তারা না পুরুষ, না মেয়ে— এক তৃতীয় লিঙ্গে পরিণত হলো। তারা এমন লিঙ্গের হয়ে গেল, যার দরুন তাদের মানসিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল।

আর তা ছিল প্রকৃতির অমোঘ প্রতিশোধ, জাহিলিয়াতের নির্বুদ্ধিতা ও খাম-খেয়ালীর কাছে তা কখনোই পরাজয় মানতে প্রস্তুত হয় না। কেননা প্রকৃতি তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, আর আল্লাহ্‌ই তো সবকিছু সৃষ্টি করে তার মধ্যে তার প্রকৃতিকেও শামিল করে দিয়েছেন, তাকে প্রয়োজনীয় হেদায়েত নির্ভুল কাজের প্রেরণা ও ঝোঁক-প্রবণতাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানুষের মধ্যকার এই প্রকৃতি কখনোই একবিন্দু পরিবর্তিত হতে পারে না।

এই প্রেক্ষিতে বলতে হয়, আধুনিক নারীরা যা কিছু বলছে, তা তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতারই প্রমাণ করছে। যে সব পুরুষ তাদেরকে তাদের স্বভাবসম্মত সাম্রাজ্য ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্যে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করছে, তাও তেমনি তাদের জন্যে খুবই মারাত্মক। আসলে এই পুরুষরা মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে পেতে চায়, কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তারা চায় তাদের ভোগ করতে। যা কেবল নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সমাজ বেষ্টনীতে খুবই সহজ ও নির্বিঘ্ন। অথচ এই কাজ প্রকৃতির সাক্ষ্যের দৃষ্টিতে চরম নির্বুদ্ধিতার। কেননা প্রকৃতি বুঝে না যে, সময়ের কাঁটা সম্মুখের দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন তা পিছনের দিকে নিয়ে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। বস্তুত প্রকৃতির সাথে ঘড়ির কাঁটার কোনো সম্পর্ক নেই। আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে সময়ের কাঁটা যদি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে নারী পুরুষ শিশু সকলেই চরম ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে। দুর্ভাগ্য

তাদের জীবনকে বিধ্বস্ত করে দেবে। তাই নারীরা যখন ঘরের বাইরে পথে-ঘাটে ছন্নছাড়া দিশেহারা হয়ে বের হয়ে পড়ে, তখন গোটা সমাজ তেমনিই হয়ে যায় যেমন বলেছেন ওয়াল ডেভাস্টটঃ

> সর্বাত্মক দুর্ভাগ্য, ব্যাপক ধ্বংস ও বিলয়। ঘর নেই, বাড়ি নেই, পরিবার নেই, নেই একবিন্দু স্থিতি— শান্তি ও স্বস্তি।

ইসলাম জাহিলিয়াতের এই নির্বুদ্ধিতা ও খামখেয়ালীকে কখনোই অনুসরণ করতে পারে না। ইসলাম নারীকে সেই ধ্বংসোন্মুখ তৃতীয় লিঙ্গ হতে কখনোই দিতে প্রস্তুত নয়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রকৃতিকে অস্বীকার করেই জাহিলিয়াত এই চরম মাত্রার বিকৃতি, বিপর্যয় ও ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে নারী সমাজকে। এই বিপথগামিতা তাদের কোনোরূপ কল্যাণ দেয়নি, এমন পথও তাদের পরিচালিত করেনি যার ফলে তারা সৌভাগ্য ও স্থিতি লাভে ধন্য হতে পারে।

তাই ইসলাম নারীদের তাদের স্বভাবতগত দায়িত্ব পালনের দিকেই আহ্বান জানিয়েছে। এই দায়িত্ব তারা যাতে করে নির্বিঘ্নে ও পূর্ণ সংরক্ষণতা সহকারে পালন করতে পারে, তার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাও গ্রহণ করছেন।

নারীর রিযিক— জীবিকার পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু উপার্জন কাজের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়নি।

তার মানবীয় মান-মর্যাদা অধিকার পাওয়ার পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা দিয়েছে, ঘর ও বাইরের কাজের দুই পাহাড়ের মধ্যে ফেলে তাদের নিষ্পেষিত করে তাদের চেষ্টা সাধনার অপচয় করা থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ারও নিরাপত্তা দিয়েছে।

তদের নৈতিক চরিত্রের পূর্ণ সংরক্ষণের নিরাপত্তা দিয়েছে। নারী-পুরুষের মিলিত বৈঠকসভা অনুষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে তাদের নিয়ে গিয়ে নৈতিক চরিত্রের ওপর কঠিন বিপত ডেকে আনার সর্বনাশা অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ারও পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। কেননা মানুষ্যত্বকে ধ্বংস করার জন্যে মানবতার দুশমনেরা নারীদের কঠিন বিপদে ফেলে দেওয়ার জন্যে প্রতি মুহূর্তে মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

পুরুষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সব রকমের ব্যয়ভার বহনের। বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া, বিয়ের অনুষ্ঠান করা ও পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পুরুষদেরই কর্তব্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। নারীকে ব্যক্তিগতভাবে ধন মালের 'মালিক' হওয়ার অধিকার দিয়েছে। তা নিজ ইচ্ছামতো শরীয়ত সম্মত পথে ব্যয় ব্যবহার করার অধিকারও নারীকে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত এই উভয় দিকের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানও তৈরি করেছে। আধুনিক জাহিলিয়াত নারীকে এ সবের কোনো একটিরও অধিকার দেয়নি, ... দিয়ে থাকলেও তা শেষের দিকে, বেশি

দিন অতিবাহিত হয়নি। তবে তাও অসম্পূর্ণ ও অশোভন ভাবে। তা লাভ করতে গিয়ে নারীরা তাদের শুধু নারীত্বই হারিয়ে ফেলেছে তা-ই নয়, তাদের সুস্থ প্রকৃতি ও নৈতিকতাও হারিয়ে ফেলেছে।

সে যাই হোক, ইসলাম শুরু থেকেই নারীকে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার অধিকার দিয়েছে। তার ধন-মাল তার স্বেচ্ছামূলক অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া কোনো ক্রমেই ব্যয় করা যেতে পারে না।

ইসলামী আইন ও বিধি বিধান সবই নারীকে মানবীয় মর্যাদা দিয়েছে— তা রক্ষার নিরাপত্তাও দিয়েছে।

মালিকানা অধিকার, ব্যয়-ব্যবহার দান ইত্যাদি হস্তক্ষেপ করার সরাসরি অধিকার নারীর জন্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ -

পুরুষরা যা উপার্জন করবে তা থেকে তার অংশ প্রাপ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে মেয়েরা যা উপার্জন করবে তা থেকেও তাদের অংশ প্রাপ্য রয়েছে।

(সূরা আন-নিসা ঃ ৩২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ط وَلَاتَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ -

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের জন্যে নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসবে। আর তোমরা তাদের পথও বন্ধ করে দিও না এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ কেড়ে নিয়ে যাবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

মানুষ মানুষে পরম সাম্য ও অভিন্নতা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছে, তার নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً -

পুরুষ বা নারী যে-ই নেক আমল করবে ঈমানদার হওয়া অবস্থায়, তাকেই আমরা অতীব উত্তম পবিত্র জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব। (সূরা নহল ঃ ৯৭)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآاُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ -

অতঃপর তাদের আল্লাহ্ তাদের দো'আ কবুল করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের মধ্যকার পুরুষ বা নারী কোনো আমলকারীরই আমলকে বিনষ্ট করে দিই না। তোমরা তো পরস্পর থেকে ... ...। পরিবারের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সম্মানও নিশ্চিত। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৯৫)

وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

তোমরা— হে পুরুষরা— মেয়েলোকদের সাথে অতীব উত্তম নিয়মে একত্রে বসবাস গ্রহণ করো। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

এমনকি অপছন্দ হওয়া অবস্থায়ও নারীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْ هُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

তোমরা— পুরুষরা— যদি তাদের অপছন্দও করো, তা হলে জেনে রাখবে, অসম্ভব নয় যে, তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাতেই বিপুল কল্যাণ নিহিত করে রেখেছেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

এমনি ভাবেই চেতনা ও কর্মে, অর্থনীতিতে ও সমাজ ক্ষেত্রে নারীদের এই নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে যে, তারা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে— কোনোরূপ জোর জবরদস্তি ব্যতিরেকেই পালন করবে। তাতে করেই তাদের স্বভাবগত প্রচ্ছন্ন গুণাবলী ও যোগ্যতা-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব। যদিও আধুনিক জাহিলিয়াত নারী-পুরুষের মোহময় ও প্রতারণাপূর্ণ সমতার শ্লোগান দিয়ে সেই স্বাভাবিক গুণ-গরিমা ও যোগ্যতা-প্রতিভাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

এতদ্সত্ত্বেও কর্মের এই বণ্টনটা মেয়েদের বেলায় এমন চূড়ান্ত ও অকাট্য নয় যে, তাতে এক বিন্দু রদ-বদল বা পার্থক্য-তারতম্য হতে পারে না। কেননা মেয়েদের জন্যে কোনো কাজ করা— উপার্জনের কোনো উপায় অবলম্বন করা একেবারেই নিষিদ্ধ বা হারাম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম নারীদের উপার্জনের কাজে অংশ নেওয়া খুব একটা ভালো দৃষ্টিতে দেখেনি। তবে প্রকৃতপক্ষেই তার প্রয়োজন দেখা দিলে— তা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়লে ভিন্ন কথা। এই প্রয়োজনটা যেমন ব্যক্তিগত হতে পারে, তেমনি হতে পারে পরিবারগত ও সমাজগত। তবে তা অবশ্যই এই প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে।

কিন্তু সমস্ত মানবীয় জীবন সংগঠন ও পরিচালনা সামাজিক, অর্থনৈতিক, চিন্তাগত, আত্মিক ও নৈতকি— সর্বদিক দিয়ে তার পুনর্গঠনের ব্যাপারে নারীদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যে মারাত্মক ধরনের বিধ্বংসী জাহিলিয়াতের নির্বুদ্ধিতা, তা বাস্তবভাবে আমরা ইতিপূর্বে দেখতে পেয়েছি, দেখেছি তার লক্ষণ, নির্দশন ও চরম অশুভ পরিণতি।

আমরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি, কর্মজীবী মহিলারা সাধারণতই তৃতীয় লিঙ্গে পরিণত হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক, সংবেদন, হৃদয়ানুভূতি, নৈতিক ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের জীবনে অনিবার্য হয়ে পড়ে, বাচ্চারা মা-হারা হয়ে চাকর ধাত্রীর হাতে বা শিশু সদনে লালিত-পালিত হয়ে অনুরূপ মারাত্মক পরিস্থিতির দুঃখ সাগরে হাবুডুবু খাবে। তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এই ধরনের মেয়েলোক ও বাচ্চাদের দ্বারা ভবিষ্যতে যে সমাজ গড়ে উঠবে, তা যে কি ধরনের মানবতা বিবর্জিত সমাজ হবে তা বুঝতে একবিন্দু অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তার অর্থ তো এই দাঁড়াবে যে, সামান্য বৈষয়িক স্বার্থ লাভের লোভে পড়ে আমরা গোটা মানব সত্তাটিকেই ধ্বংস করে দিতে রাজি হব, বৈষয়িক স্বার্থটা যত বড়ই হোক, তা মনুষ্যত্বের মৌল সত্তা ও সার নির্যাসের তুলনায় খুব সামান্য ও নগণ্য। আজকের দুনিয়ার সমস্ত বস্তুগত উৎপাদন এবং আগামীকালের ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতির সংগৃহীত সমস্ত উপায়-উপকরণ মিলিত হয়েও মহান মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্যের একটি ক্ষুদ্র অংশেরও সমান হতে পারে না।

না, না, ইসলাম জাহিলিয়াতের খামখেয়ালী ও নির্বুদ্ধিতার অন্ধ অনুসরণ কখনোই করবে না। ইসলাম পুরুষ নারী শিশু— প্রত্যেককে তার যথোপযুক্ত স্থানেই রেখে দেবে।

পুরুষরা পুরোপুরিভাবে উৎপাদন উপার্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। সেই সাথে যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দায়-দায়িত্বও পালন করবে।

আর মেয়েরা একান্তভাবে নিয়োজিত হবে মানব বংশ উৎপাদনের মহান ব্রতে, সেই সাথে আনুসঙ্গিক সন্তান লালন-পালন, প্রশিক্ষণ ও প্রবৃদ্ধিদান প্রভৃতি কাজও তাকেই সম্পন্ন করতে হবে।

শিশুরা তাদের স্বাভাবিক লালন-পালন ক্ষেত্র— মাতৃক্রোড় পাবে। তা থেকে বাচ্চাদের দূরে সরিয়ে নেওয়া ভবিষ্যতের মানব বংশকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিবারই হচ্ছে শিশুদের জন্যে কল্যাণকর একমাত্র পরিবেশ। তাকে স্থিতিশীল হতে হবে, তার সাথে নারীর মনের সংবেদনের গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে। নারীর নিঃস্বার্থ স্নেহ বাৎসল্য সমৃদ্ধ ক্রোড়ই হলো শিশুদের স্থিতিলাভের একমাত্র আশ্রয়। তাতেই গড়ে উঠবে আদর্শ মানুষের ভবিষ্যৎ।

এই দায়িত্ব পালন ও এই ব্যবস্থা নারীকে নিতান্ত প্রয়োজনের সময় কাজ ও উপার্জনে অংশ নেওয়া থেকে নিষেধ করবে না। কিন্তু নারীর জন্যে তা স্থায়ী ব্যস্ততা হতে পারে না। তা এমন ভাবেও হতে পারে না, যার ফলে নারীর শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, ধ্বংস ও কলুষিত হয়ে যেতে পারে তার চরিত্র।

ইসলামে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সাথে সরাসরি মিলিত হতে পারে কেবল মাত্র পারিবারিক পরিবেষ্টনীতে। এই মিলন সামাজিক সমর্থনের আওতার মধ্যে সংঘটিত হবে উন্নত সুদৃঢ় পবিত্র সামষ্টিক লক্ষ্যে।

নারী ও পুরুষ আনন্দ-স্ফূর্তি, খেল-তামাসা ও পশুর মত ভোগ-সম্ভোগের জন্যে পরস্পর মিলিত হতে পারে না। এখানে ওখানে নীতি গর্হিত কার্যকলাপে মশগুল হওয়ার উদ্দেশেও তারা একত্রিত ও মিলিত হতে পারে না। তাদের পারস্পরিক মিলনের উদ্দেশ্য হতে হবে উন্নত সত্যাদর্শী সমাজ কায়েম ও গঠনের লক্ষ্যে।

মা এই পরিবারের কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে শুধু সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসবই করবে না, সে তার সন্তানদের ইসলামের নৈতিক আদর্শানুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করবে।

পুরুষ এই পরিবারের কর্তা হিসেবে উক্ত কাজে তারই সহযোগী। এই পবিত্র পারিবারিক পরিমণ্ডল পাগলের ন্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে পুরুষ নারীর মিলন হতে পারে না। কেননা তা নৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে, তা পুরুষ নারী যুবক-যুবতীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও চরিত্রের জন্যে কোনো ক্রমেই কল্যাণকর হতে পারে না।

আধুনিক জাহিলিয়াত নৃত্য সঙ্গীত ইত্যাদির অনুষ্ঠানে কত যে মূল্যবান সময় ও সম্পদের অপচয় করছে, তা একবার হিসেব করে দেখা আবশ্যক। এই সব অনুষ্ঠানের সর্বশেষ ফল পাশবিক লালসার চরিতার্থতা ও নৈতিক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি ?

এসব করে জাহিলিয়াতের সমাজ নারীদের জীবতাত্ত্বিক বিপর্যয় এবং পুরুষ ও শিশুদের জীবনে কঠিন দুর্দিন নিয়ে আশা ছাড়া আর কি লাভ করছে ?

নৈতিক চরিত্র বলতে এখানে সেই নিয়ম-নীতি ও রীতি-পদ্ধতিকেই বোঝানো হচ্ছে, যা সমাজ তার যাবতীয় কার্যাদি সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাস্তবে অনুসরণ করে চলে।

ইসলাম মানুষের ক্ষেত্রে নৈতকি চরিত্রের প্রশ্নের প্রতি কখনোই বিন্দুমাত্র উপেক্ষা প্রদর্শন করবে না, করতে পারে না। কেননা তা করা হলে মানুষ বিকৃতি ও বিপথগামিতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক চরিত্র বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহ্র একটি বিরাট অবদান, তা জীবন গঠনকারী ও সমাজ পরিচালনাকারী আইন বিধান থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত হতে পারে না।

ইসলাম যেমন সবচাইতে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে আল্লাহ্‌র তাওহীদের ওপরে— আল্লাহ্ একমাত্র ইলাহ্ এবং একমাত্র সার্বভৌম— এই আকীদাহ্‌র ওপর, ঠিক তেমনি নৈতকিতার উৎস হিসেবেও একমাত্র আল্লাহ্‌কেই গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ যা ঠিক করে দিয়েছেন তা-ই নৈতিকতা। কেননা এই চরিত্র সম্পর্কে সর্বশেষ জবাবদিহি তো একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই করতে হবে।

জাহিলিয়াত যখনই আল্লাহ্‌র এক ইলাহ ও সার্বভৌম হওয়ার আকীদা থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে, ঠিক তখনই তা মানুষকে সেই কঠিন সর্বগ্রাসী দুর্বিপাকে ফেলে দিয়েছে, যার বিস্তারিত রূপ আমরা পূর্ববর্তী আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। সে দুর্বিপাক ঘটেছে রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সমাজের ক্ষেত্রে, তেমনি আল্লাহ্‌র ঘোষিত নৈতিক বিধি-বিধানসমূহ পালন থেকে যখন বিপথগামী হয়ে পড়ল, তখনই তারা নানা বিপর্যয় ও দুঃখ-বিপদের আবর্তে পড়ে গেল। কেননা তা মূলত একই ব্যাপার। এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই।

যে তাগুতী শক্তি রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব চালায়, তা-ই যখন ইসলাম থেকে বিপথগামী হয়, তখন সেই তাগুতই মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে। কেননা নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণও তো তারই হাতে। সে-ই নিজ ইচ্ছামতো ভিন্ন প্রকৃতির নৈতিক নিয়ম-নীতি রচনা করে। অতএব নৈতিকতার বিপর্যও সেই তাগুতেরই কারসাজি।

তাহলে মূলত নৈতিকতা কি ? ...... চরিত্র কাকে বলে ?

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা নৈতিক চরিত্রের ব্যাখ্যায় বলেছে, চরিত্র হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিবিম্ব। বলেছে তা কোনো স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল জিনিস নয়, তা হচ্ছে পরিবর্তনশীল, বিবর্তনমূখী। বিবর্তন ও পরিবর্তনের নিশ্চিত অপরিহার্যতাই তার বিশেষত্ব। কেননা তা নিত্য নবোদ্ভূত অর্থনৈতিক পর্যায়সমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করে।

এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে বাতিল সন্দেহ নেই। তবে অন্তত, একটি দিক দিয়ে তা সত্য মনে করা যায়।

একথা সত্য যে, বিপর্যস্ত জাহিলিয়াতের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তিত পর্যায় বাস্তবসমূহ অনুসরণ করাই চরিত্র বা নৈতিকতা। সেই সাথে তার বিবর্তনশীলতাও তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কেন ? তা এজন্যে নয় যে, তা একটি নিশ্চিত ও স্বভাবগত ব্যাপার। ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যাদাতারা অবশ্য তা-ই মনে করে। বরং তা এজন্যে যে, বাস্তবে যা ঘটে তা হলো— তাগুত-ই অর্থনৈতিক নিয়ম-নীতি রচনা ও নির্ধারণ করে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের কল্যাণের জন্যে। অবশ্য দোহাই জনগণেরই দেওয়া হয়। সেই তাগুতই নৈতিকতার বিধি-বিধানও রচনা এবং চালু করে। তাও

করে সাধারণ গণ-মানুষের দোহাই দিয়ে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীকে সন্তুষ্ট ও ধন্য করার লক্ষ্যে। ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যা এখান থেকেই বিপরীত ফল দেখতে পায়। কেননা মনে করে যে, অর্থ ব্যবস্থা ও নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে কারণ ও ফলের মধ্যকার সম্পর্ক। কিন্তু তা ভুল। আসলে বিপর্যস্ত জাহিলিয়াতের পাশ্চাত্য সমাজে অর্থ ব্যবস্থা ও নৈতিকতার মৌল উৎস এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে সেই তাগুতী শক্তি। কাজেই অর্থনীতি যা হবে, নৈতিকতাও তা-ই হবে স্বাভাবিকভাবেই।

কিন্তু ইসলাম আল্লাহ্‌র দেখানো পথে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির মধ্যে যেমন নিবিড় সম্পর্ক, তেমনি নৈতিকতাও এরই সাথে জড়িত। কিন্তু আবার বলছি, এখানে এই সম্পর্ক 'কারণ ও তার ফল'— এই দুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নয়। তাতে সেই বিপরীত কালের মতাদর্শে দেখা যায়, যা ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যার দরুন তৈরি হয়েছে। এখানেও এই সবের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক এই কারণে যে, এই সবেরই মৌল উৎস এক ও অভিন্ন এবং তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ্‌। ইসলামের সব ব্যাপারই এমনি হয়ে থাকে।

কেননা যে সত্তাই মানুষের সমগ্র জীবনের জন্যে আইন বিধান দেয়, রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, সমাজ ও নৈতিকতার নিয়ম-কানুন এবং দুই লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ— সেজন্যে প্রয়োজনীয় নীতি-রীতি সবকিছু সেই একই সত্তা দিয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই মৌল উৎস কি হবে, কাকে এই সব ক্ষেত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধানের উৎসরূপে গ্রহণ করা হবে?

এই উৎস হয় হবেন আল্লাহ্‌ তা'আলা, না হয় হবে 'তাগুত'।

আধুনিক ইউরোপীয় জাহিলিয়াতের নৈতিকতা যখন তার আসল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলল তারপরই সেখানে সে ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় ও বিপথগামিতা ঘটল। আর সে আসল তাৎপর্য যে কেবলমাত্র ইসলামেই নিহিত। আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন নৈতিকতার প্রকৃত উৎস, তা বলাই বাহুল্য। তা থেকে আধুনিক ইউরোপে যে বিপর্যয়টা ঘটল, তা খুবই ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হলো। কেননা আগেই বলেছি, নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটে, তা কখনোই হঠাৎ করে হয় না, ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃই হয়। কেননা তার সম্পর্ক থাকে মানব মনের গভীরতর অভ্যন্তরের সাথে। তা সহসা নড়ে না, মুছে যায় না। যদিও বাইরের দিকে অনেক ওলট-পালট হয়ে যায়, চরম অস্থিরতা ও ভাংগাচোরা ঘটে যায়। যা কোনোক্রমেই সামলানো যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোটা প্রাসাদটাই এক সাথে ধ্বসে পড়ে।

প্রথমে রাজনীতি নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর বিচ্ছিন্ন হলো অর্থব্যবস্থা, তারপর যৌনতা, অতঃপর মুনাফাবাদী ও সুবিধাবাদী চরিত্রই হয়ে

দাঁড়ালো জাতীয় চরিত্র, পরে পাশ্চাত্যে নবোদ্ভূত বংশধরদের হাতে এই মুনাফাবাদী ও সুবিধাবাদী চরিত্র সবকিছু নিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে চলে গেল।

অবশ্য পূর্বে গোটা নৈতিকতাই চরমভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে এমন ঘটনা কখনোই ঘটেনি। না, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত মেলে না, কেননা মানব মন তার যৌন ও মিলিত প্রকৃতির কারণে সম্পূর্ণ ও সামষ্টিকভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় পাপপ্রবণ হয়ে যেতে পারে না। শেষ পর্যায়েও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট থেকেই যায়। তবে শেষের দিকে পাপপ্রবণতা প্রবল হয়ে যখন অন্যান্য গুণের ওপর বিজয়ী হয়ে ওঠে, তখনই গোটা প্রাসাদই ধুলিসাৎ হয়ে পড়ে।

ইসলামী নৈতিকতার প্রতিটি বিষয় ও ব্যাপারই তার সত্য সঠিক ও স্বাভাবিক স্থানে স্থাপন করা হয়। কেননা অন্যান্য সব জিনিসের ন্যায় নৈতিকতার উৎসও কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, আল্লাহ্র দ্বীন। ফলে তথায় তাগুতী খেলা চলতে পারে না, তার দাপট থেকে তা মোটামুটি সংরক্ষিতই থাকে। যদিও জাহিলী তাগুত তার নামকরণ করেছে বিবর্তন বা পরিবর্তন— উন্নতি। এ নামকরণের আসল কারণ হচ্ছে তাগুতী শয়তানীকে গোপন করা এবং মানব মনের ওপর সহজেই তার প্ররোচনার কার্যকর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়া।

কিন্তু ইসলামী নৈতিকতা মূলত রাব্বানী (খোদায়ী) নৈতিকতা। সে নৈতিকতা মানুষের রচিত বা কল্পিত নয়। তা কখনই কারোর খামখেয়ালীর প্রভাবাধীন হয় না; তার সুদৃঢ় স্তম্ভসমূহ কখনোই নড়ে যায় না। লোকদের মধ্য থেকে কোনো বিশেষ শ্রেণী বা জনগোষ্ঠীর সাথে তা পরিবর্তিত-ও হয়ে যায় না। মানুষের খামখেয়ালী ও কামনা বাসনার অনুসরণ করতে তা কখনোই প্রস্তুত হয় না। তা পরিবর্তনশীল প্রদর্শনীতেও পরিণত হয় না কখনোই।

ইসলামী নৈতিকতা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নৈতিকতা। এই কারণে তা মানবিক নৈতিকতা। মানবিক এই অর্থে যে, তা রক্ষিত হবে নির্বিশেষে সকল মানব সন্তানের দ্বারা। কোনো জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, নয় বংশীয় বা শ্রেণীগত অথবা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ দিয়ে, বৈষয়িক স্বার্থের ভিত্তিতেও তা আচরিত হবে না। ইউরোপীয় নৈতিকতা আল্লাহ্ প্রদত্ত পন্থা থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যে কদর্যতার মধ্যে পড়ে গেছে, নৈতিকতার সেই বিভ্রান্তিসমূহের মধ্যের কোনো একটির ধরনেও তা চলবে না।

সর্ব মানুষের সাথে তা আচরিত হবে মানুষ হিসেবেই, বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভৌগোলিক জাতীয়তা বা শ্রেণীগত পার্থক্যের কিংবা আকীদা-বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্মগত বৈষম্যের দৃষ্টিতেও এ ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে তা অবলম্বিত হবে যে, সকল মানুষ মূলত একই মানুষ আদমের সন্তান, সেই একজন

থেকেই সূচিত হয়েছে সমস্ত মানুষের মহাযাত্রা। তার থেকেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। অতঃপর এই দুজন থেকেই সৃষ্ট হয়েছে দুনিয়ার শতকোটি মানুষ। দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এই মানুষ পুরুষ ও নারী হিসেবে সংখ্যাতীত।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً -

হে মানুষ! তোমরা ভয় করো তোমাদের সেই মহান সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র মানুষ থেকে। তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং অতঃপর এই দুজন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে পড়েছে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১)

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানার্হ সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ্-ভীরু।
(সূরা হুজরাত ঃ ১৩)

এ নৈতিকতার নিয়ম-বিধানসমূহ সর্বাবস্থায়ই স্থায়ী ও অপরিবর্তিত থাকে। এমন কি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও তাতে কোনোরূপ তারতম্য ঘটে না, কেননা ইসলামে এই সব কিছুই মানব জীবনে চিরস্থায়ী এক মৌল উৎস থেকে উৎসারিত। আর তা হচ্ছে মানুষ হিসেবেই সব মানুষ সমান, মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে মানুষ পরস্পর অভিন্ন। তাদের মান-মর্যাদা ও বাড়াবাড়ি সীমালংঘনমূলক আচারণ থেকে তা সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারের দিক দিয়ে পরস্পর সমান, সম্পূর্ণ অভিন্ন।[১]

ইসলামের ইতিহাসে উক্ত চরিত্রের বাস্তব দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের নৈতিকতা নিছক মুনাফা ও স্বার্থ ভিত্তিক। বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ জাতির স্বার্থ অন্যান্য সব মানুষের স্বার্থের চাইতে অনেক বড় করে দেখাই সে নৈতিকতার ভিত্তি। ইসলামী নৈতিকতা ও সেই নৈতিকতার মধ্যে এই কারণেই বিপুল পার্থক্য।

ইহুদীরা ইসলামের প্রাথমিক সময়েই তার ওপর যে জঘন্য যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, মুমিনের ঈমান নষ্ট করার ও এই নবতর আকীদা হৃদয় কন্দরে সুদৃঢ় হয়ে আসীন হওয়ার পূর্বেই তা উৎপাটিত করার লক্ষ্যে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, ষড়যন্ত্র, কলা-কৌশল, বিক্ষোভ প্রচার, পরস্পর কর্তৃক, পরস্পরে মনে সংশয় সৃষ্টি, মুসলিম

---

১. الثبات التطور গ্রন্থের . الاسلام وحياة البشرية অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পুরুষ ও নারীর ইজ্জতে কলংক লেপন ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ, যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা, চুক্তি ভঙ্গ করা, মর্যাদা হনন করা ইত্যাদি— কোনো কিছু বাদ রাখেনি। এত সব সত্ত্বেও ইসলাম ইহুদীদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি, একজন ইহুদীর ওপরও আক্রমণ করা হয়নি। এই সময়ই এক মারাত্মক মিথ্যা অভিযোগ তোলা হলো। এই কারণে তাদের ওপর আক্রমণের পরিস্থিতি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তখনও তাদের নির্দোষিতা প্রমাণের লক্ষ্যে নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহ ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ ط وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا - وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا - يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا - هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا - وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا - وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ط وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا -

নিঃসন্দেহে আমরা আপনার প্রতি এই গ্রন্থ পাঠিয়েছি পরম সত্যতা ও বাস্তবতা সহকারে, যেন আপনি লোকদের মধ্যে সেই অনুযায়ী শাসন ও বিচার ফয়সালার কার্য সম্পাদন করেন। সেই অনুসারে তা করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আপনি সেই খেয়ানতকারী লোকদের পক্ষ সমর্থন করবেন না। আপনি মাগফেরাত প্রার্থনা করুন আল্লাহ্‌র কাছে। কেননা আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। যারা নিজেদের প্রতি খেয়ানতমূলক আচরণ করে

তাদের পক্ষে আপনি জবাবদিহি করবেন না। কেননা যারা বড় খেয়ানতাকারী, পাপী, আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন না। যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, লোকদের থেকে তো লুকোয়, কিন্তু আল্লাহ্কে লজ্জা পায় না, অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তারা যখন আল্লাহ্র মর্জীর বিপরীত কাজের ষড়যন্ত্র করায় লিপ্ত হয়— আল্লাহ্ তো তাদের কার্যাবলী নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে নিয়েছেন। হ্যাঁ, তোমরা তো এমন যে, তোমরা বৈষয়িক জীবনে তো তাদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করছ; কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে তাদের পক্ষে কে জবাবদিহি করবে ? কিংবা কোন ব্যক্তি তাদের কার্য সম্পাদন করবে ? অথবা যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করল কিংবা নিজের ওপরই জুলুম করল পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইল, সে আল্লাহ্কে বড়ই ক্ষমাদানকারী ও অতীব দয়াবানই পাবে। যে লোক কোনো গুনাহ্ করছে, সে গুনাহের শাস্তি তারই ওপর পতিত হবে। আর আল্লাহ্ তো বড়ই বিজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী। যে লোক কোনো ভুল করে বসল কিংবা কোনো গুনাহ করল, পরে সেই দোষ চাপিয়ে দিল কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর। সে তো সুস্পষ্ট গুনাহ ও মিথ্যা অভিযোগের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিল।

আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত যদি তোমার প্রতি না থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই ওদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী তোমাকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে পূর্ণ চেষ্টা চালাত। তবে তার পরিণামে নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই পথভ্রষ্ট করতে পারত না এবং তারা তোমাকে এক বিন্দু ক্ষতিগ্রস্তও করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন তা, যা তুমি জানতে না। আর তোমার প্রতি তো আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনেক বড় ও বিরাট। (সূরা আন-নিসা ঃ ১০৫-১১৩)

এই মোট নয়টি আয়াত বিস্তারিত বর্ণনা, বারবার করা কঠোর তাগিদ ও বিশ্লেষণসহ নাযিল হয়েছিল সেই নির্দোষ ইহুদীর ওপর অবিচার করার কাজ থেকে রাসূলে করীম (স)-কে বিরত রাখার জন্যে। ইহুদীটি মূলত নির্দোষ হলেও সমস্ত লক্ষণ ছিল তাকে দোষী প্রমাণের পক্ষে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারে না।

এই বাস্তব ঘটনা দ্বারা ইসলাম এই চিরন্তন মানবীয় মৌলনীতি দাঁড় করিয়েছে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও তার নাম-চিহ্ন বা লেশমাত্রও পাওয়া যাবে না কখনোই।[১]

এটা তো ছিল দ্বীনী আত্মচেতনা বোধের ব্যাপার।

---

১. التطوا والشيات গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর আচরণ আমাদের সম্মুখে ইতিপূর্বেই প্রতিভাত হয়েছে। তখন তিনি ইসলামের শত্রুদের আরব্ধ ইসলাম-বিরোধী যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন।

বৈদেশিক রাজনীতির দিক দিয়েও একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা) 'হীরা'র নিকটবর্তী কয়েকটি জনপদের লোকদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। তাতে লিখিত হয়েছিল ঃ

> আমরা যদি তোমাদেরকে আক্রমণকারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করি, তাহলে তোমরা আমাদেরকে জিজিয়া দেবে, নতুবা নয়। পরে হিরাক্লিয়াস যখন এই অঞ্চলের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্যে সৈন্যবাহিনী তৈরি করল, তখন হযরত আবূ উবায়দা সিরিয়ার বিজিত এলাকাসমূহের কর্মকর্তাগণকে লিখে পাঠালেন যে, এই সব এলাকার লোকদের কাছ থেকে যে জিযিয়া নেওয়া হয়েছে তা তাদের ফেরত দিয়ে দাও। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকেও জানিয়ে দিলেন, আমরা তোমাদের কাছ থেকে গৃহীত ধন-মাল তোমাদেরকেই ফেরত দিচ্ছি এই কারণে যে, আমরা শুনতে পেয়েছি যে, এই এলাকার ওপর আক্রমণ করার জন্যে বিরাট বাহিনী তৈরি হচ্ছে, এদিকে তোমরা আমাদের সাথে শর্ত করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করব। কিন্তু এক্ষণে তা করতে আমরা অক্ষম। এই কারণেই তোমাদের কাছ থেকে আমরা যা কিছু গ্রহণ করেছিলাম, তা তোমাদের ফেরত দিলাম। আমরা তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদার ওপর অবিচল রয়েছি। যে চুক্তি আমাদের পরস্পরে লিখিত হয়েছিল, তা অপরিবর্তিত এই আশায় যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই আক্রমণকারীদের ওপর বিজয় দান করবেন।[১]

লক্ষণীয়, রাজনীতি তার উভয় দিকসহ নৈতিকতার বেষ্টনীর মধ্যে এভাবেই পড়ে যায়, তাকে নৈতিকতার বন্ধন থেকে বের করে নেওয়ার কোনো মেকিয়াভেলী অপকৌশল ইসলামে আদৌ স্বীকৃত নয়।

অর্থনীতি সম্পর্কেও আধুনিক জাহিলিয়াত ধারণা করে নিয়েছে যে, তার কোনো সম্পর্কই নৈতিকতার সাথে নেই। তার ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায় তার সেসব নিশ্চিত অপরিহার্যতার নিয়মাবলী, যাকে ভালোও বলা যায় না, বলা যায় না তা মন্দ। তাকে উন্নতও বলা যায় না, বলা যায় না তা হীন। কেননা প্রতিটি জিনিসের মানদণ্ড তার নিজের মধ্যেই বিরাজিত, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর কার্যকর নিশ্চিত অনিবার্য স্তর বহাল থাকবে। আবার নিশ্চিত অনিবার্যতার কারণে সে স্তর যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন সেই প্রথম মানদণ্ডই ফিরে আসবে ও নবতর মানদণ্ড গড়ে উঠবে। ফলে

---

১. الدعوة الالى سلام। টি, ও আরনল্ড লিখিত।

গতকাল যা উত্তম ভালো ও উপযোগী ছিল, আজ তা-ই অভিশপ্ত ও পরিত্যক্ত হয়ে যাবে নতুন দিনের পরিবেশে। এখানে কোনো স্থায়ী নৈতিক ভিত্তি নেই। এই দৃষ্টিতে সামন্তবাদ তার স্তরে যথার্থ ছিল, ছিল সর্বজনগৃহীত। এটা তার নিজস্ব বিবেচনার মানদণ্ড। পরে তার নিশ্চিত অনিবার্য স্তর যখন শেষ হলো, তখন এলো পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদী সমাজে সামন্তবাদ অত্যন্ত ঘৃণ্য, বীভৎস। তা এজন্যে নয় যে, সামন্তবাদ মূলতই বুঝি ঘৃণ্য ও খারাপ বা শাশ্বত ন্যায়নীতির পরিপন্থী; বরং তা এজন্যে যে, তা তার জন্যে নির্দিষ্ট ও প্রতিশ্রুত সময় পরিমাণের পরও দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। তার সময়ই ফুরিয়ে গেছে। এখন তার টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। তখন তো পুঁজিবাদই যথার্থ। যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার স্বাভাবিক সময়ের মধ্যে টিকে থাকবে এবং যতই অসৎ কর্ম সম্পাদন করতে থাকুক না কেন সেই সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেলেই পাল্লা উল্টে যাবে, নতুন মানদণ্ড দাঁড়িয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের গতিধারা। তার মূল সত্তার বাইরে থেকে গৃহীত কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে তাকে বিচার করা চলবে না। আর নৈতিকতা তো হচ্ছে সর্বশেষ বিষয়, যার ভিত্তিতে বিষয়গুলোর ওজনও যাচাই করা যেতে পারে।

এসব কথা উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রগতি সংক্রান্ত।

কিন্তু ইসলাম তো আল্লাহ্‌র কালেমা। তা শুরু থেকেই মানবজীবনের কোনো একটি ক্ষুদ্রতম জিনিসেরও সম্পর্ক নৈতিকতার সাথে নেই একথা স্বীকার করতেই রাজি নয়।

এ কারণেই সুদ সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে। তা যেমন ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে হারাম, ঠিক সেই একই সময় তা হারাম অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়েও। কেননা মৌল আইন-প্রণয়নের দিক দিয়ে এ দুয়ের মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই জীবনের বাস্তবতার দিক দিয়েও।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ - وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ -

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় করো আল্লাহ্‌কে। আর ছেড়ে দাও সুদের অবশিষ্ট অংশ— যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তা না করো, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তেমারা প্রস্তুত হও। আর তোমরা যদি

তওবা করো, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা ফেরত পাবে।...না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের ওপর জুলুম করা হবে। আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি কঠিন দারিদ্রে পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি গোটা ঋণের টাকাটাই সাদকা করে দাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম, যদি তোমরা জানো। তোমরা ভয় করো সেই দিনকে, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রতিটি ব্যক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় দিয়ে দেওয়া হবে যা সে অর্জন করেছে, তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবেনা। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৮-২৮৯)

আইন প্রণয়নের কারণ এমনি ভাবেই বিশ্বাস করা হয়েছে সবকিছু মিলিয়ে এক সাথে। তাতে নৈতিক চরিত্র যুক্ত রয়েছে রাজনীতির সাথে, অর্থনীতির সাথে, কোনোটিই অপর কোনোটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

সুদ হারাম এজন্যে যে, তা জুলুম। এ জুলুম যেমন অর্থনৈতিক, তেমনি সামাজিকও। আর ঠিক সেই একই সময় তা এক নৈতিক নির্লজ্জতা, বীভৎসতাও বটে। হারাম করার মূল কারণের মধ্যে এইসব দিক সমানভাবে লক্ষ্যভূত। নৈতিক দিক দিয়ে তার নির্লজ্জতার কারণে হারাম হওয়াটা অর্থনৈতিক দিকদিয়ে তার জুলুম ও শোষণ হওয়ার কারণে তার হারাম হওয়ার তুলনায় বিন্দুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, নয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি অপরটি থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। আবার সেই মুহূর্তেই সুদ নৈতিকতার বিরোধী, তার সাথে সাংঘর্ষিক তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীরুতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে। সুদের বিরুদ্ধে জিহাদ একটা বড় সওয়াবের কাজ। এই কারণে সুদখোরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রাসূল অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র জিহাদ করবে তার রাজনৈতিক, প্রতিষ্ঠানিক ও বিচার বিভাগীয় শক্তির পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। উভয় দিক দিয়েই সুদবিরোধী যুদ্ধ সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটা নয় যে, নৈতিকতা বিরোধী কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধটা কম বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর শরীয়ত আইন ও শাস্তির দিক দিয়ে তার মাত্রা কম বা বেশি হবে। দুটো একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে অভিন্ন মূল সূচনা থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত। এ দুয়ের মধ্যে কোনো পর্যায়েই কোনো পার্থক্য নেই— বৈপরীত্য নেই।

অ-সুদী ব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক এই পূর্ণাঙ্গ সংমিশ্রিত ধারায় প্রথম ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার অর্থনৈতিক ভিত্তিটি ছিল নৈতিকতার বেষ্টনীর মধ্যে। আর ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ের যাবতীয় পারস্পরিক কাজকর্ম সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল।

ইসলামী সমাজের অর্থব্যবস্থা সুদ হারাম হওয়ার ওপর ভিত্তিশীল ছিল। মওজুদদারী পুঁজিবাদও তথায় সম্পূর্ণ হারাম ছিল। অপহরণ, ছিনতাই, লুঠপাট, ডাকাতি, চুরি ও আত্মসাৎ– এ সবও ছিল সম্পূর্ণ হারাম। অধিকার প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করা বা খারাপভাবে অধিকার প্রয়োগ করা— উভয়ই সেখানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। আর এসবই ছিল সুস্পষ্ট অনিবার্য নৈতিকতার ভিত্তিতে। এটাই ইসলামের আদর্শ অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনের জন্যে।

ইসলামের কায়েম করা এই নৈতিক আদর্শ থেকেই বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি হয়ে গেছে বলে পাশ্চাত্য অর্থনীতি, সামন্তবাদী বর্বরতা, পুঁজিবাদী শোষণ, নির্যাতন-নিষ্পেষণ এবং সামাজিক সামষ্টিক স্বৈরতন্ত্র– প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। যদিও জাহিলিয়াত নিষ্পেষিত মানবতা এখন পর্যন্ত জাহিলিয়াতের মারাত্মক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেনি। তারা নিজেরাই নিজেদের অর্থ ব্যবস্থায় যে জুলুম পীড়ন ও সীমালংঘনমূলক স্বভাব বিরোধী ঘটনা-দুর্ঘটনার স্বাদ আস্বাদন করেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে করছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাদের অর্থনীতির গোটা ব্যবস্থাই নৈতিক ব্যবস্থা ও আদর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নৈতিকতা ও অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের উঁচু পাহাড় দাঁড় করে দেওয়া হয়েছে। জাহিলিয়াতের ধারণা হচ্ছে, অর্থনীতির নিজস্ব ও বিশেষ নিশ্চিত-অনিবার্য নিয়ম-বিধি রয়েছে, যার সাথে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক আসলেই নেই।

কিন্তু ইসলাম একান্তই আল্লাহ্ নির্ধারিত পথ বলে তার প্রথম আদর্শিক পর্যায়েই অতীব উত্তম পবিত্র পরিচ্ছন্ন নৈতিকতা গুরুত্ব সহাকরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও। মানবতার ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন সামষ্টিক ধন-সম্পদে আনসার ও মুহাজির মুসলমানরা উভয়ই পরম আন্তরিকতা সহকারে সমান অংশীদারীত্বে শরীক হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সরকারকে কোনো হস্তক্ষেপ করতে হয়নি। সে জন্যে বিশেষ কোনো চেষ্টা যত্নও নিতে হয়নি। এই সময় যাকাত দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলত। কেননা এই যাকাত হচ্ছে ইসলামী সমাজে সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি। তার লক্ষ্য মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের হিসেব নিজে করতেন, নিজের ঈমানের তাগিদে প্রত্যেকেই যাকাত দিয়ে দিতেন, আল্লাহ্র পথের নেক আমল হিসেবেও তাঁরা অনেক দান-সদকা করতেন।

হযরত আবূ বকর (রা) যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন প্রশ্ন উঠল, তিনি নিজের জীবিকার জন্যে যে ব্যবসায় করতেন তা করতে না পারলে তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে ? মুসলিম জনগণের পক্ষ থেকে বলা হলো, খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হলে ব্যবসায়ে মশগুল থাকা চলবে না। তিনি প্রশ্ন কলেন,

তা হলে আমার চলবে কি করে ? তখন মুসলমানরাই তাঁর জন্যে বায়তুলমাল থেকে তাঁর জীবিকা প্রয়োজন পূরণ পরিমাণের সমান মাত্র কয়েকটি দিরহাম নির্দিষ্ট করে দিলেন, কিন্তু উত্তরকালে তাঁর জীবনের শেষভাগে তিনি বায়তুলমাল থেকে খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে ভাতা বাবদ গৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ বায়তুলমালে ফেরত দিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা বায়তুলমালে তাঁর ঋণ এবং এই ঋণই ফিরিয়ে দেওয়া হলো। তাঁর পর হযরত উমর ফারূক (রা) যখন খলীফা হলেন, তাঁর জন্যেও বায়তুলমাল থেকে একটা ভাতা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কেননা তাঁর জীবিকার নিজস্ব কোনো উপায় ছিল না। তাঁর গোলাম সেই ভাতার অর্থ দিয়ে কিছু পরিমাণ ঘি ক্রয় করেছিল। হযরত উমর (রা) সেই ঘি গরীব জনগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এই বলে যে, সাধারণ মানুষ যখন খেতে পায় না, তখন উমর ঘি খাবে, তা হতে পারে না। তা খাওয়া হালাল হবে না। হযরত আলী (রা) খলীফা হলে তিনি বায়তুলমাল থেকে এক বস্তা আটা গ্রহণ করতে গিয়ে তার ওপর সিল মেরে বললেন— সিল এজন্যে মারা হলো, যেন আমার পেটে কতটা যাচ্ছে তা আমার জানা থাকে। আরও পরে উমর ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা নির্বাচিত হলে মারওয়ান বংশ তাঁর জন্যে যে সব জমি-জায়গা লিখে দিয়েছিল তা সব মুসলমানদের বায়তুলমালে ফিরিয়ে দিলেন। উমাইয়া বংশের লোকেরা ইতিপূর্বে জনগণের কাছ থেকে যা'কিছু কেড়ে কুড়ে নিয়েছিল, তা-ও ফেরত দিয়ে দিলেন, কেননা তা নেওয়ার কোনো অধিকারই তাদের ছিল না, তা তাদের জন্যে হালাল ছিল না।

ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়সমূহে মুসলমানরা যদিও বিপথগামিতা ও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তখনও সামন্তবাদী প্রথার বিরুদ্ধে ইসলাম বাধার সৃষ্টি করেছিল, পাশ্চাত্যের কাছে যা ছিল অর্থনীতির নিশ্চিত অপরিহার্য স্তর। ঐতিহাসিক বিচারে একথা জোর দিয়ে বলা যায়, ইউরোপীয় অর্থনীতিতে সামন্তবাদী ব্যবস্থা যে ভয়াবহ ও অর্থনৈতিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সমগ্র মুসলিম জাহানে তা কখনোই দেখা যায়নি। যদিও মুসলিম সমাজেও বিভিন্ন দিক দিয়া আংশিকভাবে অনেক বেশি বিপথগামিতা দেখা দিয়েছিল, তবুও এমন বিপথগামিতা কখনোই আসেনি যে, গোটা অর্থ ব্যবস্থাটাই তার নৈতিকতার ভিত্তিকে হারিয়ে ফেলবে। অথচ পাশ্চাত্যের জাহিলী সমাজ ব্যবস্থায় গোটা ইতিহাসে এক মুহূর্তের তরেও মানবিক ব্যবস্থার স্বাদ গ্রহণ করার কোনো সুযোগই মানুষ পায়নি।

কি সামন্তবাদী জায়গীরদারী ব্যবস্থা, কি পুঁজিবাদী আর কি সমূহবাদী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা— কোথাও একবিন্দু মানবিকতার সংবেদনশীলতা দেখতে পাওয়া যায়নি। অন্তত এ সবের যে আদর্শ স্তর ছিল, তাতেও নয়।

কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিটি কমিউস্টি সমাজতান্ত্রিক দেশে বিশেষ কিছু অধিকার ভোগ করে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বপ্নেও চিন্তা বা আশা

করা সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বসবাসের ঘর-বাড়ি সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উন্নতমানের হয়ে থাকে। জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অনেক উচ্চে তাদের বসবাস ও অবস্থান। এমন কি এই ক্ষমতাসীন দলের লোকদের প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র ও বিপুল অর্থ ব্যয় দেশের বাইরে থেকে আমদানী করা হয়। আর সাধারণ মানুষের নির্ভরতা কেবলমাত্র দেশীয় ঔষধের ওপর, সে ঔষধ যেমনই হোক। বর্তমান দুনিয়ার পরাশক্তি রাশিয়ায় এই ব্যবস্থাই কার্যকর।

এর একমাত্র কারণ এই যে, এসব সমাজ ব্যবস্থা অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনো নৈতিকতার প্রতিই বিশ্বাসী নয়। মেকিয়াভেলীর জাহিলী নীতিরই অনুসরণ হচ্ছে সর্বত্র। সেখানে লক্ষ্য উপায়কে পবিত্র করে দেয়, মূলত উপায়টা যতই খারাপ হোক না কেন। আর সে লক্ষ্যটাও কোনো নৈতিক মানেই যাচাই করার পক্ষপাতীও তারা নয়।

কিন্তু দ্বীন-ইসলাম মহান আল্লাহ্‌র নাযিল করা দ্বীন। উপরোক্ত সর্বাত্মক বিপর্যয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার তা-ই হচ্ছে একমাত্র পথ, এক মাত্র উপায়।

ইসলামের অর্থ ব্যবস্থা যখন মানবিক নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জুলুমের সকল পথ স্বতঃই রুদ্ধ হয়ে যায়। তাগুতী শক্তির সম্মুখে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানের জহিলিয়াত সমাজে যে সামান্য নৈতিকতা ও মানবিক নগণ্য গুণাবলী দেখতে পাওয়া যায়— যেমন সততা-সত্যবাদিতা, আমানতদারী, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা ও দৃঢ়তা, অবিচলতা ইত্যাদি— এগুলো আসলে ইসলামী নৈতিকতারই ভগ্নাংশ ও অবশেষ। ইউরোপীয় সমাজের লোকেরা মুসলমানদের সমাজের সাথে যোগাযোগের ফলে মুসলমানদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছে (যদিও আজ যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করছে, তারা এসব নৈতিকতা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করেছে বা হারিয়ে ফেলেছে।) কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য যে, ইউরোপে এই সব ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে মুনাফা লাভ ও সুবিধা লাভের লোভ। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুনাম রক্ষার জন্যেই তারা প্রয়োজনমতো এগুলো ব্যবহার করে। কিন্তু ইসলামে এ নৈতিকতা নিতান্তই মানবিক।

বস্তুত ইসলামের সমস্ত নৈতিকতা মানবিকতার উচ্চ উন্নত মহান আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল। তাতে যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুবিধার প্রশ্ন নেই, তেমনি নেই বিদ্বেষ কলুষিত কোনো পার্থক্যবোধ। কেননা ইসলামী নৈতিকতা আসলে রাব্বানী নৈতকিতা, আল্লাহ্‌র দেওয়া ও আল্লাহ্‌র জন্যে এই নৈতিকতা। ফলে তা সকল মানুষের জন্যেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

মানুষ যখন আল্লাহ্ প্রদর্শিত সীরাতে মুস্তাকীমে চলতে শুরু করে, তখনই সে এই চরিত্র অর্জন করে। পাশ্চাত্য তো মাত্র একটা দিকই পেয়েছে, সম্পূর্ণ নৈতিকতা তাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। কিন্তু ইসলামী আদর্শ অনুসরণকারীর নৈতিকতা তো অনেক উচ্চতর মানে হয়ে থাকে। পরে এই নৈতিকতার বেষ্টনীর মধ্যে মানব জীবনের মাত্র কয়েক দিক নয়— সমস্ত বিষয় ও দিকই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তার আওতার বাইরে কিছুই থাকে না। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, যৌনতা— এর কোনো একটিও ইসলামী নৈতিকতার বাইরে থাকে না, থাকতে পারে না। কেননা নৈতিকতাই হচ্ছে সাধারণ আচরণ বিধি, তা এমন নয় যে, জীবনের কোথাও তা অনুসৃত হবে আর কোথাও হবে না।

যৌনতা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার বহু কয়টি দিক রয়েছে। সাধারণভাবে নৈতিক চরিত্র বলতে যা বোঝায়, আমরা এখানে সেই সংকীর্ণ নৈতিকতা সম্পর্কে কোনো আলোচনা করব না। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা অনেক বড় ও বিশাল ব্যাপার। লোকেরা যা মনে করে এবং নৈতিকতা সম্পর্কে যে ধরনের কথাবার্তা বলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণীয় নয়। লোকদেরও এরূপ সংকীর্ণ ধারণার কারণ হলো, তারা পুরুষ-নারীর মধ্যকার যৌন-সম্পর্ককে পর্যন্ত তার বাইরে রেখে তাতে চরম মাত্রার বিপর্যয় ঘটাতে ইচ্ছুক।

ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্র হচ্ছে সমগ্র মানুষ। তার যত দিকের সাথে সম্পর্ক রয়েছে তার নিজের সাথে নিজের, তার আল্লাহ্র সাথে এবং জনগণের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে তা সবই এই নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম কেবল যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারকেই নৈতিকতার আওতায় গণ্য মনে করে না, লোকদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কটুকুর মধ্যেই নৈতিকতাকে সীমাবদ্ধ করে না। বরং তাতে শামিল রয়েছে সেই সব গোপন চিন্তা ও ভাবধারাও, যা মানুষ সাধারনত লোকদেরকে জানাতে পর্যন্ত রাজি হয় না। অনেক সময় সে হয়ত নিজেকেও তা জানায় না। এমন সব ব্যাপারও নৈতিকতার মধ্যে, বাইরে নয়। তবু নৈতিকতার মৌল নীতিসমূহ সঠিক, নির্দিষ্ট ও সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তো—

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى -

জানেন সব গোপন ও প্রচ্ছন্নতম ব্যাপারও। (সূরা ত্ব-হা ঃ ৭)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ -

তিনি জানেন দৃষ্টির বিশ্বাসঘাতকতাকেও এবং অন্তর যা লুকিয়ে রাখে তাও।
(সূরা মুমিন ঃ ১৯)

অতএব আল্লাহ্ মানুষের যতটা জানেন ততটার মধ্যে মানুষের উচিত পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও গুণাহমুক্ত হওয়া। তাতে মানুষের সব গোপন ও প্রচ্ছন্নই সম্পূর্ণরূপে

শামিল। এই কারণে ইসলামের নিতান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোনো চরিত্র সমর্থিত নয়; এমন চরিত্র যে, একজন ব্যক্তির সাথে এক রকমের আচরণ গ্রহণ করা হবে আর অন্যান্য মানুষের সাথে ভিন্নতর আচরণ অবলম্বন করা হবে। কেননা ইসলামে এটা সুস্পষ্ট মুনাফিকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে যাই হোক দুনিয়ার মানুষ প্রাচীনতম কাল থেকেই যৌনতার সাথে চরিত্রের নিবিড় সম্পর্কের কথা স্বীকার করে এসেছে, এটা হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো ব্যাপার নয়। এমনকি ব্যাপার এতদূর গড়িয়ে ছিল যে, তারা মনে করত, বিশেষভাবে যৌনতার নৈতিকতাই হচ্ছে একমাত্র নৈতিকতা। তাই বলছিলাম, এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। যদিও এই সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে নৈতিকতাকে সীমাবদ্ধ করে তারা সঠিক কাজ করেনি। কেননা তারা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জানতে পেরেছিল যে, যৌন ব্যাপারে মানুষ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হলে নৈতিকতা তার ব্যাপক তাৎপর্যসহ টিকে থাকতে পারবে না। আর যে লোক যৌন ব্যাপারে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়, দীর্ঘমেয়াদী তার কোনো চরিত্রই থাকতে পারবে না।

এই বিষয়টি নিয়ে আধুনিক জাহিলিয়াত একটা রূঢ় ঝগড়ার সৃষ্টি করে বসেছে। তার কথা হচ্ছে, সাধারণভাবে যৌনতার সাথে নৈতিকতার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। যৌনতার ক্ষেত্রে মানুষ যা ইচ্ছা হয় তা-ই করতে পারে। এটা করেও তারা চরিত্রের বড় বড় সংরক্ষক হওয়ার গৌরবও করতে পারে।

পূর্বে আমরা আমাদের মতামত জাহিলিয়াত পর্যায়ের আলোচনায় পেশ করেছি। আমরা দেখেছি, মানুষ যখন লালসার গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে গেয়ে বিপথগামী হয়, তখন আল্লাহ্‌র নিয়ম এক চূড়ান্ত অনিবার্যতা সহকারে কার্যকর হয়।

এখানে আমরা ইসলাম সম্পর্কে কথা বলব। জাহিলিয়াতের সাথে একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত করাই আমাদের ইচ্ছা। এবং এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমরা যৌন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করব। জনগণ অভ্যাসবশত নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ দিয়ে 'নৈতিক চরিত্র' বাক্যটি ব্যবহার করে, আমরা সে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে এখানে কোনো কথা বলতে চাইনে।

আমরা ইসলামের ধারণানুযায়ী ব্যাপক অর্থে নৈতিকতা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করছি। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতার সংকীর্ণ কোনো অর্থ নেই। ইসলামী নৈতিকতার তাৎপর্য সমগ্র মানবীয় সত্তাকে শামিল করে। যার দরুন এই চরিত্রের কারণে একজন মানুষ অপর জন থেকে স্বতন্ত্র প্রতিভাত হয়, পাশবিকতার স্তর থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে তার অবস্থান প্রমাণিত হয়।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা— জিনা— সংকীর্ণ তাৎপর্যের নৈতিক নিয়মাদির বিপরীত। শুধু এই করণেই ইসলাম জিনাকে হারাম ঘোষণা করেনি। বরং তা মানুষ উপযোগী

মান থেকেও অত্যন্ত নীচ ও হীন কাজ বলেও ইসলাম তাকে হারাম ঘোষণা করেছে। নৈতিক চরিত্রের সংকীর্ণ ধারণা ও ব্যাপক পূর্ণাঙ্গ ধারণার মধ্যে এটাই হচ্ছে পার্থক্য।

মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা। তারা আল্লাহ্‌র অর্পিত আমানত ধারণ করেছে, অথচ আসমান-জমিন-পাহাড় সবই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। কেননা সে আমানত গ্রহণ করতে তারা সাংঘাতিকভাবে ভয় পেয়েছিল তাদের পক্ষে তার বোঝা বহন করা সম্ভব নয় বলে।

খলীফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে পৃথিবীকে আবাদ করা, আদর্শভিত্তিক খিলাফত যথাযথভাবে কায়েম করা, সত্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করা। আদর্শানুসারী রাজনীতি, সুষ্ঠু অর্থ ব্যবস্থা ও আদর্শভিত্তিক মানবসমাজ গড়ে তোলা মানুষেরই দায়িত্ব। এই সমস্ত কাজের জন্যে জিহাদ করার দায়িত্ব মানুষের ওপরই অর্পিত। কেননা উপরোক্ত কাজগুলো জিহাদ ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন করা যেতে পারে না।

এ-ই হচ্ছে মানুষের পরিচয়। এই মানুষ যদি যৌনতার কলংকময় গহ্বরে পড়ে যায়, তা হলে পৃথিবীর অবস্থা কি দাঁড়াবে?

খিলাফতে রাশেদা কয়েম করা তাঁর দ্বারা কি করে সম্ভব হবে, সেজন্যে জিহাদই বা হবে কি করে?

মানুষকে এই দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে যে, তাকে তার ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বাস্তব পার্থক্য সৃষ্টি করতে হবে। যৌনতার গহ্বরে ডুবে গেলে সে পার্থক্য থাকবে কোথায়, সে-ও তো ঠিক পাশবিকতার হীন নীচ পর্যায়ে নেমে যাবে। অথচ আল্লাহ্ তাকে অনেক উর্ধ্বে ওঠার শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা-প্রতিভা দান করেছেন।

এই মানুষ যদি তার আসল দায়িত্বের কথা ভুলে যায়, তা পালন না করে, পাশবিকতার উর্ধ্বে ওঠার শক্তি-সামর্থকে সে যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তা হলে নৈতিকতার ইসলাম উপস্থাপিত সেই ব্যাপক তাৎপর্যের পরিণতি কি হবে?

মানুষ যদি লালসার দাসত্ব করতে গিয়ে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, তা হলে তার চরিত্র বলতে কছু অবশিষ্ট থাকবে কি? সে লালসা তো চির অতৃপ্ত, কোনো দিনই তার পূর্ণ মাত্রার চরিতার্থতা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। বরং তার ফলে একদিকে তার বৃহত্তম মানবীয় শক্তির মর্মান্তিক অপচয় হবে তার পাশবিক তৎপরতার পরিণতিতে। সে তখন এমন মানে নেমে যাবে যা কেবল জন্তু-জ ানোয়ারের জন্যেই শোভন হতে পারে। তার ইচ্ছাশক্তির বিশেষত্বও নিঃশেষ হয়ে যাবে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষকেই এই গুণে গুণান্বিত করেছেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের যে প্রাকৃতিক

ও স্বাভাবিক নিয়মতন্ত্র রয়েছে সেটুকু রক্ষা করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে মানুষ জন্তু-জানোয়ারেরও নীচে চলে যাবে।

ইসলাম জিনাকে হারাম করেছে, কেননা ইসলাম চায় মানুষের ইজ্জত। চায় আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার অতীব উচ্চ ও মহা সম্মানার্হ মর্যাদায় মানুষকে অভিষিক্ত দেখতে।

হারাম কাজের প্রতি লালসা ও ঝোঁক, কেবল এই হিসেবেই জিনাকে হারাম করা হয়নি। বান্দাগণের জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দেওয়াও এই হারাম করণের উদ্দেশ্য নয়। কেননা আল্লাহ্ মানুষের প্রতি এই ধরনের আচরণ করেন না। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

هُوَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

সেই আল্লাহ্ই তোমাদেরকে বাছাই করে পছন্দ করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

مَايُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

আল্লাহ্ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান, চান যেন তাঁর নেয়ামত তিনি তোমাদের প্রতি পূর্ণ করতে পারেন। এবং তোমরা যেন শোকর করো। (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا - يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا -

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন (রহমত দান) করতে চান। পক্ষান্তরে লালসা-কামনার অনুসারীরা চায় যে, তোমরা খুব বেশি করে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়। আল্লাহ্ চান তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে। আর মানুষকে তো দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৭-২৮)

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -

আল্লাহ্ কোনো লোকের ওপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৬)

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا -

তোমরা যদি শোকর করো ও ঈমান আনো, তাহলে তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ্‌র কিছুই করার নেই। আল্লাহ্ তো শোকর কবুলকারী মহা বিজ্ঞ। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৪৭)

না, আল্লাহ্ মানুষের জীবনে সংকীর্ণতা বা অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে চান বলে যেনা-ব্যভিচার হারাম করেন নি। আল্লাহ্ তো মানুষকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও দোষ-ক্রটিমুক্ত সত্তারূপে গড়ে তুলতে চান, তাদেরকে সত্যিকার মানবীয় মানে উন্নীত করে রাখতে চান। কেননা আল্লাহ্ তো মানুষকে উন্নত মানের সৃষ্টিরূপে গণ্য করেছেন, তাকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর বহু সংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাকে প্রাধান্য ও বিশিষ্টতা দান করেছেন।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا -

আর সত্য সত্যই আদম সন্তানকে আমরা অতীব সম্মানিত করেছি এবং তাদের বহন করে নিয়ে গেছি স্থলভাগে এবং তাদের পবিত্র রিযিক দিয়েছি। আর তাদেরকে খুব বেশি মাত্রায় উচ্চ মর্যাদা দিয়েছি আমাদের বহু সংখ্যক সৃষ্টির তুলনায়। মানুষকে তার প্রথম সৃষ্টি মুহূর্তে তাকে স্বতন্ত্র ও একক মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ - فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ -

স্মরণ করো, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি মৃত্তিকাসার থেকে একজন মানুষ সৃষ্টিকারী। আমি যখন তাকে সৃষ্টি করার পর সম্পূর্ণ ঠিকঠাক ও ভারসাম্যপূর্ণ দেহসত্তা বানিয়ে দিলাম তখন আমার রূহ্-এর থেকে ফুঁকে দিলাম। পরে ফেরেশতারা তার উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে গেল। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৭১-৭২)

অর্থাৎ মানব দেহ মৃত্তিকা নির্যাস ও রূহ্— এই দুই জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। এই সমন্বিত স্বাভাবিক সত্তাই হচ্ছে মানুষ। ফলে সে স্বাভাবিক সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন লালসা বৃত্তি চরিতার্থতায় কখনোই মগ্ন হতে পারে না। অপরদিকে দৈহিক চাহিদা পূরণ অপেক্ষা করে কেবলমাত্র রূহ্-এর দাবি মেটানোর কাজে মগ্ন হওয়াও এর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা সমন্বয়ের উপাদান দ্বয়ের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব ও কার্যকরতা এই দুনিয়ায় কখনোই সম্ভব নয়। বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বরং এই জগতে তার সকল কাজে-কর্মেই এই উভয় মৌল উপাদানের সমন্বিত রূপ-ই দেখা যাবে। যৌনতার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম অকল্পনীয়।

ইসলাম নৈতিকতাকে মানব জীবনের সকল কাজে সম্প্রসারিত করেছে, যৌনতাকেও তার আওতার মধ্যে শামিল করে নিয়েছে। মানুষের সমন্বিত সত্তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এই ব্যবস্থা। কেননা মানবীয় প্রকৃতি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ম শৃঙ্খলামুক্ত যৌন-লালসা চরিতার্থতার পন্থাকে কখনোই বরদাশত করতে প্রস্তুত হয় না। পক্ষান্তরে দেহের স্বাভাবিক দাবিকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র রূহ্ সর্বস্ব হয়ে থাকাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা পরিপন্থী ব্যাপার।

ইসলামে নৈতিকতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ও কার্যকর হতে পারার মত কোনো বিধান নয়। মানুষের মৌল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার কোনো মূল্য বা ব্যবহারিকতা থাকে না। তার নিজ সত্তার বাইরে থেকে জোরপূর্বক ও ক্ষমতার দাপটের বিহ্বলতায় তা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করতে চাইলে তা যথার্থভাবে কাজ করতে পারে না। মূলত তা মানুষের নিজের সুস্থ-স্বভাবসম্মত প্রকৃতির বিধান। মানব প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত দাবি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি স্বতঃই তাকে শক্তিশালী করে, তার নিজের ছাড়া বাইরের অপর কোনো জিনিসের প্রকৃতির চাপে তা চলতে পারে না।

ফেরেশ্তাদের চরিত্র, জীব-জন্তুর চরিত্র, ফেরেশতা ও জীবন জন্তুর সাথেই জড়িত (অবশ্য তাদের ব্যাপারে 'চরিত্র' শব্দটি পরোক্ষভাবেও যদি ব্যবহার করা চলে) তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর জিনিস। মানবীয় চরিত্রের সাথে তার কোথাও কোনো দিক দিয়েও একবিন্দু মিল নেই। চরিত্র প্রতিটি সৃষ্টির নিজস্ব ও অবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। মানুষের চরিত্রও ঠিক তাই।

ফেরেশতারা আল্লাহ্র একটি বিশেষ সৃষ্টি। তাদের ইচ্ছা ও নিজস্ব হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাস বলতে কিছুই নেই। তাদের চরিত্রও ঠিক তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল।

لَايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ -

আল্লাহ্ তাদের যে আদেশ করেন তারা তা কখনোই অমান্য করে না এবং যাই করতে বলা হয়, তাই তারা করে। (সূরা তাহ্রীম ঃ ৬)

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُوْنَ -

তারা রাত-দিন তাসবীহ্ করে, কোনো সময়ই তা বাদ দেয় না। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২০)

জন্তু-জানোয়ারও আল্লাহ্ তা'আলার এমন একটি সৃষ্টি, যারা স্বাভাবিক ঝোঁক প্রবণতার মধ্যেই পরিবেষ্টিত। নিজস্ব ইচ্ছা বলতে তাদের কিছু নেই। ওরা দৈহিক প্রবণতার তাগিদেই চলে। ওদের চিন্তা-ভাবনা করার কোনো ক্ষমতা নেই, ওদের সাধারণ কাজে-কর্মে তার কোনো প্রয়োজনও দেখা দেয় না।

মানুষও আল্লাহ্‌রই এক বিশেষ সৃষ্টি যার অভ্যন্তরীণ স্বভাবগত তাগিদ আছে, আছে তার বাস্তবায়নের জন্যে নিয়ম-কানুনও। তা তার মাটির নির্যাস ও ফুঁকে দেওয়া রূহ্-এর সংমিশ্রণে গঠিত সমন্বিত প্রকৃতি নিঃসৃত। সুস্থ-স্বভাবিক অবস্থায় তাদের চরিত্র প্রকৃতির দাবিতে সাড়া দেয় বটে তবে তা তাদের সাধ্যানুযায়ী। তাদের প্রকৃতি নিহিত অবস্থাগত ইচ্ছার নিয়মাবলী তাকে বাধাগ্রস্ত করে। তার কার্যাবলী দৈহিক তাগিদে হওয়া সত্ত্বেও রূহ্-এর প্রভাব থেকে কখনোই মুক্ত থাকে না।

এই কারণে মানুষের কার্যাবলী কখনোই নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারে না, অনিবার্য লক্ষ্য ছাড়াও হয় না তার কোনো কাজ এবং জীব-জন্তুর মতো নিছক তীব্র দৈহিক দাবিতেই মানুষের কোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

মানুষের ক্ষেত্রে তার চরিত্র সর্বাত্মক, সর্বব্যাপক। তার কোনো একটি কাজও তার যৌনতাও— চরিত্র মুক্ত হয় না। তার অর্থ, তার চরিত্র হচ্ছে স্বভাব-প্রকৃতির দাবি নিয়ম-তন্ত্রের মধ্যে সংযত অবস্থা, সুস্পষ্ট ও অনুভবযোগ্য লক্ষ্য সহকারে এবং মাটির নির্যাসের তাগিদ মিশ্রিত রূহ্-এর প্রবণতা রক্ষা সহকারে।

তাই মানুষের বেলায় যৌন-চরিত্র তার জীবনের অন্যান্য যাবতীয় কর্মের চরিত্রের মতোই। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ ইত্যাদি কোনো একটাও তার বাইরে থাকতে পারে না। মানুষ নিছক লালসার বশবর্তী হয়েই যৌন প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিতে পরে না, তার সাথে প্রেম-ভালোবাসাও মিশ্রিত থাকে। নিছক যৌন-লালসা চরিতার্থ করাও তার একক লক্ষ্য হয় না, যার জন্যে মানুষ পাগলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাহল লক্ষ্য অর্জনের উপায়। তবে তা-ও নিয়ম-প্রণালী ছাড়া হতে পারে না। এই নিয়ম-প্রণালীই তাকে এমনভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে যে, তাতে ব্যক্তির ধ্বংস ডেকে আনা হয় না, সমাজ সমষ্টির জন্যেও তা হয় না বিপর্যয়কারী।

ফল কথা, মানব জীবনের সকল দিকে ও সকল ক্ষেত্রেই নৈতিকতার ব্যাপক প্রতিপত্তি অনিবার্য। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, ধন-সম্পত্তির মালিকানা, দেশ শাসনের ক্ষমতা, যুদ্ধ ও প্রদর্শনী কোনো কিছুই চরিত্রের আওতা-বহির্ভূত নয়।

আর এই সর্বাত্মক চরিত্র রক্ষা করেই মানুষ মানুষ হয়, মানুষ থাকতে পারে। তা ব্যতিরেকে মানুষ নিকৃষ্টতম জীব মাত্র, জন্তু-জানোয়ারের অপেক্ষাও হীন ও নীচ।

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط
اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ -

এই মানুষদের হৃদয় আছে; কিন্তু তাকে অনুধাবনের কাজে লাগায় না। ওদের চক্ষু আছে; কিন্তু তদ্দ্বারা দেখার কাজ করে না। ওদের কর্ণ আছে, কিন্তু তার

দ্বারা শ্রবণের কাজ করে না। ওরা ঠিক জন্তু-জানোয়ারেরই মতো; বরং তাদের চাইতেও অধিক ভ্রষ্ট। ওরা আসলে অজ্ঞতা-অচেতনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। (সূরা আরাফ ঃ ১৭৯)

এই ব্যাপকভিত্তিক নৈতিকতায় যৌনতার কোনো বিশেষ ধরনের নিয়ম প্রণালীর প্রয়োজন পড়ে না। মানুষের অন্যান্য যাবতীয় কর্মতৎপরতায় যেমন, এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। ইসলাম এভাবেই যৌন সমস্যার সমাধান করেছে— এ প্রেক্ষিতেই ইসলাম মানুষের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নিয়েছে।

ইসলাম যৌনতা নিঃশর্তে ও সাধারণভাবে হারাম করেনি। তাকে ঘৃণ্য পরিতাজ্য রূপেও গণ্য করেনি। ইসলাম তাকে কোনো হীনতা নীচ বা জঘন্য জিনিস বলেও মনে করে না। মানবীয় চেতনাকে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেও বলে না। হিন্দু সমাজে এবং গির্জা বিরচিত খ্রিস্টীয় মতে যৌনতা ঘৃণ্য হলেও তার বিধি-নিষেধ মুক্ত ব্যবহার মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে। তা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ধারণা ও মানসিকতার ফলশ্রুতি। বাহ্যত দেহকে কোণঠাসা করেই এক ধরনের পবিত্রতা ও উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা চালায়, তার প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করে।

কিন্তু ইসলামে তা নির্দোষ। মানুষের প্রকৃতিগত সব দাবি ও জৈবিক কাজকর্ম সবই মূলত দোষমুক্ত, অঘৃণ্য।

তবে ইসলাম তাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। সুসংবদ্ধ করে। তাকে সুসংবদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম-বিধানও তৈরি করেছে। তা অনিষিদ্ধ থাকা পরিবেষ্টনীতেও এই নিয়মতন্ত্র কার্যকর। তার অনিষিদ্ধতা ও নিষিদ্ধতা দুটোই বাহ্যিক সীমারেখা। এই সীমারেখা ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। কিন্তু তা যৌন সম্পর্কের সার্বিক নৈতিকতা নয়, তা মানুষের জন্যে জরুরি। বৈধ ও অবৈধ— নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ-এর মধ্যে পার্থক্যকারী সীমারেখা শুধু যৌনতার ক্ষেত্রেই নয়, পানাহারের ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত।

রক্ত, লাশ, শূকর মাংস ও অ-আল্লাহ্র নামে যবাই করা জন্তু হালাল নয়, হারাম। এ ছাড়াও অন্য সব জিনিসই সাধারণভাবে ও নিঃশর্তে জায়েয নয়। কেননা খাদ্য নিশ্চয়ই চুরি করা, লুটে নেওয়া ও অপচয় পর্যায়ের না হওয়া একান্ত জরুরী।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ -

তোমাদেরকে আমাদের দেওয়া পবিত্র রিযিক তোমরা খাও। (সূরা আরাফ ঃ ১৬০)

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا -

তোমরা খাও, পান করো, কিন্তু অপচয় করোনা। (সূরা আরাফ ঃ ৩১)

এই খাদ্য গ্রহণের কতগুলো নিয়ম-নীতি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কেননা মানুষ যেসব পাত্র ভর্তি করে, তার মধ্যে পেট-ই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের পাত্র। মানুষের জন্যে মাত্র কয়েক মুঠো খাবারের প্রয়োজন, যাতে তার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

اَنَّ لنَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاَنَاءِ اَوْيُنْفَخَ فِيْهِ -

নবী করীম (স) পানপাত্র বা খাদ্যপাত্রে শ্বাস ছাড়তে বা ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

এভাবে খাদ্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মলিনতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তা এমন জীবন্ত কাজ হয়ে যায় যা মানুষের উপযোগী। তাতে একই সময় তার দেহ ও রূহ্ উভয়ই সম্মিলিত হয়ে দাঁড়ায়।

যৌনতাও এমনিই। মানব জীবনের কোনো কিছুই উক্ত নিয়মের বাইরে নয়।

ফলে যৌনতার মধ্যেও কিছু বিধি-নিষেধ আছেঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ .... وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ -

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা'দের, তোমাদের কন্যাদের, তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুফুদের, তোমাদের খালাদের এবং ভাই ও বোনের কন্যাদের........আর বিবাহিতা অবস্থায় থাকা মেয়েদের। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৩-২৪)

এ ছাড়া অবশিষ্ট সব মেয়েরাই মুবাহ্ অ-নিষিদ্ধ। কিন্তু তাও শর্তহীনভাবে নয়। এই পর্যায়ে এমন সব কারণকে তুলে ধরা হয়েছে যা যৌনতাকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নতমানের করে দেয়। তা বিজয়ী ও প্রভাবশালী দৈহিক তাড়নাকে নিছক দৈহিক লালসা হওয়া থেকে মুক্ত রাখে।

---

১ احمد ترمذى ابن ماجه - حاكم.

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى ط فَاعْتَزِ لُوْاالنِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ لا وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

হে নবী! লোকেরা তোমাকে ঋতুবতী মেয়েলোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বলে দাও, তা একটি নষ্ট-অপবিত্রতা, তাই হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর (সঙ্গম) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকো। তাদের নৈকট্য নিও না যতক্ষণ তারা পবিত্র না হচ্ছে। পরে তারা যখন পুরো মাত্রায় ভালো হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাদের কাছে আসো, যেখান থেকে যাওয়ার অনুমতি আল্লাহ্ তোমাদের দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্ তওবাকারী লোকদের ভালোবাসেন, সেই সাথে ভালোবাসেন পবিত্র রক্ষাকারীদেরও। (সূরা বাকারা ঃ ২২২)

সেই সাথে সেসব কথাবার্তাও স্মরণীয়, যা অনুভূতির তীব্রতাকে হ্রাস করে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নবী করীম (স) থেকে এই পর্যায়ের বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসসমূহ উপরোক্ত কথাকে অধিকতর তাগিদপূর্ণ করে দেয়।

পরে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও সঙ্গম কার্যের একটা বিশেষ ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য রয়েছে ঃ

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ -

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত বিশেষ।

এরূপ কথা বলে আসলে আল্লাহ্ বুঝিয়েছেন, ক্ষেতে চাষ করে যেমন বীজ বপন করা হয়, স্ত্রী সঙ্গমেও বীজ বপন লক্ষ্য থাকতে হবে ও তা থেকে সন্তান উৎপাদন চাইতে হবে। অর্থাৎ বৈধভাবে সন্তান উৎপাদন ও বংশের ধারা রক্ষা এই কার্যক্রমের মাধ্যমেই চালু রাখতে হবে।

পরে আল্লাহ্ এ-ও জানিয়েছেন যে, যৌন সঙ্গম নিছক একটা দৈহিক কর্মই নয়; বরং তার সাথে অবশ্যই যুক্ত থাকতে হবে আনুভূতিক, আত্মিক ও প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَا جًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً -

আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্তিত্বের একটি অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তোমরা সেই জুড়ির

কাছে মনের গভীর প্রশান্তি লাভ করো। তিনি তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রীতি-ভালোবাসা ও দয়া-সহমর্মিতার ভাবধারা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম ঃ ২১)

মানবীয় উত্থানের এই উন্নত ও উচ্চতর পর্যায়ে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা এমন একটা কাজ হয়ে যায়, যা মনুষ্যত্বের মান থেকে সবদিকের বিচারেই অত্যন্ত নীচ ও হীন হয়ে পড়ে। মানুষের কোনো গুণের এক বিন্দু সমর্থন সে কাজে পাওয়া যায় না, না রূহ্-এর আলো, না সংযম শক্তি, না উদ্দেশ্যের চিন্তা, না সমাজের আদর্শভিত্তিক খিলাফতের সীমার মধ্যে রূপায়ণ, যা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এসব কারণে ইসলাম যেনা-ব্যভিচারকে হারাম করেছে। হারাম করেছে, কেননা সে কাজ আল্লাহ্র খলীফার জন্যে শোভা পায় না। মানুষের ওপর সংকীর্ণতা ও অসুবিধা চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কাজ করেনি। সেই সাথে যে-সব কাজ বা ব্যবস্থাপনা ব্যভিচারকে সহজ করে দেয়, তাকে লোভনীয় বা অধিকতর চাকচিক্যময়, আকর্ষণীয় বানিয়ে দেয়, মানুষকে সেদিকে ঠেলে দেয়, সেইসব কাজ ও ব্যবস্থাপনাও সম্পূর্ণ হারাম। এই কারণে পুরুষ নারীর পাগল করে দেওয়া, মিল-মিশ ও অপ্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ, যোগাযোগ ইত্যাদিও হারাম। উলঙ্গ-অবাধ চলাফেরা নারী-পুরুষ উভয়কেই এই বিপদে নিক্ষেপ করে। গায়র-মুহাররম পুরুষের সম্মুখে নারীদেহ ও দেহ-সংলগ্ন অলংকারাদি প্রদর্শনও এই জন্যে হারাম।

এই কারণে লালসা পংকিল দৃষ্টিদান ও নির্লজ্জ কথাবার্তাও নিষিদ্ধ। এ কারণে জেনা-ব্যভিচার কার্যত করা তো আরও বেশি করে নিষিদ্ধ হবে অতি স্বাভাবিকভাবে।

নারী-পুরুষের যৌন মিলনের একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত রয়েছে, তা হচ্ছে বিবাহ। এই পথটাই পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও নির্দোষ।

আমার লিখিত অন্যান্য গ্রন্থে[১] একটি কিংবদন্তী উদ্ধৃত করেছি। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এতটা পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নত বর্তমান পরিবর্তনশীল জীবনে কি করে সম্ভব ? কেননা বর্তমানে তো মানুষ বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল সময়ে জীবন যাপন করছে।

এটা সত্যিই কিংবদন্তী। একটি ভিত্তিহীন কথা। ইসলামের উপরোদ্ধৃত উন্নত মানের মানবিক আদর্শ সব সময় এবং চিরকালই মানুষের পক্ষে পালন করা সম্ভব। সম্ভব যদি মানুষ মানুষের স্তরে থাকে। পশুর স্তরে পৌঁছে গেলে তো সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য।

---

১. الانسان بين المدية ولاسلام গ্রন্থের الشكلة الجنسوة অধ্যায় এবং –معر كة التقالي এবং التطور والثبات فى حيات البشرية গ্রন্থগুলো দ্রষ্টব্য।

একালে যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন ও চাহিদার দোহাই দেওয়া হয়, তা নিতান্তই অর্থহীন কথা। আধুনিক জাহিলিয়াতই তা মানুষের সম্মুখে ভয়াবহ করে তুলে ধরেছে। কেননা তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে দৈহিক স্বাদ আস্বাদন ও যৌন-লালসার গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেওয়া। এটাই হচ্ছে সেই আল্লাহ্দ্রোহিতা, যা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে তাদের দাসানুদাস বানায়।

ও যে সত্যিই অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন নয়, তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে, সর্বগ্রাসী সমাজবাদী রাষ্ট্রে রাশিয়াও ব্যক্তিগণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের পানাহার, বাসস্থান ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছে, সেই সাথে বিবাহের দায়িত্ব নেওয়া যেত। তাহলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাই বা হবে কেন এবং জিনা-ব্যভিচারের ঘটনাই বা ঘটবে কোন কারণে ?

কিন্তু রাশিয়া অন্যান্য কাজ করলেও বিবাহের দায়িত্ব নেয়নি। বরং সেখানেও নারী-পুরুষ কোনোরূপ অর্থনৈতিক প্রয়োজন ব্যতিরেকেই জন্তু-জানোয়ারের মতোই মেলামেশা ও ঢলাঢলি করে চলছে। সরকার সেজন্যে তাদের বিরাট ও ব্যাপকভাবে উৎসাহ যোগাচ্ছে, সুযোগ করে দিয়েছে এবং কোনোরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যতীতই পুরুষ-নারী যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হচ্ছে।

এটা জাহিলিয়াত ছাড়া আর কিছু নয়। এ জাহিলিয়াত নৈতিকতার সব সীমা লংঘন করেছে। তা মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের মতো যৌন লালসার প্লাবনে ভেসে বেড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে। দিয়েছে এই জন্যে যে, মানুষ যেন আত্মসম্বিত হারিয়ে ফেলে তাগুতী শক্তির দাসানুদাস হয়ে থাকতে স্বতঃই বাধ্য হয়।

কিন্তু ইসলাম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পথে প্রবল ও দূরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করেছে। কেবল এই ক্ষেত্রেই তো নয়, প্রত্যেক স্বভাবগত প্রবৃত্তির যথেচ্ছা চরিতার্থতার পথেই ইসলাম বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। এই পথ বাধাগ্রস্ত করে দিয়ে অবাধ ও উন্মুক্ত করে দিয়েছে বৈধ ও পবিত্র পথ। যেন মানুষ এই পবিত্র পরিচ্ছন্ন পথেই স্বীয় স্বাভাবিক যৌন-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে এবং তাতে মানবীয় উচ্চতর মর্যাদা রক্ষা পায়, এক বিন্দু নৈতিক পতনের কারণ না ঘটে।

ইসলাম বিবাহকে সহজ করে দিয়েছে। সেজন্যে বিপুল উৎসাহ যুগিয়েছে— অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, চিন্তাগত ও আধ্যাত্মিকভাবে সর্বোপরি নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে। ইসলাম বিয়েকে একটি ইবাদত গণ্য করেছে। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

এই কারণে ইসলাম একসাথে কয়েকটি বিষয়ের নিরাপত্তা দিয়েছে। মানুষের মন-মানসিকতা ও স্নায়ুমণ্ডলীর পরম শান্তি ও সুস্থতার নিরাপত্তা দিয়েছে। প্রবল স্বভাবগত দাবিকে দমন করলে যে স্নায়ুবিক অসুস্থতা দেখা দেওয়া অনিবার্য,

ইসলাম তার পক্ষপাতী নয়। অবশ্য ইসলামের এই চেষ্টা চিরন্তন যে, সমাজকে অবশ্যই পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে হবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি যেন না হয় যে, লোকেরা ধৈর্য-সহ্যের সীমা লংঘন করে বিদ্রোহ করে বসবে। বরং ইসলাম বিয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে একটা নিয়মতন্ত্র অনুসরণ করাকে জরুরি মনে করে। এটা মন-মানসিকতার সুস্থতা ও প্রশান্তির জন্যে একান্তই সহায়ক। নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিঘ্ন ও স্থিতিশীল জীবন ও সমাজও ইসলামের কাম্য। অবশ্য ইতিপূর্বে অল-ডেড-র‍্যান্টের উক্তি উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়েছি যে, আধুনিক জাহিলিয়াত মানবতাকে চরম স্নায়ুবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয় ও চরম অশান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

ইসলাম বিবাহিত ও দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা দেয়। পূর্বে আমরা দেখেছি, পাশ্চাত্য নৈতিকতার বন্ধন খুলে গেছে। ফলে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সব ভিত্তিই নড়ে গেছে। পুরুষ ও নারীর পথহারা আশ্রয়হারা পঙ্গপালের মতো যত্রতত্র ঘুরে ও মধুপান করে বেড়াচ্ছে।

মানব সন্তান যাতে করে স্নেহ-বাৎসল্যের পরম-প্রশান্ত ক্রোড়ে লালিত পালিত হতে পারে, ইসলাম তারও ব্যবস্থা করেছে। সকল প্রকারের বিপর্যয় ও অশান্তি থেকে দূরে থাকার জন্যে এই ক্রোড় শিশুদের অতিবড় আশ্রয়।

ইসলাম যখন মানুষকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর উন্নততর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, তখন এই মর্যাদা রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থাপনা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, তার পরিপূরণের উপায় ও পন্থারও নির্দেশ করে।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতিও আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথে ও আদর্শে গড়ে তোলা একান্তই আবশ্যক। আমার লিখিত 'ইসলামী শিল্প পদ্ধতি' শীর্ষক গ্রন্থে আমি সেসব লোকের বিস্তারিতভাবে জবাব দিয়েছে, যারা মুখ বাঁকা করে ও নাক উঁচু করে বলে বেড়ায় যে, শিল্প সংস্কৃতির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

এখানে সেসব কথার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। ইশারা-ইঙ্গিতে ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামী জীবন পদ্ধতির বিস্তারিত রূপ নিয়ে আলোচনা করব না। এখানে শুধু দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছি এবং পথকে উজ্জ্বল করার মত সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি মাত্র।

ইতিপূর্বে আমরা যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা নৈতিকতা ও পুরুষ নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যায়ে আল্লাহ্ প্রদর্শিত পন্থার প্রাথমিক কথাগুলো বলে এসেছি, ঠিক তেমনি এখানেও শিল্প সংস্কৃতির পদ্ধতি সম্পর্কেও প্রাথমিক মৌলনীতিসমূহ পর্যায়ে কথা বলব।

শুরুতেই আমরা সেই মুখ ভ্যাংচিয়ে ও নাক উঁচু করে কথা বলার লোকদের সম্পর্কে বলতে চাই, শিল্প-সংস্কৃতি একটি মানবীয় তৎপরতা ও ব্যস্ততা, মানুষ তা নিয়ে জীবন-পথে চলে। আর মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও নৈতিকতা — সবই যখন আল্লাহ্ প্রদর্শিত পদ্ধতি— ইসলামের অন্তর্ভুক্ত, এবং এখানে তা গড়ে তোলার ও তাকে মানবোপযোগী মানে উন্নত করার সব ব্যবস্থাই রয়েছে, তখন শিল্প সংস্কৃতিও অনুরূপভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা তাও অন্যান্য গুলোর মতোই মানবীয় তৎপরতা ছাড়া আর তো কিছুই নয়। সেগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়মে গড়ে উঠতে পারলে এটাও সেই নিয়মেই গড়ে তোলা যাবে। কেননা এটাকেও মানবোপযোগী মানে উন্নীত করার ও তাকে সুসংগঠিত করে তোলার সব ব্যবস্থাই আল্লাহ্র পদ্ধতি ইসলামে রয়েছে।

এই মুখ ভ্যাংচানো ও নাক সিটকানো লোকদের আবার বলছি, শিল্প-সংস্কৃতিকে আল্লাহ্র পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা যে নিছক ধর্মীয় ওয়াজ ও মিম্বরের ওপর দেওয়া খোত্বায় পরিণত হবেই, তার মাধ্যমে মানুষের বিকৃত চিত্র বানানো হবেই এমন কথা বলার কোনোই যুক্তি নেই। বরং এই সবই এক সাথে স্পষ্ট প্রকাশমান পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, উন্নত ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে উঠবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

উক্তরূপ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতার কারণেই এই ধানের ধারণা পোষণ করা হয়। এটা সম্পূর্ণ জাহিলী মানসিকতার প্রকাশ। শিল্প-সংস্কৃতিকে আল্লাহ্র পদ্ধতি অনুযায়ী গড়তে দিতে তারা রাজি নয় বলেই এরূপ কথা তারা বলছে।

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে তাকে উন্নতির চরম পর্যায় পৌঁছানো সম্ভব, আল্লাহ্র পদ্ধতি মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে উন্নতির যে চরম সীমা নির্ধারণ করেছে, সেখানে নিয়ে যাওয়াও কিছু মাত্র অসম্ভব হবে না। পরে তা আরও.... আরও উন্নত হবে। এটাই বাস্তব সত্য কথা। কোনোরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই গোটা সত্তাকে নিয়ে আল্লাহ্র পদ্ধতির কারবার।

আল্লাহ্ বিশ্বলোক, জীবন এবং মানুষ এই সবই ইসলামী শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্র। তা আরও যতটা বিশাল হওয়া সম্ভব এতটা বিশালতা সহকারেই তা চলবে।

এই সবই স্বভাবতই ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে গৃহীত। কেননা শিল্প সংস্কৃতি তার বিভিন্ন রূপসহ মানুষের চেষ্টা সাধনা বলে সেই বাস্তবতাকে চিত্রিত ও রূপায়িত করার লক্ষ্যে, যা তাদের অনুভূতিতে অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত মহা সত্য সম্পর্কে ধরা পড়ে। তা অতীব উন্নত, নিখুঁত ও প্রভাবশালী চিত্র সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক, বিশ্বলোকের সাথে মানুষের সম্পর্ক। জীবনের সাথে, তার নিজে ও অন্যদের সাথে তার সম্পর্ক এই সবই হচ্ছে শিল্প-সংস্কৃতির

প্রকাশ ক্ষেত্র। তা ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি হোক কিংবা হোক অন্য কোনো শিল্প ও সংস্কৃতি।

শিল্পকে ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে যা ঘটবে, তা হচ্ছে এই যে, উক্ত সম্পর্কগুলোর সবই ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলা হবে। ইসলামী চিন্তাধারা ও আচরণ-বিধির অনুসারী হবে তা, এ কথায় কোনোই অস্পষ্টতা বা গোজামিল নেই। একজন মুসলিম ইসলামী আচরণ-বিধি অনুযায়ী-ই তাকে গ্রহণ ও ব্যবহার করবে, তারই প্রকাশ ঘটাবে তার মাধ্যমে, যা তার অনুভূতিতে তীব্র ও প্রকট হয়ে রয়েছে। অন্যরা যা অনুভব করে, তার কোনো গুরুত্বই সে মেনে নিবে না। এটাই স্বাভাবিক।

একজন মুসলিম অন্তরে যে বিধি-বিধান ও বাস্তবতার অনুভব করে, তা হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা ও ভয়। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে তার সাথে জীবন্ত অংশীদারিত্বের অনুভূতিও থাকে আর জীবনের সাথে ভালোবাসার সাথে মিশ্রিত থাকে জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি গভীর ঐকান্তিকতা। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অবিচ্ছিন্নতা ও পরিব্যাপ্ততা, যা দুনিয়ার জীবনে কখনোই ভিন্নতর হয় না।

হ্যাঁ, ইসলাম এক বাস্তব জীবন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিরই ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ -

মানুষের কতক দ্বারা অপরক কতককে প্রতিরোধ করা যদি আল্লাহ্‌র স্থায়ী নীতি না হতো, তাহলে দুনিয়াটা মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যেত।
(সূরা বাকারা ঃ ২৫১)

আরও বলেছেঃ

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيْهِ -

হে মানুষ! তুমি নিশ্চয়ই তোমার আল্লাহ্‌র দিকে পৌছার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করে চলেছ। ফলে তোমরা অবশ্যই তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে।
(সূরা ইনশিক্বাক ঃ ৬)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে খুব বেশি কষ্ট ও কাঠিন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।

বস্তুত ইসলাম পৃথিবীর বুকে কোনো 'স্বর্গ' রচনার কথা বলে প্রতারণা দেয় না। একথাও বলে না যে, তোমরা দুনিয়ার জীবনে পায়ের তলায় স্বতঃই মওজুদ পেয়ে যাবে জীবনের প্রয়োজনীয় সব নেয়ামত। বরং ইসলাম ঘোষণা করেছে, এ জীবনটা

বড্ড কষ্টের, প্রাণপণ চেষ্ট-সাধনা-সংগ্রাম দিয়েই এই জীবনকে গড়তে হবে। এ জীবনে রয়েছে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ।

মানুষের নিজ সত্তার দিক দিয়ে ইসলাম এক বাস্তব জীবন পদ্ধতি। ইসলাম মানুষকে বলে না যে, তুমি ফেরেশতা, অনেক উচ্চে ও উর্ধ্বে তোমার অবস্থান।

একথাও বলছে না যে, সমস্ত মানুষই দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয়ের অধিকারী। বরং বলেছে– وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا – "এবং মানুষ খুবই দুর্বল সৃষ্ট হয়েছে।" আরও বলে, كُلُّ بَنِى اٰدَمَ خَطَّاءٌ – সমস্ত মানুষই ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা।

এই প্রেক্ষিতে বলতে হচ্ছে, ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে তোলা শিল্প সংস্কৃতি মানুষ ও জীবনে ভুল মিথ্যা বিকৃত ও প্রতারণাপূর্ণ কোনো চিত্র প্রতিকৃতি গড়ে তুলবে না। কোনো অসত্য ও ভিত্তিহীন কাল্পনিক রূপও দেবে না তার। কোনো উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে চেহারা দিয়েও মানুষকে উপস্থাপিতও করবে না। কেননা তার মূলে কোনো সত্য বা বাস্তবতা নিহিত নেই।

ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক শিল্প-সংস্কৃতি পৃথিবীতে মানুষের দ্বন্দ্বের জীবনের জটিলতার ও সমস্যাসমূহের এবং ভালো ও মন্দের মাঝে যে টানাহেচ্‌ড়া চলছে, আছে যে উত্থান ও পতনের ব্যাপার, এই সব কিছুরই অত্যন্ত বাস্তব ও বস্তুনিষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ইসলামী শিল্প-সংস্কৃতি ও জাহিলিয়াতের শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকল কি ?

জবাবে বলব, হ্যাঁ, বহু বিষয়ে ও অসংখ্য দিক দিয়েই এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষেই পার্থক্য রয়েছে।[১]

প্রথম, ইসলামী বাস্তবতা বস্তুতই কোনো সংকীর্ণ বাস্তবতা নয়। যদিও আধুনিক জাহিলিয়াতে শিল্প-সংস্কৃতি চরম সংকীর্ণতায় পড়ে রয়েছে। কেননা সেখানে শিল্প ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণাটি মানুষ সম্পর্কিত পাশবিক ব্যাখ্যা থেকেই গৃহীত।

কিন্তু ইসলামে মানুষের মানবীয়— মানবোপযোগী-ব্যাখ্যাই গৃহীত। সে ব্যাখ্যায় মানুষের পতন, উত্থান, ভালো ও মন্দ সবই শামিল, শামিল মানুষের এক মুঠি মাটিও রূহ-এর সমন্বিত সত্তা হওয়ার কথা। এক সাথে এই সব কিছুই তাতে স্বীকৃত।

পার্থক্যের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য (central point)।

ইসলামী শিল্প-সংস্কৃতি মানব জীবনের যে চিত্র অংকিত করে, তাতে সাদা-কালো-উজ্জ্বল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দুটি দিকই জীবনের বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃত।

১. منهج الفن الاسلامى গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হ্যাঁ বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ দুটির মধ্যে কোনটির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়?

জাহিলিয়াতের শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের পাশবিক ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভুত বলে তা মানুষের কালো— অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলোর ওপরই সমস্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ করে। সে দৃষ্টিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলোই যেন মানব জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, 'অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক' বলে আমরা কোনো সীমাবদ্ধ নৈতিক দিক বোঝাতে চাচ্ছি না। সকল ব্যাপার সম্পর্কে আমরা বলছি ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে।

মানুষের ছবি এরূপ দেওয়া হয় যে, সে প্রয়োজনের কাছে অক্ষম হয়ে মাথা নত করে রয়েছে, না উচ্চে উঠতে পারে না নিচে নামতে পারে। এ হচ্ছে মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্র, কালো দিক মাত্র।

আবার যখন দেখানো হবে, মানুষ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে, চিরদিনের জন্যে এই অবনত অবস্থা অর্থনৈতিক, সামষ্টিক ও ঐতিহাসিক নিশ্চিত অনিবার্যতার সম্মুখে তা থেকে মুক্ত হতে পারছে না, তার লক্ষ্য ইতিবাচক নয়, সে বন্ধনের মোকাবিলা করারও কোনো দৃঢ় সংকল্প তার নেই, তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হচ্ছে না, তার লক্ষ্যও সহীহ করা হচ্ছে না, বলব, এটাও মানুষের সেই কালো দিকই।

অনুরূপভাবে যখন জীবনকে চিত্রায়িত করা হবে বিভ্রান্ত, দিশেহারা, লক্ষ্যহীনরূপে। যার কোনো তাৎপর্য, লক্ষ্য ও বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষ হাতড়ে মরছে এক চিরন্তনী তীহ্ ময়দানে, সঠিক পথের সন্ধান জানা নেই, নেই মনের স্থিতি প্রশান্তি, নেই দৃষ্টির আলো, এইরূপ জীবন— মানব জীবনের এইরূপ নিঃসন্দেহে কালোদিকেরই প্রকাশ।

তেমনি মানুষকে যদি চিত্রিত করা হয় এভাবে যে, সে লালসার বহ্নিতে জ্বলছে কিংবা যৌন-কামনার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, তার নিজের মধ্যে মর্মান্তিক পরিণতির এক বিন্দু চেতনা জাগছে না, না তাকে সচেতন বানানো যাচ্ছে, তাহলেও বুঝতে হবে, মানবতার একটি কলংকময় দিকই এতে চিত্রিত করা হয়েছে।

মানুষের মধ্যে এই কলংকময় দিকগুলো রয়েছে, সেটা একান্তই বাস্তব, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের মৌল সত্তার প্রকৃতির দিক দিয়ে, তার শক্তি-সামর্থের প্রকৃত অবস্থিতি ও তার জীবন লক্ষ্যের মহাসত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে। নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে— প্রমাণিত হবে যে, মানুষের এই অবস্থা কোনো স্থায়ী ও চিরন্তন বাস্তবতা নয়, অনুরূপভাবে তা নয় মানুষের আসল ও প্রকৃত রূপ। যা দেখানো হচ্ছে, তা মানুষের বিকৃতি, চরিত্র হনন ও চির উজ্জ্বল মুখে কলংক লেপন মাত্র।

এই প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় হচ্ছে ইসলামী পদ্ধতিতে আমাদের বাস্তবতায় ঘটনাটিকে আমরা যেমন দেখছি তেমনিই চিত্রিত করব বটে; কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত পদ্ধতির ছত্রছায়ায় মানুষের আসল ও অন্তর্নিহিত মহাসত্য যেভাবে অনুভূত হবে, আমরা তারই ওপর আলোকসম্পাত ঘটাব, তাতে মানুষের কেবল কালো দিকটিই নগ্ন ও প্রকট হয়ে উঠবে না, পাশাপাশি তার সত্যরূপ— উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দিকটিও প্রকটিত হয়ে উঠবে।

আর কালো দিকটিকে আমরা চিহ্নিত করব একটি বিকৃতি, বিপথগামিতা ও পথভ্রষ্টতা অথবা বিপর্যয় হিসেবে। মানুষের অকৃত্রিম ও আসল রূপ হিসেবে নয়। আমরা বলব, এটা মানুষের দুর্বল মুহূর্ত, দুর্বলতার দিকটিই তাতে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তা একান্তই সাময়িক— মুহূর্তের ব্যাপার। পরক্ষণেই মানুষের হুঁশ ও কাণ্ড-জ্ঞান ও চেতনা ফিরে আসবে। সে দুর্বলতা কাটিয়ে অধোগমনের বদলে উর্ধ্বে গমন শুরু করবে। বলব, মানুষের দুর্বলতা চিরন্তন ব্যাপার নয়, নয় নিয়মিত লেখন। তা মানুষের মধ্যে অনুতাপ জাগায়। নাক সিঁটকানো না হলেও দুঃখানুভূতির আর্তনাদ অবশ্যই আকাশ-বাতাস মথিত করবে। যেমন আল্লাহ্র কথা ঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ -

আফসোস বান্দাদের জন্যে! তাদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছে, তারা তারই প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করেছে। (ইয়াসীন ঃ ৩০)

মনে রাখা আবশ্যক, মানুষের দুর্বলতা কখনোই তার 'সাহসিকতা' বা বীরত্ব নয়। জাহিলিয়াতের শিল্প-সংস্কৃতি তো সে ভাবেই চিত্রিত করেছে।

আর উভয় ধারার মাঝে পার্থক্যের এ একটা বড় দিক।

এছাড়া অন্যান্য বিকৃতি বিপর্যয় যা আছে, তার সব কয়টি থেকেই ইসলামী পদ্ধতি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

তাতে আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝে সেই ঘৃণা দ্বন্দ্ব মুসলিমের অনুভূতিতে কখনোই প্রকট হয়ে উঠতে পারে না। কেননা ইসলামী শিল্প এই দ্বন্দ্বকে প্রকট করে না। দ্বন্দ্ব থাকলেও তা আছে বিকৃত ও বিপথগামী মনমানসিকতায়। ইসলামী শিল্প তাকে একটি বিকৃতিরূপেই চিহ্নিত ও চিত্রিত করবে।

ইসলামী শিল্পে অ-আল্লাহ্র প্রতি কোনো প্রীতি বা মুগ্ধতার স্থান নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে 'ইলাহ' বানাতে প্রস্তুত নয়।

মানুষের প্রকৃতি স্বভাবতই উত্তম, সুন্দর, নিখুঁত, প্রিয়তর, বিচিত্র প্রতিকৃতির সংগ্রাহক, পরিবেশক। মানুষের চেতনা তা দেখে নিশ্চয়ই বিস্ময় রসে আপ্লুত। কিন্তু

তা প্রকৃতিকে ইলাহ্ বানায় না কখনোই। গির্জার ইশ্বর থেকে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে যে রোমান্টিকতার উদ্ভব করেছিল, তারা প্রকৃতিকেই ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছিল। কেননা ইতিপূর্বে তারা পৌত্তলিকতায় মগ্ন থাকার পর খ্রিস্টীয় পাদরী পুরোহিতদের থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিল।

ইসলামী শিল্পের দৃষ্টিতে মানুষও ইলাহ্ নয়। ইলাহ্ হওয়ার কোনো যোগ্যতাও তার নেই, যদিও তাকে বহু বড় বড় কাজের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। মানুষের যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র দেওয়া নেয়ামত, সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি। তার জবাবে মানুষের কর্তব্য আল্লাহ্র শোকর করা। কিন্তু সে যদি আল্লাহ্র প্রতি কুফরী করে ও তাঁর শোকর আদায় না করে, তাহলে বুঝতে হবে, তার বিপর্যয় ঘটেছে, সে বিপদগামী হয়ে পড়েছে, যা মানুষের বলা অসম্ভব কিছু নয়। ... ইসলামী শিল্পকলা এই চিত্রও তুলে ধরবে। লোকদেরে জানিয়ে দেবে যে, এটা একটা বিপর্যয়।

নিশ্চিত অপরিহার্যতা বা অনিবার্যতাও ইলাহ্ নয়, ইলাহ হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা তার নেই। মানুষের উচিত নয় তার অনিবার্যতার বলি হওয়া ও তার অধীন হয়ে নিজেকে লাঞ্ছিত অপমানিত করা। ইতিহাসের জাহিলী ব্যাখ্যা ও সামষ্টিক মতসমূহ ভিত্তিক শিল্প ও সাহিত্য মানুষকে এই নিশ্চিত অনিবার্যতার দাসানুদাস নিয়ে চিত্রিত করেছে।

ইসলামী শিল্প নীতি ব্যাখ্যার জন্যে বিশালা ক্ষেত্র লাভ করে। জীবনের কোনো একটি ব্যাপারও তার আওতার বাইরে থাকে না।

অসাধারণভাবেই শিল্পের যে ক্ষেত্র, তার তুলনায় ইসলামের ক্ষেত্র বিশালতর, ইসলামী শিল্পের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বলোক, জীবন ও মানুষ আর এই সকলের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আরও বহু বিষয়ে বিস্তীর্ণ।

কিন্তু ইসলামী পদ্ধতিতে অন্যান্য সব জিনিসের ন্যায় এক্ষেত্রেও সব কিছু ভারসাম্যপূর্ণ, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, উচ্চতর-উন্নততর মানে গৃহীত। সে মান নিশ্চয়ই তা যা আল্লাহ্র খলীফার উপযোগী। অবশ্য সেই বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে, যে মানুষের জীবনে 'খিলাফতে রাশেদা' থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে, সেই সাথে মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতাকেও ভুলে যাওয়া হয়নি। কেননা তা মানুষের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

আল্লাহ্র পদ্ধতি এমনি ভাবেই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, নৈতিকতা, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শিল্প— এই সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত। কোনো কিছুই তার বাইরে নয়।

মানুষ এই জমিনের বুকে যা কিছুই করে, যে কর্ম তৎপরতাই চালায়, তার কোনো একটিও আল্লাহ্র পদ্ধতি ইসলামের বাইরে নয়, হতে পারে না। ইসলাম সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা অক্ষমতা ও বিপর্যয় থেকে মুক্ত যদি কোনো পদ্ধতি সত্যিই থেকে থাকে, তা হলে তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্র পদ্ধতি– ইসলাম।

এ ছাড়া আর যা কিছু, তা সবই জাহিলিয়াত। পিছনের দুটি অধ্যায়ে যে সব বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়ে এসেছি, সেই সবই পুরোপুরি বিপর্যয়, বিপথগামিতা। মানুষের জীবনে সেগুলো যে অন্যায়, পাপ, নির্মমতা ও দুঃখ পীড়নের উদ্ভব করেছে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

এসবের বিশ্লেষণ থেকে একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ যদ্দিন পর্যন্ত আল্লাহ্র দিকে— আল্লাহ্র প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির দিকে ফিরে না আসবে, পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করবে ইসলামকে তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে, ততদিন পর্যন্ত জীবন নৌকা টলটলায়মান থাকবেই, ভারসাম্য কখনোই ফিরে আসবে না।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনে ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, তাহলে তাদের প্রতি আমরা আসমান-জমিনের বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবো ... ... কিন্তু তারা অসত্য মনে করেছে, ফলে আমরা তাদের পাকড়াও করলাম তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের দরুন। (সূরা আরাফ ঃ ৯৬)

বস্তুতই মানুষের সম্মুখে শুধুমাত্র দুটি পথ রয়েছে। তার যে কোনো একটা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

হয় ঈমান আনবে, তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে। তার ফলে আল্লাহ্ তাদের জন্যে আসমান-জমিনের অফুরন্ত নেয়ামত ও বরকতের দ্বার খুলে দেবেন। অথবা তারা সত্যকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করার পথ ধরবে। তা হলে আল্লাহ্ তাদেরই কৃতকর্মের ফল হিসেবে তাদের পাকড়াও করবেন। এ দুটি ছাড়াও তৃতীয় পথ বলতে কিছুই নেই।

এতদসত্ত্বেও...এই বিষয়টির অন্তর্নিহিত সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠার পরও একটি কথা থেকে যায়— যেমন পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ে আমরা বলে এসেছি। কথাটি

হলো, অন্ধকারে নিমজ্জিত জাহিলিয়াত পাগলের ন্যায় চির আবর্তনশীল। এক মুহূর্তের তরেও এই জাহিলিয়াত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে না। এর তলে মানুষ এতই গাফিল হয়ে পড়ে আছে যে, তাদের চেতনা কোনো দিন ফিরে আসবে, তারা কতখানি বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে পৌঁছে গেছে তার চেতনাটুকু লাভ করবে এবং অতি দ্রুত ও অবিলম্বে এই ধ্বংসোম্মুখ মানবতার রক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হওয়া একান্ত জরুরি তার অনুভূতি তাদের মধ্যে জেগে উঠবে, তা এক দুসূর পরাহত ব্যাপার মনে হয়।

ব্যাপার বোধ হয়, তার চাইতেও খারাপ..........

তবে আল্লাহ্র বিধান ইসলাম মানুষের বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান থেকে কিছুমাত্র দূরে নয়।

শুধু এতটকুই নয়, জাহিলিয়াতের বর্তমান প্রবল চাপে জনগণ ইসলামকে জানতেই পারেনি বলে তাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হচ্ছে না। বরং তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই সচেষ্ট।

ইসলামকে লোকেরা ঘৃণা করে কেন ?

ইসলামী জীবন পদ্ধতি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। সকল প্রকার বক্রতা ও বিকৃতি বা বিপথগামিতার মলিন স্পর্শ থেকে তা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

মানুষের মনে যত প্রশ্নের উদয় হয়, মানুষের জীবনে দেখা দেয় যত সমস্যা ও জটিলতা, সব কিছুর জবাব ও সমাধান ইসলাম দিতে পারে, দিচ্ছেও। আর তার দেওয়া প্রতিটি জবাব নির্ভুল এবং সমস্যার ক্ষেত্রে দেওয়া প্রতিটি সমাধান যেমন ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিভিত্তিক, তেমনি অতীব কার্যকর।

এই জীবন বিধান মানুষের মনের বহু বিচ্ছিন্ন যোগ্যতা প্রতিভাকে একত্রিত করে একটি মাত্র মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজে লাগায়। এর ফলে মানুষের বিপুল যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা যেমন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হতে পারে না, তেমনি তার মনের ঝোঁক প্রবণতা ও আগ্রহ-উৎসাহও বহুতর ক্ষেত্রে বিভক্তও হয়ে পড়ে না। নানাবিধ পরস্পর বিরোধী কাজে ব্যস্ত হয়ে নিজেদের সীমিত শক্তিকে ব্যয় করে ফুরিয়ে যেতেও অন্তঃসারশূন্য হয়েও পড়তে হয় না মানুষকে।

এই জীবন পদ্ধতিই মানুষকে তার সকল দুর্ভাগ্য, দুঃখ-কষ্ট, পীড়ন, বিস্ময় ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে। এই মুক্তিদানের জন্যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো কিছুরই কিছুই করার নেই।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক মানুষ ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে অপছন্দ করে এবং এড়িয়ে চলতে চায়, এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয় ?

এই লোকদের যতই এদিকে ডাকা হয়, ততই যেন তারা এ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নিকটে আসার পরিবর্তে। ...এ দেখে নিশ্চয়ই সকলের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়া খুবই স্ব'ভাবিক।

কিন্তু না, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এটা নয় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা। এ দেখে বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়াটা অস্বাভাবিক না হলেও এই মূল ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক।... স্বাভাবিক যতদূর কল্পনা করা যায়।

সমস্ত জাহিলিয়াতেই– ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যতগুলো জাহিলিয়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়— তার প্রতিটিই ইসলামকে অপছন্দ করেছে। অপছন্দ করেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। কেননা এটা ইসলাম। ...ইসলাম তো ঘৃণারই পাত্র।.....

জাহিলিয়াত প্রচণ্ড অহংকারী। আল্লাহ্ থেকে দূরে— অনেক দূরে অবস্থিত। জাহিলিয়াত তাকে অপছন্দ করে কেবল এজন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এই

পদ্ধতি নাযিল করেছেন মানুষের সমগ্র জীবনে তা বাস্তবায়িত করার জন্যে। এই জন্যে যে, তা-ই হবে গোটা মানব জীবনের একমাত্র নেয়ামক ও নিয়ন্ত্রণকারী বিধান।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাহিলিয়াত অন্যান্য সকল জাহিলিয়াতের তুলনায় অধিক গৌরবী ও অহংকারী। আর এ কারণেই তা ইতিহাসের সব কয়টি জাহিলিয়াতের তুলনায় ইসলামকে অধিক অপছন্দকারী।

তাই বলছিলাম, জাহিলিয়াত ইসলামকে ঘৃণা করে, শত্রু মনে করে। কিন্তু ইসলামে যে পরম সত্য ও মহাকল্যাণ নিহিত জাহিলিয়াত জানে না বলে ঘৃণা করে, তা নয়। অথবা জাহিলিয়াত যে বাতিল মতাদর্শের মধ্যে অবস্থান করছে ও তাকেই তা সঠিক ও নির্ভুল মনে করে এবং ইসলামের তুলনায়ও তাকে উন্নত ও অধিক সত্য বলে বিশ্বাস করে এটাও তার ঘৃণার আসল কারণ নয়।

ইসলামের প্রতি জাহিলিয়াতের এই ঘৃণা বোধটা কোনোরূপ অজ্ঞতা বা ভুল বুঝাবুঝির কারণে নয়। বরং ইসলামে নিহিত সত্য ও কল্যাণের কথা মানব জীবনে সংঘটিত সকল বক্রতাকে ইসলাম যে সঠিক করে, তা জেনে শুনেই তাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে। এই ঘৃণার কারণ হলো, জাহিলিয়াত মানব জীবনের বক্রতা ও বিকৃতি-বিপর্যয়েরই কামনা করে, বক্রতা ও বিপর্যয় দূর হয়ে যাক, তা তো তার সহ্যই হয় না। মানুষ চিরকাল বিপথে চলুক এটাই তার কাম্য। অথচ ইসলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা পালন করে।

জাহিলিয়াত জাহিলিয়াত বলেই তা ইসলামকে ঘৃণা করে।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى -

আর সামুদের কথা। আমরা তো তাদেরকে হেদায়েত দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা হেদায়েতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে ভালো মনে করে গ্রহণ করে নিল। (সূরা হা-মীম সেজদা ঃ ১৭)

এটি একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং তা সমস্ত দৃষ্টান্তেরই সারনির্যাস। হেদায়েতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে গ্রহণই হলো ইতিহাসের প্রতিটি জাহিলিয়াতের নীতি ও আদর্শ।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ - قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

আমরা অবশ্যই নূহকে তার সময়কার জনগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। সে বললে হে জনগণ; তোমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো। কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ আর কেউ নেই। আমি তোমাদের প্রতি কঠিন দিনের আযাবের ভয় করছি। তার সময়কার জনগণের সরদার ও বড় লোকেরা বলল আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। (সূরা আরাফ ঃ ৫৯-৬০)

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ سَفَاهَةٍ -

আদ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে আহ্বান জানালো! হে জনগণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকো। তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ কেউ নেই। তোমরা কি ভয় করে তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিজেদের বাঁচাবে না ? জবাবে কাফেরদের সরদার ও বড় লোকেরা বলল— আমরা তো তোমাকে খুবই নির্বুদ্ধিতার মধ্যে ডুবন্ত দেখতে পাচ্ছি।..... (সূরা আরাফ ঃ ৬৫-৬৬)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ .... قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ -

এবং সামুদদের প্রতি তাদের ভাই সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে আহ্বান জানাল এই বলেঃ হে জনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ কেউ নেই...তখন সেই অহংকারী লোকেরা বললঃ তোমারা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তাকে অস্বীকার করছি...। (সূরা আরাফ ঃ ৭৩ ও ৭৬)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ - اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ - وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ -

এবং লুতকে পাঠিয়েছি। সে তার জনগণকে বললে ঃ তোমরা এমন এক নির্লজ্জতার অপরাধ করে যাচ্ছ, যা তোমাদের পূর্বে জগতের কেউ করেনি। তোমরা যৌন লালসা পূরণের জন্যে মেয়েদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাচ্ছ?..... আসলে তোমরা তো সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া বাড়াবাড়িকারী লোক।

এই কথার জবাবে সমাজের লোকদের জনপদ থেকে ওদের বহিষ্কৃত করো। ওরা তো এমন লোক যে, নিজেদেরকে খুব পবিত্র চরিত্রবান রূপে জাহির করছে। (আরাফ ঃ ৮০-২১)

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ..... قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْلَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا -

মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল ঃ হে জনগণ! তোমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করো, তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ কেউ নেই— বড় ও সরদার লোকেরা যারা অহংকারে মেতে গিয়েছিল বলল ঃ হে শুয়াইব, আমরা তোমাকে অবশ্যই বহিষ্কৃত করব, তোমার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও অথবা তোমরা আমাদের নিজস্ব পন্থা ও রীতিনীতিতে ফিরে আসবে.........। (সূরা আরাফ ঃ ৮৫ ও ৮৮)

এই ধরনের ঘটনা মূলত অভিন্ন হলেও ইতিহাসে তা বারবার ঘটেছে, বারবারে ঘুরেফিরে আসা একই জাহিলিয়াতের ইসলামের প্রতি শত্রুতার আচরণ এক চিরন্তন সত্য হয়ে রয়েছে।

যার সারনির্যাস হচ্ছে ঃ

ওদের হেদায়েত তো আমরা দিয়েছিলাম, কিন্তু হেদায়েতের পরিবর্তে অন্ধত্বকেই ভালোবেসে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করে নিল।

তাই আমরা বলছিলাম, জাহিলিয়াত যে ইসলামকে পছন্দ করে না, বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়, তা দেখে বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইতিহাসের সুদীর্ঘ ধারায় প্রতিটি জাহিলিয়াতই ইসলামের প্রতি এই শত্রুতামূলক আচরণ গ্রহণ করেছে। তা ইসলামকে ঘৃণা করে তাকে সহ্য করতেই পারে না। যে লোকই ইসলামের আহ্বান জানায়, তাকেও তা সহ্য করে না। তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে, তার ওপর কঠিন দণ্ডের ফয়সালা করে। ইসলামের আহ্বান দাতারা একটু শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে বাঁচাবে, বসবাস করবে, তাও তার বরদাশ্‌ত হয় না। মত প্রকাশের বা কোনো আকিদা পোষণের স্বাধীনতাটুকু দিতে প্রস্তুত নয়।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَاتَبْخَسُوْا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ج وَاذْكُرُوْآ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ص وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ- وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ - قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا -

এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠালাম। সে বললঃ হে জনগণ! তোমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করো, তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ কেউ নেই। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি অকাট্য দলীল এসে গেছে। অতএব তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণ করো, লোকদেরকে তাদের জিনিস সমূহে ক্ষতিগ্রস্থ করো না এবং তোমরা পৃথিবীতে শান্তিও স্থিতি কায়েম হওয়ার পর তথায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না। এই নীতিই তোমাদের জন্যে বিপুল কল্যাণবহ যদি তোমরা মুমিন হও এবং প্রতিটি পথে তোমরা বসো না, বসে লোকদের নানা ওয়াদা করো না, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্‌র পথে যেতে বাধাগ্রস্ত করো না। তাদের বাঁকা পথে নিয়ে যেতেও চেয়ো না। তোমরা স্মরণ করো, যখন তোমরা খুব কম সংখ্যক ছিলে, পরে তিনি তোমাদের সংখ্যা বিপুল করে দিয়েছেন। তোমরা লক্ষ্য করো, বিপর্যয়কারীদের পরিণাম কত মর্মান্তিক হয়েছে। তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক যদি আমার প্রেরিত দ্বীন ও ঈমান এনে থাকে, আর কিছু লোক যদি ঈমান না এনে থাকে, তা হলে তোমরা ধৈর্যধারণ করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের পরস্পরের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। কেননা তিনিই সর্বোত্তম বিচারক। জনগণের মধ্য থেকে অহংকারী বড় লোকেরা বললঃ হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমানদার হয়েছে তাদের সকলকে আমাদের এই জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করব অবশ্যই। অথবা তোমরা আমাদের রীতিনীতি ও আদর্শে ফিরে আসবে। (সূরা আরাফ ঃ ৮৫-৮৮)

না, জাহিলিয়াত পন্থীদের এতটুকু ধৈর্য-সহ্যও নেই। এমনকি সেই নম্র নীতিবাদী ও শান্ত সন্ধিকামী লোকদের যারা বলেঃ তোমরা একটু ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন, তিনিই তো সর্বোত্তম সুবিচারক। তাদেরকেও বরদাশ্‌ত করা হয়নি।

জাহিলিয়াতের এই আচরণ হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ব্যাপারেও নয়। এর পেছনে বহু কারণ বর্তমান।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও তাঁর পথ থেকে যখন বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা শুরু হয় তখন গোটা ব্যাপারের মূলেই বিপর্যয় সূচিত হয়ে যায়, প্রথমে মুমিনদের প্রতি লজ্জাবোধ ও গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। কেননা এই সময় মুমিনরাই থাকে বিজয়ী শক্তি। আর আল্লাহ্‌র দ্বীন হয় চূড়ান্ত পথ-নির্দেশক।

প্রাথমিক পর্যায়ে শুভ ধ্যান-ধারণা নিয়েই বিপর্যয় সূচিত হয়। কষ্ট বহনে অক্ষমতার কারণে ও দুর্বলতার দোহাই দিয়েই বিপথগামিতা শুরু করা হয়। সিরাতুল মুস্তাকীমে চলা খুই কষ্টকর মনে হয় বলেই তাকে প্রথম দিক দিয়ে বরদাশ্‌ত করা হয়।

অথবা মুসলিম সমাজে বাইরের থেকে অনুপ্রবেশকারী ও মুনাফিকরা খুবই খারাপ উদ্দেশ্যে এই বিপর্যয় শুরু করে। তারা ওৎ পেতে অপেক্ষায় বসে থাকে, সুযোগ পেলেই মৌল বিশ্বাসের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। কেননা তারা তো তার প্রতি সত্যিকারভাবে ঈমান আনেনি, মুনাফিকী মনোভাব নিয়েই তার ধারক সেজে ছিল। তাদের এবং মুনাফিকীর গোপন কৌশলের ব্যবহার চলতে থাকে যদ্দিন সেই মৌল বিশ্বাস বিজয়ী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে— তার ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

কিন্তু এই অবস্থার মধ্য দিয়েও মুনাফিকী ও বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা একটুও থেমে যায় না, যদিও সে চেষ্টা হালকা, গভীর এবং প্রকাশ্যভাবে করার সাহসের অভাব থাকে।

অতঃপর ভাঙ্গন শুরু হয়, বিপর্যয়ের রেখা দীর্ঘ হয়। লোকদের মনের ওপর গাদ জমতে থাকে আকীদা থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির অনুপাতে। পথের স্বচ্ছতা এবং সেপথ গ্রহণকারীর মনের স্বচ্ছতার ওপর ময়লা জমে ওঠে। অতঃপর আলোকসম্পাত বন্ধ হয়ে যায়।

আর তখনই পৃথিবীতে বিপর্যয় সূচিত হয়। তাগুত ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

ক্রমশ ভাঙ্গনটা বৃদ্ধি পায়, বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে লোকদের সাহস বেড়ে যায়। আর তখন তাগুত কার্যত মানুষের ব্যাপারাদিতে হস্তক্ষেপ করেও নিজ ইচ্ছামতো শাসন কার্য চালাতে থাকে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান পুনরায় কার্যকর হতে পারে না।

এই রূপ অবস্থায় হেদায়েতের দিকে আহ্বানদাতার আহ্বানে জাহিলিয়াত সাড়া দিতে প্রস্তুত হয় না; বরং তার প্রতি ক্রমান্বয়ে শত্রুতার আচরণ শুরু করে দেয়।

একটু পরই তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ও নির্মম যুদ্ধ শুরু করে দেয়। চেষ্টা করে তাকে সমাজ ও দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে। তার ব্যাপারে মারাত্মক ধরনের সিদ্ধান্ত করতে এই সময়ও হেদায়েতের আহ্বান যতই হতে থাকে, যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ততই বাড়তে থাকে। তখন শেষহীন শত্রুতা ছাড়া উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের আর কোনো দিক অবশিষ্ট থাকে না।

এই স্তরে এসে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর মনে শুভ মানসিকতা ও সদিচ্ছা বলতে কিছুই থাকে না, তা-ই মানুষকে মৌল আকীদা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার একমাত্র কারণ থাকে না। শত্রুতার কারণ হয় না ইসলামী পদ্ধতির সম্পর্কে অজ্ঞতা।

তখন জহিলিয়াত স্বীয় অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়। তার লালসা ও নবতর আলো থেকে বিভ্রান্তির চরিতার্থতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। সত্য থেকে বিপথগামিতা, স্বেচ্ছাচারিতার শাসন ও লালসার কাছে আত্মসমর্পণ যে পরিমাণে বাড়ে, তখন তা সে মনে মনে অনুভব করে। সহীহ্ আকীদা দুনিয়ার ওপর বিজয়ী থাকা কালে তাকে তার স্বার্থ, মুনাফা ও সুবিধাদি থেকে কতটা বঞ্চিত করে রেখেছিল, জাহিলিয়াত তা মর্মে মর্মে অনুভব করে।

আর এই কারণেই জাহিলিয়াত ইসলামকে ঘৃণা করে। তার বিরুদ্ধে রীতিমতো সশস্ত্র যুদ্ধ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। একাজে অহংকারী বড় লোক ও দুর্বল শাসিত সকলেই এখানে একাকার হয়ে যায়। কেননা জাহিলিয়াতে প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু স্বার্থ মুনাফা ও কামনা-বাসনা থাকে, যা সে পুরোপুরি পেতে চায়, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে প্রস্তুত হয় না। তাই আল্লাহ্র পদ্ধতি পুনরায় বিজয়ী ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদেরকে সেই সব থেকে বঞ্চিত করে দিক, তা চাইতেই পারে না। এ রূপ অবস্থায় তো খারাপ স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনের সুবিধাদি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে। তাদের লালসা-কামনার চরিতার্থতার পথে সত্য দ্বীন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

এ তত্ত্বকে সামনে রাখতে ইসলামের বিরুদ্ধে আধুনিক জাহিলিয়াতের অনমনীয় ও চরম শত্রুতার ভূমিকা গ্রহণের অন্তর্নিহিত কারণটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না।

আসলে এটা হচ্ছে জাহিলিয়াতের ইসলামকে পছন্দ না করার, শত্রুতা ও যুদ্ধ করার ভূমিকা। এই ব্যাপারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্পূর্ণ একমত। যে সব দেশ নিজেদের ইসলামী দেশ মনে করে তারাও এক্ষেত্রে কিছু মাত্র পশ্চাদপদ নয়।

তবে ইউরোপের কথা— তার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ তথা আমেরিকার অবস্থাটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

শুরুতে তারা 'দ্বীন' মাত্রকেই ঘৃণা করে, উপেক্ষা করে চলে। আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনকেও তারা অত্যন্ত খারাপ মনে করে। বাস্তব জীবনের ওপর আল্লাহ্র প্রতি ঈমান কিছুমাত্র কর্তৃত্ব করবে, তা তারা বরদাশ্ত করতে রাজি নয়। এ ছাড়াও তারা ইসলামকে অপছন্দ করে ও অচিন্তনীয়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ভিন্নতর এক বিশেষ কারণে।

তবে দ্বীন বা ধর্ম মাত্রকেই তাদের অপছন্দ করার পর্যায়ে আমরা এই গ্রন্থের পিছনের অধ্যায়সমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি।

রোমান সাম্রাজ্যবাদের সময়ে কনস্ট্যান্টাইন সম্রাটের নির্দেশে সৃষ্ট ধর্মকে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যবাদের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এ কথাও জানা আছে যে, আসমানীয় ঈসায়ী আকীদার সাথে তৎকালে প্রচলিত ব্যাপক পৌত্তলিকতা সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তা করা হয়েছেল পৌত্তলিকদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পক্ষে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে।[১] এভাবে খোদায়ী দ্বীন ও পৌত্তলিক ধারণা সংমিশ্রিত হলে লোকদের পক্ষে তা দুর্বোধ্য হয়ে গেল। আর এই সময়ই গির্জা দাবি করে বসল, ধর্মের বিশেষ গভীর তত্ত্ব কেবল তারই জানা আছে। এ বিষয়ে তার সাথে কেউই শরীক নেই। কাজেই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতে হলে তাদের দাবিকৃত তত্ত্বের প্রতি অন্ধভাবে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আর আল্লাহ্‌কে পেতে হলে গির্জাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এভাবে গির্জা জনগণের অন্তর, চিন্তা ও মন-মানসিকতার ওপর দুরধিগম্য প্রতিপত্তি চাপিয়ে দেয়।

সকল প্রকার কর ধার্য করে দেয় জনগণের ওপর।

পরে এই গির্জাই বৈরাগ্যবাদের দিকে আহ্বান জানায়, যদিও বৈরাগ্যবাদ স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী ও তার সাথে সংঘর্ষিক।

জনগণ কিছু কাল পরই লক্ষ্য করল, গির্জার আসল প্রতিষ্ঠানটিই পবিত্রতা, ইবাদত ও আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠা রাখার পরিবর্তে অত্যন্ত জঘন্য ধরনের নানা হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে কাজগুলো তারাই করে যারা ধর্মের ধারক-বাহক, পাদ্রী পুরোহিত তথা পবিত্র মহান আত্মা হওয়ার দাবিদার লোকেরাই।

এর পরই গির্জা শুরু করে দেয় ক্ষমা পাওয়ার চেক বিক্রয় করতে। ফলে ধর্ম সংক্রান্ত গোটা ব্যাপারটাই একটা অর্থহীন জিনিসে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মনে ধর্মের প্রতি এক বিন্দু ভক্তি ও শ্রদ্ধা অবশিষ্ট থাকে না।

তারপর গির্জা যখন নবতর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখন ধর্মের ওপর এলো প্রচণ্ড আঘাত। গির্জা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানীদের নানাভাবে পীড়ন দিয়ে ও জ্বালিয়ে মারতে শুরু করে দিল। আর এই সবই করা হচ্ছিল আসমানী ধর্মের দোহাই দিয়ে।

এই সময় থেকেই সমগ্র ইউরোপে ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঝে দুরতিক্রম্য পার্থক্যের পাহাড় দাঁড়িয়ে যায়। জীবন থেকে ধর্ম নিঃশেষিত হয়ে যায় ক্রমশ।

---

১. আমেরিকান লেখক ড্রিপার-এর পিছনে উদ্ধৃত সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

ইউরোপে ধর্মের বিরদ্ধে সাধারণ মনোভাবের মূল কারণ এটাই। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেল মানুষের জীবন ক্ষেত্র থেকে।

পরে রেনেসাঁর যুগের সূচনা হয়। ইউরোপ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির থেকে জ্ঞানের যে নির্মল আলো লাভ করেছিল, ইসলামের মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছিল, তা ইউরোপে ধর্মের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে গেল রেনেসাঁর নামে। তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁ কার্যত ধর্ম বিরোধী পুনর্জাগরণ মাত্র।

ইউরোপের জন্যে একটা বড় কৈফিয়ত দেওয়ার বিষয় হলো গির্জার সাথে রেনেসাঁর চরম মাত্রার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। কিন্তু গির্জার সাথে এই দ্বন্দ্ব ধর্মের বিরোধীতা রূপ পরিগ্রহ করল কেন? ... ... এর কোনো জবাব ইউরোপ দিতে পারবে না।

সে যা-ই হোক, বাস্তবে ঘটেছিল এই যে, গির্জাকে ঘৃণা করতে করতে তারা গির্জার ধর্মকেও ঘৃণা করতে লাগল। উত্তরকালে ধর্ম বিরোধী এই মনোভাব ইসলামের বিরুদ্ধে— ইসলামের প্রতি কুফরী গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করল অথচ ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানই ছিল ইউরোপের রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণের মৌল প্রেরণার উৎস। এক্ষণে তারা অন্ধকার থেকে আলোকের মধ্যে কি করে আসতে পারে?[১]

গির্জাবিরোধী মনোভাবকে ইসলামেরও বিরুদ্ধে ব্যবহার করা একটা অপরাধ সন্দেহ নেই। আসলে তারও মূলে নিহিত কারণ হচ্ছে গির্জার সেই ঘৃণ্য ভাবধারা। যদিও ইসলামের ব্যাপক কল্যাণময় অবদানের কথা তাদের কিছু মাত্র অজানা ছিল না, তাদের রেনেসাঁও যে ইসলামেরই ব্যাপক কল্যাণময় অবদানেরই বিশেষ অবদান তাও তারা ভালোভাবেই জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে মরণ-পণ যুদ্ধ শুরু করে দিল। চতুর্দিকে ইসলাম বিরোধী মিথ্যা প্রচারণা চালাতে থাকল, ইসলামের উজ্জ্বল নির্মল অকলংক চেহারাকে বিকৃত করে পেশ করতে লেগে গেল।

অবশ্য ইহুদীবাদ যে কোনো নবতর দ্বীনী আহ্বানের অপেক্ষায় ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসেছিল, তার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালানোর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে, আল্লাহ্‌র সাথে কৃত তাদের চুক্তিকে পর্যন্ত তারা গ্রহ্য করছিল না, আল্লাহ্‌র হেদায়েতকে পালন করে চলতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

ইউরোপে যখন রেনেসাঁর উদ্ভব হলো গির্জার ধর্মের বিরুদ্ধে মনোভাব ও প্রচণ্ড শত্রুতা লয়ে, তখন ইহুদীবাদ এটাকে মহাসুযোগ রূপে গ্রহণ করল খুব চালাকী

১. এই গ্রন্থে উদ্ধৃত বেফল্ট-এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

সহকারে। যে খ্রিস্টবাদ ইহুদীদেরকে নানাভাবে অত্যাচারে জর্জরিত করেছে, তার বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধ প্রবৃত্তি ছিল একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তারা এই যুদ্ধ চালালো সকল শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে।

এর পরই ডারউইনের আগমন। তার বিশেষ ধর্মবিরোধী মনোভাবের মতবাদের কারণে গির্জার সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হল। বিশ্ব ইহুদীবাদ গির্জা বিরোধী এই যুদ্ধকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে দিল। এগিয়ে এলো তিন জন প্রখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত মার্কস, ফ্রয়েড ও দরখায়েম। তারা তিন জন মিলিত চেষ্টায় ধর্মের ভিত্তিটিকেই সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত ও তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।[১] অতপর গহ্বর আরও অধিক গভীর হয়ে খ্রিস্ট ধর্মের আকীদাটিকেও সম্পূর্ণ গিলে ফেলে। দৃষ্টান্তহীন জঘন্য ও বীভৎস চরিত্রহীন কার্যকলাপের দ্বারা ব্যাপক নৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিল, মানব-ইতিহাসে যার কোনো দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে নৈতিক বিপর্যয় সমগ্র বিশ্ব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তি ও জাতিসমূহের মধ্যকার সংহতি ধ্বংস করেছে, তার ভিত্তিমূলে বিশ্লিষ্টতা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটা ঠিক সেই সময় ঘটেছে যেখন বিশ্ব ইহুদীর বিশ্বের রাজনীতি গড়ে তুলে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে। ফলে তা একই সাথে পুঁজিবাদ ও মার্কসীয় ধর্মভিত্তিক সমাজবাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে নিয়েছে।

অতঃপর ইহুদী খ্রিস্টান যৌথ শক্রতা সমগ্র শক্তি ও প্রচণ্ডতা নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শক্রতায় উঠে-পড়ে লেগে যায়।

অতঃপর ইউরোপ ইহুদীদের ধন-মালের সাহায্য পুষ্ট হয়ে সারা মুসলিম জাহানের ওপর সর্বাত্মক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করে। মুসলমানদের অধীন বানিয়ে তাদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ইসলামকে তার মূল থেকে উৎপাটিত করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। মিশনারীদের পাঠায়, ইসলামের বীভৎস রূপ অংকিত করে মুসলিমকেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বানাতে চেষ্টা করে। মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রবর্তিত বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষী একটি নবতর বংশ গড়ে তোলেন। এই মুসলিম সন্তানরাই উত্তরকালে মুসলিম দেশগুলো থেকে ইসলামকে বিদায় দিয়ে তার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের অন্ধ গোলামীকে নিজেদের আদর্শ ও চরিত্ররূপে গ্রহণ করে।[২]

খ্রিস্টান ইহুদীবাদে মুসলিম জাহানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার সঠিক প্রসঙ্গ এটা নয়। ইসলামকে খতম করার জন্যে ওদের যৌথ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও অবলম্বিত হীন ষড়যন্ত্র কলাকৌশল ও চক্রান্ত এক জঘন্য ব্যাপার।

---

১. التور ولنشبات فى لله الشرية। গ্রন্থের তিন ইহুদী দ্রষ্টব্য।

২. هل نحن مسلمون গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, বিশেষ করে তার عوامل محلية অধ্যায়।

তবে এই পর্যায়ে এ্যালফর্ড কন্ট্রোল স্মীথ তার Islam in modern History গ্রন্থে যে স্বীকারোক্তি করেছে তার প্রতি ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট। উক্ত গ্রন্থের ১০৪ থেকে ১১৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, পাশ্চাত্য ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক, বৈজ্ঞানিক, চৈন্তিক, সামাজিক, সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক সর্ব প্রকারের হাতিয়ারই অকাতরে ব্যবহার করেছে। এই পাশ্চাত্যই মুসলিম জাহানের বুকে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। এটা এই সুপরিকল্পিত ও বিশেষ আয়োজন সহকারে আবদ্ধ ব্যাপক যুদ্ধেরই একটা অংশ।

বস্তুত ইউরোপ ইসলামের সাথে চরম শত্রুতা করছে এবং তাকে সর্বতোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেদিকে ইঙ্গিত করাই এখানকার এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

তবে 'আলমে ইসলামী' যে দেশসমূহকে শামিল করে তা কোনো কোনো দিক দিয়ে ইউরোপ থেকে ভিন্নতর অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই সাথে মিলিত হচ্ছে, যেমন একটি জাহিলিয়াত অপর একটি জাহিলিয়াতের সাথে মিলিত হয় পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে এবং ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে। যদিও খুব কম দিক দিয়েই সে দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকে যা একটিকে অপরটি থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে ও একটির পরিবেশ অন্যটি থেকে খানিকটা ভিন্নতর হয়।

সত্যি কথা এই তথাকথিত আলমে ইসলামী— ইসলামী জাহানেরও ইসলাম বর্তমানে একান্তই অপরিচিত ও ঠিক যেমন জাহিলিয়াতের আরব ভূ-খণ্ডে সূচনাকালে নিতান্তই অপরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে পার্থক্য এতটুকু ঘটেছে যে, তখন শুধু অপরিচিতই নয়, সেই সাথে 'ঘৃণিত'-ও অবশ্য বেশ কিছু দেশে।

কিন্তু লোকেরা ইসলামকে ঘৃণা করে কেন, এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা এখানে একটু একটু করে আলোচনা করব। এ আলোচনায় বিভিন্ন অংশে মানুষের প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়বে। আলমে ইসলামের অধিবাসী লোকদের ইসলাম-বিরোধীতা বা ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রকারে বিভক্তি হয়ে রয়েছে।

'মুসলিম জাহানে'র কোনো আল্লাহ্দ্রোহী শক্তি তা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকুক কিংবা বাহ্যিকভাবে সমঝোতার মনোভাব প্রকাশ করে ভিতরে ও গোপনে গোপনে ইসলামের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হোক— ইসলামের সাথে মোকাবিলা করতে পারে না। তার একটা সহজতর কারণ রয়েছে এবং সে কারণ হচ্ছে যে, ইসলাম সরাসরি আল্লাহ্র সাথে মানবতার সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু অপরাপর শক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করায়।

ইতিহাসের যে-কোনো আল্লাহ্দ্রোহী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলে এমনি ভাবেই পরাজয় বরন করতে বাধ্য হচ্ছে। তার এই যুদ্ধ ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হোক, কি ইসলাম অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে।

এতদ্ব্যতীত এ ব্যাপারও বিবেচনা সাপেক্ষ যে, মুসলিম জাহানের এই আল্লাহ্দ্রোহী শক্তিগুলো নিজস্ব শক্তির বলে দাঁড়াতে পারেনি, আসলে খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদী ষড়যন্ত্র মিলিতভাবে তাদের দাঁড় করিয়েছে এবং সাহায্যদানে পরিপুষ্ট করছে, যেন তারা ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত ও মুসলমানদের ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়।

মুসলিম জাহানে বুদ্ধিজীবীর নামে পরিচিত ব্যক্তি রয়েছে। তারা আসলে খ্রিস্টীয় ইহুদী যৌথ ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার। ইসলামের আসল দুশমন ওরাই। কেননা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই বিশেষ চেষ্টা যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এই বুদ্ধিজীবীদের গড়ে তোলা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম সমাজের মধ্যেই এমন একটি বংশ তৈরি করা, যারা নামে মুসলিম হলেও প্রকৃত পক্ষে ইসলামকে বিন্দুমাত্রও জানবে না। তার পরিবর্তে তাদের হৃদয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয়ে হবে মর্মান্তিকভাবে বিভ্রান্ত।

এই 'মুসলিম বংশধর'দের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম পশ্চাদপদতা, অধঃপতন, দারিদ্র ও প্রতিক্রিয়াশীলতারই নাম। উন্নতি প্রগতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির মানেই হচ্ছে ধর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। জীবনের তৎপরতা ও চেষ্টা সাধনার ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন দিক— রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতিকে— ধর্মের প্রভাব থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে— তাদের কোনো সুযোগই দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ইসলামের পরিবর্তে খ্রিস্টীয় ইহুদী চিন্তা-বিশ্বাস থেকে গ্রহণ করতে হবে।

এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের শেখানো হয়েছে যে, ধর্ম হচ্ছে উন্নতি ও প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। শক্তি ও সভ্যতা এবং বিজ্ঞান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা ও জীবনের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া।

নিজেদের বোকামি ও মেধা-বুদ্ধিমত্তার অনুপস্থিতির কারণে এই বুদ্ধিজীবীরা আধুনিক জাহিলিয়াতের বিষাক্ত ঝর্ণা থেকে পানি পান করে সঞ্জীবিত হয়ে এসেছে। এমন কি বর্তমানে তারা নিজেদের সত্যিকার কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। এই গর্দভেরা এতটুকুও বুঝে না যে, এই বিদ্যার্জন সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তা যতই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হোক এবং জীবনের বিভিন্ন দিকে আল্লাহ্ প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মতাদর্শ গ্রহণ

কখনোই এক ও অভিন্ন জিনিস নয়; বরং এ দুটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। একটির সাথে অন্যটির কোনো যৌক্তিক সম্পর্ক নেই। আর বর্তমানে এই চিন্তাগত বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতাই ইসলামী জাহানকে ঘুণের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টীয়-ইহুদী ধোঁকাবাজিতে পড়েই এই বুদ্ধিজীবীরা ইসলামকে ঘৃণা করছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে সেই সমস্ত হাতিয়ার ও কলাকৌশল, যা খ্রিস্টীয় ইহুদী ইসলাম দুশমন শক্তি ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছে।

এদের বাইরে বেশ কিছু সংখ্যক লেখক, শিল্পী, গাল্পিক, রেডিও আর্টিস্ট, ও সিনেমা টেলিভিশন অনুষ্ঠানকারীও প্রতিটি মুসলিম দেশে অবস্থান করছে যারা ইসলামকে ঘৃণা করে। সত্যিকথা ইসলামকে তারা ভয় পায়।

তাদের এই ঘৃণা বা ভয় পাওয়ার বড় কারণ, তারা যে ব্যবসা করে সেই পথে যে বিপুল মুনাফা অর্জন করে তাদের জীবিকার উৎস যা, তা-ই মূলত চরিত্র ধ্বংসকারী, সমাজে ব্যাপক চরিত্রহীনতা বিস্তারকারী। যুবক-যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন বানাবার এগুলোই হচ্ছে প্রধান মাধ্যম। এরা পরস্পর পরস্পরের ওপর হঠাৎ করে আক্রমণ করে। এই ব্যবসায় ও জীবিকা যে সম্পূর্ণ হারাম, তা তারা খুব ভালো করেই জানে এবং এও জানে যে, ইসলাম বিজয়ী হয়ে এলে তাদেরকে এই হীন নিকৃষ্ট কলংকময় উপজীব্য গ্রহণের আদেশ সুযোগ বা অনুমতি দেবেনা। কেননা এই জীবিকা তাদের জীবনকে কলুষিত করেছে, তাদের রক্ত-মাংস হারাম খাদ্য খেয়ে বেড়ে উঠেছে ও দিন-রাত বেড়ে চলছে। আসলে এসব উপজীব্য সরাসরি ইয্যত আবরু বিক্রয় করে যা দেহপণ্যের বিনিময়ে উপার্জনের সমান কাজ। এ দুইয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই। এ কথা তারা অন্তর দিয়ে বুঝে ও বিশ্বাসও করে। তারা এও জানে যে, কেবলমাত্র আধুনিক জাহিলিয়াত তাদের জন্যে এই জীবিকার ব্যবস্থা করেছে এবং তা যদ্দিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিনই তারা এর মাধ্যমে বিলাসী জীবনের অফুরন্ত উপজীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ইসলাম একটি পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও নির্মল জীবনাদর্শ বলে তাদেরকে এসবের মাধ্যমে বিলাসবহুল জীবিকা গ্রহণ ও এই উপায়সমূহ চালাবার কোনো সুযোগই দেবে না। আর ঠিক এই কারণেই উক্ত লোকেরা ইসলামকে ঘৃণা করে, তার আগমনকে ঠেকাবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সেসব যুবক-যুবতীর জীবন দুয়ার খোলাই হয়েছে তাদের 'লাশের' ওপর, শুধু এজন্যে যে, তারা নিজেরাও বিপথগামী হবে, বিপর্যয় সৃষ্টি করবে গোটা সমাজ পরিমণ্ডলে। তারা তো নৈতিক চরিত্রহীনতা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশভাবে। তাদের জীবনটাই হয়ে পড়েছে প্রবহমান সঙ্গীত; কিংবা লম্পটের

কাহিনী অথবা নগ্নতার নির্লজ্জ নৃত্য বিশেষ। অথবা গোপনে বা প্রকাশ্যে যৌন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মুহূর্ত সমষ্টি। এরা যে ইসলামকে অত্যন্ত বিষ দৃষ্টিতে দেখবে, তা বলার প্রয়োজন পড়ে না।

এরা ইসলামকে বিষের মতো পরিতাজ্য মনে করে। কেননা ওরা ভালো করেই জানে যে, ওরা এসব পণ্যের বিনিময়ে বিপুল অর্থ কামাই করছে, ওরা পরস্পরের দেহপণ্য ক্রয় করছে ও বিক্রয় করছে বিপুল অর্থের বিনিময়ে, আর এই যৌন লালসার মধ্যেই ওরা দিন-রাত ডুবে থাকছে। আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে ওরা কত দূরে চলে গেছে, তা বোঝবার সাধ্যটুকু নেই ওদের। আল্লাহ্‌র দ্বীন তো পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও উচ্চতর আদর্শিকতার কারণে ওদেরকে এই কলুষতার মধ্যে পড়ে থাকার অনুমতি কখনোই দেবে না। অথচ ওরা এই ময়লা ভরা গহ্বরে পড়ে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই কলুষতার মধ্যেই যেন ওদের জীবন নিহিত। তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যেন ওদের জানটাই বের হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা জানে না পূর্বকালের বহু জাতি বহু জনবসতিই এই রূপ চরিত্রহীনতার পংকে পড় দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে ও চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সে সব জাতিও তাদের মতোই চরিত্রহীন ও পাপ কলুষতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। পরে ওরা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। ওরা এও বুঝে না যে, মানবতার চির দুশমন বিশ্ব বিপর্যয়কারী শক্তিগুলো তাদের বিপর্যয়ের আয়োজন করেছে, তাদেরকে খ্রিস্টীয় বিশ্ব ইহুদীবাদের কর্মী বানাবার লক্ষ্যে লালসার গড্ডালিকা প্রবাহে এমনিভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের এই অবস্থা সম্পর্কে কোনো চেতনাই পায় না। শুধু তাদেরকে কেউ সজাগ করতে চাইলে, তাদেরকে বিপর্যয়ের গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করলে এবং তাদের এই হীন অবস্থা থেকে তুলে উর্ধ্বে উঠিয়ে নিতে চাইলে তাকেও ওরা বন্ধু মনে করবে না; বরং শত্রুই মনে করবে, তাই ওদেরও ইসলামকে অপছন্দ করা কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়।

এছাড়া স্বাধীনা বন্ধনমুক্ত মেয়েরাও ইসলামকে পছন্দ করে না। বরং ইসলামকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপই করে। বস্তুত মুসলমানের ঘরের মেয়েদেরকে সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টান-ইহুদী শক্তিই বিগত কয়েক শতাব্দী কালের অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও যত্নের ফলে এই অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

La Conquete du Monde Musulman নামের ফরাসী ভাষার একটি গ্রন্থ রয়েছে, "আল্-আলমিল-ইসলামী' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় আরবী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে মুসলিম জাহানে মিশনারীদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হতো। উক্ত গ্রন্থের আরবী অনুবাদের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে ঃ

খ্রিস্টান মিশনারীদের চেষ্টার ফলে প্রাথমিকভাবে যে ফল পাওয়া গেছে তাহলো, যুবক-যুবতীদের মধ্য থেকে খ্রিস্টান বানানো গেছে খুবই অল্প সংখ্যককে। আর দ্বিতীয় ফল এই পাওয়া গেছে যে, মুসলমানদের প্রায় সব শ্রেণীতেই এমন লোক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যারা ক্রমশ খ্রিস্টীয় চিন্তা-ভাবনাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও অনুসরণ করবে। এর পূর্ববর্তী ৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ

মিশনারীদের নিরাশ হওয়া উচিত নয় যদি তারা মুসলমানদের মধ্যে তাদের কাজ দুর্বল দেখতে পায়। কেননা একথা অকাট্যভাবে সত্য যে, মুসলমানদের মনে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি এবং তাদের মেয়েদের 'মুক্ত' করার জন্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

আর উক্ত বইয়ের ৮৮ ও ৮৯ পৃষ্ঠায় লক্ষ্ণৌ ও কায়রোতে অনুষ্ঠিত খ্রিস্টান মিশনারীদের সম্মেলনদ্বয়ের বিবরণ ও প্রস্তাবাদির উল্লেখ রয়েছে। লক্ষ্ণৌ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১১ সনে। তাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গৃহীত হয় ঃ

প্রথম, চলমান অবস্থার পূর্ণ অধ্যয়ন।

দ্বিতীয়, মিশনারী ও মেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রকে অধিকতর প্রশস্ত করার জন্যে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা।

কায়রোর অধিবেশন হয়েছিল ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। তাতে উপরোক্ত কয়টি ছাড়া আরও কতিপয় কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল।

সপ্তম দফাঃ মুসলিম মেয়েলোকদের মধ্যে পারস্পরিক মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সম্পর্কের উৎকর্ষ বিধান।

এবং এভাবে সূচনা করা হয়েছে ঃ মিশনারীদের সম্মেলনসমূহে মুসলিম মেয়েদের উন্মুক্ত করণ।

অর্থাৎ, খ্রিস্টান-মিশনারীরা মুসলিম মেয়েদেরকে মুক্ত করার আহ্বান জানায় এবং সেজন্যে কাজ করে।

কিন্তু কেন এই প্রশ্ন করবে?

তার জবাব হচ্ছে, Morroe Berger সমসাময়িক আমেরিকান ইহুদী লেখক তাঁর The Arab world today গ্রন্থে লিখেছেনঃ

(শেষের দিনগুলোতে আরব জাহান সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই গ্রন্থখানি অধিক শক্ত, সূক্ষ্ম এবং বিপদসংকূল)।[১]

---

১. গ্রন্থটি ১৯৬২ সনে প্রকাশিত হয়।

মুসলিম শিক্ষিতা মহিলারাই সমাজের সব লোকের তুলনায় দ্বীন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে সব চাইতে বেশি দূরে অবস্থিত। আর গোটা সমাজকে দ্বীন-ইসলাম থেকে অনেক দূরে টেনে নেওয়ার দিক দিয়ে সকল লোকের তুলনায় অনেক বেশি সক্ষম।

এক্ষণে মহিলাদেরকে শিক্ষাদানের মিশনারী ক্ষেত্রকে অধিক প্রশস্ত করে দেওয়ার নির্দেশ উপদেশ প্রকাশিত হওয়া এটা নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং মিশনারীরাও মিশনারীদের সম্মেলনে যে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে, তাতেও আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা তাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে, গোটা মুসলিম সমাজকে দ্বীন-ইসলাম থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া।

কেননা মুসলিম মহিলারা যদি বাস্তবিকই প্রকৃত মুসলিম থাকে, তাহলে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে খতম করার জন্যে গৃহীত অন্যান্য সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাই যে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

যেহেতু মা-ই নতুন বংশ সৃষ্টির ও শিশুর লালনের প্রধান ও প্রাথমিক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, মা'র ক্রোড়ই শিশু প্রথম শিক্ষাগার। মুসলিম মা যতই মুর্খ হোক, সে নিশ্চয়ই তার ক্রোড়ের শিশুর মনে ইসলামী আকীদার বীজ বপন করবে। বাচ্চাদের প্রাথমিক স্বাভাবিক শিক্ষাই হবে ইসলামী আকীদা শিক্ষা। এই বাচ্চাদের বাইরের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতার প্রভাবে যতই বিপর্যস্ত ও বিপথগামী হোক, সমাজ সমষ্টি বা বিপর্যয়ের পরিকল্পনাকারী তাদের বিপর্যস্ত করার জন্যে যত চেষ্টাই করুক, তাদের অকলংক শিশুমনে বোনা ইসলামী আকীদা তাদের চূড়ান্ত মাত্রার বিপর্যয় থেকে অবশ্যই রক্ষা করবে, ফিরিয়ে আনবে। কিছুকালের বিভ্রান্তির পর আবার তাদের সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রত্যাবর্তিত করবে।

কাজেই মুসলিম সমাজের মা'দেরকেই যদি সকল উপায় পন্থা নিয়োগ করে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে খ্রিস্টীয় ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের ইসলামী আকীদাকে খতম করার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

অতএব মা'দেরকে ইসলাম থেকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী বানাতে হবে মা'র অন্তর থেকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস কুরে কুরে নির্মূল করতে হবে। কেননা ব্যাপকভাবে ইসলামী আকীদাকে হত্যা করাই খ্রিস্টান ইহুদীদের চিরদিনের চেষ্টা।

মুসলিম মেয়েদের মধ্য থেকে এমন একটি গোষ্ঠীকে এমন তৈরি করে দিতে হবে, যারা ইসলাম জানে না চিনে না। আর তার একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষা। সে শিক্ষা দান অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে হতে হবে, যার অভিজ্ঞতা বহু পূর্ব থেকেই অর্জন করা গেছে পুরুষদের ব্যাপারে এবং তার সুফল (?)-ও পাওয়া গেছে, যদিও

সীমিত পরিমাণে; এই সীমাবদ্ধতার কারণ হচ্ছে, মুসলিম মা'রা সব সময়ই তাদের সন্তানদের মনে-মগজে পশ্চাত্য বিপর্যয় বিরোধী বীজ বপন করে আসছিল।

খ্রিস্টীয় ইহুদী সাম্রাজ্যবাদ তুরস্ক, মিসর, আরব ও পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ববর্তী ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহের মোকাবিলা করা হচ্ছিল, সেই সাথে নারী শিক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্র তৈরির জন্যে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল। তা-ও ছিল সাম্রাজ্যবাদকে শক্ত বুনিয়াদে দাঁড় করার জন্যে গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী (তা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হোক বা মিশনারী শিক্ষা প্রতষ্ঠানে) উদ্দেশ্য ছিল এমন সব মুসলিম মহিলা তৈরি করা, যারা শুধু ইসলামী রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ পরিত্যাগকারিণীই হবে না, তারা হবে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, ইসলামের শত্রু।

একথা বলার প্রয়োজন হয় না, ইসলাম মুসলিম পুরুষ নারী সকলের প্রতিই ইল্‌ম অর্জন করা ফরয করেছে। কাজেই ইসলাম নারী শিক্ষার পথে বাধার সৃষ্টি করেনি বরং ইসলামই নারী শিক্ষার বড় প্রবক্তা। কিন্তু পুরুষ ও নারীকে নিশ্চয়ই সেই শিক্ষা দিতে ইসলাম বলেনি যা তাদের উভয়কে দ্বীন-ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী ও তার শত্রু বানিয়ে দেবে।

আর খ্রিস্টীয় ইহুদী সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম নারীদের শিক্ষার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে নিশচয়ই এজন্যে নয় যে, তারা প্রকৃত অর্থেই মুসলিম মহিলা হয়ে গড়ে উঠবে। বরং তা কেবলমাত্র এজন্যে যে, তারা নিজেদের মুক্ত বানিয়ে নেবে। কিসে থেকে মুক্ত ও স্বাধীন ? সাম্রাজ্যবাদী গোলামী থেকে নিশ্চয়ই নয়। বরং দ্বীন ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন।

নারীশিক্ষার এই জরুরী ব্যবস্থাপনার পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হলো এই যে, মুসলিম নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী নিয়ম-নীতিতে। মুসলিম জাহানে নবতর সামাজিক চিন্তাগত ও নৈতিক পরিবেশ নতুন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। অনৈসলামী রীতিনীতিতে মুসলিম মহিলাদের শুধু শিক্ষাই দেওয়া হলো, যা তাদের ঘরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বাইরে বের করে আনা হলো ভিন পুরুষের পাশে। এভাবেই বিপর্যয় সৃষ্টির কাজটাকে সম্পূর্ণতা দান করা হলো।

কেননা নারীদের বিপথগামী করাই ছিল প্রথম লক্ষ্য, যেন তারা অন্যদের— অন্য নারী ও পুরুষদের বিপর্যরে মধ্যে টেনে নিতে সক্ষম হয়, আর কার্যত হয়েছেও তাই।

প্রথমে যুবক-যুবতীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিষাক্ত ও কলংকিত পরিবেশের মধ্যে একত্রিত করে দেওয়া হলো। তারাই হলো লেখক, গাল্পিক, শিল্পী, সাংবাদিক, সিনেমা আর্টিস্টি, ঘোষক।

চলাফেরা, ক্যাম্প, শিল্পকারখানা, ব্যবসায় কেন্দ্র, অফিস-আদালত ও পথে ঘাটে সর্বত্রই নারী ও পুরুষের— যুবক ও যুবতীদের অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা করা হলো। কেননা আসলে লক্ষ্য হচ্ছে নারীদেরকে চরিত্রহীনা বানানো।

বর্তমান মুসলিম জাহানের নতুন জেগে ওঠা সমাজই হচ্ছে খ্রিস্টীয় ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের আসল টার্গেট। কেননা তারাই হবে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের অবশিষ্ট শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলার জন্যে বড় হাতিয়ার। বিশেষ করে নব্য বয়সের নারীরা। এক ইহুদী লেখক তাদের সম্পর্কে লিখেছে, সমগ্র সমাজটিকে ইসলাম থেকে অনেক দূরে টেনে নেওয়ার জন্যে সকলের তুলনায় অধিক সক্রিয় ও সার্থক হাতিয়ার হবে এই মেয়েরাই।

হ্যাঁ কার্যত হয়েছেও তাই।

একালের শিক্ষিতা যুবতী মেয়ে সবদিক দিয়েই মুক্ত, স্বাধীন। তাদের গর্ভে যদি কখনও সন্তানের জন্ম হয়, তা হলে তারা নিশ্চয়ই শিশু সন্তানের মনে-মগজে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বীজ বপন করবে না। কেননা তারা নিজেরাই তার প্রতি বিশ্বাসী নয়, তাদের বাস্তব জীবন যাত্রার ওপর ইসলামের একবিন্দু প্রভাব নেই। বরং ইসলামী রীতি ও বিশ্বাসের প্রতি তারা বিদ্বেষী, শত্রু ভাবাপন্ন। তারা ইসলামকে রীতিমত ঘৃণা করে। এক্ষণে খ্রিস্টীয় ইহুদী জগতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। বিগত দুই শতাব্দী কাল ধরে যে প্রাণ-পণ চেষ্টা চালিয়েছিল, তা এখনও চালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলিম দ্বীন প্রচারণকারী ও সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমটা তারা এ যাবত করে এসেছে তার দায়ত্ব এখন পালন করে চলছে মুসলিম পরিবার ও সমাজের সেই মেয়েরা, যারা তাদের শিক্ষা ও চরিত্র পেয়ে মনে-প্রাণে-চরিত্রে খ্রিস্টান ইহুদী হয়ে গেছে— তাদের গর্ভে এখন আর মুসলিম সন্তানের জন্ম হয় না। তারা হয় সন্তান প্রসব ছেড়েই দিয়েছে খ্রিস্টান-ইহুদী চক্রান্তে পড়ে, আর কোনো সন্তান প্রসব করলেও তার মন-মগজে ইসলামী আকীদার বীজ তারা বপন করে না। ফলে খ্রিস্টান ইহুদীদের সেই সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা এখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের সে সর্বাত্মক চেষ্টা বন্ধ করা হয়নি। কেননা এতসব আয়োজন সত্ত্বেও তারা তাদের মুসলিম নিধন যজ্ঞের পরিকল্পনাকে পূর্ণত্বে পৌছানোর জন্যে সজাগ রয়েছে। কেননা ইসলামের সাথে শত্রুতা করার জন্যে নিত্য নতুন পন্থার উদ্ভাবন তারা প্রয়োজনীয় মনে করে।

এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এই স্বাধীনা ও মুক্ত নারীর কোনো বিবাহ ইসলামের সাথে নেই। অর্থাৎ অধিকার প্রাপ্তির জন্যে ইসলামের সাথে তাদের কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের সৃষ্ট করার অবকাশ নেই।

কেননা অধিকার দাবির ব্যাপারটির মীমাংসা হতে পারে কেবল ইসলামী শরীয়তকে পুরোপুরি পরিহার করার দ্বারা। অথবা এমন পন্থায়, যা বাহ্যত অতীব সহজ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অধিক বিপধজনক। আর ইসলামের সম্পূর্ণ উৎখাত সাধনের জন্যে তা অবশ্য অধিক কার্যকর আর তা হচ্ছে দ্বীন-ইসলামের অর্থ ও তাৎপর্যকেই পরিবর্তিত করে দেওয়া। বর্তমানের মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবীরা তা-ই করছে।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের বাইরে রয়েছে সাধারণ মুসলিম জনগণ। তারা ইসলামকে ঘৃণা করে, ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসও রয়েছে। যদিও ইসলামকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে চলাকেই তাদের অনেকেই পছন্দ করে না।

এই সাধারণ মুসলিম জনগণ অন্তরে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকা আকীদার পক্ষপাতিত্বকে তারা সেভাবেই রাখতে ইচ্ছুক। আর বেশি হলেও শুধু এতটুকুতেই তারা রাজি যে, ইসলামী আকীদা অনুযায়ী তারা নামায পড়ছে, রোযা রাখছে, কিন্তু এছাড়া আরও কিছু পালন করতে হলে তাদের হৃদয়কে কষ্ট করতে হবে, যা করতে তারা রাজি হচ্ছে না।

তারা সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত সহজ জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তারা চায়, সিনেমা দেখা যতই গুনাহের কাজ হোক, তা তারা দেখবে। টেলিভিশনের নৃত্য ও গান দ্বারা নিজেদের চোখ ও কানকে পরিতৃপ্ত করবে, তা যতই নগ্ন ও অশ্লীল অশ্রাব্য হোক।

এতদ্‌সত্ত্বেও তারা মুসলিম। এই কাথা মনে করে তারা সান্ত্বনা পেতে চায়। তারা মিথ্যা কথা বলবে, গীবত করবে, পরের দোষ তালাস করে করে বের করবে বা বানোয়াট করবে ও শত মুখে প্রচার চালাবে পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে। কেউ চায় না যে তাদের বলে, এটা হারাম আর এটা হালাল। পুরুষরা চায় মেয়েরা ঘরের বাইরে রাস্তা ঘাটে তাদের সাথে ধরাধরি করে আনন্দ স্ফূর্তি ও স্বাদ আস্বাদন করবে।

তাদের মেয়েরা চায়, এই পুরুষগুলোকে যে কোনো উপায়ে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত বানাবার জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালাবে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ অলংকারাদির ও দৈহিক সৌন্দর্য কোনোরূপ গোপনীয়তাকে প্রশয় না দিয়ে প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে বেড়াবে।

আর এই পুরুষ ও নারী উভয়েরই মনের কামনা হচ্ছে, তারা যে কোনো ভুল কাজ করছে এই চেতনাটুকুও যেন তাদের না হয় কেননা তাদের নিয়ত খুবই ভালো।

এভাবে ইসলাম মনের গোপন পরতে লুক্কায়িত একটা আকীদা বা বিশ্বাস মাত্রে পরিণত হয়ে গেছে। বেশির পক্ষে তা এমন আকীদা, যার সাথে কিছুটা নামায-রোযাও আছে। কিন্তু গোটা জীবনের বিধান হবে ইসলাম, বাস্তব জীবন ইসলাম অনুযায়ী যাপন করতে হবে, ছোট বড় সব আদেশ-নিষেধ পালন করে জীবনকে মহা কষ্টের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। পোষাক, খানাপিনা, আইন ও শাসন, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সব কিছুই ইসলাম অনুযায়ী চালাতে হবে— এমন বাধ্যবাধকতা তারা মাথায় তুলে নিতে একেবারেই না-রায। তার প্রয়োজনীয়তাও তারা বোধ করে না।

এসব লোক যদিও উপরিউক্ত বুদ্ধিজীবীদের মতো ইসলামকে ঘৃণা করে না, ইসলামের প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষও পোষণ করে না, তবু এতে সন্দেহ নেই যে, তারা প্রকৃত ইসলামকে গভীর অন্তর দিয়ে গ্রহণ করার পক্ষপাতী নয়।

বর্তমান মুসলিম সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচরণ ও ভূমিকা ইসলামের প্রতি কিরূপ, তা-ই এতক্ষণ বিবৃত হলো।

শেষ পর্যায়ে এদের সাথে মিলিত হয় সেসব লোক, যারা সুবিধাবাদ, স্বার্থ দৃষ্টি ও লালসা-কামনার দরুন ইসলামকে ঘৃণা করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই ঘৃণায় সমান মাত্রায় শরীক রয়েছে সমাজের বড় বড় অহংকারী লোক এবং সমাজের নানা দিক দিয়ে দুর্বল লোকেরা।

কেননা এদের প্রত্যেকেরই একটা সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, আছে নিজস্ব স্বার্থ ও লালসা-কামনা, যাঁর জন্যে দিন রাত উন্মুখ ও অন্বেষী হয়ে থাকে। ধর্ম পালন তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করুক তা তারা পছন্দ করে না। ফলে মুসলিম জাহানেও জাহিলিয়াত প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে, যেমন আধুনিক জাহিলিয়াত সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে।

তা হলে মুসলিম পরিচিত লোকদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকল কারা ? হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও কিছু মুসলিম রয়েছে, যারা সারা মুসলিম জাহানের ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছেন, তারা ব্যক্তি মাত্র। তারা দ্বীন-ইসলামের প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্ব জানেন, তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন, তাকে সাধ্যমত সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন এবং পালনও করেন যতটা সাধ্যে কুলায়। তারা নিঃসন্দেহে জানেন যে, দ্বীন-ইসলামই সত্য, আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্যিকার জীবন বিধান এবং বর্তমান সময় বিশ্বমানবতা যে কঠিন সমস্যাবলীর আবর্তে দিশেহারা, তাদের যাবতীয় সমস্যারও একমাত্র সমাধান হচ্ছে এই ইসলাম।

সেই সাথে তাঁরা এও জানে যে, এই প্রকৃত ইসলামের পথ কিছুমাত্র কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং ভয়াবহভাবে কন্টকাকীর্ণ। এ পথে রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম, রক্ত দান ও অশ্রুবর্ষণের অনিবার্য প্রয়োজন। আল্লাহ্র পথে অবস্থিত কাঁটায় বিদ্ধ হতেও তারা

কাতর নয়। কেননা তারা তার বিনিময় এই পৃথিবীতে পেতে চান, চান না আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে কোনো বিনিময় লাভ করতে।

কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ ঐকান্তিক কামনা ও চেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমান পর্যায়ে কোনো কিছু করিয়ে বা ঘটিয়ে দেওয়ার সাধ্য রাখে না। দলবদ্ধ ও সমষ্টিগত চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা প্রকৃত ইসলামকে কায়েম করার সংগ্রাম তো দূরের কথা, এককভাবেও তারা অত্যাচারী দুর্ধর্ষ নির্মম শাসকদের কড়া শাসনের অধীন টার্গেট হয়ে বসে আছেন, তারা এদেরকেও চিরতরে ধ্বংস করতে সচেষ্ট।

কিন্তু দ্বীন-ইসলামের ব্যাপারে মানুষই নয় চূড়ান্ত ও একমাত্র সিদ্ধান্তকারী।

নিজেদেরকে মুসলিম মনে করে, এমন লোক তো দুনিয়ায় অসংখ্য বাস করছে। তারা নিজেদেরকে মুসলিম ধারণা করেও— বড়ই দুঃখের বিষয়— ইসলামকে পছন্দ করতে পারছে না। তাদের দিন-রাতের তৎপরতা নিয়োজিত রয়েছে জীবনের পৃষ্ঠা থেকে ইসলামের নাম-চিহ্নটুকুও মুছে ফেলার লক্ষ্যে। কিন্তু তবু ওরা এবং ওদের মতো অন্যরা ইসলামের একমাত্র অভিভাবক নয়।

وَلِلّٰهِ مَافِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوْا اللّٰهَ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا - وَلِلّٰهِ مَافِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا - اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا -

আল্লাহ্র জন্যেই সেই সব কিছু যা আছে আসমান জগতে এবং যা আছে পৃথিবীতে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তাদেরকে আমরা অসিয়ত করেছি যে, তোমরা নিজদেরকে রক্ষা করো, আল্লাহ্কে ভয় করো আর তোমরা যদিও কুফরী করো তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ্রই জন্যে রয়েছে যা কিছু আসমান লোকে আছে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আর আল্লাহ্ তো পরবিমুখ এবং মহাপ্রশংসিত। আর আল্লাহ্রই জন্যে আসমান ও জমিনের সবকিছুই। আল্লাহ্ই যথার্থ দায়িত্বশীল, আল্লাহ্ যদি চান— হে মানুষ— তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং অন্য লোকদের নিয়ে আসবে। আর আল্লাহ্ তা করতে খুবই ক্ষমতাবান। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৩১ - ১৩৩)

হ্যাঁ, দুনিয়ার সর্বত্র এক নতুন বংশধর জেগে উঠেছে, যারা মহান আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যাবে......।

আল্লাহ্‌র দিকে বিশ্বমানবতার প্রত্যাবর্তন

আধুনিক জাহিলিয়াত এবং তার ধারক-বাহক তাগুতেরা মনে মনে ধারণা করে বসেছে যে, তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করেছে।

হ্যাঁ, আধুনিক জাহিলিয়াতের এই ধারণাটা নেহায়েত ভিত্তিহীন নয়। এরূপ ধারণা করার তার অধিকার আছে। কেননা যে লোকই দুনিয়ার মানচিত্রের ওপর হালকাভাবে দৃষ্টিপাত করবে, সে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, প্রতিটি দেশের বুকের ওপর জাহিলিয়াতের গঠিত পতাকা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। আর ইসলামের পতাকা সর্বত্রই অবনমিত।

কিন্তু মানবতা আল্লাহ্‌র দ্বীনের একমাত্র অভিভাবক নয়, যেমন পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষে বলে এসেছি।

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

আল্লাহ্‌ই তাঁর ব্যাপারে বিজয়ী, যদিও বহু মানুষই তা জানে না।

(সূরা ইউসূফ ঃ ২১)

জাহিলিয়াত আজই প্রথমবার ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামকে ঘৃণা করা ও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ ও যুদ্ধ করার জন্যে ওঠে পড়ে লাগেনি। এ তো তার চিরকালীন ভূমিকা।

তা হলে ?

তাহলে মানুষ তো আল্লাহ্‌র দ্বীনের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হতে পারে না। ফয়সালা করবেন তো একমাত্র আল্লাহ্‌। তিনিই ইসলামকে যে ভাবে রাখতে চান তাই রাখবেন। দ্বীন-ইসলামের অগ্রগতির পথে জাহিলিয়াত যতই বাধার সৃষ্টি করুক,তাতে কিছুই আসবে যাবে না।

চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহ্‌ই করবেন। তিনি ইসলামের পথের বাধা জাহিলিয়াতকে হয় দূর করে দেবেন, না হয় এই জাহিলিয়াতকেই ইসলামের দিকে হেদায়েত করবেন।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اِنِّىٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ - قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّالَنَرَاكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ

وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ - اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاۤءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ
مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ -

এবং আমরা নূহ্‌কে তার সময়ের লোকদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। সে বলল– হে জনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ কেউ নেই। আমি তোমাদের ওপর কঠিন দিনের আযাবের ভয় পাচ্ছি। জনগণের মধ্য থেকে বড় লোকেরা বললঃ আমরা তো তোমাকে সুস্পষ্ট গুম্‌রাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। বলল ঃ হে জনগণ! আমার মধ্যে কোনো গুম্‌রাহী নেই; আমি তো রব্বুল আলামীনের রাসূল। আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রিসালাত তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিই এবং তোমাদেরকে নসীহত করছি। আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাই জানি, যা তোমরা জানো না। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে উপদেশবাণী তোমাদের মধ্যেরই এক ব্যক্তির কাছে এসেছে দেখে তোমরা বিস্ময় বোধ করছ কি ?... তা এসেছে তো এজন্যে যে, সে তোমাদের সাবধান করবে এবং যেন তোমরা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো এবং যেন তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও। কিন্তু পরে তারা তাকে অসত্য মনে করে অমান্য করল। তখন আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদের নৌকায় আরহন করায়ে বাঁচিয়ে দিলাম এবং ডুবিয়ে মারলাম সেই লোকদেরে, যারা আমার আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করেছে। আসলে ওরা অন্ধ-জ্ঞানহীন লোক ছিল। (সূরা আরাফ ঃ ৫৯-৬৪)

আ'দ কওমের লোকদের প্রতি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম, সে বললঃ হে জনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকো, তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ কেউ-ই নেই। তোমরা কি ভয় পেয়ে নিজেদের বাঁচাবে না ? জনগণের মধ্যে যে বড় লোকেরা কুফরী নীতি গ্রহণ করেছিল তারা বললঃ আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত দেখছি। আর তোমাকে আমরা মনে করি মিথ্যাবাদীদের একজন। বলল, হে জনগণ! না, আমার কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই, আমি তো বরং রাব্বুল আলামীনের রাসূল। আমি তো আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রিসালাত তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী। তোমাদের মধ্যে থেকেই এক ব্যক্তির কাছে হেদায়েতের বিধান এসেছে যেন সে তোমাদের সাবধান করে, তাতে কি তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছ ? তোমরা স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহ-এর পর খলীফা বানিয়ে ছিলেন এবং সৃষ্টির মধ্যে তোমাদেরকে খুবই সচ্ছল-সুস্বাস্থ্যবান বানিয়েছেন। তাহলে তোমরা স্মরণ করো আল্লাহ্‌র অফুরন্ত

নেয়ামতের কথা, সম্ভবত তোমরা সফল হতে পারবে। তারা বললঃ আমরা কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করব এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের মা'বুদদেরকে ত্যাগ করব, এই কথা বলতেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছ ? তাহলে তুমি সেই আযাব নিয়ে আস আমাদের কাছে যাঁর ওয়াদা তুমি আমাদের করছ, যদি তুমি একজন সত্যবাদী ব্যক্তি হয়ে থাকো। সে বললেঃ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি তোমাদের ওপর ফেঠে পড়েছে, এসেছে তাঁর গজব। তোমরা কি আমার সাথে সেই নামগুলো নিয়ে ঝগড়া করতে চাও, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা রেখেছে ? যার পক্ষে আল্লাহ্‌ কোনো সনদ নাযিল করেন নি ?... তাহলে তোমরাও অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে সাথে অপেক্ষায় রইলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা অনুগ্রহ করে হুদ ও তার সঙ্গীদের বাঁচিয়ে দিলাম। আর তাদের মূল উৎপাটন করলাম, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করেছে। তারা আসলে ঈমান আনতেই রাজি ছিল না।

আর সামুদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম তাদেরই ভাই সালেহ্‌কে। সে বললঃ হে জনগণ! তোমরা এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্‌ কেউ-ই নেই। তোমাদের কাছে তো অকাট্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার-প্রতিপালকের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রীটি। এটি তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। অতএব ওটিকে মুক্ত করে ছেড়ে দাও, ওটি আল্লাহ্‌র জমিনে খাদ্য খেয়ে বেড়াবে। ওটির গায়ে কোনো খারাপ মনোভাব দিয়ে হাত লাগিও না। অন্যথায় একটা মর্মবিদারী আযাব তোমাদেরকে পরিবেষ্টিত করবে। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ্‌ আদ বংশের লোকদের পরে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এই মর্যাদা দিলেন যে, আজ তোমরা তার সমতল ভূমিতে উঁচু উঁচু দালান-কোঠা বানাচ্ছ এবং পাহাড়গুলোকে ঘর-বাড়ি রূপে বানিয়ে নিচ্ছ। অতএব তাঁর কুদরতের কীর্তিকলাপের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করো না এবং পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করো না। জনগণের মধ্যে যারা বড় হয়ে বসেছিল সে সব দুর্বল লোকদের ওপর যারা ঈমান এনেছিল, বললে ঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জানো যে, সালেহ্‌ তাঁর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নবী ? তারা বলল ঃ নিঃসন্দেহে যে পয়গাম সহ সে প্রেরিত হয়েছে তার প্রতি আমরা ঈমানদার। সেই বড় অহংকারী লোকেরা বলল ঃ তোমরা যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি কুফরী করেছি। পরে তারা উষ্ট্রীর পা কেটে দেয় ও তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আদেশ অহংকারবশত অমান্য করল। তারা বললঃ হে সালেহ্‌! তুমি যদি সত্যিই একজন প্রেরিত ব্যক্তি হয়ে থাকো, তাহলে সেই আযাব আমাদের ওপর নিয়ে আসো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের

কাছে করেছ। শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ বিপদ তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরেই উল্টোভাবে পড়ে থাকল। আর সালেহ্ তাদের বসতি থেকে এই বলে বের হয়ে চলে গেল যে- হে আমার জনগণ! আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের বহু কল্যাণ কামনাও করেছি। কিন্তু আমি কি করব, তোমরাই তোমাদের কল্যাণকামীকে পছন্দ করো না।

আর লূতকে আমরা নবী বানিয়ে পাঠালাম। সে লোকদের বললঃ হে জনগণ! তোমরা এত নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছ যে, তোমরা এমন নির্লজ্জ কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ কখনও করেনি। তোমরা নারীদের পরিবর্তে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন লালসা চরিতার্থ করছ। সত্য কথা হচ্ছে, তোমরা সর্বশেষ সীমা লংঘনকারী লোক। কিন্তু তার এই কথার জবাবে জনগণের পক্ষ থেকে এছাড়া বলার মতো আর কিছুই ছিল না যে, বহিষ্কৃত করো এই লোকগুলোকে তোমাদের বসতি থেকে, ওরা নিজেদেরকে খুবই পবিত্র চরিত্রের বলে জাহির করছে। শেষ পর্যন্ত আমরা লূত ও তার ঘরের লোকদেরকে— তার স্ত্রী বাদে যারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে ছিল— বাঁচিয়ে বের করে নিয়ে গেলাম এবং সেখানকার জনগণের ওপর এমন বৃষ্টি বর্ষালাম যে, অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছিল, তা সত্যিই দেখার মতো।

আর মাদাইয়ানবাসীদের প্রতি পাঠালাম তাদের ভাই শুয়াইবকে। সে বলল, হে ভাইগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো। কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের ইলাহ্ আর কেউ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর স্পষ্ট পথ-নির্দেশ এসে গেছে। অতএব তোমরা পরিমাপ ও ওজন পূর্ণ কর, লোকদেরকে তাদের পণ্যে ক্ষতি করো না এবং পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করো না, যখন তথায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত যদি তোমরা সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাকো। আর জীবনের প্রতিটি পথে তোমরা ডাকাত হয়ে বসো না যে, লোকদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করণে ও ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধাগ্রস্ত করতে থাকবে। আর সরল ঋজু পথকে বাঁকা করে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হবে। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক। পরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক বানিয়ে দিলেন। আর চক্ষু উন্মুক্ত করে দেখ দুনিয়ার ফাসাদকারীদের কি পরিণাম হয়েছে?

তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক যদি সেই শিক্ষার প্রতি ঈমান আনে, যা সহ আমি প্রেরিত হয়েছি, আর অন্য লোকেরা তার প্রতি ঈমান না আনে তাহলে ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য করতে থাকো, যতদিন না আল্লাহ্ আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিচ্ছেন। তিনিই তো সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। তার জনগণের

মধ্যে অহংকারে নিমজ্জিত লোকেরা তাকে বলতে লাগলঃ হে শুয়াইব, আমরা এবং তোমাদের সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে আমাদের বসতি থেকে বহিষ্কার করে দেবে অথবা তোমরা আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। শুয়াইব জবাবে বললেন, 'আমরা ফিরে আসতে রাজি না হলেও জোরপূর্বক আমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। তাহলে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা দোষারোপকারী হয়ে পড়ব, যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই। অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে নাজাত দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে ওদিকে ফিরে যাওয়া আর কোনো ভাবেই সম্ভব নয়– আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিজেই তা চাইলে ভিন্ন কথা। আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের জ্ঞান সর্ব পরিব্যাপ্ত। তাঁরই প্রতি আমরা নির্ভরতা গ্রহণ করেছি। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমিই আমাকে ও আমাদের জ্ঞানের মধ্যে যথাযথ ফয়সালা করে দাও সত্যতা সহকারে। তুমিই সর্বোত্তম উন্মুক্ততা দানকারী ফয়সালাকারী। জনগণের মধ্য থেকে কাফের হয়ে যাওয়া লোকেরা সাধারণ লোকজনকে বলল ঃ তোমরা শুয়াইবকে মেনে চলবে, তোমরা তখন অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরে মহা ধ্বংস সৃষ্টিকারী একটি আযাব তাদের গ্রাস করে ফেলল এবং তারা নিজেদের ঘরে উল্টে পড়ে রইল। যারা শুয়াইবকে অসত্য মনে করেছিল তারা এমনভাবে নির্মূল হয়ে গেল যে, যেন তারা তাদের ঘরে কখনোই উপস্থিত ছিল না। শুয়াইব এই কথা বলে সেই বসতি থেকে বের হয়ে গেল যে, হে জনগণ ভাইরা! আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনার চূড়ান্ত করেছি, এখন আমি সেই লোকদের প্রতি কেন দুঃখ বোধ করব, যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে।

এমন কখনও হয়নি যে, কোনো জনবসতিতে আমরা নবী পাঠিয়েছি অথচ প্রথমেই আমরা তাদের পাকড়াও করিনি দুঃখ বিপদসহ, এই মনে করে যে, তারা নম্রতা ও বিনয় কান্নাকাটির পন্থা অবলম্বন করবে। পরে আমরা তাদের দুরবস্থাকে অচ্ছলতায় বদলিয়ে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা খুবই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর হয়ে গেল ও বলতে লাগল, আমাদের আগের পুরুষদের ওপরেও অনেক দুঃখ-বিপদ এসেছে। পরে তাদেরকে সহসাই পাক্‌ড়াও করলাম; যদিও তারা টেরও পায়নি। বসতির লোকেরা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করত, তাহলে আমরা তাদের প্রতি আসমান ও জমিন থেকে বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করে বসল, ফলে আমরা তাদের খারাপ কাজের জন্যে তাদের পাকড়াও করলাম, যা তারা নিজেরাই করত।

বসতির লোকেরা কি এই দেখে ভয়মুক্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের পাকড়াও কখনও সহসা রাত্রিকালে এসে পড়বে না, যখন তারা শয্যাশায়ী হয়ে থাকে।

কিংবা বসতির অধিবাসীরা কি এই নিরাপত্তা লাভ করেছে, যে, আমাদের কঠোর শক্ত হস্ত কখনও তাদের ওপর দিনের বেলায় এমন অবস্থায় এসে পড়বে না, যখন তারা খেল-তামাসায় লিপ্ত রয়েছে। ওরা কি আল্লাহ্‌র কৌশলের ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে গেছে ? ওরা কি আল্লাহ্‌র কৌশলপূর্ণ আযাব দানের ব্যাপারে ভয়-মুক্ত হয়ে গেছে ? অথচ আল্লাহ্‌র কৌশলপূর্ণ কাজ থেকে নির্ভীক হয় কেবল সেই লোকেরা, যারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসই হয়ে যায়। (আল-আ'রাফঃ ৬৫-৯৭)

বিশ্বমানবতার প্রতি আল্লাহ্‌র এইরূপই আচরণ হয়ে এসেছে, যার সুদীর্ঘ কাহিনী উপরে উদ্ধৃত হল।

لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ -

কাফের লোকদের সম্পর্কে একথা মনে করো না যে, তারা পৃথিবীতে পালিয়ে আমাকে পরাজিত করে দেবে। (সূরা নূর ঃ ৫৭)

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

আল্লাহ্‌ই বিজয়ী তাঁর নিজের সব ব্যাপারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ২১)

জাহিলিয়াত যতই প্রবল ও প্রচণ্ড হোক, তা কখনোই আল্লহ্‌কে পৃথিবীতে পরাজিত করতে পারবে না। বরং আল্লাহ্‌র সুন্নাতই পৃথিবীতে শাশ্বতভাবে কার্যকর থাকবে চিরকাল। আর তাঁর সুন্নাত হচ্ছে, তিনি মানুষকে কঠিন বিপদ-আপদে নিমজ্জিত করে তাদের পরীক্ষা করেন, সম্ভবত তারা ভয় পেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কাতর হয়ে কান্নাকাটি করবে। কিন্তু লোকেরা যদি ভয়-ই না পায়, তাহলে আল্লাহ্ খারাপকে ভালো দ্বারা পরিবর্তন করে দেন এবং লোকদেরকে অপরিমেয় নেয়ামতসমূহ দান করেন। তাতে তারা মশগুল হয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌কেই ভুলে যায়। বলতে শুরু করে, আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো এরকম বিপদ-আপদে পড়েছিল, আবার তারা বিপুল সচ্ছলতাও পেয়েছে। উভয় অবস্থার মধ্যেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আমরা তাদেরই মত কখনও স্বল্পতা সংকীর্ণতার মধ্যে পড়ে যাই, আবার কখনও বিপুল সচ্ছলতাও লাভ করি। কিন্তু আল্লাহ্‌র সুন্নাত হলো লোকদের অবস্থা যখন উক্তরূপ হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সহসাই তাদের পাকড়াও করেন, যা তারা জানতেও পারে না।

আমরা এক্ষণে অনুভব করতে পারছি, মানবতার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়ে গেছে। হয় জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে— কেননা তারা বিশ্ব-ভূ-মণ্ডলকে জাহিলিয়াতের পাপ-পংকিলতায় কানায়

কানায় ভরে দিয়েছে অথবা এই মানবতার মধ্য থেকেই তিনি একটা নতুন বংশধর গড়ে তুলবেন, যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিশ্বমানবতাকে জাহিলিয়াতের ব্যাপক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে। আসলে আল্লাহ্ই এই ব্যাপারে চির বিজয়ী। যদিও অনেক লোকই তা জানে না, বুঝে না, সেদিকে লক্ষ্য দেয় না।

এক্ষণে আমরা যদি আবার বিশ্ব মানচিত্রের অধ্যয়ন করি, তাহলে প্রথম বারের মানচিত্র দর্শনে যেমন প্রথম দৃষ্টিতেই সমগ্র জগত জাহিলিয়াতের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখতে পাই, তেমনি নিশ্চয়ই দেখতে পাব না। বরং দূরে দূরে কিছু আলোর ঝলকানি দৃষ্টিগোচর হবে।

সেই আলোর ঝলকানিতেই এই গ্রন্থ লেখা হলো। আমরা বলতে চাচ্ছি, জাহিলিয়াতের প্রভাব দিগন্তে নতুন সূর্যের কিরণ ফুটে উঠছে বলে মনে হচ্ছে, একি সেই নতুন দিনের সূর্যোদয়ের পূর্ব লক্ষণ?

গায়বের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা কাউকেই দেননি— আমাদেরও নেই। তবে আমরা আল্লাহ্র শাশ্বত সুন্নাত— অপরিবর্তনীয় নিয়ম– অবশ্যই অধ্যয়ন করতে পারি, সেই আল্লাহ্রই প্রদর্শিত নিয়মে।

আল্লাহ্র সুন্নাত-ই উদাত্ত কণ্ঠে ডেকে বলছে ঃ

হয় আল্লাহ্র দিকে হেদায়েত গ্রহণ করো, না হয় চিরন্তন ধ্বংসের মধ্যে বিলীন হয়ে যাও।

এক্ষণে আল্লাহ্র নির্ধারণে মানবতার চূড়ান্ত ধ্বংসই যদি লিপিবদ্ধ হয়ে না থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ্র দিকের হেদায়েত গ্রহণ একান্তই অপরিহার্য। তৃতীয় কোনো পথ নেই।

আমরা মানবতায় বিশ্বাসী, মানবতার আল্লাহ্র দিকের হেদায়েত গ্রহণ করবে, এই বিশ্বাসও আমাদের রয়েছে। আর এই মহা সুখময় ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ জাহিলিয়াতের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার বুক দীর্ণ করে ঝক্মক করে উঠছে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বর্তমান জাতিলিয়াতের গ্রাসে পড়ে বিশ্বমানবতা এক মহাদুর্ভাগ্যের ও নিতান্তই অশুভ অবস্থার মর্মান্তিক শিকারে পরিণত হয়েছে।

মানুষের দুঃখ, পীড়া, বঞ্চনা ও নিপীড়নের কোনো অন্ত নেই। অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা জনগণের স্নায়ু নিয়ে সম্পূর্ণ রূপে অকর্মণ্য করে দিয়েছে।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, নৈতিকতা, দুই লিঙ্গের মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক ও শিল্প সংস্কৃতি......সব কিছুই চরম ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের গ্রাসে পড়ে গেছে,

মানবতা অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শ্বাসরুদ্ধ প্রায়, আর এই সবই অকাট্য নিদর্শন হচ্ছে মানবতা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

মানবতার এই দুর্ভাগ্য তার সহ্য শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এক মহা আযাব মানবতাকে তিল তিল করে পিষে মারছে।

বর্তমানের জাহিলিয়াত আল্লাহ্র দুশমন। এই কারণে তা মানুষের দুর্ভাগ্য ও জ্বালা-যন্ত্রণার অসীম অবস্থা দেখেও নির্বিকার। অথবা তার আংশিক স্বার্থ-সুবিধা ও লালসা-কামনার চরিতার্থতা মানতাকে এই অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে-ই হতে পারে বলে তা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

কিন্তু ব্যাপার তো জাহিলিয়াতের প্রতিবাদহীনতার নয়। মানবতার গোটা সত্তার গভীর অন্তঃস্থলে ধ্বংস ও বিপর্যয় পরিব্যাপ্ত। অতঃপর নিশ্চিত ধ্বংস, চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়া অবধারিত।

আল্লাহ্র সাথে শত্রুতাকারী মানবতার বর্তমান বংশও চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে অনিবার্যভাবে।

কিন্তু দূর-দিগন্তের নিলিমার কোল থেকে যে নবতর বংশধরদের অভ্যুদয় ঘটতে যাচ্ছে...তারা তো এই অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করছে। এই বিলীয়মান বংশের কাছ থেকে— মানবতার এই নির্মম পরিণাম থেকে অবশ্যই উচিত শিক্ষালাভ করবে। ....তাই বলছিলাম, তারা অবশ্যই আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসবে। বর্তমান বংশধর বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্কে অস্বীকার করছে। কেননা বর্তমান দুনিয়ার বড় বড় শয়তানেরা তাদের বুঝিয়েছে যে, বিজ্ঞান আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের পরিপন্থী। মধ্যযুগীয় এসব কুসংস্কারকে বিজ্ঞান নিতান্তই ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে, সে সবের ব্যাপার চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিজ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতি ও বিকাশ এই শয়তানদের হাতে একটা নিকৃষ্ট ও মারাত্মক অস্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বিজ্ঞানের উন্নতি, অগ্রগতি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানবতা আল্লাহ্ থেকে ততই দূরে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু যে বিজ্ঞানীরা লোকদেরকে কুফরীর দিকে নিয়ে গিয়েছিল তারাই এক্ষণে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করে দিয়েছে।

এখানে আমরা বিজ্ঞানীদের কিছু স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করব, যা পূর্বেও করেছি, তার সাথে আরও কিছু এখানে যোগ করব।

প্রকৃতি পদার্থ বিজ্ঞানী ও অংকশাস্ত্র পারদর্শী স্যার জিমস্ জীন্স বলেছেনঃ প্রাচীন বিজ্ঞানী আমাদের বলত, প্রকৃত পদার্থ কেবল একটি মাত্র দিকেই গতিবান, যে দিকটি তার জন্যে চিরদিনের জন্যে স্থির ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এটা কার্যকারণের শেষহীন ধারাবাহিকতা 'ক' সংঘটিত হলে 'খ' অবশ্যই সংঘটিত হবে।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলছেঃ 'ক' এর পর 'খ'ও আসতে পারে। আসতে পারে 'গ' বা 'ঙ'-ও। খুব বেশি বলতে শুধু এতটুকুই বলা যায়,'খ' আসার সম্ভাবনা 'গ' আসার সম্ভাবনার তুলনায় বেশি এবং গ ও ঙ আসার সম্ভাবনাকে নতুন করে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু দৃঢ় নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। কেননা আধুনিক বিজ্ঞান কেবল সম্ভবনার বিষয়েই কথা বলতে পারে, আর যা অনিবার্যভাবে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, তা মূল্যমানের ওপর ছেড়ে দেওয়া।

ফ্রাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক অর্নেস্ট চার্লস রাসেল বলেছেন ঃ

> নিষ্প্রাণ প্রস্তর জগত থেকে কি ভাবে জীবন উন্মোচিত হল, এই পর্যায়ে কয়েক প্রকারের মতবাদ উপস্থিত করা হয়েছে। কোনো কোনো গবেষকের মত হচ্ছে জীবন 'প্রোটোজীন' থেকে উদ্ভূত অথবা 'নীলকান্তমণি' থেকে হয়েছে কিংবা প্রোটিন-এর কোনো কোনো বড় বড় অংশের পারস্পরিক মিলিত হওয়ার কারণে উন্মোচিত হয়েছে। লোকদের ধারণা, প্রস্তুর জগত থেকে জীবন রূপায়িত হওয়ার মধ্যবর্তী শূণ্যতা পূরণ করে দিয়েছে। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, প্রস্তর থেকে জীবনের উন্মেষ লাভ সংক্রান্ত সমস্ত মতবাদই সম্পূর্ণ ভুল। কেননা হঠাৎ করে যা ঘটনাবশত কতিপয় অংশের একত্রে মিলিত হয়ে যাওয়ার দরুন জীবন উন্মোচিত হয়েছে তার পরে তা সেই রূপ ধারণ করছে, যা আমরা জীবন শেষে লক্ষ্য করছি— আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকারকারী কোনো ব্যক্তিও এই কথার সমর্থনে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীনতা রয়েছে, ইচ্ছা হলে জীবন উন্মোচিত হওয়া পর্যায়ের এই বিশ্লেষণটিকে নির্ভুল মেনে নিতে পারে। এই বিশ্লেষণকে সত্য মেনে নেওয়ার পর— মানুষ আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতা গ্রহণ করলে তিনি স্বীয় নির্ভুল ব্যবস্থাধীন সবকিছু সৃষ্টি করেছেন— যতটা জটিলতার মধ্যে পড়ে যেতে পারে, তার চাইতেও অনেক বেশি জটিলতার মধ্যে পড়ে যাবে। আমি মনে করি, প্রতিটি জীব-কোষে এতবেশি জটিলতা নিহিত যে, তা অনুধাবন করা খুবই কঠিন। পৃথিবীর বুকে বিরাজমান কোটি কোটি জীব কোষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের নির্ভুল ও অকাট্য সাক্ষ্য পেশ করছে। এই কারণে আমি তো আল্লাহ্‌র প্রতি অতীব দৃঢ়তা সহকারে ঈমান এনেছি।

'উইলিয়াম এয়ারফ' এডী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লব্ধ উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ ও মিশগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি বলেছেন ঃ

> বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদেরকে এই জ্ঞান দিতে অক্ষম যে, এই অশেষ ও অসাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুসমূহ কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করল। আর জীবন

রূপায়নে সেগুলো পরস্পরে কিভাবে মিলিত হয়। আমি প্রাণী তত্ত্ব অধ্যয়নে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করেছি। জীবনের অধ্যয়নের জন্যে প্রাণীবিজ্ঞান একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ও কেন্দ্র। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের অধ্যয়ন একটি চিন্তাকর্ষক ব্যাপার। পথের পার্শ্বে উদ্ভূত ত্রি-পত্র উদ্ভিদ (Terfoil)-কে দেখো, মানুষের বানানো সমস্ত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার সমৃদ্ধ ও এই সামান্য নগণ্য উদ্ভিদের সমান হতে পারে না। তা একটি জীবন্ত যন্ত্র যা রাত দিন সর্বক্ষণ কর্মে নিরত এবং সহস্র রাসায়নিক ও পদার্থগত অবস্থা অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে। আর এই সমস্ত কার্যক্রম প্রোটোপ্লাজমের অধীন হচ্ছে। তা-ই হচ্ছে সেই জড় পদার্থ যা সমগ্র জীবন জগতের রূপায়ণে অঙ্গীভূত হয়, তাহলে এই জটিল জীবন্ত যন্ত্র কোথেকে এলো ? ... আল্লাহ্‌ই তো সৃষ্টি করেছেন এবং তা তিনি কেবল এই একটিকেই এমনিভাবে সৃষ্টি করেন নি; তিনি জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকটিকে স্বশক্তিতে বেঁচে থাকার ও নিজেকে রক্ষা করার সমর্থ বানিয়েছেন। তাকে যুগের পর যুগ ধরে অব্যাহত থাকার যোগ্যতাও দিয়েছেন। সেই রক্ষা করছে স্বীয় সব বিশেষত্ব ও পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য। এই জিনিসই তাকে অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে পৃথক হয়ে থাকার কাজে তাকে সাহায্য করে।

জীবনের বিপুলতার অধ্যয়ন আল্লাহ্‌র কুদরত প্রকাশে অধিক সাহায্যকারী এবং জীব-জগত অধ্যয়নে অধিক প্রেরণা দানকারীও।

এখানে শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলাম। এগুলো নিতান্তই নমুনাস্বরূপ মাত্র। এসব এমন একখানি গ্রন্থ থেকে গৃহীত যার একটার মধ্যেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকারের বহুশত উক্তি শামিল রয়েছে। যদিও এর বেশ কয়েকটির ওপর জাহিলিয়াতের প্রচ্ছায়া পড়েছে বলে স্পষ্ট মনে হয়।[১]

বিজ্ঞানীদের এমনি সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি অসংখ্য রয়েছে। এরা সেই বিজ্ঞানী যারা বর্তমান সময়ের মানব বংশকে কুফরীর দিকে টেনে নিয়েছিল। আর এক্ষণে তারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছে।

বর্তমান যুগের বিভিন্ন জীবন ব্যবস্থার ধ্বংসও বিশ্বমানবতাকে আল্লাহ্‌র দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দিকের পথ দেখাচ্ছে।

পুঁজিবাদ দুনিয়ার বহু দেশেই একটি বিশ্বাস ও সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি, ধ্বংস হয়ে গেছে, যদিও আমেরিকায় বর্তমনেও তা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। কিন্তু সেখানেও তা এখন মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে, অন্যান্য দেশে তার যে নিশ্চিত অনিবার্য পরিণতি হয়েছে, তথায়ও তাই হতে যাচ্ছে। তবে তা অর্থনৈতিক বা বস্তুগত কিংবা ঐতিহাসিক নিশ্চিত অনিবার্যতার ভিত্তিতে নয়, তার

১. বিজ্ঞানের যুগে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট স্বীকৃতি।

বিলুপ্তি হবে আল্লাহ্‌র সুন্নাতের ভিত্তিতে। কেননা অন্যায় জুলুম শোষণের পথে তা সীমালংঘন করে গেছে, কাজেই আল্লাহ্‌র সুন্নাত অনুযায়ী তার বিলুপ্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

কমিউনিজম সমাজতন্ত্র জাতিলিয়াতের নতুন উৎপাদন, তাও বিলুপ্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তীব্র গতিতে।

১৯৬৪ সনের মার্চ মাসে ক্রুশ্চেভ বলেছিল, শ্রমকিদের মজুরিতে নিরংকুশ সমতার ব্যবস্থা খতম করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অধিক উৎপাদনের জন্যে ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উৎসহ দেওয়ার জন্যে সেই অনুপাতে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া উপায় নেই। এছাড়া সামষ্টিক সমাজতান্ত্রিক চাষ প্রথা উৎপাদনের চরম ব্যর্থতা নিয়ে এসেছে।[১]

ক্রুশ্চেভের এই কথা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতাই প্রমাণ করে অকাট্যভাবে। শুধু তাই নয় এই উক্তি মার্কসবাদ লেনিনবাদের স্পষ্ট অস্বীকৃতি। অথচ কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র বলতে তো ঐ ব্যবস্থাকেই বোঝায়। তা ত্যাগ করে অপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য প্রমাণ করেছে। কিন্তু কি গ্রহণ করা হবে, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

আধুনিক জাহিলিয়াতের প্রধান খুঁটি তো এই দুই ব্যবস্থাই। এই দুটিই যদি বিলীন হয়ে যায়, একটি দৃঢ় মত, বিশ্বাস হিসেবে যদি টিকেই না থাকে, তাহলে নবতর এক ব্যবস্থার দিকে চলে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কি উপায় হতে পারে! অবশ্য এ দুটির সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রতি আমরা কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না। কেননা এই শক্তির কোনো নিশ্চয়তা নেই। আসল শক্তি হচ্ছে বিশ্বাস ও মতাদর্শ। তাই রাজনৈতিক শক্তি সংগ্রহ ও সুসংবদ্ধ করে এবং জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাই নিয়ে আসে প্রকৃত সাহায্য ও বিজয়।

এর পর থাকে একমাত্র ইসলাম।

অবশ্য পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পর ইসলামের নতুন কোনো বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি।[২] তবে উক্ত দুটি জীবন ব্যবস্থা দুই প্রান্তিক সীমায় পৌঁছে যাওয়া ব্যবস্থা। একটি যদি চরম ডানদিকে অবস্থিত তাহলে অপরটি চরম বাম দিকে। মধ্যবর্তী জীবন ব্যবস্থা একমাত্র ইসলাম। আল্লাহ্‌ই এই নামকরণ করেছেন এবং এর অনুসারী ও ধারক-বাহকদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিমীন'।

---

১. ক্রুশ্চেভের পর রাশিয়ায় কয়েক দফা বিপ্লব ঘটেছে; কিন্তু মজুরি পর্যায়ে সর্বশেষ বিপ্লবও ক্রুশ্চেভের সিদ্ধান্ত থেকে ব্যতিক্রম কিছু হয়নি।

২. বিগত তিন-চার বছর ধরে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত তার ফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, যদিও উভয় শক্তিই তাকে ব্যর্থ করতে চাচ্ছে।— অনুবাদক

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ -

তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, এর পূর্বে এবং এই গ্রন্থেও, যেন রাসূল তোমাদের সাক্ষী (পথ-প্রদর্শক) হয়, আর তোমরা হও লোকদের ওপর সাক্ষী (পথ-প্রদর্শক)। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

এমনিভাবেই আমরা বানিয়েছি তোমাদেরকে এক উন্নত মধ্যম মানের উম্মত, যেন তোমরা সাক্ষী (পথ-প্রদর্শক) হও এবং রাসূল হবে তোমাদের সাক্ষী (পথ-প্রদর্শক)। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

এসব যেমন সুসংবাদ, অকাট্য দলীল, যা প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বমানবতাকে অবশ্যই আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসতে হবে।

এ পর্যন্ত যে-কয়টি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছাড়াও ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, যা এসব কয়টির অপেক্ষাও অধিক প্রকটভাবে প্রমাণ পেশ করছেন যে, বিশ্বমানবতা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র দিকেই ফিরে আসবে।

আমেরিকা আধুনিক জাহিলিয়াতের প্রাণকেন্দ্র। আমেরিকাই এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামকে চূড়ান্তভাবে খতম করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে।[১] এ উদ্দেশ্যে বৈষয়িক উপায়-উপকরণ-অস্ত্র ও কৌশল যতকিছু সংগ্রহ ও ব্যবহার করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল, সবই সে করেছে, কিছুই বাদ রাখেনি। ইতিহাসের জাহিলিয়াত যত নিকৃষ্টতম উপায়ই আজ পর্যন্ত ব্যবহার করেছে, তা সবই সে করেছে। তাতে সমানভাবে শরীক রয়েছে খ্রিস্টান ইহুদী ষড়যন্ত্র। কেননা উভয়েরই চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামকে হত্যা করা। এই উদ্দেশ্য যেখানেই কোনো ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকেই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চেয়েছে। তারা এই আত্মপ্রতারণায় পড়ে গেছে মনে করে বসেছে, ইসলামকে তার জন্মস্থানেই নির্মূল করে দিয়েছে। এক্ষণে ইসলামে টিকে থাকার বা মোকাবিলায় মাথা তোলার কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই। সর্বত্রই জাহিলিয়াতের ভক্ত-অনুরক্তরা আনন্দে ও উৎফুল্লতা সহকারে নিজেদের সিংহাসনে আসীন হয়েছে এবং নিজেদের সাফল্য দেখে হাত তালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে।

---

১. এশিয়ার ইরানে আমিরিকা যা করেছে, তা তথাকার ইসলামী বিপ্লবকে প্রথমে রুখবার জন্যে এবং পরে তাকে অংকুরেই খতম করার লক্ষ্যে করেছিল, এখনও করে যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছুই চরম ব্যর্থতায়র পর্যবষিত। ইরানে ইসলামী জীবন-বিধান পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই আমেরিকাতেই একটি জীবন্ত ও সক্রিয় ইসলামী আন্দোলন জেগে উঠেছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এটা নিশ্চয়ই জাহিলিয়াতের প্রতি মহান আল্লাহ্র একটা বিদ্রূপ। জাহিলিয়াতের গালে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত। তার কপালে লেপিত একটি বড় রকমের কলংক! আল্লাহ্র দ্বীনের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রকারীদের ব্যর্থতার এমন একটা অকাট্য প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলাই এর ব্যবস্থা করেছেন।

অথচ খ্রীষ্টীয়-ইহুদীবাদে মিলিত শক্তি ইসলামী দেশগুলোর অভ্যন্তরেই ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে চেষ্টার কিছুই বাকী রাখেনি।

এক্ষণে তাদের নিজেদের ঘরের অভ্যন্তরেই সহসা এই দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো পথই তারা খুঁজে পাচ্ছে না। এ আন্দোলন একটুও থেমে নেই, ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ও ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে আমেরিকার ইসলাম দুশমনশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। সে শক্তি ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নকামী মুসলিমদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার-জুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। বহু মানুষকে বিনা অপরাধে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। এ ছাড়া ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা প্রচার করে জনগণের মনে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও ঘৃণারও উদ্রেক চলেছে। মুসলমানদেরকে সেই পরিবেশের মধ্যে আটকে দেওয়ারও প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে, যা তারাই মুসলিম দেশগুলোতে আগে থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, এই ঘটনাটি তারই একটি নমুনা।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ -

ইসলামের দুশমনেরা অনেক ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহ্ তাদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আর আল্লাহ্ই হচ্ছেন ষড়যন্ত্র ব্যর্থকারীর সর্বোত্তম ব্যবস্থাকারী। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৪)

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ج فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ -

ওরা কি আল্লাহ্র ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে ? (সূরা আরাফ ঃ ৯৯)

আল্লাহ্র ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরাপত্তা বোধ করে কেবলমাত্র ফাসিক ব্যক্তিরা।

ভবিষ্যতে দুনিয়ায় কি ঘটতে যাচ্ছে উপরি উল্লিখিত ঘটনাটি তার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত।

জাহিলিয়াত তো মনে করে বসেছে যে, তা দুনিয়ার বুকে দ্বীন ও ধর্মের সব ছায়া চিরদিনের জন্যে বিলীন করে দিয়েছে। দ্বীন সম্পর্কিত ধারণাকেও তারা অসম্ভব বানিয়ে দিয়েছে তাদের যাবতীয় জাহান্নামী উপায় উপকরণ ব্যবহার করে।

কিন্তু না, আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে মানুষ কখনোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী হতে পারে না। যেসব লোক জাহিলিয়াতের গর্ভে জীবন যাপন করছে এবং জাহিলিয়াতের সমস্ত বিষ দিনরাত আকণ্ঠ পাণ করতে বাধ্য হচ্ছে, তারা যদি হঠাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে বসে, জাহিলিয়াতের সে বিষগুলো উপড়িয়ে ফেলে দেয়, আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং দুনিয়ার মুসলমানরাও তাদের ব্যাপারে বিশেষ কৌতুহলী হয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহ্‌র সুন্নাত কাজ শুরু করে দিয়েছে। এটা তার একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত।

এই ধরনের ঘটনা ও জাতিলিয়াতের অধীন বসবাসকারী মানুষের এমনিভাবে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন তা যে কারণে ও যে পথেই হোক— অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতের বিশ্বমানবতা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে।

আর এ কাজ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে খুব সহজেই তাঁর নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। এখনকার দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকেও আমরা এই কথার বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি। মানুষ সত্যিই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। জাহিলিয়াত যত ষড়যন্ত্রই করুক, আসতে যতই বাধা দিক, এসে যাওয়া লোকদেরকে ফিরে যেতে যতই বাধ্য করুক, মহান আল্লাহ্‌র দিকে লোকদের প্রত্যাবর্তনকে রোধ করার সাধ্য কারোরই নেই। তারা এখনও যা করছে, যতই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, আল্লাহ্‌র কাছে তার এককানা-কড়িও মূল্য নেই। তিনি নিজেই যদি দুনিয়ায় ইসলামের বিজয় চান ও তার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে এ সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কেননা 'আল্লাহ্ তাঁর নিজের ব্যাপারে সর্বজয়ী ... ... যদিও অনেক লোকই তা জানে না।'

মুসলিম দেশগুলোর অধিবাসী তথাকথিত মুসলমানরা আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের অকর্মণ্যতা অপদার্থতার জন্যে আফ্‌সোস করেও কুল-কিনারা পাবে না।

কেননা দ্বীনের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ায় বরং তার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করায় এবং এক আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা না করায়,

জাহিলিয়াতের অন্ধ অনুসরণ করতে ব্যস্ত থাকায়, জীবনের জাহিলী ব্যাখ্যা গ্রহণ করায় এবং জাহিলিয়াতের দেওয়া দ্বীনের ভুল ব্যাখ্যা নীরবে মেনে নেওয়ায় মুসলিম উম্মত যে মহা অপরাধ করেছে, তার জন্যে আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব থেকে তারা কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না।

ভবিষ্যতে মুসলমানদের এই গুনাহর মাত্রা আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে, যখন এসব নামকাওয়াস্তের মুসলমানরা তাদের অজ্ঞতা-মুর্খতা, দুর্বলতা ও সাহসীকতা, তাদের নফসের খাহেশ অনুসরণ ও চরম লাঞ্ছণা-গঞ্জনার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে যাবে, অথচ বিশ্বমানবতা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে 'স্বাগতম' জানাবার জন্যে— তাকে জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার দিক দিয়ে অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে যাবে।

তখন আল্লাহ্‌র দ্বীন তো কায়েম হয়ে যাবে; কিন্তু মুসলিম নামধারীরা সেই দ্বীনের প্রতি নিজেদের অনাগ্রহ, অপমান ও চরম উপেক্ষার আচরণ করেই যাবে। কেননা—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থাকে পরিবর্তিত করে দেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা উঠে নিজেদের অবস্থাকে পরিবর্তিত করে দেবে। (সূরা রা'আদ ঃ ১১)

সেই সাথে এই সত্য অনস্বীকার্য যে, যেসব লোক নিজেদের জন্যে নিজেরাই অপমান, লাঞ্ছণা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে বিশেষ বিশেষত্ব বানিয়ে নেবে, আল্লাহ্ কখনোই তাদের হাতে দ্বীন-ইসলাম বিজয় সূচিত করেন না।

প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর দ্বীনের মান-মর্যাদা সংরক্ষণ ও বিজয়-সাধনের জন্যে ওদের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ও নতুনতর জনগোষ্ঠী সংগ্রহ ও তৈরি করে নেন, যারা নিজেরা সাগ্রহে ইসলামের আনুগত্য করবে এবং প্রকৃত ইসলামকে নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যাবে।

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا -

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন হে লোকেরা, আর তোমাদের স্থলে অন্য লোকদের নিয়ে আসবেন। আর আল্লাহ্ তো তা করতে সর্বতোভাবে সক্ষম। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৩৩)

আর এই নবাগত জনগোষ্ঠী যখন ইসলামকে গ্রহণ করে ইসলামের বিজয় পতাকা উর্ধ্বে উড্ডীন করে এগিয়ে যাবে, তখন এই নামধারী মুসলমানরা লজ্জা-

শরমে, অপমান-অসম্মানে মস্তক অবনত করে দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের পক্ষে তখন হয়ত কিছুই করা সম্ভব হবে না।

তারা তাদের কাল-নিদ্রায় নিমজ্জিত থাক কিংবা তারা ইসলামকে নিয়ে উঠুক, তাতে কোনো পার্থক্য হবে না।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিরুদ্ধে এই পাগলা যুদ্ধ ও হীন ষড়যন্ত্র থেকে যাক কিংবা পাগলীয় উল্লাসে ও পূর্ণ দাপট সহকারে তা বলতেই থাকুক, তাতেও অবস্থার মধ্যে কোনো তারতম্য ঘটবে না।

মানুষ আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে। ভবিষ্যতের মানুষ নামধারী মুসলমান...বংশীয় মুসলমান হবে না, তারা হবে প্রকৃতই খাঁটি মুসলিম।

আজ বিশ্বব্যাপী কুফর-এর সর্বগ্রাসী রাজত্ব। আজ বিশ্বমানবতা কঠিনতর আযাব ও শোষণ-পীড়নে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তাগুতী অন্ধকার সারা পৃথিবীকে গ্রাসের মধ্যে নিয়ে গেছে তা যতই হোক, ভবিষ্যতের পৃথিবী আল্লাহ্‌র দ্বীনের নির্মল আলোতে ততই সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে আলোকচ্ছটা জাহিলিয়াতের অন্ধকারের বুক দীর্ণ করেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

আল্লাহ্‌র দ্বীন আগামী কালের পৃথিবীর নির্মেঘ আকাশে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্যের মত দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে।

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে দ্বীনের সূর্যের সেই অভ্যুদয় স্বচক্ষে দেখতে পারব কিংবা আমাদের পরবর্তী বংশধরই হয়ে উঠবে সে দ্বীনের সূর্যসেনা, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

কিন্তু বিশ্বমানবতা যে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে, পুরোপুরি গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করবে আল্লাহ্‌র এই দ্বীনকে তাতে আমাদের মনে এক বিন্দু সন্দেহ বা সংশয় নেই।

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ -

আল্লাহ্ তাঁর দ্বীন-এর আলোকে সম্পূর্ণ করে দেবেন, কাফের মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা সফ ঃ ৮)

সমাপ্ত